কবিতা পাঠ

1. কবিতা পাঠ
2. রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা
3. পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল
4. কাশীরাম দাস
5. প্রশ্ন

শব্দার্থ ও টীকা

1

কবিতাপাঠ

1.1 প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের মতে কবি নিজের অন্তর থেকে 'বচন' কথা বা শব্দসম্ভার সংগ্রহ করে আনন্দলোক সৃষ্টি করেন। শব্দে, সংগীতে, উপমায়, চিত্রকল্পে ও অনুভূতিকে প্রকাশই হচ্ছে কবিতা।

কবিতার দুটি দিক : (১) ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক (২) রূপগত দিক। প্রথমে কবিতায় কী ভাব বা বিষয় প্রকাশ পেয়েছে তা খুঁজে বার করে সেই ভাব বা বিষয়ের মধ্যে মানবজীবনের কোন্ সত্য প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করতে হবে। তারপর কবিতার ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কবিতার শব্দ, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প কীভাবে সাহায্য করেছে তার বিচার করতে হবে।

আনন্দলোক = আনন্দের জগৎ।

অলংকার = কবিতায় অলংকার বলতে বোঝায় অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ইত্যাদি।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় প্রায় সব দেশের সাহিত্যের সূচনা হয়েছে কবিতা দিয়ে। তার কারণ সুদূর অতীতে যখন লেখার চল ছিল না তখন মানুষ সেসব ঘটনা, অনুভূতি বা আবেগকে স্মরণীয় করে রাখতে চাইত। সেই সব ঘটনা অনুভূতি বা আবেগকে ছন্দের বাঁধনে বেঁধে মনে রাখার চেষ্টা করত। তারপর লেখার চল হলে সেই ছন্দে বাঁধা রচনাগুলো লিখে রাখতে লাগল। এই ভাবে কবিতা লেখার সূত্রপাত হল। লেখার ক্ষেত্রে গদ্যের চল হয়েছে অনেক পরে। অন্য ভাষার সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও সূচনা হয়েছে কবিতা দিয়ে। দশম, দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে বৌদ্ধ সাধকেরা যেসব চর্যাপদ লিখেছিলেন সেগুলিই বাংলা কবিতা বা কাব্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। চর্যাপদগুলি ধর্মীয় অনুভূতিনির্ভর ছোটো কবিতা। এর পর নানা ঘটনা ও কাহিনি নিয়েও বড়ো আকারের কবিতা লেখা হল। শুরু হল আখ্যানকাব্য লেখা। এইভাবে বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল দু ধরণের কবিতা (১) ছোটো আকারের খণ্ড কবিতা; (২) বড়ো আকারের আখ্যান কাব্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি :

- কবিতা কী সে সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করতে পারবেন;
- কবির হৃদয়াবেগ ফুটিয়ে তুলতে কবিতার ভাষা ও ছন্দ কীভাবে সাহায্য করে জানতে পারবেন;
- কবিতায় অলংকার ও চিত্রকল্প কী কাজ করে জানতে পারবেন;

- প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- কবিতাতে চিত্রকল্পের স্থান কোথায় জানতে পারবেন;
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন;
- উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্যের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- মহাকাব্য ও গীতিকবিতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

1.3 বিষয়ের রূপরেখা

ক) ছন্দ

কবিতার বাণীরূপের একটি প্রধান উপকরণ হল ছন্দ। কবিতায় মনের ভাবকে স্মরণীয় করে রাখা হয় বলে কবিতায় বাক্যগুলিকে বিশেষভাবে সাজাতে হয়। কবিতায় বাক্যগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি অনুযায়ী সাজানো হয়। কবিতার বাক্যে এই নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি তরঙ্গের বিন্যাসই হচ্ছে কবিতার ছন্দ। আর এই ধ্বনি তরঙ্গের ক্ষুদ্রতম মাপটি হচ্ছে তার মাত্রা।

বাংলা কবিতায় ছন্দের মাত্রাবিন্যাস নানাভাবে হয়। কারণ এই মাত্রাবিন্যাস বা মাত্রার পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ভর করে শব্দের মধ্যে কয়টি দল আছে তার উপর। দল হচ্ছে কথা বলার সময় শব্দের যে অংশটি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। যেমন : ‘জলধর’— এই শব্দটি আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারি না, প্রথমে ‘জ’ উচ্চারণ করে তারপর একটু দম নিয়ে ‘ল’ উচ্চারণ করি, তারপর একটু দম নিয়ে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি ‘ধর’। এই জ[১] ল[১] ধর[১] — জলধর শব্দের তিনটি দল। দল আবার দুই ভাগে বিভক্ত : মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল। যে দলের শেষে স্বরধ্বনি আছে তাকে বলে মুক্ত দল, আর যে দলের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে তাকে বলে রুদ্ধ দল। এ দিক থেকে জলধর শব্দের প্রথম দুটি ‘জ’ ও ‘ল’ হচ্ছে মুক্তদল। কারণ এদের উচ্চারণ শেষ হচ্ছে স্বরধ্বনি ‘অ’ দিয়ে, কিন্তু ‘ধর’ হচ্ছে রুদ্ধ দল, কারণ এর উচ্চারণ শেষ হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি ‘ধর’ দিয়ে। সাধারণ ভাবে সব ছন্দেই মুক্ত দলের মাপ হচ্ছে এক মাত্রা। কিন্তু রুদ্ধ দলের ক্ষেত্রে এক এক ছন্দে এক এক মাপ বা মাত্রা দেখা যায়। এ দিক থেকে ছন্দের মধ্যে তিনটি ধরন বা রীতি লক্ষ্য করা যায়।

এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল উভয়েরই মাপ এক মাত্রা। যেমন : ‘নিরুদ্দেশ’ এই রীতিতে নি/রুদ্/দেশ্ = ৩ মাত্রা। আর এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল একমাত্রা হলেও রুদ্ধদল দুই মাত্রা। যেমন: নি/রু/দ/দে/শ্ = ৫ মাত্রা। তৃতীয় আর এক ধরনের ছন্দে মুক্ত দল এক মাত্রা হলেও শব্দের শেষের রুদ্ধ দল দুই মাত্রা। কিন্তু শব্দের ভেতরকার রুদ্ধদল একমাত্রা, যেমন: নি[১] রুদ্[১] দেশ[২] (এখানে ‘রুদ’ রুদ্ধ দল হলেও শব্দের মাঝখানে আছে তাই একমাত্রা, কিন্তু রুদ্ধদল ‘দেশ’ শব্দের শেষে আছে বলে এর দুই মাত্রা) কাজেই বোঝা যাচ্ছে মুক্ত দলের মাত্রা সব ধরনের ছন্দেই একরকম হলেও রুদ্ধ দলের মাপ এক এক ছন্দে এক এক রকম। রুদ্ধ দলের মাত্রা তিন ধরনের ছন্দে তিন রকমের হয় বলে ছন্দবিজ্ঞানীরা বাংলা ছন্দরীতিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

১) প্রথম রীতির ছন্দটির নাম দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান:

যেমন,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান = ৪+৪+৪+১

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১১ ১
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান = ৪+৪+৩+১

২) দ্বিতীয় রীতির ছন্দটির নাম কলাবৃত্ত বা ধ্বনি প্রধান:

যেমন,
১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
সা-গর জলে সি-নান ক-রি স-জল এ-লো চুলে = ৫+৫+৫+২

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ব-সিয়া ছি-লে উপল উ-প কূলে = ৫+৫+২

৩) তৃতীয় রীতির ছন্দটির নাম কলাবৃত্ত বা তান প্রধান:

যেমন,
১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে = ৮+৬
১ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে = ৮+৬

বাংলা ছন্দের এই তিন ধরনের মূল রীতিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কবি ছন্দের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধান। তিনি গদ্য ছন্দের কবিতাও লিখেছেন। একে বলে গদ্য কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পরে আরও অনেকে গদ্য কবিতা লিখেছেন। আপনাদের পাঠ্য বইয়ে ‘নাজমা’ কবিতাটি এই রকম গদ্য কবিতার উদাহরণ।

পাঠগত প্রশ্ন 1.1

ক) দুদিকের অংশ ঠিকমতো যোগ করুন

(১) ছন্দ হচ্ছে	(i) একটি গদ্য কবিতা।
(২) মাত্রার পরিমাণ নির্ভর করে	(ii) শব্দের দল অনুযায়ী
(৩) দল হচ্ছে	(iii) ছন্দ তিন প্রকার।
(৪) ধরন অনুযায়ী	(iv) নির্দিষ্ট মাপের ধ্বনি অনুযায়ী কবিতার সাজানো বাক্য।
(৫) ‘নাজমা’ হচ্ছে	(v) এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত শব্দের অংশ।

1.4 খ) অলংকার

কাব্যকে কবি নানাভাবে সাজিয়ে তোলেন। তখন কাব্য হয়ে ওঠে রূপময়। কাব্যকে সাজিয়ে তোলার জন্য যে সব সাজসজ্জার ব্যবহার করা হয় সেগুলিকেই বলা হয় অলংকার। কাব্যে অলংকার গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির সব উপাদানকেই অলংকার বলা হয়েছে। বাক্যকে শব্দ ও অর্থ দিয়ে সাজিয়ে দিলেই কাব্য হয় না। এইজন্য কাব্যের বাক্যে দুভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি বা অলংকার প্রয়োগ করা হয়। ১) কাব্যের শব্দ ব্যবহারের

শব্দার্থ ও টীকা

বিষ্টি = বৃষ্টি।
নদেয় = নদীতে।
কন্যে = কন্যা।

সিনান = স্নান।
এলো = খোলা।

মধ্যে, (২) বাক্যের অর্থবিস্তারের মধ্যে। এজন্য অলংকার দুই শ্রেণির: শব্দালংকার ও অর্থালংকার।

শব্দের সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য যে অলংকার ব্যবহার করা হয় তাকে বলে শব্দালঙ্কার। যেমন:

‘গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে’।

এখানে ‘গ’ ধ্বনিটি বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে বার বার ঘুরে ঘুরে এসে একটা ধ্বনি-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এই সৌন্দর্য শব্দের বিশেষ কৌশলী প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। এজন্য এখানে শব্দালংকারের প্রয়োগ ঘটেছে। এই শব্দালংকারের নাম **অনুপ্রাস**। অনুপ্রাস ছাড়া আরও দুটি বিশিষ্ট শব্দালংকার **শ্লেষ** ও **যমক**।

শ্লেষ— কবি যখন বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পাঠকও বিভিন্ন অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করেন তখন শ্লেষ অলংকার। যেমন :

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা)

এখানে ঈশ্বর কবির নাম ও ভগবান এই দুই অর্থে বোঝাচ্ছে। প্রভাকরেরও দুই অর্থ ১) সূর্য ২) ঈশ্বর গুপ্ত।

যমক— দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনি সমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হলে হয় যমক অলংকার। যেমন, ‘ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে’। এখানে প্রথম ‘ভারত’ কবি ভারতচন্দ্র, দ্বিতীয় ‘ভারত’ ভারতবর্ষ।

অর্থালঙ্কার— যে অলংকার একান্তভাবেই অর্থের উপর নির্ভর করে এবং কাব্যের শব্দগুলিকে পরিবর্তিত করে সেখানে অন্য সমার্থক শব্দ বসিয়ে দিলেও যে অলংকার একই থাকে তার নাম অর্থালংকার।

যেমন: ‘গৌর নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গ তায়’ — উদ্ধবদাস

এখানে গৌরাঙ্গ দেবকে সাগর ও তাঁর ভাবলীলাকে সাগরের তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার তুলনা করা হয় তাকে বলে **উপমেয়**। আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলা হয় **উপমান**। যেখানে উপমেয় ও উপমানকে অভিন্ন মনে করা হয় সেখানে **রূপক অলংকার** হয়। অলংকারের বর্তমান উদাহরণটিও রূপক অলংকারের।

যেমন : ‘মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে।’

এখানে উপমেয় ‘মন’-এর সঙ্গে উপমা ‘মাঝি’র তুলনা করা হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.2

ক) ঠিক উত্তর আলোচিত অংশ থেকে বেছে নিয়ে লিখুন

(১) কাব্যে অলংকার হল ....।

(২) অলংকার শাস্ত্র হচ্ছে ....।

(৩) যমক অলংকার হচ্ছে ....।

(৪) উপমেয় হচ্ছে ....।

খ) উত্তর দিন

(১) শব্দশ্লেষের উদাহরণ দিন।

(২) উপমানের উদাহরণ দিন।

1.5 গ) চিত্রকল্প

কবি তাঁর কল্পনায় শব্দ ও বাক্যের সম্ভারে সাধারণকে অসাধারণ রূপময় করে তোলেন। ভাবকে রূপময় করে তোলার জন্য কবি দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন (১) উপমা বা উপমেয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক অলংকার প্রয়োগ (২) চিত্রকল্পের প্রয়োগ যা অলংকারের মতো সাদৃশ্যধর্মী হয়েও অলংকারের চেয়ে আরো গভীর ও তাৎপর্যময়। যখন সরু ও টানা টানা চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা করার জন্য বলা হয় পটোল-চেরা চোখ, তখন শুধু চেরা-পটোলের বাইরের আকারের সঙ্গে সাদৃশ্য বোঝানো হয়। এতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তা সাদৃশ্যমূলক অলংকার প্রয়োগের ফলে। এতে শুধু ছবি আছে, কিন্তু গভীর কোনো ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ যখন বলেন,

‘সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।’

এই ব্যঞ্জনা অলংকার থেকে আসে নি, এসেছে আরও তাৎপর্যময় এক ছবির মধ্যে দিয়ে। এই ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রই হচ্ছে কবিতার চিত্রকল্প। তখন কবি চোখের সঙ্গে পাখির নীড় বা বাহ্য আকারের সাদৃশ্য বোঝান না, বোঝান বনলতা সেনের চোখের মধ্যে পাখির নীড়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা।

শব্দার্থ ও টীকা

পদ্ধতি = রীতি, উপায়।
সাদৃশ্য = মিল।

ব্যঞ্জনা = রীতি, উপায়।
সাদৃশ্য = ভাব।

নীড় = বাসা।

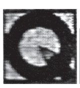

পাঠগত প্রশ্ন : 1.3

ক) একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) ভাবকে রূপময় করে তোলার জন্য কবি কটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন?

(২) ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ’— কবিতাংশটি কোন্ অলংকারের উদাহরণ?

(৩) বনলতা সেনের চোখে পাখির নীড়ের কীসের ব্যঞ্জনা রয়েছে?

(৪) বনলতা সেন কবিতাটি কার লেখা?

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান।

(১) ভাবকে রূপময় করার জন্য কবি যে পদ্ধতি দুটি অবলম্বন করেন সেগুলির নাম (i) .... (ii) ....

(২) ‘কাশীরাম দাস’ কবিতাটি .... -এর উদাহরণ।

শব্দার্থ ও টীকা

1.6 বাংলা কবিতার প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা কাব্যধারায় মূলভাব ছিল ভক্তিবাদ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মসাধনার সংগীত। খ্রিষ্টীয় দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা এই চর্যাগীতিগুলি রচিত। 'চর্যাপদ'ই আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন। বৌদ্ধ সাধকদের সাধন প্রণালী ও দর্শন তত্ত্ব নানা ধরণের রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের আভাষে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। আবার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ— গাছ, নদী, আকাশ, ফুল, ফল, বাংলার তখনকার সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা, তাদের পোশাক-আশাক, অলংকার, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত খাদ্য, বাসনপত্র, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। তবে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষ ডোম-শবর-শুঁড়ি প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রাই প্রাধান্য পেয়েছে চর্যার পদে।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য দুটি ধারায় প্রবাহিত।

(ক) আখ্যানকাব্য, (খ) খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য। আখ্যানকাব্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্য, চরিত সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য প্রধান। গীতিকাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি ও বাউলগান অন্তর্গত।

নীচে একটি ছকে আখ্যানকাব্যের বিষয়গত বিভাজনটি দেখান হল—

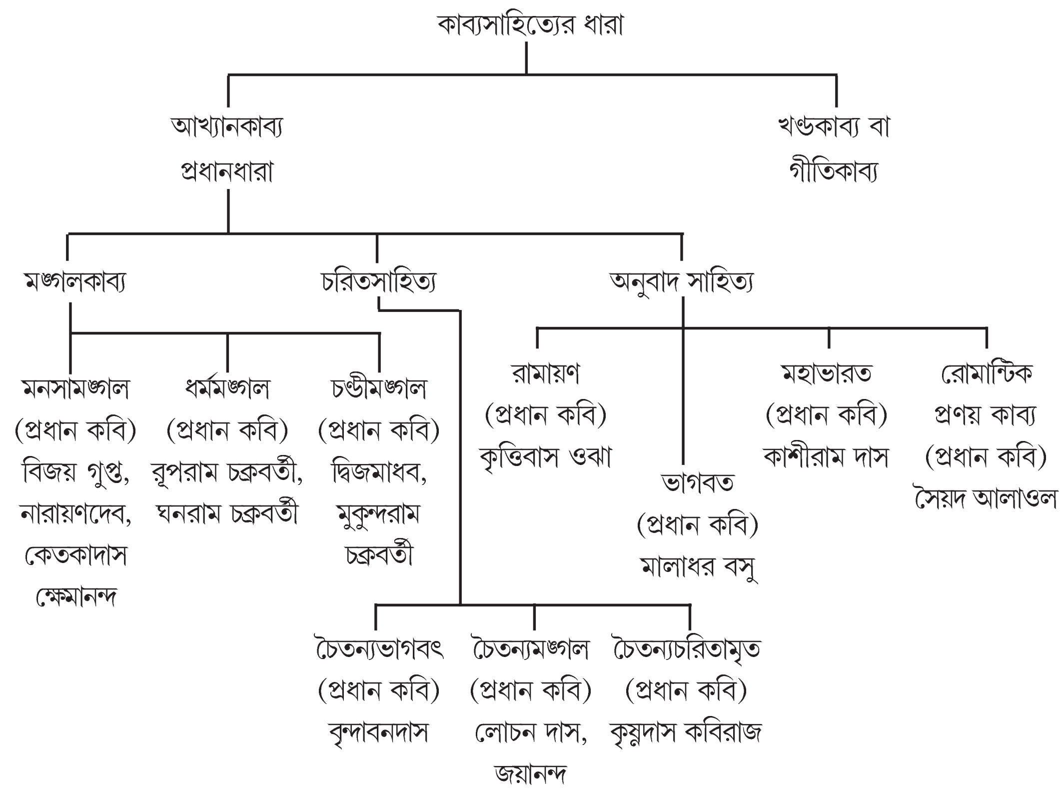

ক) আখ্যানকাব্য :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শাখা হল আখ্যানকাব্য। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর কালপর্ব। যে কাব্য আখ্যান অর্থাৎ কাহিনিনির্ভর তাকে আখ্যানকাব্য বলে। আখ্যানকাব্য কাহিনিপ্রধান। কাহিনি বড়োও হতে পারে আবার ছোটোও হতে পারে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বিপদে ভক্তকে উদ্ধার

শব্দার্থ ও টীকা

করেন। যাঁরা দৈব নির্দেশ অমান্য করেন তাঁদের কপালে জোটে দারুণ দুর্ভোগ। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে মর্তবাসীরা ঐ আরাধ্য দেবতা বা দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তারপর ভক্তের মধ্য দিয়ে তাঁর পূজা প্রচার ও বিজয়গাথা বর্ণনা করে তিনি স্বর্গে ফিরে যান। প্রতিভাবান কবিদের লেখনীতে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গলের রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গলের এবং দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি।

আখ্যানকাব্য ধারায় অনুবাদ সাহিত্যের শাখাটিও বড় স্থান দখল করে আছে। বাংলার লোকসাধারণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। তবে এগুলি বাংলার লোকসংস্কৃতির সাথে মিশে যাওয়ার জন্য কবিরা আক্ষরিক অনুবাদ করলেন না, করলেন ভাবানুবাদ। এই অনুবাদ সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ভক্তিবাদ। কৃত্তিবাস 'রামায়ণ'-এর, কাশীরাম দাস 'মহাভারত' এবং মালাধর বসু 'ভাগবত'-এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এছাড়া ইসলামি শাসনকর্তাদের আনুকূল্যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন ভাষায় লেখা রোমান্টিক প্রণয়কাব্য বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। যেমন, পঞ্চদশ শতকে গৌড় দরবারের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কবি শাহ মুহম্মদসগীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের অনুবাদ। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওল 'পদ্মাবতী' অনুবাদ করেন। আপনাদের পাঠ্য বইতে 'পদ্মাবতী' কাব্যের একটি অংশ সংকলিত হয়েছে।

আখ্যানকাব্য ধারার অন্যতম একটি শাখাচরিত কাব্য। বাংলা ভাষায় চরিত সাহিত্য ধারার উৎস চৈতন্যদেব। যুগনায়ক চৈতন্যদেব প্রেম, ভক্তি দিয়ে বাংলাদেশে এক ভাব বিপ্লবের সূচনা করলেন। তাঁর মানবপ্রেমের মূলকথা কৃষ্ণভক্ত অচ্ছুত চণ্ডালও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতুল্য হতে পারে। চৈতন্যের ব্যক্তি চরিত্রের মহিমা বর্ণনা সাহিত্যে তথ্যনিষ্ঠ সমাজ দর্শন ও ইতিহাস চেতনার সূত্রপাত ঘটাল। চৈতন্যচরিতকাব্য মূলত ভক্তির কাব্য। তাঁর চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করলেও সেখানে মহাপ্রভুর বংশ পরিচয়, বাল্যজীবন, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, সন্ন্যাস প্রভৃতি জীবনবৃত্তান্ত কাব্যে স্থান পেয়েছে। দেবদেবী অধ্যুষিত অলৌকিক বাংলা সাহিত্য জগতে চৈতন্যচরিত সাহিত্য নতুন প্রবণতার সৃষ্টি করল। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' লোচনদাস ও জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। এগুলি সবই চরিত-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

অধ্যুষিত = অধিষ্ঠিত, অধিবাসীযুক্ত।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.4

ক) একটি দুটি শব্দে উত্তর দিন :

(১) প্রাচীন যুগের কাব্যের মূল ভাব কী ছিল?

(২) চর্যাপদ কীসের নিদর্শন?

(৩) আখ্যান কাব্য রচনার সূচনা পর্বটি কবে ঘটে?

(৪) বাংলা সাহিত্যে অনুবাদকর্ম কখন শুরু হয়?

(৫) বাংলায় চরিত-সাহিত্যের উৎস কে?

(৬) মঙ্গলকাব্যধারার দুজন প্রধান কবির নাম লিখুন।

1.7 খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য

গীতিকাব্য হল গীতিমূলক ছোটো কবিতা, যার মধ্যে ধারাবাহিক কাহিনি নেই। গীতিময়তা এই কবিতার প্রাণ। মধ্যযুগের গীতিকাব্যের ধারা মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত। বৈষ্ণবপদাবলি, শাক্ত পদাবলি ও বাউলগান। এই তিনটি ধারা নানা ভাবে প্রবাহিত, পরবর্তী পৃষ্ঠায় তা একটি ছকে দেখান হল—

শব্দার্থ ও টীকা

গীতিকাব্যের প্রধান ধারা

- বৈষ্ণব পদাবলি প্রধান ধারা
  - চৈতন্য পূর্ববর্তী (প্রধান কবি) জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস
  - চৈতন্য পরবর্তী (প্রধান কবি) জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস
- শাক্ত পদাবলি প্রধান ধারা
  - উমা সংগীত (প্রধান কবি) রামপ্রসাদ সেন
  - শ্যামাসংগীত (প্রধান কবি) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য
- বাউলগান (প্রধান কবি) লালন ফকির, হাসান রাজা

বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। গীতিময়তা বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি, উৎকণ্ঠা, প্রেম মাধুর্য, অতীন্দ্রিয় জীবন বোধ, রোমান্টিক ভাববিহ্বলতা, পাওয়া না-পাওয়ার, মিলন বিরহের আনন্দ-বেদনা বৈষ্ণব পদাবলিতে ফুটে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যকে চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্য পরবর্তী দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব কবিদের পদাবলি ছিল মানব-মানবীর লৌকিক প্রেমকাহিনি। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলির স্বরূপটি আলাদা। চৈতন্য পরবর্তী কবিতা চৈতন্যলীলার প্রভাবে ঐশ্বর্যময়। চৈতন্য ভক্তরা বিশ্বাস করতেন মহাপ্রভু অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা, ফলে চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলি সাহিত্যে আসে ভাবের নবরূপায়ণ। বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শন নতুন করে গড়ে ওঠে। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা সকলেই ভক্ত, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদনই হল কাব্যের বিষয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবি বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস উল্লেখযোগ্য।

গীতিকাব্য ধারার উল্লেখযোগ্য শাখা হল শাক্ত পদাবলি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাপ্রকার আঘাতে জনজীবন বিপর্যস্ত। এই ঘোর দুর্দিনে শাক্তকবিরা অনন্ত-শক্তিময়ী 'কালভয়হারিনী' বরাভয়দাত্রী জগজ্জননীর কাছে উদ্ধারের প্রতিকার চাইলেন। কালীকে শাক্তকবিরা কোমলে কঠোরে রূপ দিলেন। তিনি হলেন মা। কালী মাতৃরূপে আরাধিত হলেন। এতে ভক্তিভাবের প্রাধান্য। কালীমাতা বা শ্যামা মাকে নিয়ে রচিত হল শ্যামাসংগীত। আবার শাক্ত পদাবলি উমাসংগীতে কালী বাঙালির ঘরের কন্যারূপে চিত্রিত। আগমনি ও বিজয়া বিষয়ক শাক্তগীতিতে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ, বাৎসল্য ফুটে উঠেছে। শাক্ত কবিরা বাঙালি জাতির বাস্তব জীবন ও ঘরসংসারের সুখ-দুঃখের ছবি এঁকেছেন তাঁদের কবিতায়। সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামাসংগীত এবং রামপ্রসাদ সেন উমাসংগীত রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 1.5

যেটি ঠিক সেটি বেছে নিন :

(১) মধ্যযুগের গীতিকাব্য কটি ভাগে বিভক্ত? (দুটি / তিনটি / চারটি)

(২) বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু কী? (রাধাকৃষ্ণের প্রেম / সাধকদের সাধনা / মুক্তির সাধনা)

(৩) শাক্ত পদাবলি কোন যুগের? (আদি যুগের / মধ্য যুগের / আধুনিক যুগের)

1.5 ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা কাব্য

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্য আধুনিকতার পথে পা বাড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা কাব্যের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের কাব্যধারা দুটি পর্বে বিভক্ত। (১) ইংরেজ শাসন পর্ব, (২) স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্ব। এই দুই পর্বে বাংলা কবিতা নানা ধারায় প্রবাহিত। উপরিউক্ত বাংলা কাব্যধারার ছকটি নীচে করে দেখানো হল—

শব্দার্থ ও টীকা

সন্ধিক্ষণ = এককালের অবসান ও অন্যকালের আগমনের সময়

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্য

- ইংরেজ শাসন পর্ব
- স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্ব

ইংরেজ শাসন পর্বে বা নবজাগরণের পূর্বে রচিত বাংলা কবিতায় দেখা গেছে মধ্যযুগের ধারার অনুবর্তন। কবিতায় কবির কল্পনায়, ভাবনায় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত ছিল না। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বাঙালির চিন্তাজগতে আনে নব চেতনা। সেই চেতনার আলো পড়ে কবিদের কাব্যে এবং সাহিত্যে। বাংলা কবিতা মধ্যযুগের পয়ার, ত্রিপদী ছেড়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আখ্যানকাব্য রচনা শুরু হয়। নতুন স্বাদের সনেট বাংলা কবিতায় নতুনত্ব আনে। নবচেতনার আলোয় কবিরা মহাকাব্য লিখে বাংলা কবিতাকে অন্য মাত্রা দিলেন। আবার রবীন্দ্র পরবর্তী বা স্বাধীনতা উত্তর কবিরা সাহিত্যে আনেন নতুনত্বের স্বাদ। রবীন্দ্রপর্ব এবং রবীন্দ্রপরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রধারার অনুগামী কিছু কবির পাশাপাশি কিছু রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কবি সাহিত্যকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেন। আবার রবীন্দ্র-নিরপেক্ষভাবে কোনো কোনো কবি নিজস্ব শৈলীতে কাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবিক মূল্যবোধের সঙ্কট প্রতিফলিত হয় অনেকের কাব্যে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্য-ধারার বিভাজনটি ছকে দেখানো হল—

সনেট = চতুর্দশপদী কবিতা

ইংরেজ শাসনপর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর বা রবীন্দ্রোত্তর পর্বের কাব্যধারা

- আখ্যানকাব্য
  - উদাহরণ
  - পদ্মিনী উপাখ্যান (রঙ্গলাল)
  - তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (মধুসূদন দত্ত)
  - পলাশীর যুদ্ধ (নবীনচন্দ্র সেন)
- মহাকাব্য
  - মেঘনাদবধ কাব্য (মধুসূদন দত্ত)
  - বৃত্রসংহার (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
  - রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস (নবীনচন্দ্র সেন)
- গীতিকবিতা (লিরিক)
  - রবীন্দ্রপূর্ব
    - বিহারীলাল চক্রবর্তী
    - দেবেন্দ্রনাথ সেন
    - সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
    - মানকুমারী বসু
    - গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
  - রবীন্দ্র রচনা
    - প্রথমকাব্য 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২ খ্রি:)
    - শেষকাব্য 'শেষ লেখা' (১৯৪১ খ্রি:)
    - (এই কাব্যধারা নানা পর্বে বিভক্ত)
  - রবীন্দ্র অনুগামী
    - কালিদাস রায়
    - কুমুদরঞ্জন মল্লিক
    - করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
    - যতীন্দ্রমোহন বাগচি
    - প্রভৃতি
  - রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন ভাবনার কবি
    - কাজী নজরুল ইসলাম
    - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
    - বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র
    - জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
    - সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শব্দার্থ ও টীকা

পটভূমি = অধ্যায়
সর্গ = অধ্যায়

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা কাব্যধারা প্রধানত তিনটি খাতে প্রবাহিত। সেগুলি হল উল্লিখিত (ক) আখ্যানকাব্য, (খ) মহাকাব্য ও (গ) গীতিকবিতা।

ক) আখ্যানকাব্য :

আখ্যানকাব্য কাহিনিমূলক কাব্য। কাহিনিই প্রধান। তবে উনিশ শতকের আখ্যানকাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথার বদলে এল মানুষের নিজের জীবনকথা। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে আখ্যানকাব্যের প্রথম রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্যগুলি তাঁর লেখা। অন্যান্য আখ্যানকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা আখ্যানকাব্য হল 'আশাকানন', 'বীরবাহু' প্রভৃতি। নবীনচন্দ্র সেনের উল্লেখযোগ্য আখ্যানকাব্য হল— 'পলাশীর যুদ্ধ'।

খ) মহাকাব্য :

ঊনবিংশ শতকে আর-এক শ্রেণির আখ্যানকাব্য রচিত হল যা মহাকাব্য। মহাকাব্য দুই শ্রেণির হয়। (১) আর্য বা প্রাচীন মহাকাব্য, (২) আলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য। প্রাচীন বা আর্য মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য হল এই শ্রেণির মহাকাব্যের মধ্যে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে।

বৈশিষ্ট্য:

মহাকাব্যের কাহিনি হবে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক। নায়ক হবে সদ্‌গুণের অধিকারী। কাহিনির পটভূমি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল। মহাকাব্যে আটটি সর্গ থাকবে। বীররস প্রধান। পৃথিবীতে এই ধরনের মহাকাব্য বাল্মিকীর 'রামায়ণ', ব্যাসদেবের 'মহাভারত', গ্রীসের হোমারের লেখা 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'। ঊনবিংশ শতকে বাংলায় মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখলেন আলংকারিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'। রামায়ণের কাহিনি নিয়ে রচিত, নয়টি সর্গে বিভক্ত। মহাকাব্য হিসেবে 'মেঘনাদবধ' বাংলা কাব্য ধারার বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এই ধারার অন্যান্য কাব্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রাভাস'।

গ) গীতিকাব্য :

ইংরেজিতে যাকে লিরিক বলা হয়, বাংলায় তাকে বলা হয় গীতিকবিতা। গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। মধ্যযুগের গীতিধর্মী খণ্ড কবিতার সঙ্গে এর মিল হল, এই কবিতাও খণ্ড কবিতার মতো আকারে ছোটো। কিন্তু সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মধ্যযুগের খণ্ড কবিতার থেকে আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য বেশি। মধ্যযুগের পদাবলির মতো খণ্ডকবিতার থেকে আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্যটাই বেশি। মধ্যযুগের পদাবলির মতো খণ্ডকবিতায় কবির ধর্মীয় অনুভূতি গানের সুরে ধরা পড়ত। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতা গাওয়ার জন্য রচিত নয়। কবির নানা ব্যক্তিগত অনুভূতিই এখানে প্রকাশ পায়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখনীতে আধুনিক গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত। তাঁর 'নিসর্গসন্দর্শন', 'সাধের আসন', 'সারদামঙ্গল' এই ধারার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি', প্রভৃতি কবিতাগুলি গীতিরসে পূর্ণ। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ সেনের লেখা 'ফুলবালা', 'ঊর্মিলাকাব্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ গীতিকবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা লিখেছেন।

বিংশ শতকে গীতিকাব্যের ধারাটি এখনও বয়ে চলে আসছে কবিদের লেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে এই দুই ধারার গীতিকবির সার্থক উত্তর সাধক। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 1.6

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) কোন্ সময় থেকে বাংলা কাব্যের রূপটি পরিবর্তিত হয়ে যায়?

(২) ঊনবিংশ শতকে বাংলা কাব্য ধারাগুলি উল্লেখ করুন।

(৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কাব্যে কীসের প্রতিফলন ঘটে?

(৪) আখ্যানকাব্য ধারার উনিশ শতকের প্রথম রচয়িতা কে?

(৫) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি মহাকাব্যের নাম লিখুন।

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান :

(১) ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’ মহাকাব্যদুটি লিখেছেন ....।

(২) মধুসূদন দত্তের লেখা মহাকাব্যটির নাম ....।

(৩) বিহারীলাল ছাড়া দুজন গীতিকবির নাম (১) .... (২) ....।

(৪) দুজন মহিলা গীতিকবির নাম (১) .... (২) ....।

1.9 আপনি যা শিখলেন

1. কবিতা কী এবং কবিতার সংজ্ঞা;
2. যথাযথ শব্দ চয়ন বা ধ্বনি-বিন্যাস বাক্যকে কাব্যে পরিণত করে;
3. কবিতায় ছন্দ ও অলংকার কবিতাকে গতিময় ও সৌন্দর্যে ভরে তোলে;
4. চিত্রকল্পের সাহায্যেও কবিরা ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন;
5. প্রাচীন যুগের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
6. মধ্যযুগের কাব্য ও কাব্যের রীতি সম্পর্কে জ্ঞান;
7. প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
8. আধুনিক যুগের কবি ও কাব্য সম্পর্কে জ্ঞান;
9. মহাকাব্যের রূপটি জানতে পারা;
10. গীতিকাব্য সম্পর্কে ধারণালাভ।

1.10 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ৬ থেকে ৮টি বাক্যে উত্তর দিন :

1. কবিতা কী? কবিতা পড়তে গেলে কবিতার কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি দিতে হয়?
2. কবিতায় ছন্দের গুরুত্ব কতখানি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
3. কবিতার অলংকার কীভাবে ব্যবহৃত হয় একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে লিখুন।
4. অলংকারের সঙ্গে চিত্রকল্পের তফাত কোথায় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
5. কবি কীভাবে ভাবকে চিত্ররূপ দান করেন লিখুন।
6. চর্যাপদে সমকালীন বাংলার সম্বন্ধে কী জানা যায়?
7. সাহিত্যের কোন ধারা অবলম্বন করে মধ্যযুগের কাব্য প্রবাহিত হয় লিখুন।
9. বাংলা অনুবাদ কাব্যের বৈশিষ্ট্য কী?
10. কাকে অবলম্বন করে চরিতকাব্য লিখিত হল?
11. মধ্যযুগের গীতিকাব্যধারায় চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।
12. শাক্ত পদাবলির বৈশিষ্ট্য লিখুন।
13. ঊনবিংশ শতকে রচিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

1.11 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

1.1 ক) (১) (iv)

(২) (ii)

(৩) (v)

(৪) (iii)

(৫) (i)

1.2 ক) (১) কাব্যকে সাজিয়ে তোলার জন্য সাজসজ্জা।

(২) অলংকার সম্বন্ধীয় শাস্ত্র।

(৩) দুভাবে।

(৪) শব্দালংকার।

(৫) যার তুলনা করা হয়।

খ) (১) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর / যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

(২) যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

1.3 ক) (১) দুটি।

(২) চিত্রকল্পের।

(৩) নিশ্চিন্ততার ব্যঞ্জনা।

(৪) জীবনানন্দ দাশ।

খ) (১) (i) উপমা ও উপমেয়-র সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক অলংকার।
(ii) চিত্রকল্প।

(২) গীতিকবিতা।

1.4 (১) ভক্তিবাদ।

(২) প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ধর্মসাধনার সঙ্গীত।

(৩) পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত।

(৪) মধ্যযুগে।

(৫) চৈতন্যদেব।

(৬) বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব।

1.5 (১) তিনটি।

(২) রাধাকৃষ্ণের প্রেম।

(৩) মধ্যযুগের।

1.6 ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে।

(২) ১. রবীন্দ্রপর্ব ২. রবীন্দ্রোত্তর পর্ব।

(৩) মানবিক মূল্যবোধের সংকট।

(৪) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫) বৃত্র সংহার।

খ) (১) হোমার।

(২) মেঘনাদবধ।

(৩) দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ।

(৪) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়।

1.12 সমধর্মী গ্রন্থ

1. সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি - উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
2. ছন্দ সোপান - প্রবোধচন্দ্র সেন
3. অলঙ্কার চন্দ্রিকা - শ্যামাপদ চক্রবর্তী

শব্দার্থ ও টীকা

2

রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা

চণ্ডীদাস

2.1 প্রস্তাবনা

রাস ও দোলযাত্রা আমাদের পরিচিত উৎসব। এই উৎসবগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাধা-কৃষ্ণের ভালোবাসার কাহিনি। রাধার কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা সবে শুরু হচ্ছে— এই সময়ের কথা কবিতায় আছে। রাধা-কৃষ্ণের ভালোবাসা যখন আরম্ভ হচ্ছে সেই অবস্থাকে বলা হয় পূর্বরাগ। পূর্বরাগ পর্বে রাধার মনের অবস্থা কী রকম, পঞ্চদশ শতকের কবি চণ্ডীদাস আমাদের তা জানিয়েছেন। মনের খবর প্রকাশ পায় আচরণের মধ্যে দিয়ে। এই কবিতায় বা পদে রাধার প্রত্যেক আচরণ তাঁর মনের বিশেষ অবস্থাকে প্রকাশ করছে।

রাধার অনেক সখী। তাঁরা রাধার একান্ত আপনজন। রাধার অবস্থা দেখে সখীরা বিচলিত। পদটিতে সখীমুখে ব্যক্ত হয়েছে রাধার আচরণ।

বিচলিত = চঞ্চল

পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। মধ্যযুগের কবিতার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পদে দেখা যাবে। যেমন 'হইল' হয়েছে 'হৈল', 'ধ্যান' হয়েছে 'ধেয়ান'। কবিতাটিতে কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) ইত্যাদি যতিচিহ্ন নেই। যতিচিহ্ন যা আছে তা হল এক-দাঁড়ি(।) এবং দু-দাঁড়ি (।।)। (।।।) এযুগে কবিতার শেষ অংশে বা ভনিতায় কবি নিজের নাম জানিয়ে দিতেন। চেষ্টা করলে এইরকম আরও বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে বার করতে পারি।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি :

- পুরোনো দিনের (মধ্যযুগের) কবিতা কেমন হত তা জানাতে পারবেন;
- রাধার কোন্ আচরণ মনের কোন্ বিশেষ অবস্থা প্রকাশ করছে তা বোঝাতে পারবেন;
- রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের 'পূর্বরাগ' পর্যায় সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- মধ্যযুগের কবিরা কীভাবে নিজেদের নাম জানাতেন তা বোঝাতে পারবেন।

2.3 মূল পাঠ

2.3.1

(1)

রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা।।

(2)

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কী কহে দুহাত তুলি।।
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে।।

শব্দার্থ ও টীকা

বিরলে = নির্জনে।
থাকয়ে একলে = একলা থাকে।
ধেয়ানে = ধ্যানে।
নয়ান-তারা = চোখের তারা।
রাঙ্গা বাস = লাল বসন।
যোগিনী = তান্ত্রিক সাধিকা।
পারা = মতো

দেখয়ে = দেখে।
খসায়ে চুলি = চুল এলো করে।
হসিত বয়ানে = হাসিমুখে।
একদিঠ করি = একদৃষ্টিতে।
করে নিরীক্ষণে = একমনে দেখে।
বঁধু = বন্ধু।
কালিয়া-বঁধুর = বন্ধু কৃষ্ণের। কৃষ্ণের গায়ের রং ছিল কালো। তাই তাঁকে ডাকা হত কালা বা কালিয়া বলে।
সনে = সঙ্গে।

2.4 বিষয়ের রূপরেখা

2.4.1 রাধার কী হৈল . . . যোগিনী পারা।।

গদ্যরূপ :

রাধার অন্তরে কীসের ব্যথা? তিনি বিরলে একলা বসে আছেন, কারও কথা তিনি শুনছেন না। সব সময় মেঘের দিকে চেয়ে ধ্যান করছেন, তাঁর নয়ন-তারা নিশ্চল। তিনি আহারে বিরত। তিনি যোগিনীর মতো রাঙা বাস পরে আছেন।

2.4.2 বক্তব্যসার :

সখীরা রাধার বেদনার কারণ খুঁজছেন। তাঁরা খুঁটিয়ে দেখছেন রাধার আচরণ। কারও কথা রাধা শুনতে পাচ্ছেন না। এই ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে, নিজের ভাবনার মধ্যে গভীরভাবে তিনি ডুবে আছেন। কৃষ্ণ কালো, মেঘও কালো। তাই মেঘের কালো রং তাঁর মন টেনেছে। যোগিনীরা বা তান্ত্রিক সাধিকারা ধ্যান করেন তাঁদের ইষ্টদেবতার।

শব্দার্থ ও টীকা

রাধাও ধ্যানে দেখছেন তাঁর একান্ত প্রিয়জনকে। রাধার প্রিয় বসন নীলাম্বরী, সেই বসন ত্যাগ করে তিনি পরেছেন রক্তবাস। মনে করা হয়, অনুরাগের রং রাঙা। রাধার রাঙা বসনে সেই অন্তরের রঙের আভাস।

পাঠগত প্রশ্ন 2.1

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) রাধার কী .... অন্তরে ....।

খ) বিরতি .... বাস পরে
যেমত ....।।

(২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন:

ক) রাধা কী অবস্থার মধ্যে বসে আছেন?
(একা / নির্জনে / সখীদের সঙ্গে / সজনে)

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন:

ক) রাধা কোন্ দিকে চেয়ে আছেন?

খ) রাধা কেমন বস্ত্র পরেছেন?

গ) রাধা কাদের মতো বস্ত্র পরেছেন?

ঘ) কেন মনে হচ্ছে যে রাধা ধ্যান করছেন?

2.4.3 এলাইয়া বেণী . . . কালিয়া বঁধুর সনে।।

গদ্যরূপ :

বেণী ও ফুলের গাঁথনি এলিয়ে চুল খসিয়ে তিনি (রাধা) দেখছেন। হাসি-হাসি মুখে মেঘের পানে চেয়ে দু-হাত তুলে কী যেন বলছেন। তিনি একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করছেন। চণ্ডীদাস বলছেন, বন্ধু কালিয়ার সঙ্গে রাধার নব-পরিচয় ঘটেছে।

বক্তব্যসার :

চণ্ডীদাস রাধার সমস্ত আচরণের কারণ বুঝতে পেরেছেন। কালো মেঘ দেখতে দেখতে রাধার মনে পড়েছে নিজের কালো কেশের কথা। চুল এলো করে তিনি দেখছেন। মেঘ তো অনেক দূরে, তিনি একান্ত কাছে পেয়েছেন তাঁর কৃষ্ণকে। মুখে তাঁর হাসি ফুটেছে। দু-হাত তুলে মেঘকে তিনি বুঝি বিদায় জানাচ্ছেন।

তারপর রাধার দৃষ্টি নেমে এসেছে মাটিতে। সামনেই ময়ূর-ময়ূরী। ময়ূরের চিকন শ্যামল কণ্ঠে তিনি দেখছেন বন্ধু কৃষ্ণের রূপ। ময়ূর-ময়ূরীর দিকে চেয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন যুগল জীবনের।

পাঠগত প্রশ্ন 2.2

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) .... বেণী .... গাঁথনি
দেখয়ে .... চুলি।

খ) কণ্ঠ করে ....।

গ) .... কয় .... পরিচয়।

(২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন:

ক) রাধা হাসিমুখে চেয়েছেন কোন্‌দিকে?
(ফুলের দিকে / বেণীর দিকে / মেঘের দিকে / ময়ূরের দিকে)

(৩) একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিন:

ক) রাধা মেঘের দিকে দু-হাত তুলেছেন কেন?

খ) ময়ূর-ময়ূরীর দিকে চেয়ে রাধা কী দেখছেন?

গ) ভণিতা কাকে বলে?

ঘ) ‘কালিয়া’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ঙ) ‘বঁধু’ শব্দটির অর্থ কী?

2.5 আপনি যা শিখলেন

কবিতা বা পদটি পড়ে আপনি শিখলেন—

1. মধ্যযুগের কবিতার কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্য;
2. রাধার বিশেষ আচরণের সঙ্গে মনের বিশেষ অবস্থার সংযোগ কীভাবে ঘটে চলেছে;
3. রাধার মনোভাব পরের পর যেভাবে বদলেছে তার মধ্যেকার যুক্তিশীলতা;
4. ভণিতা কাকে বলে।

2.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. রাধা-কৃষ্ণ-কাহিনিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় এমন দুটি ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখুন।
2. রাধার কী আচরণের জন্য তাঁকে যোগিনী বলে মনে হচ্ছে?
3. রাধা মেঘের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কেন?
4. রাধার আচরণে পর-পর যে-পরিবর্তন ঘটেছে তার বর্ণনা দিন।
5. মধ্যযুগের কবিতার লিখন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

2.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

2.1

১) (ক) হৈল, ব্যথা।
   (খ) আহারে, রাঙা, যোগিনী-পারা।
২) (ক) নির্জনে
৩) (ক) মেঘের দিকে
   (খ) রাঙা।
   (গ) যোগিনীদের।
   (ঘ) রাধার দৃষ্টি স্থির, পরণে যোগিনীদের মতো পোশাক।

2.2

১) (ক) এলাইয়া, ফুলের, খসায়ে।
   (খ) নিরীক্ষণে।
   (গ) চণ্ডীদাস, নব।
২) মেঘের দিকে।
৩) (ক) মেঘকে তাঁর প্রয়োজন নেই।
   (খ) ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ-বর্ণের মধ্যে দেখছেন কৃষ্ণের চিকন-শ্যামল রূপ।
   (গ) কবিতার বা কাব্যাংশের শেষে কবিরা মন্তব্য করেন। নিজের নাম জানিয়ে দেন। এই অংশটি ভণিতা।
   (ঘ) কৃষ্ণকে।
   (ঙ) বন্ধু।

2.8 কবি পরিচিতি

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বীরভূমের নান্নুর। ঠিক কোন সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে, মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি। চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর প্রিয় ছিল চণ্ডীদাসের পদ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম নিয়ে চণ্ডীদাস পদ রচনা করেছেন। রাধার পূর্বরাগের একটি পদ পাঠ্য বইয়ে আছে। পূর্বরাগ পর্বের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। সহজ সরল বাংলাভাষায় তিনি পদ রচনা করেছেন। এমন সব বাক্য তাঁর গানে ছড়িয়ে আছে যা আমাদের চমকিত করে। যেমন—

- শাশুড়ি ক্ষুরের ধার, ননদিনি জ্বালা
- চণ্ডীদাস বলে, বনের ভিতরে কভু কি রোদন সাজে
- সুজনে সুজনে মিলে কুজনে কুজনা

2.9 সমধর্মী রচনা

চণ্ডীদাসের আর-একটি পূর্বরাগের পদ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়।।
রাই এমন কেন বা হৈল।
গুরু দুরজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কী দেব পাইল।।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে।।
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কী বা অভিলাষে বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে।।

3

পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল

সৈয়দ আলাওল

3.1 প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যে আলাওল ছিলেন খ্যাতিমান কবি। কবি আলাওলের রচিত বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' থেকে 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতাটি সংকলিত। পদ্মাবতী কাব্যটি কোনও মৌলিক কাব্য নয়। এটি বিখ্যাত হিন্দি কবি মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। কিন্তু অনুবাদ হলেও আলাওলের রচনাগুণে এটি মৌলিক কাব্যে পরিণত হয়েছে। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়।

পদ্মাবতী সিংহলরাজ গান্ধর্বসেনের কন্যা। চিতোরের রাজা রত্নসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে সখীদের কথোপকথনের মাধ্যমে বিবাহের পরিবেশটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সেই বিবাহ উৎসবের কাহিনিই 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতাটির বিষয়বস্তু। একটি বিবাহের মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানে কন্যার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কবি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

3.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনারা—

- হিন্দু সমাজের বাইরের একজন কবির লেখা হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য একখানি আখ্যান কাব্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারবেন;
- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কখনও দ্বৈতভাব থাকা উচিত নয়—একথা বুঝতে পারবেন;
- 'বিবাহমঙ্গল' শুধু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গমাত্র নয়, বিবাহমঙ্গল স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর একাত্ম হবারও বার্তা—একথা বুঝতে পারবেন।

3.3 মূল পাঠ

(1)

বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ।
করেত লইল রামা নির্মল দর্পণ॥

নিজ আঁখি নিজ রূপ দেখি সুশোভন।
আপনার রূপ হেরি মজিল আপন॥

আপনা রূপের ভাবে আপে হইল লীন।
আপনা হেরিতে হইল আপ হোন্তে ভিন॥

সখিগণে এক মিলি নানা যন্ত্র বাহে।
কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে॥

সুসৌরভে নাসিকা শ্রবণ দিব্য স্বরে।
দিব্যরূপ হেরি আঁখি আনন্দ নির্ভরে॥

প্রেমমদে ঘূর্ণ আঁখি হইল তন্দ্রিত।
তনু অচেতন মাত্র মন সচকিত॥

সচেতন অচেতন স্বপ্ন সমসর।
দেখিছে শুনিছে যত হইল গোচর॥

তথাত দেখিল প্রিয় রত্নসেন মুখ।
হরিষে পুলক অঙ্গ মন সকৌতুক॥

রসময় আনন্দে-সাগরে ডুবি বালা।
নৃপ-গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা॥

শব্দার্থ ও টীকা

বিচিত্র বসন = নানা সুন্দর পোশাক।
আভরণ = সাজসজ্জা, অলংকার।
নির্মল দর্পণ = পরিষ্কার আয়না।
মজিল = মুগ্ধ হল।
আপে = নিজে।
লীন = বিভোর।
হোন্তে = থেকে।
মঙ্গলগীত = বিয়ের গান।
প্রেমমদে = গভীর প্রেমে।
তন্দ্রিত = তন্দ্রাজড়িত।
সচকিত = কম্পিত।
সমসর = সদৃশ, একই রকম।
গোচর = প্রত্যক্ষ।
হরিষে = আনন্দে।
তথাত = সেখানে।
মাগে = চায়।

(2)

সখীগণে বোলে বালা কীবা মতি তোর।
আপনার রূপ দেখি হইলা বিভোর॥

কোথা সেই নৃপরত্ন বিবাহের স্থলে।
অন্তঃপুরে থাকি চাহ মালা দিতে গলে॥

আপনা রূপ দেখি হইলা এমন।
প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন॥

আন স্থানে মাগো বরমালা নিজ গলে।
এমত করিবা নাকি বিবাহের স্থলে॥

বিভাকালে হেন যদি করহ খানিক।
মুখ নিছি ফেলাইমু এ পঞ্চ মাণিক॥

এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে।
তোমাতে কহিলুঁ রানি বড়ো অনুরাগে॥

বোলে = বলে।
কীবা = কী?
মতি = ইচ্ছা।
আন = অন্য।
করিবা = করবে।
বিভা = বিবাহ।
মুখ নিছি = মুখ থেকে।
ফেলাইমু = ফেলব।
দিব্য = দিব্যি, শপথ।
তোমাতে = তোমাকে।
কহিলুঁ = বললাম।

(3)

উপহাসি সখী যদি এমত কহিল।
সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিল॥

যার হৃদে প্রেমাঙ্কুর পাগল সতত।
তুমি সবে নাহি জানো ভাব রস তত॥

ভাবের ভাবিনী যদি হইতা তুমি সবে।
এমত বচন মোকে না বুলিতা তবে॥

আমার মরমে ব্যথা তুমি উপহাসি।
এবে সত্য কহি কথা বচন প্রকাশি॥

তুমি বোলো প্রভু আছে বিবাহের স্থলে।
আমি দরশন পাই হৃদয় কমলে॥

যেই স্বামী সেই আমি নাহি ভাব ভিন।
আপনা চাহিতে প্রাণনাথ হইল লীন॥

যেই দিব্য দিলা সখী না হইত আন।
সমদৃষ্টি চাহি যদি না রহিব প্রাণ॥

ঘোঁঘট অন্তরে আঁখি মুখ হইল লুক।
সে সময় স্ত্রিয়া লাজে থাকি অধোমুখ॥

না জানি কী হয় মধু-চন্দ্রিমার কালে।
তোমার শপথ পাছে ততমাত্র ফলে॥

তাহার উপায় আছে শুনো সখীবর।
জাতি কুল লাজ মান লোকচর্চা ডর॥

(4)

এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত।
মহাদেবী আজ্ঞা হইল চলিতে তুরিত॥

রত্নময় চতুর্দৌল নিকটে আনিল।
উঠ উঠ বলি সখী ধরিয়া তুলিল॥

জয় জয় শব্দ হইল মন উতরোল।
গীতে নাটে বাদ্যে হইল পুরী হুলস্থুল॥

চলিতে না চলে কন্যা অর্ধপদ গতি।
চাহিতে সখীর দিগে লজ্জা বাসে অতি॥

শব্দার্থ ও টীকা

উপহাসি = উপহাস করে।
সম্ভ্রমিতা = সম্ভ্রমযুক্ত।
পদুত্তর = প্রত্যুত্তর।
প্রেমাঙ্কুর = প্রেমের উন্মেষ।
ভাবের ভাবিনী = একই ভাবের অংশীদার।
সমদৃষ্টি = সমান ভাবে দেখা।
বুলিতা = বলতে।
লুক = লুকালো।
স্ত্রিয়ালাজে = স্ত্রীসুলভ লজ্জায়।
মধুচন্দ্রিমা = বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর বিহার।
লোকচর্চা = লোকনিন্দা।
ডর = ভয়।

এতেক = এ পর্যন্ত।
তুরিত = শীঘ্র।
চতুর্দৌল = (চারজনে বয়ে নেবার) পালকি।
উতরোল = উতলা।
অর্ধপদ গতি = ধীর গতি।
লজ্জা বাসে অতি = খুব লজ্জার সঙ্গে।

3.4 বিষয়ের রূপরেখা

[বিচিত্র বসন পরি .... কন্যা মাগে বরমালা।]

3.4.1 গদ্যরূপ:

রামা বিচিত্র বসন ও নানা আভরণ পরে করেতে নির্মল দর্পণ নিলেন। নিজের আঁখিতে আপন সুশোভন রূপ দেখে আপনি মজলেন। আপনার রূপের ভাবনায় আপনি লীন হলেন। আপনাকে (নিজেকে) দেখতে দেখতে আপনি (নিজে) ভিন্ন হয়ে গেলেন। সখীগণ একসঙ্গে মিলে নানা যন্ত্র বাজায়। কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গায়। নাসিকা সুসৌরভে শ্রবণ দিব্যস্বরে ও আঁখি দিব্যরূপে দেখেন। পদ্মাবতী (একান্তভাবে) আনন্দে নির্ভর করেন। প্রেমমদে (তাঁর) ঘূর্ণ (ঘূর্ণায়মান) আঁখি তন্দ্রিত হল। তনু অচেতন (হওয়া) মাত্রই তাঁর মন সচকিত। স্বপ্নে সচেতন (ও) অচেতন যেমন সমসর (একাকার) হয় (তেমনি) যা কিছু শুনছেন ও যা কিছু গোচরে (দৃষ্টিতে) আসছে সে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। তথায় তিনি রত্নসেনের মুখ দেখলেন এবং হরিষে (আনন্দে) তাঁর অঙ্গ ও মনে কৌতুক (জাগল)। রসময় আনন্দসাগারে ডুব দিয়ে বালা (কন্যা) নৃপের গলায় পরাতে বরমাল্য চাইলেন।

3.4.2 বক্তব্যসার:

চিতোরের রাজ অন্তঃপুরে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সখীরা সাজিয়ে দিচ্ছে বিচিত্র পোশাক ও নানা রত্নালংকারে। হাতে তার এক স্বচ্ছ দর্পণ। দর্পণে নিজের রূপ দেখে তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তখন নিজের মধ্যে নিজে আর নেই। তিনি যে রাজকন্যা পদ্মাবতী সেই বোধটাই তাঁর মধ্য থেকে দূর হয়ে গেল।

সখীরা নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল। কেউ কেউ সুকণ্ঠে গাইছিল মঙ্গলগীত। চারধার সুন্দর গন্ধে আমোদিত।

যা কিছু দেখছেন, শুনছেন, সবকিছুর মধ্যে দেখতে পেলেন প্রিয় রত্নসেনের মুখ। তিনি রাজার গলায় মালা দেবার জন্য সখীর কাছে বরমালা চাইলেন।

পাঠগত প্রশ্ন 3.1

1. নীচের শব্দগুলির মধ্য থেকে সঠিক শব্দটি খুঁজে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান ঃ

বিচিত্র বসন পরি __________ আভরণ। (অনেক, নানা, মেলা)

করেত লইলা রামা __________ দর্পণ। (স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্মল)

নিজ __________ নিজ রূপ দেখি সুশোভন। (মুখ, আঁখি, দেহ)

আপনার রূপ __________ মজিল আপন। (দর্শি, দেখি, হেরি)

2. 'নানা যন্ত্র বাহে'—কথাটির অর্থ কী? ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) নানারকম যন্ত্র বহন করে আনে।

(খ) নানারকম যন্ত্রকে বাহন করে।

(গ) নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

3. 'কেহ কেহ সুস্বরে......মঙ্গলগীত গাহে'—'মঙ্গলগীত' কী? কথাটির ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(অ) মঙ্গলগ্রহের গীতকে 'মঙ্গলগীত' বলা হয়।

(আ) পদ্মাবতীর এক সখীর নাম মঙ্গলা, তার সুমিষ্ট কণ্ঠের গীতকে মঙ্গলগীত বলা হয়েছে।

(ই) বিবাহানুষ্ঠানে দেবতার কাছে কল্যাণজনক যে প্রার্থনাগীত গাওয়া হয় তাকে 'মঙ্গলগীত' বলা হয়।

4. নীচের 'অ' সারিতে চারটি বাক্যাংশ আছে। ওই সারির বাক্যাংশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন পাঁচটি বাক্যাংশ 'আ' সারিতে এলোমেলোভাবে আছে। প্রথম সারির বাক্যাংশের নম্বর পরের সারির বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে চিনিয়ে দিন।

অ	আ	
(ক) প্রেমমদে ঘূর্ণ আঁখি	(i) হইল গোচর	( )
(খ) তনু অচেতন মাত্র	(ii) স্বপ্ন সমসর	( )
(গ) সচেতন অচেতন	(iii) মন সচকিত	( )
(ঘ) দেখিছে শুনিছে যত	(iv) হইল তন্দ্রিত	( )

5. 'হরিষে পুলক অঙ্গ'—কীসের হরিষ? ঠিক উত্তরটি টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন ঃ

(ক) পদ্মাবতী অপূর্ব রূপবতী বলে হরিষ।

(খ) পদ্মাবতীর বিবাহ অনুষ্ঠান বলে হরিষ।

(গ) সখীরা মঙ্গলগীত গাইছে বলে হরিষ।

(ঘ) দর্পণে রত্নসেনের মুখ দেখছে বলে হরিষ বা আনন্দ।

6. 'নৃপ গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা'—ঠিক উত্তরটি টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) কন্যাটি কে?

অ. মহাদেবী আ. পদ্মাবতী ই. রাজকন্যার সখী

(খ) কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান হতে চলেছে?

অ. সিংহল রাজের সঙ্গে আ. চিতোর রাজের সঙ্গে

(গ) সে বরমালা চেয়েছে কার কাছে?

অ. রত্নসেনের কাছে আ. সখিদের কাছে ই. মহাদেবীর কাছে

7. কী দেখে পদ্মাবতীর অঙ্গ কেন পুলকিত হল?

[সখীগণে বোলে বালা .... বড়ো অনুরাগে]

3.4.3 গদ্যরূপ:

সখীগণ বলে তোর মতি কী। আপন রূপ দেখে বিভোর হলি। নৃপরত্ন কোথায় সেই বিবাহস্থলে! অন্তঃপুরে থেকে (তাঁর) গলায় মালা দিতে চাও! আপন রূপ দেখে তোর এমন হলে প্রিয়তমের রূপ দেখলে কেমন করবি। অন্যস্থানে (থেকে) নিজগলে বরমাল্য চাও। বিবাহ- স্থলেই এরকম করতে হয়। বিভাকালে (বিবাহের কালে) এরকম যদি কর মুখ থেকে পঞ্চমাণিক মুছে ফেলা হবে। আমাদের দিব্য লাগে তোমাকে রাণি বড় অনুরাগে (একথা) কইলাম।

3.4.4 বক্তব্যসার:

সখীরা তো অবাক! তারা বলল, রাজকন্যার এ কীরূপ মতি। নিজের রূপ দেখে সে এত বিভোর হয়ে গেল। রাজা রয়েছেন বিয়ের আসরে। আর কন্যা অন্তঃপুরে। রাজার গলায় তিনি মালা দিতে চাইছেন। নিজের রূপ দেখে তিনি কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করবেন। আর যখন তিনি সামনাসামনি রাজাকে দেখবেন, তখন তিনি কী করবেন? তিনি নিজের গলায় দেবার জন্য বরমাল্য চাইছেন। বিবাহের সময় এমন করলে মুখ থেকে পঞ্চরত্ন মুছে ফেলা হবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.2

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) পদ্মাবতী রাজার গলায় কখন বরমালা দিতে চেয়েছেন?

(অ) বিবাহের আসরে রাজা রত্নসেনকে দেখতে পেয়ে।

(আ) দর্পণে নিজের রূপের মধ্যে স্বামী রত্নসেনের মুখ দেখতে পেয়ে পদ্মাবতী তাঁর গলায় পরিয়ে দেবার জন্য বরমালা চেয়েছেন।

(ই) রত্নময় চতুর্দোলায় চড়ে বিবাহ সভায় যাত্রাকালে বরমালা চেয়েছেন।

(খ) সখীরা পদ্মাবতীকে উপহাস করলেন কেন?

(অ) রাজা দূরে বিবাহসভায় থাকা সত্ত্বেও অন্তঃপুরে বসে পদ্মাবতী বরমাল্য চেয়েছেন বলে।

(আ) নিজের রূপ দেখে পদ্মাবতী বিহ্বল হয়েছেন বলে।

(ই) স্বামীর প্রতি প্রেমের আবেশে পদ্মাবতীর চোখের তারা ঘুরতে লাগল বলে।

2. এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে।

(ক) কে কাকে বলেছে?

অ. পদ্মাবতী সখীদের বলেছেন।

আ. সখীরা পদ্মাবতীকে বলেছে।

(খ) দিব্য দেবার কারণ কী?

অ. বিবাহের সময় পদ্মাবতী যেন এরূপ অদ্ভুত আচরণ না করেন—তার জন্য তারা দিব্য দিচ্ছে।

শব্দার্থ ও টীকা

আ. দর্পণে স্বামীর অলৌকিক দিব্যরূপ দেখে পদ্মাবতী আনন্দ- সাগরে ভাসছিলেন বলে তারা দিব্য দিচ্ছে।

3. নীচে চারটি বাক্য 'অ' এবং 'আ' সারিতে এলোমেলো করে লেখা আছে। বাক্যগুলি ঠিক করবার জন্য প্রথম সারির বাক্যের নম্বর পরের সারির বন্ধনীর মধ্য দিয়ে চিনিয়ে দিন।

অ	আ	
(ক) আপনার রূপ দেখি	(i) করিবা কেমন	( )
(খ) প্রিয়তম রূপ হেরি	(ii) বিবাহের স্থলে	( )
(গ) আন স্থানে মাগো বরমালা	(iii) হইলা এমন	( )
(ঘ) এমত করিবা নাকি	(iv) নিজ গলে	( )

4. (ক) অন্তঃপুরে থেকে পদ্মাবতী কেন বরমাল্য চাইলেন তা ৩টি বাক্যে উত্তর দিন।

(খ) প্রভু বিবাহস্থলে থাকলেও পদ্মাবতী অন্তঃপুরে থেকে কীভাবে তার দর্শন পান অনধিক ৩টি বাক্যে দিন।

[উপহাসি সখী .... লোকচর্চা ডর]

3.4.5 গদ্যরূপ:

উপহাস করে সখীরা এরূপ বললে লজ্জাযুক্ত হয়ে সম্ভ্রমে (পদ্মাবতী) প্রত্যুত্তর করলেন। যার হৃদয় প্রেমের অঙ্কুরে সর্বদা পাগল তোমরা সকলে সেই ভাবরস ততটা জানোনা। তোমরা সবাই যদি (একই) ভাবের ভাবিনী হতে তবে এরূপ বচন আমাকে বলতে না। আমার মর্মের ব্যথা তোমরা উপহাস করছ তা এবার সত্যকথা প্রকাশ করছি। তোমরা বলো প্রভু বিবাহের স্থলে আছেন, আমি হৃদয় কমলে (তাঁর) দর্শন পাই। স্বামী যে আমিও সে, ভিন্ন ভাবনা নেই, আপনার (দিকে) চাইতে প্রাণনাথকে (সেখানে) লীন আছেন দেখি। সখীরা দিব্য দিলেও অন্য হত না। সমদৃষ্টি চান অন্যথায় প্রাণ রবে না। ঘোমটার অন্তরে চোখ মুখ লুকিয়ে রইল সে সময় স্ত্রী লজ্জায় অধোমুখ থাকে। মধুচন্দ্রিমার কালে কী হয় জানি না। তোমাদের শপথ সেই পর্যন্ত ফলবে (কার্যকরী থাকবে)। সখীরা শোনো তার উপায় হল জাতিকুল লজ্জামান লোকচর্চার ভয়।

3.4.6 বক্তব্যসার:

স্বামী-স্ত্রীর দেহ ভিন্ন হলেও প্রেমের ফলেই তা একাকার হয়ে যায়। সেখানে স্বামী দূরে থাকলেও তিনি স্ত্রীর হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজ করেন সবসময়। স্ত্রীর মধ্যে স্বামী থাকেন আত্মলীন। সখীরা সবাই তাঁর মনের ভাব জানে না বলেই এমন কথা বলছে। তাঁর মনের প্রেমের ভাব সকলে যদি জানত, যদি তারা তাঁর ভাবের ভাবিনী হত, তবে এমন কথা তাঁকে বলতে পারত না। সখীরা দেখছে শুধু তাঁর বিবাহাচার। কিন্তু এই বিবাহাচারের অন্তরালে স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ের যে সংযোগ ঘটে গেছে, তারা তার খবর রাখে না। বিবাহমঙ্গল কেবল বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানই নয়, বিবাহমঙ্গল স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর একান্ত হবারও বার্তা। এবার তিনি সখীদের কিছু সত্য কথা প্রকাশ করছেন। এ হল প্রেমের গূঢ় কথা। সখীরা বলছেন তাঁর প্রভু আছেন বিয়ের আসরে। কিন্তু পদ্মাবতী তো তাঁকে তাঁর হৃদয় কমলেই দেখতে পাচ্ছেন। যেখানে তাঁর স্বামী সেখানেই তিনি। তাঁদের মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই। পদ্মাবতী আরও বুঝিয়ে দিলেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তিনি ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে

শব্দার্থ ও টীকা

রাখেন, স্ত্রীসুলভ লজ্জায় তখন মুখ নীচু করে থাকেন। কিন্তু মধুচন্দ্রিমার মিলনের সময়ে কী ঘটবে তা তিনি জানেন না। সখীদের অনুমান তখন হয়তো ফলে যেতে পারে। তবে জাতি, কুল, লজ্জা, মান আর লোকনিন্দার ভয় তাঁকে হয়তো সংযত করতে পারে।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.3

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) 'সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিলা'—'লজ্জাযুক্তা' এখানে কাকে বলা হয়েছে?

অ. পদ্মাবতীকে আ. সখীদের

(খ) 'তুমি সবে নাহি জানো ভাব রস তত'—ভাব রস কী?

(অ) ভাব রস হল আনন্দপূর্ণ কৌতুক রস।

(আ) ভাব রস হল প্রেমের গভীর ভাব।

(গ) 'এবে সত্য কহি'—সত্যটা কী?

(অ) রাজকন্যা পদ্মাবতীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁর স্বামীর জন্য সর্বদা প্রেমের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

(আ) পদ্মাবতীর স্বামী তাঁর হৃদয়কমলে সর্বদা বিরাজ করছেন।

(ঘ) পদ্মাবতীর সখীরা পদ্মাবতীর হৃদয়বার্তা বুঝতে পারেনি কেন?

(অ) সখীরা পদ্মাবতীর ভাবের ভাবিনী নয় বলে।

(আ) সখীরা নানা যন্ত্র বাজাতে এবং মঙ্গলগীত গাইতে ব্যস্ত ছিল বলে।

(ঙ) সখীদের সঙ্গে কথোপকথনে পদ্মাবতী সখীদের কী বুঝিয়েছেন?

(অ) তিনি সখীদের বুঝিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই। তারা এক ও অভিন্ন, এক দেহে লীন হয়ে থাকেন।

(আ) বিবাহের সময় সাজসজ্জা করে দর্পণে নিজের রূপ দেখে পদ্মাবতী আত্মহারা। তাঁর মনে জেগেছে এক ভাবান্তর। তাই তিনি সখীদের কাছে বরমালা চেয়েছেন স্বামী রত্নসেনের গলায় পরিয়ে দেবার জন্য।

(চ) পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল কবিতাটির মূল বিষয় কী?

(অ) পদ্মাবতীর বিয়ে ও তার রূপসজ্জা। এবং বিয়ে উপলক্ষেই সখীদের সুমিষ্ট কণ্ঠে মঙ্গলগীত পরিবেশন।

(আ) সুন্দর একটি রোমান্টিক প্রেমকাব্যের উপাখ্যান।

[এতেক কহিতে শুভক্ষণ .... লজ্জা বাসে অতি]

3.4.7 গদ্যরূপ:

এসব বলতে বলতে শুভক্ষণ উপস্থিত (হল)। মহাদেবীর ত্বরিত চলতে আজ্ঞা হল। রত্নময় চতুর্দোল

শব্দার্থ ও টীকা

নিকটে আনল। উঠ উঠ বলে তাঁকে সখীরা ধরে তুলল। জয় জয় শব্দে মন উতরোল হল। গীতে নাটে বাদ্যে পুরী হুলস্থুল হল। চলতে (গিয়েও) কন্যা চলেন না গতি তাঁর অর্ধপদ। সখীদের দিকে চাইতে অতি লজ্জা লাগে।

3.4.8 বক্তব্যসার:

সখীদের সঙ্গে পদ্মাবতীর কথাবার্তা যখন চলছিল, তখনই এল সেই শুভ মুহূর্ত। পদ্মাবতীকে তাড়াতাড়ি বিয়ে আসরে নিয়ে যাবার জন্য মহারানি আদেশ দিয়েছেন। রত্নময় চতুর্দোলা এসে পৌঁছল। সখীরা তাকে ধরে ধরে দাঁড় করাল। চারদিক জয় জয় শব্দে ভরে গেল। গীতে নাটকে বাদ্যে রাজপুরী পূর্ণ হল। লজ্জায় রাজকন্যার তখন চরণ সরে না। তিনি পুরোপুরি পা ফেলে হাঁটতে পারছেন না। সখীদের দিকে তাকাতেও তার লজ্জা।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.4

1. (ক) 'এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত'—'এতেক কহিতে' বলতে কাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল?

(অ) সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর সখীদের।

(আ) মহারানির সঙ্গে রাজকর্মচারীদের।

(খ) মহারানি কী আজ্ঞা দিয়েছিলেন?

(অ) পদ্মাবতীর সখীদের সুমিষ্ট কণ্ঠে মঙ্গলগীত গাইতে আদেশ দিয়েছিলেন।

(আ) মহারানি পদ্মাবতীকে তাড়াতাড়ি বিবাহস্থলে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন।

(গ) পদ্মাবতী কোন্ বাহনে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন?

(অ) পদ্মাবতী সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে চেপে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন।

(আ) পদ্মাবতী রত্নময় চতুর্দোলায় চড়ে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন।

(ঘ) রাজপুরী হুলুস্থূল হল কেন?

(অ) গীতে নাটে বাদ্যে রাজপুরী হুলুস্থুল হল।

(আ) হস্তীর তাণ্ডবে রাজপুরী হুলুস্থুল হল।

(ঙ) বিবাহস্থলে যাবার পূর্বে পদ্মাবতীর মন উদ্‌বিগ্ন হল কেন?

(অ) সখীদের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছেন না বলে।

(আ) জয়ধ্বনিতে স্থান ভরে ওঠায় পদ্মাবতীর মন উদ্‌বিগ্ন হল।

2. (ক) কন্যা 'চলিতে না চলে' কেন?

3.5 আপনি যা শিখলেন

1. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিন্তাভাবনার কোনও মূলগত পার্থক্য নেই।
2. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা হল প্রেমের মূল।
3. এই সমদৃষ্টি থাকলেই তাদের ব্যবধান যায় ঘুচে, তারা এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে।

3.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে'—কারা কোথায় মঙ্গলগীত গাইছিল? সেখানে মঙ্গলগীত গাওয়া হচ্ছিল কেন অনধিক পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

2. পদ্মাবতী কোথায় বসে কার গলায় কখন বরমালা দিতে চেয়েছেন, আর যাঁকে বরমালা দিতে চেয়েছেন তিনিই বা তখন কোথায় ছিলেন তা অনধিক আটটি বাক্যে উত্তর দিন।

3. 'আপনার রূপ দেখি হইলা এমন।
প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন।।

   কার প্রতি কাদের উক্তি? এই উক্তির তাৎপর্য কী?

4. 'যেই স্বামী সেই আমি।'— কথাটির তাৎপর্য কী?

5. 'সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিল।'—সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা কাদের কী কথার প্রত্যুত্তর দিলেন? তিনি প্রত্যুত্তর কীভাবে দিলেন?

6. পদ্মাবতীর বিবাহসজ্জার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা ৮টি বাক্যে লিখুন।

7. 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতায় রাজপুরীর অন্তঃপুরের যে পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে আট-দশটি বাক্যে তার পরিচয় দিন।

8. 'এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত'—'শুভক্ষণ উপস্থিত' হলে কী ঘটনা ঘটল?

9. 'বিবাহ সজ্জায় অন্তঃপুরে থেকে এক মধুরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পদ্মাবতী এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন।'
   (ক) মধুরভাবে আচ্ছন্ন বলতে কী বলা হয়েছে?
   (খ) কী কাণ্ড করলেন?
   (গ) কাণ্ডটি অদ্ভুত কেন?
   (ঘ) তাহলে কি পদ্মাবতীর আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে বলে মনে করেন?

3.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

3.1

1. নানা, নির্মল, আঁখি, হেরি
2. ——— গ
3. ——— ই
4. ক — (iv)
   খ — (iii)

গ — (ii)
ঘ — (i)

5. ——— ঘ

6. ক — আ
খ — আ
গ — আ

7. বিবাহের সাজে সজ্জিত পদ্মাবতী দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে স্বামীর মুখ দেখে পুলকিত।

3.2

1. ক — আ
খ — অ

2. ক — আ
খ — অ

3. ক — (iii)
খ — (i)
গ — (iv)
ঘ — (ii)

4. (ক) অন্তঃপুরে প্রেমবিহ্বল রাজকন্যা। বর বিবাহসভায়। প্রেমাবিষ্ট পদ্মাবতীর মানসিক বিভ্রমের জন্যই এই বরমাল্য চাওয়া।

(খ) প্রগাঢ় প্রেমানুভূতিতে রাজকন্যার মানসিক বিভ্রম। বাস্তব-অবাস্তব বোধ তাঁর লুপ্ত। তাঁর হৃদয়ে ভাবী স্বামীর উপস্থিতির অনুভব।

3.3

1. ক — অ
খ — আ
গ — আ
ঘ — অ
ঙ — অ
চ — আ

2. সখীরা উপহাস করেছিল বলে।

3.4

1. ক — অ
খ — আ
গ — আ
ঘ — অ
ঙ — আ

2. সখীদের উপস্থিতিতে নারীসুলভ লজ্জায় তাঁর গতি মন্থর।

লেখক পরিচিতি

কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কবি জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামে। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর নানা ভাষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সংগীত- শাস্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। সংস্কৃত শাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ।

হিন্দু সমাজের বাইরের একজন মানুষ হয়েও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সে শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি।

আরাকান রাজ্যের (বর্তমান মায়ানমারের অন্তর্গত) প্রধানমন্ত্রী মগন ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাংলাভাষায় কাব্য রচনা করতে তিনি আলাওলকে উৎসাহ দিয়েছেন। আরাকান রাজ্যের সেনাবাহিনীতে তিনি কাজ করতেন। আলাওলের জীবনাবসান হয় ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

সমধর্মী রচনা

কবি দৌলত কাজি রচিত ঃ '**সতী ময়না**'।

4

কাশীরাম দাশ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

4.1 প্রস্তাবনা

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছেন। তখন তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে। অনেক পড়াশোনা, অনেক কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায় তাঁর গ্রাম সাগরদাঁড়ির কথা, ছোটোবেলায় চেনা কপোতাক্ষ নদের কথা। আর সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কবিদের কথা, পাশ্চাত্যদেশের লেখকদের কথা, দেশের নানা মনীষীদের কথা। সেই সময়ে তিনি ইটালীয় কবি পেত্রার্কের এক নতুন শৈলীতে লেখা কবিতায় আকৃষ্ট হন। তার নাম 'সনেট'। মধুকবি সেই চোদ্দটি পঙ্‌ক্তির কবিতার অনুসরণে তাঁর মনে পড়া বিষয়গুলিকে নিয়ে কবিতা লিখলেন। নাম দিলেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি'।

'কাশীরাম দাস' নামের কবিতাটি ওই জাতীয় কবিতা। কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাকাব্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালি পাঠককে মহাভারতের রসসুধা পান করিয়েছেন। বাঙালিমাত্রেই এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মধুকবি বাঙালি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এই ছোট্ট কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কাশীরামের মহান কীর্তিকে স্মরণ করেছেন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

এই কবিতার ভাষায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা হল বাংলা ভাষার প্রাচীন শব্দের সঙ্গে আধুনিক শব্দের মিশ্রণ। যেমন, রাখিলা, তেমতি, পূজি, মুকতি, খননি, নারিবে — এগুলি প্রাচীন পদ, শুধু কবিতায় ব্যবহৃত হয়। এই সব বিশেষ রূপের সঙ্গে 'আকুল', 'রোদন', 'গৌড়'-এর মতো আধুনিক শব্দ পাশাপাশি বসেছে। কাশীরাম দাস বাংলা সাহিত্যের একজন প্রাচীন কবি, তাঁর স্মরণে রচিত এই কবিতায়, প্রাচীনতার গৌরব ফুটিয়ে তোলার জন্য ভাষার এমন মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

4.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি —

- কবি মধুসূদনের মহাকবি কাশীরাম দাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে পারবেন;
- মহাভারত মহাকাব্যের মহনীয়তার কথা স্মরণ করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ বোধ করবেন;
- সাধারণ বাঙালির মহাভারত মহাকাব্যের মূল রসগ্রহণের কথা জানতে পারবেন;
- 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতার গঠন-কাঠামোর বিষয় জানতে পারবেন;
- এই কবিতায় উল্লেখিত পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্রের কথা জানতে পারবেন।

4.3 মূল পাঠ

কাশীরাম দাস

(1)

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;

(2)

সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

শব্দার্থ ও টীকা

সনেট (Sonnet) = বিশেষ রীতিতে লেখা চোদ্দ লাইনের গীতিকবিতা।
চন্দ্রচূড় = চূড়ায় যার চন্দ্র।
জটাজাল = জটারাশি।
যেমতি = যেমনভাবে।
সংস্কৃত-হ্রদ = সংস্কৃত ভাষা-রূপ আবদ্ধ জলাশয়।
জাহ্নবী = গঙ্গা নদীর অন্য নাম।
ভারত-রস = মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ।
নর-কুল-ধন = মানুষের সমাজের সম্পদ।
সাধিলা = সাধন বা সম্পন্ন করলেন।
ভগীরথ = সগর বংশের সন্তান, রাজা।
সগর বংশ = সগর নামে এক পৌরাণিক রাজার কুল।

ভারত-রস = মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ।
ভাষা-পথ = ভাষারূপ পথ।
খননি = খনন করে, খুঁড়ে।
স্ববলে = নিজের শক্তিতে।
কবীশ = কবিশ্রেষ্ঠ।
কাশি = কাশীরাম দাস।

শব্দার্থ ও টীকা

4.4 বিষয়ের রূপরেখা

চন্দ্রচূড় . . . তিন ভুবন

4.4.1 গদ্যরূপ :

পবিত্র গঙ্গা (জাহ্নবী) যেমন মহাদেবের জটামণ্ডলে আবদ্ধ ছিলেন, ঋষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঠিক তেমনি মহাভারত মহাকাব্যের রূপ রসকে সংস্কৃত-ভাষারূপ হ্রদে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ফলে সেই রসসুধা পানে আকুল বাঙালি তৃষ্ণায় রোদন করছিল। সগর বংশের সন্তান রাজা ভগীরথ যিনি পৃথিবীর বুকে তপস্যা করে ধন্য এবং মানবসমাজে সম্পদবিশেষ, তিনি কঠোর তপস্যায় গঙ্গাকে মর্তে এনে সগরবংশের শাপভ্রষ্ট সন্তানদের মুক্ত করলেন। গঙ্গাকে প্রবাহিত করে তিন ভুবনকে (স্বর্গ-মর্ত-পাতাল) পবিত্র করলেন।

4.4.2 বক্তব্যসার :

মহাকবি বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় 'মহাভারত' মহাকাব্য রচনা করেন। মূল কাহিনি যদিও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, সেই কাব্যের বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সমস্ত যুগের কথাই যেন ধরা পড়েছে। ভাবতে অবাক লাগে এই কাব্যে এমন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা আজকের জীবনেও সত্য। এই কাব্যে একদিকে যেমন সত্য, ধর্ম, প্রেম, ভালোবাসা, শান্তি, মনুষ্যত্বের কথা আছে, অন্যদিকে ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, মোহ, ধ্বংস ও যুদ্ধের কথা আছে। এই কাব্যের ভাষা এবং ছন্দ রসসমৃদ্ধ। পাঠকমাত্রেই এর স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হন। কিন্তু দুঃখের কথা, সংস্কৃত না-জানা বাঙালি এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনলেও নিজে পড়ে এর স্বাদগ্রহণ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে কবি কাশীরাম দাস এক মহৎ কাজ করেছেন। একে বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুললিত পয়ার ছন্দে (চরণগুলির শেষে মিল এবং চোদ্দো অক্ষরের কবিতা)।

কবি মধুসূদন সুন্দর উপমার সাহায্যে কাশীরামের কীর্তিগাথা বর্ণনা করেছেন। তিনি পুরাণের আখ্যান অবলম্বন করে বলেছেন যে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিলমুনির অভিশাপে ভস্মীভূত হলে, অনেক বছর বাদে সেই বংশের সন্তান রাজা ভগীরথ গভীর তপস্যায় গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করে মর্তে এনে সেই সন্তানদের মুক্তি দিলেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে গঙ্গার মর্তে নামার সময় সেই প্রবল স্রোতকে ধারণ করা কঠিন ছিল। মহাদেবের জটাজালে তিনি আবদ্ধা ছিলেন। ভগীরথ কঠিন তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন।

কবি মধুসূদন কাশীরাম দাসকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা মহাভারত মহাকাব্যরূপ গঙ্গা যেন সংস্কৃত ভাষারূপ মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। আর কাশীরাম কঠোর পরিশ্রম করে সেটি পাঠকের কাছে গ্রহণীয় ও সুখপাঠ্য করে তোলেন। তিনি সুললিত ছন্দে বাংলা মহাভারত রচনা করেছেন। তিনি শুধু একারণে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভারতবর্ষের পবিত্রতম নদী গঙ্গাকে মর্তে এনে মর্ত্যলোককে ভগীরথ পবিত্র করেছেন, ঠিক তেমনি কাশীরামও মহাভারতরূপ পবিত্র মহাকাব্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি ধন্য।

পাঠগত প্রশ্ন 4.1

১। **বন্ধনীর মধ্য থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসান ঃ**

ক) চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি ————। (গঙ্গা/জাহ্নবী)

খ) . . ঢালি ———— রাখিলা যেমতি। (বাংলা-হ্রদে/ সংস্কৃত-হ্রদে)

গ) কঠোরে গঙ্গায় পূজি ———— ব্রতী, (ভগীরথ/সগর)

ঘ) পবিত্রিলা আনি ————, এ তিন ভুবন। (মায়ে/ মাকে)

২। **একটি বাক্যে উত্তর লিখুন :**

ক) 'ভারত-রস' বলতে কী বোঝায়?

খ) সগর-বংশের অভিশপ্ত সন্তানদের মুক্তিসাধন করলেন কে?

গ) কীসের তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ রোদন করত?

ঘ) 'কাশীরাম দাস' কবিতার কবির নাম কী?

ঙ) সংস্কৃত-হ্রদের সঙ্গে কীসের তুলনা করা হয়েছে?

৩। **প্রতিশব্দ দিন :**

ক) জাহ্নবী

খ) চন্দ্রচূড়

৪। **বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিকের বিষয়ের মধ্যে ঠিক সম্পর্কটির সংখ্যা শূন্যস্থানে লিখুন :**

	A	উত্তরের সংখ্যা		B
i)	সংস্কৃত-হ্রদ		(a)	কাশীরাম দাস
ii)	ভগীরথ -		(b)	জাহ্নবী
iii)	মহাভারত মহাকাব্য -		(c)	মহাদেবের জটা

সেই রূপে . . . পূণ্যবান

4.4.3 গদ্যরূপ :

সেইভাবে নিজের শক্তির সাহায্যে ভাষার পথকে (সংস্কৃত ভাষা) খনন করে (খুঁড়ে) ভারত-রসের (মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ) স্রোত তুমি বইয়ে দিয়েছ এবং তা করেছ তার নির্মল বা পবিত্র জলে গৌড়ের (বঙ্গবাসীর) তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে। গৌড়দেশ (বঙ্গদেশ/বাঙালি জাতি) সে ঋণ কখনও শোধ করতে পারবে না। মহাভারতের কথা (কাহিনি) অমৃত বা সুধার মতো। ওগো কাশীরাম, তুমি শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে পুণ্যবান্ বা মহত্ত্বের অধিকারী।

4.4.4 বক্তব্যসার :

কবি কাশীরাম দাসের কাছে বাঙালির ঋণের শেষ নেই। মহাকবি বেদব্যাসের মহাভারতকে সংস্কৃতভাষা-না-জানা বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন। তা করেছেন বাংলায় ভাবানুবাদের মধ্য দিয়ে। একথা ভাবতে গেলে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে আসে।

এ কাজকে কবি মধুসূদন ভগীরথের গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসার মতোই কঠিন বলে মনে করেছেন। স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসার জন্য দীর্ঘ যাত্রাপথকে খুঁড়ে রাস্তা তৈরি করেছিলেন ভগীরথ। ঠিক তেমনি কাশীরাম সংস্কৃত রূপ কঠিন ভাষায় লেখা কাহিনিকে যেন খনন করে, অর্থাৎ বিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার সহজ রাস্তা তৈরি করেছেন। সেইপথে গঙ্গারূপ মহাভারতের রসধারাকে প্রবাহিত করেছেন।

এর ফলে মহাভারতের স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত তৃষ্ণার্ত বাঙালি সুললিত ছন্দে লেখা বাংলা মহাভারতের নির্মল জল পানে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পেরেছিলেন। এজন্য কাশীরাম দাসের ঋণ বাঙালি কখনওই শোধ করতে পারবে না। এই অসাধারণ কীর্তির জন্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম কাশীরাম দাস ধন্য।

পাঠগত প্রশ্ন 4.2

১। **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসান :**

ক) সংস্কৃতে লেখা মহাভারত মহাকাব্যের রচয়িতা ছিলেন ————। (কৃত্তিবাস/ কাশীরাম দাস/ ঋষি দ্বৈপায়ন)

খ) গৌড়ভূমি কার ধার শোধ করতে পারবেন না? ———— (ঋষি দ্বৈপায়নের/ মধুসূদনের/ কাশীরাম দাসের)

গ) জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে ———— জলে! (নির্মল/ মিষ্টি/ বিমল)

ঘ) ‘হে কাশি!’ — এখানে ‘কাশি’ হলেন ————। (কাশীধাম/ বেনারস/ কাশিবাবু/ কাশীরাম দাস)

২। **‘ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি’ — ‘ভারত-রস’ বলতে কবি যা বুঝিয়েছেন তা বোঝাতে নীচের ঠিক খোপটিতে (✓) চিহ্ন দিন।**

ক) ভারতের রস — ☐

খ) মহাভারত মহাকাব্যের স্বাদ — ☐

গ) ভারতবর্ষের কাহিনি — ☐

ঘ) গঙ্গানদীর প্রবাহ — ☐

৩। **‘গৌড়ভূমি’ বলতে বোঝায় — (ঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দিন) :**

ক) পশ্চিমবঙ্গ

খ) বঙ্গভূমি

গ) বাঙালি জাতি

ঘ) পূর্ববঙ্গ (আজকের বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্র)

৩। **নীচের শব্দগুলির প্রাচীন রূপের জায়গায় আধুনিক রূপ লিখুন :**

ক) যেমতি ____________________

খ) তেমতি ____________________

গ) পূজি ____________________

ঘ) পবিত্রিলা ____________________

ঙ) খননি ____________________

চ) নারিবে ____________________

4.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা মহাভারতের রচয়িতা (অনুবাদক) কাশীরাম দাসের নাম এবং মহান কীর্তির কথা।
2. সগর বংশের রাজা ভগীরথের স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে প্রবাহিত করার পৌরাণিক কাহিনি।
3. মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা কবিতার নতুন রীতি অর্থাৎ চতুর্দশপদী কবিতা লেখার বিষয়।
4. কবি মধুসূদনের মহাকবি কাশীরাম দাসের প্রতি বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার কথা।
5. বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ শব্দ, যা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না।

4.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'কাশীরাম দাস' কবিতাটি গঠনের দিক দিয়ে কী জাতীয় কবিতা?
2. কবিতাটির নাম 'কাশীরাম দাস' রাখা হয়েছে কেন? (চার/পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন)
3. কাশীরাম দাসকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন? (৪/৫টি বাক্যে লিখুন)
4. দ্বৈপায়ন কে? তিনি বিখ্যাত কেন? তিনি কী নামে বিখ্যাত ছিলেন?
5. কীসের তৃষ্ণায় বঙ্গবাসী আকুলভাবে রোদন করেছেন? কে সেই তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করেছেন? কীভাবে তিনি সে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন ২/৩টি বাক্যে লিখুন।
6. মহাভারতের কথা অমৃত-সমান বলে কেন মনে করেছেন মধুকবি? কাশীরাম দাসকে কবিদের মধ্যে পুণ্যবান বলেছেন কেন ২/৩টি বাক্যে লিখুন।
7. কবিতাটির অন্য কী শিরোনাম দেওয়া যায়?
8. সংস্কৃত হ্রদকে মহাদেবের জটার সঙ্গে এবং জাহ্নবীর সঙ্গে মহাভারত মহাকাব্যের তুলনা কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? সংক্ষেপে লিখুন।

4.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

4.1

১. ক) জাহ্নবী,
খ) সংস্কৃত-হ্রদে,
গ) ভগীরথ,
ঘ) মায়ে।

২. ক) মহাভারত মহাকাব্যের রসসুধা বা সেই কাব্যের অপূর্ব কাহিনির স্বাদ।
খ) সগর-বংশের ভস্মীভূত সন্তানদের মুক্তি সাধন করলেন সেই বংশের সন্তান ভগীরথ।

গ) মহাভারতের রসসুধা পানে বঞ্চিত বাংলাদেশ তৃষ্ণায় আকুল হয়ে রোদন করত।

ঘ) কবির নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ঙ) সংস্কৃত-হ্রদের সঙ্গে মহাদেবের জটামণ্ডলের তুলনা করা হয়েছে।

৩. ক) গঙ্গা

খ) মহাদেব বা শিব

৪. i) (c)

ii) (a)

iii) (b)

4.2

১. ক) ঋষি দ্বৈপায়ন,

খ) কাশীরাম দাস,

গ) বিমল,

ঘ) কাশীরাম দাস।

২. খ)

৩. খ)

৪. ক) যেমন

খ) তেমন

গ) পূজা করে

ঘ) পবিত্র করলেন

ঙ) খনন করে, খুঁড়ে

চ) পারবে না

কবি পরিচিতি

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। জন্ম ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪। জন্মস্থান — বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম, কপোতাক্ষ নদের ধারে। পিতা - রাজনারায়ণ, মাতা - জাহ্নবী দেবী। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। পরে কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন এই কলেজের 'উজ্জ্বলতম ছাত্র'। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি একদিকে যেমন ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগী হয়ে ওঠেন, তেমনি পাশ্চাত্য আচার- আচরণেও প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। এর ফলে হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণ করেন এবং ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যান। ১৮৪৮-এ চলে যান মাদ্রাজে এবং সেখানে সাত বছর ছিলেন। সেখানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা করেন। প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে এমিলি হেনরিয়েটা নামে এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেন। কলকাতাতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন। ১৮৬২ সালে বিলেতে যাবার আগেই তিনি লেখেন 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী'

প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে তাঁর যেসব বই ওই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় সেগুলি হল — ‘তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য’, ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’, ‘ব্রজাঙ্গনা’ ও ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’, ‘রামায়ণ মহাকাব্য’ অবলম্বনে রচিত। এই মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যের এক বৈপ্লবিক রচনা। ফরাসি দেশে থাকাকালে ইটালীয় কবি প্রেত্রার্কের ‘সনেট’-এর অনুসরণে ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ নামে অভিনব কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন — ‘কপোতাক্ষ নদ’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’, ‘কৃত্তিবাস’, ‘কাশীরাম দাস’ ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন।

4.8 সমধর্মী কবিতা

‘কাশীরাম দাস’ কবিতার মধ্য দিয়ে কবি মধুসূদন একদিকে যেমন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ‘মহাভারত’-এর মহনীয়তাকে স্মরণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ভাষার বেড়াজাল থেকে একে মুক্ত করে বাঙালি পাঠককে এর রসসুধা পান করাবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতার ছাঁদে বাংলা রামায়ণ-এর রচয়িতা কৃত্তিবাসকেও স্মরণ করেছেন নীচের কবিতাটিকে।

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! - কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথাস্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পুর্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি।
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরি;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।

5

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5.1 প্রস্তাবনা

অনেকের বিশ্বাস এই পৃথিবী ভগবানের সৃষ্টি। সুতরাং এই পৃথিবী ও তার জীবজগতের কল্যাণ কামনাই তিনি করবেন—এটাই স্বাভাবিক। এখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নানা অসাধু পথে গ্রাস করে শক্তিমান হচ্ছে। আর বাকিরা হতদরিদ্র বঞ্চিত জীবনযাপন করছে। পৃথিবীর পরিবেশ আজ হিংসা ও বিদ্বেষে দূষিত ; মানবসমাজও নানা সংকীর্ণ ভাগে বিভক্ত। শান্ত পৃথিবী আজ অশান্ত ও বিপন্ন। এই অবস্থা কখনই স্রষ্টার কাম্য নয়। তাই এই কবিতায় কবি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন। আর এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই মানবসমাজের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গিয়েছে। পরের মুখের গ্রাস যারা কাড়ে তারাই শুভশক্তির বিরোধী, তারাই সর্বনাশা শক্তি। ভগবান এই সর্বনাশা শক্তির প্রতি বিমুখ ও বিরূপ। যারা তাঁর সৃষ্টিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের প্রতি তিনি স্বাভাবিকভাবেই রুষ্ট। প্রশ্নের মাধ্যমেই কবি অপরাধীদের ও তাদের অপকর্মকে চিনিয়ে দিয়েছেন এবং তারা যে ভগবানের অর্থাৎ পৃথিবীর মঙ্গলকামী শক্তির কোনো প্রশ্রয় পাবে না তা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কবি এইভাবে মানুষের শুভশক্তি ও অশুভশক্তিকে চিনিয়ে দিয়ে এক হিংসা-দ্বেষমুক্ত সুস্থ সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

অসাধু = অসৎ।
গ্রাস = দখল।
দ্বেষ = শত্রুতা।

5.2 উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে আপনি—

- বর্তমান সমাজকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
- এই পৃথিবীতে কারা এবং কেন মনীষীদের উপদেশ অমান্য করছে তা ধরতে পারবেন।
- দুর্বলেরা যে সবলদের লোভ ও হিংসার জন্য ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না তা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- দুর্বলের প্রতি এক মানবিক মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত হবেন।
- মানবসমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত পথের হদিস পাবেন।

উদ্দীপ্ত = উত্তেজিত।
হদিস = খোঁজ, সন্ধান।

5.3 মূল পাঠ

(1)

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

(2)

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

(3)

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষম করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

শব্দার্থ ও টীকা

দূত = প্রতিনিধি বা যে সংযোগ রক্ষা করে।
দয়াহীন সংসারে = নিষ্ঠুর সংসারে।
শক্তের = শক্তিশালীর।
বরণীয় = বরণযোগ্য।
স্মরণীয় = স্মরণযোগ্য।
ব্যর্থ = বিফল।
ব্যর্থ নমস্কারে = মনীষীদের মানুষকে ভালোবাসা ও অন্তর থেকে হিংসা দূর করার উপদেশ ধনীরা প্রত্যাখ্যান করছে।

নিঃসহায়ে = অসহায়কে।
প্রতিকার = প্রতিবিধান।
শক্ত = শক্তিমান।
তরুণ বালক = কিশোর। কবি এখানে এক তরুণ বালকের যন্ত্রণাকাতর ছবি তুলে ধরেছেন।

রুদ্ধ = বাধাপ্রাপ্ত।
কারা = কারাগার।
অমাবস্যা = কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, এখানে অন্ধকার।
দুঃস্বপ্ন = অশুভ ঘটনার স্বপ্ন।
লুপ্ত = আচ্ছন্ন।
লুপ্ত.....তলে = কবির চিন্তাকে দুশ্চিন্তায় ভরিয়ে তোলে।
বিষাইছে = বিষাক্ত করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

5.4 বিষয়ের রূপরেখা

[ভগবান, ... ব্যর্থ নমস্কারে]

5.4.1 গদ্যরূপ :

ভগবান যুগে যুগে বারে বারে তুমি দয়াহীন সংসারে দূত পাঠিয়েছ। তাঁরা সবাইকে ক্ষমা করতে ও অন্তর থেকে সমস্ত বিদ্বেষ দূর করতে বলেন। তাঁরা বরণীয় ও স্মরণীয়, তবুও বাহির-দ্বারে আজ দুর্দিনে তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরানো হল।

5.4.2 বক্তব্যসার :

কবি রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবীর স্রষ্টার ভূমিকায় এক অদৃশ্য শুভ শক্তির কল্পনা করেছেন। স্রষ্টার কাছে সব মানুষই সমান হবে এটাই প্রত্যাশিত। অথচ সেই শুভশক্তিকে অমান্য করে সবল মানুষেরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করছে ; তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে। যুগে যুগে অনেক মনীষী এই পৃথিবীতে এসে মানুষদের হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে ক্ষমা ও ভালোবাসার শুভপথে চলতে বলেছেন। কবি এই মনীষীদেরই ভগবানের প্রেরিত প্রতিনিধি বা দূত বলেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই শিক্ষা স্বার্থপর লোভীরা গ্রহণ করেনি। শুধু লোক-দেখানো সম্মানটুকু জানিয়ে তাদের বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। একদল মানুষের এই হৃদয়হীন আচরণ কবিকে ব্যথিত করেছে ; কবির চোখে এই সংসার দয়াহীন বলে মনে হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন 5.1

১. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) বরণীয় কারা?

(অ) ভগবান (আ) কবি (ই) ভগবানের দূতেরা।

(খ) তারা কাদের ক্ষমা করতে ও ভালোবাসতে বলেছেন?

(অ) সবলদের (আ) দুর্বলদের (ই) সব মানুষকে।

২. (ক) কারা কেমনভাবে বরণীয় ও স্মরণীয়দের নির্দেশে সাড়া দিয়েছিল?

(খ) সংসারকে দয়াহীন বলা হয়েছে কেন?

[আমি যে .... মাথা কুটে]

5.4.3 গদ্যরূপ :

কপট রাত্রি ছায়ায় গোপন হিংসা নিঃসহায়কে আঘাত করতে দেখেছি। আমি দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আমি দেখেছি তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছোটে এবং কী যন্ত্রণায় পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে মরেছে।

5.4.4 বক্তব্যসার :

সমাজে অত্যাচার, বঞ্চনা, কপটতা ইত্যাদি অসামাজিক কাজকে অন্ধকার জগতের কাজ বলেই মনে

শব্দার্থ ও টীকা

অসহনীয় = অসহ্য

করা হয়। দুর্বলদের ওপর সবলেরা প্রতিনিয়ত এই অন্ধকার জগতের জঘন্য অপরাধমূলক আক্রমণ করে চলেছে। তারা বিচারব্যবস্থাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে এনে শাস্তি এড়িয়ে যাচ্ছে। শক্তিমানদের দাপটে দুর্বলেরা কোনোদিনই সুবিচার পাচ্ছে না এবং অন্যায়ের প্রতিকার না পেয়ে এক অসহনীয় জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কবি এক স্বপ্নভঙ্গ উন্মাদ তরুণের পাথরে মাথা কোটার ছবি এঁকে সমাজের অসহায় মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন।

5.4.5 মন্তব্য :

'গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে'— শক্তিমান ইংরেজ প্রভুদের নির্দেশে ১৯৩১ সালে হিজলি জেলে প্রহরীরা যে নিরীহ বন্দিদের ওপর রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে ২ জনকে খুন ও ২০ জনকে আহত করে, পংক্তিটি তার কথাই স্মরণ করায়।

পাঠগত প্রশ্ন 5.2

১. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) 'কপট রাত্রি ছায়ে'—কাকে আঘাত করা হয়েছে?

(অ) তরুণ বালককে (আ) কবিকে (ই) নিঃসহায়কে।

(খ) কে উন্মাদ বালককে যন্ত্রণায় ছুটতে দেখেছেন?

(অ) ভগবানের দূত (আ) ভগবান (ই) কবি।

২. একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(ক) শক্তের অপরাধের কোনো প্রতিকার হয় না কেন?

(খ) তরুণ বালকের নিষ্ফল মাথাকুটার দৃশ্য দিয়ে কাদের জীবন যন্ত্রণার ছবি আঁকা হয়েছে?

[কণ্ঠ .... ভালো?]

5.4.6 গদ্যরূপ :

আজ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ। বাঁশি সংগীতহারা; অমাবস্যার কারা আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে লুপ্ত করেছে ; তাইতো তোমায় অশ্রুজলে জিজ্ঞেস করি যারা তোমার বায়ু বিষাচ্ছে, তোমার আলো নিভাচ্ছে তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ ও ভালোবেসেছ?

5.4.7 বক্তব্যসার :

দুর্বলের প্রতি অসীম মমতায় কবি ভাষা হারিয়েছেন। কবির বাঁশি থেমে গেছে। দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় কবি উদ্বিগ্ন। কবির মন তাই অস্থির দুশ্চিন্তায় ঢাকা পড়েছে। তাই তিনি স্রষ্টাকে জানিয়েছেন যে যারা লোভ-লালসার বশে শুভপথ থেকে সরে যাচ্ছে তারাই মানবসমাজের ভবিষ্যতকে কালো অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে, মানবসমাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। মানুষের চেতনার আলো নিভিয়ে দিয়ে পরিবেশকে দূষিত করে কবি এক ভয়ংকর বিপন্নতার দিন আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

সহমর্মিতা = সমান মনোভাব।

বিপন্ন = বিপদগ্রস্ত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 5.3

১. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কার কণ্ঠ রুদ্ধ?

(অ) ভগবানের (আ) কবির (ই) বালকের।

(খ) কারা তোমার বায়ু বিষাচ্ছে?

(অ) কিছু মানুষ (আ) তরুণ বালক (ই) লোভী স্বার্থপররা।

২. প্রশ্নকালে কবির চোখে জল কেন?

টীকা : সেপ্টেম্বর ১৯৩১ হিজলির বন্দিনিবাসে কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজবন্দিদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের বিরোধ হয়। রাতের অন্ধকারে জেলের প্রহরীরা বন্দিদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দি তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ মিত্রকে খুন করে এবং ২০ জনকে আহত করে।

বন্দিদের ওপর এই অমানবিক আক্রমণের প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মনুমেন্টের নীচে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ শরীর নিয়েও সভাপতিত্ব করেন ও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষণ দেন। এরপর জানুয়ারি ১৯৩২ হিজলি জেলে বন্দিরা রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন ও কবিকে এক অভিনন্দন বার্তা পাঠান। তাতে লেখেন—ধন্ধবিমূঢ় 'অবমানিতের মর্মবেদনাকে ভাষা দান করিয়াছ তুমি'। ২২শে জানুয়ারি '৩২ কবি তার উত্তর দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' কবিতাটি রচনা করেন। 'গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে'—পংক্তিটি হিজলি জেলে বন্দীদের ওপর নারকীয় আক্রমণকেই স্মরণ করায়।

5.5 আপনি যা শিখলেন

1. মানবসমাজের দুর্বল অংশকে ভালবাসতে।
2. দুর্বলদের ন্যায়বিচার দেওয়ার মত অবস্থা ও পরিস্থিতি রচনা করাই হল ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রকৃত পথ।
3. সমাজ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না করা হলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

5.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. কবির ব্যথিত হবার কারণ পাঁচটি বাক্যে উত্তর করুন।
2. রাতের অন্ধকারে অসহায় মানুষকে আক্রমণের যে ঘটনা কবির সময়ে ঘটেছিল তা দশটি বাক্যের মধ্যে লিখুন।
3. শক্তের অপরাধের বিরুদ্ধে কেন প্রতিকার পাওয়া যায় না তা পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

5.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

5.1

১. (ক) ই

(খ) ই

২. (ক) লোকদেখানো সম্মান জানিয়ে বিদায়।

(খ) এই পৃথিবীর শুভশক্তিকে অমান্য করে দুর্বলদের উপর অত্যাচার।

5.2

১. (ক) ই

(খ) ই

২. (ক) সবলদের দাপটে বিচারব্যবস্থা প্রভাবিত।

(খ) মানবসমাজের দুর্বল অংশের।

5.3

১. (ক) আ

২. (খ) ই

৩. (ক) দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। দুর্বলের প্রতি মমতা।

(খ) অপরাধীরা পৃথিবীর মঙ্গলকামী শক্তির বিরুদ্ধে ; তারা চিহ্নিত। তাদের বিচ্ছিন্ন করেই উত্তরণের পথ মিলবে।

কবি পরিচিতি

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। ১৯১৩ সালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাই কবি প্রয়াত হন।

'প্রশ্ন' কবিতাটি কবির **'পরিশেষ'** কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' ও 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের ১৮নং কবিতা। (নাগিনীরা..........)

গদ্য পাঠ

6. গদ্য পাঠ
7. গালিলিয়
8. বিড়াল
9. শিলাইদহ থেকে
10. সব্যসাচী
11. অতীতের বোঝা

শব্দার্থ ও টীকা

6

গদ্যপাঠ

6.1 প্রস্তাবনা

আমরা ব্যবহারিক জীবনে, মুখে সব সময় যে ভাষায় কথা বলি তা গদ্য ভাষা। গদ্য ভাষা মাত্রেই সাহিত্যের ভাষা নয়। গদ্য ভাষা যখন আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে তার মধ্যে চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতি প্রকাশ করে তখন সেই গদ্য সাহিত্যিক গদ্য হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে সাহিত্যচর্চার মাধ্যম ছিল ছন্দবন্ধ রচনা যা পদে বাঁধা থাকত বলে তাকে বলা হয় পদ্য। গদ্য ছিল মুখের, দলিল দস্তাবেজের এবং চিঠিপত্রের ভাষা। পোর্তুগিজ ও ইংরেজ মিশনারিদের হাতে বাংলা গদ্য লেখার সূচনা। উইলিয়াম কেরির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ব্যাপক ভাবে গদ্যে বই লেখা শুরু হয়। আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শব্দ-বহুল সে-সব গদ্যের ভাষা অতি দুর্বোধ্য। উদ্ভব ও বিকাশের পথ ধরে বাংলা সাহিত্যে ক্রমে গদ্যের আবির্ভাব ঘটে। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের বিশিষ্ট লেখক।

দুর্বোধ্য = বোঝা কঠিন।
উদ্ভব = উৎপত্তি

6.2 উদ্দেশ্য

পাঠটি পড়ে আপনি :

- বাংলা গদ্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করতে পারবেন;
- মুখের গদ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক গদ্য ভাষার পার্থক্য করতে পারবেন;
- বাংলায় গদ্যে লেখা প্রথম দিককার বই সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন;
- যাঁদের হাত ধরে বাংলা গদ্য চলতে শুরু করল তাঁদের সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন;
- বাংলা গদ্য সাহিত্যের সাধু রীতি ও চলিত রীতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন;
- বাংলা উপন্যাস ও উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- বাংলা ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন;
- বাংলা নাটকের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

6.3 বিষয়ের রূপরেখা

6.3.1 সাধুগদ্য ও চলিত গদ্য

বাংলা গদ্য ধারা প্রধানত ২টি রীতিতে লিখিত হয়— সাধুগদ্যরীতি ও চলিত গদ্যরীতি। সাধুগদ্যরীতি হল লিখিত গদ্যের এমন রীতি যাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব খুব বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত গদ্যে ছিল সাধু রীতির প্রভাব। সাধু গদ্যরীতিতে যাঁরা অবদান রেখেছিলেন এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফোর্ট উইলয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির জন্য আপনি যে বাংলা পাঠ্য বইটি ব্যবহার করবেন তার মধ্যে 'গ্যালিলিয়', 'বিড়াল', 'সব্যসাচী' রচনাগুলি সাধু গদ্যে রচিত।

অন্যদিকে চলিত গদ্যে কথ্য ভাষার প্রচলিত ভঙ্গি প্রাধান্য পায়। এ জন্য চলিত রীতিতে সংস্কৃত নয় এমন অনেক শব্দ অনায়াসে ব্যবহৃত হয়। চলিত রীতির গদ্যে চলার বেগ প্রবল বলে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদগুলিকে ছোটো করে নেওয়া হয়।। অন্য দিকে সাধুভাষার বেগ একটু মন্থর। তাই সেখানে দীর্ঘ ক্রিয়াপদ ও দীর্ঘ সর্বনাম পদ বসে। যেমন, 'তাহারা খাইয়াছে', কিন্তু চলিত ভাষায় এই বাক্যটি হয় 'তারা খেয়েছে'।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকরা কথ্য ভাষাকে লেখার কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কথ্য ভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে লিখলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। উৎকৃষ্ট চলিত গদ্য না হলেও এই গ্রন্থের ভাষা 'আলালী ভাষা' রূপে খ্যাতিলাভ করে। চলিত ভাষার বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্যারিচাঁদ মিত্রের চলিত গদ্যে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য সাধু ও চলিতের মিশ্রণ থেকে মুক্ত। তাঁর চলিত ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। চলিত রীতি বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে। আপনার পাঠ্য বই-এর 'শিলাইদহ থেকে', 'অতীতের বোঝা', 'অনাচার' ইত্যাদি চলিত ভাষায় লেখা।

বাংলা গদ্য ভাষা বিকাশের প্রধান ধারাগুলি হল— (ক) কথাসাহিত্য (খ) প্রবন্ধ সাহিত্য (গ) নাট্য সাহিত্য। নীচে এই ৩টি ধারা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.1

ক) একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) বাংলা গদ্যের লিখনরীতি কী কী?

(২) কোন্ সময় পর্যন্ত সাধু গদ্য রীতি প্রধান ছিল?

(৩) চলিত গদ্যে কোন্ রীতি প্রাধান্য পায়?

(৪) চলিত গদ্য রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদগুলি কেমন হয় দুটি উদাহরণ দিয়ে দেখান।

(৫) চলিত গদ্য ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখকের নাম করুন।

খ) শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান:

(১) বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন ১. ...., ২. ....।

(২) 'আলালী ভাষা' হচ্ছে ....।

(৩) সাধু গদ্য ও চলিত গদ্যের একটি পার্থক্য হল সাধুগদ্যে ...., চলিত গদ্যে ....।

(৪) কালীপ্রসন্ন সিংহের চলিত গদ্যের রূপটি পাওয়া যায় .... বইটিতে।

6.3.2 বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিভাজন

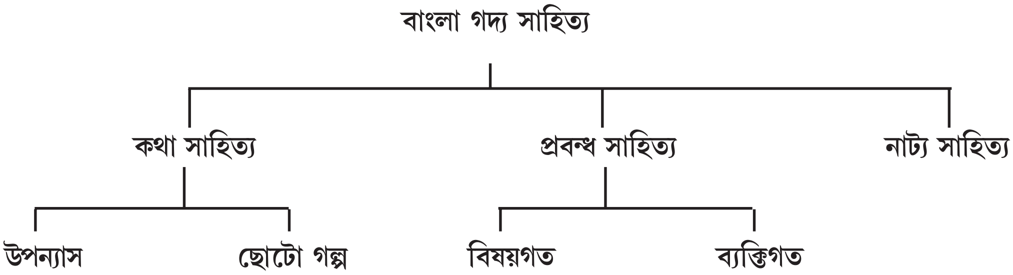

শব্দার্থ ও টীকা

কথা সাহিত্য :

কথা সাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা— (ক) উপন্যাস (খ) ছোটোগল্প।

উপন্যাস:

ঘটনার ঘনঘটায় আধুনিক গদ্যে রচিত মানবজীবনের বাণীরূপ হল উপন্যাস। প্লট, চরিত্র, সংলাপ, মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত, পটভূমি ও জীবনদর্শন— এই ৬টি উপন্যাসের উপাদান।

প্লট = এখানে মূল কাহিনি-সূত্র।

হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের লেখা বাংলায় প্রথম উপন্যাস ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ (১৮৫২)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ (১৮৫৭), প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) প্রথম দিকের রচিত উপন্যাস, যদিও কোনটিই সার্থক উপন্যাস নয়। বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতকের তিনিই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি পূর্ববর্তী কোনো রচনার ধারাকে অনুসরণ করেননি। বরং তাঁর উপন্যাস রচনার ধারা পরবর্তী রচয়িতাদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রোমান্স রসাশ্রয়ী উপন্যাসের ধারা ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে।

অনুসৃত = অনুসরণ করা হয়েছে।

বিষয় অনুসারে বাংলা উপন্যাসের প্রধান ধারাগুলি হল ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, রোমান্সধর্মী উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস প্রভৃতি। কয়েক ধরনের উপন্যাসের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস:

ইতিহাসের কাহিনি ও মানবচরিত্রের সার্থক সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের মতে ‘ইতিহাসের সত্য’ এবং ‘মানব সত্যের’ সার্থক মিশ্রণেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব। একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রাজসিংহ’ (১৮৮২)

ঐতিহাসিক = ইতিহাস সংক্রান্ত।

সামাজিক উপন্যাস:

একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামো, সামাজিক চরিত্র এবং সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত অবলম্বনে রচিত উপন্যাসকে বলা হয় সামাজিক উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে লেখকের একটি বিশেষ বক্তব্য থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৮), ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩) সামাজিক উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া রোমান্সধর্মী উপন্যাসে বাস্তবের চেয়ে কল্পনা প্রাধান্য পায়— যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’। রাজনৈতিক উপন্যাসে কোনো রাজনৈতিক পটভূমি ব্যবহৃত হয়। যেমন, শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ এলাকার জনজীবনের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়। যেমন তারাশঙ্করের ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’।

ঘাত-প্রতিঘাত = ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

শব্দার্থ ও টীকা

চরমক্ষণ = সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি।
ব্যাপ্তি = প্রসার, ছড়ানো।
সংজ্ঞা = পরিচয় জ্ঞাপক।
বিস্মৃতি = ভুলে যাওয়া।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.2

ক) দুটি অংশ ঠিকমতো যুক্ত করুন :

(১) বাংলা গদ্য সাহিত্যকে প্রধান	(i) কথা সাহিত্যে একটি ভাগ।
(২) কথা সাহিত্যের প্রধান একটি ধারা	(ii) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
(৩) প্রবন্ধ সাহিত্য	(iii) তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।
(৪) বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা	(iv) রাজসিংহ।
(৫) বাংলায় একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম	(v) ছোটোগল্প।

6.3.3 ছোটোগল্প :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে ছোটোগল্পের জন্ম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শিল্পকর্ম ছোটোগল্প। ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (ক) ছোটোগল্পে একটি মাত্র বস্তুকে একমুখীভাবে পাওয়া যাবে। (খ) গল্পের মধ্যেকার অন্যান্য ঘটনা ও চরিত্রগুলি একমুখীনতাকে সাহায্য করবে। (গ) ছোটোগল্পে একটি মাত্র চরমক্ষণ (Climax) থাকবে। (ঘ) এর শুরু হবে হঠাৎ এবং ব্যাপ্তির মধ্যে থাকবে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাই ছোটোগল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা—

''ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা'
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।''

রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম লেখক। তাঁর 'অতিথি', 'কঙ্কাল', 'নষ্টনীড়', 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি গল্পগুলি ছোটোগল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটোগল্পের বিশিষ্ট লেখক। আপনার পাঠ্য বই-এর 'কালাপাহাড়' ও 'অনাচার' বাংলা ছোটোগল্পের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.3

ক) শূন্যস্থানে যথাযথ তথ্য দিয়ে পূরণ করুন :

(১) ছোটোগল্পের জন্ম হয় ....।

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যটি লিখেছেন ....।

(৩) কয়েকটি ছোটোগল্পের নাম ....।

(৪) ছোটোগল্পে চরমক্ষণ ....।

শব্দার্থ ও টীকা

খ) নীচের প্রশ্নগুলির দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন :
  (১) শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞামূলক কবিতাটি লিখুন।
  (২) ছোটোগল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
  (৩) ছোটোগল্পে কীসের ব্যঞ্জনা থাকে?

6.3.4 প্রবন্ধ :

গদ্যসাহিত্যের আর-একটি উল্লেখযোগ্য ধারা প্রবন্ধ। প্রবন্ধ মানে প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন যুক্ত রচনা। কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় উপস্থাপিত করা এবং যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। রচনারীতির দিক থেকে প্রবন্ধকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— (ক) বিষয়গত ও (খ) ব্যক্তিগত।

কাঠামো = ছক।

6.3.5 বিষয়গত বা বস্তুগত প্রবন্ধ :

যে প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে কোনো বিষয় বা বস্তুকেই উপস্থাপিত করা হয় তাকে বলা হয় বিষয়গত প্রবন্ধ। বিষয়গত প্রবন্ধে কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। তাই এখানে তথ্য ও যুক্তির প্রাধান্য দেখা যায়।

উপস্থাপিত = উপস্থিত করা হয়েছে।

6.3.6 ব্যক্তিগত ও আত্মগত প্রবন্ধ :

ব্যক্তিগত প্রবন্ধে বিষয় অপেক্ষা লেখকের ব্যক্তিহৃদয়কেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে এই শ্রেণির প্রবন্ধে যুক্তি ও তথ্যের বদলে কল্পনাপ্রবণতা, আত্মগত চিন্তাভাবনা, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রাধান্য পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিচিত্র প্রবন্ধে’র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি ব্যক্তিগত বা আত্মগত প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া প্রবন্ধ বিভাগে আছে স্মৃতিমূলক, ভ্রমণসাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা মূলক, রাজনীতিমূলক, ডায়েরি, পত্রাবলি ইত্যাদি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঊনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক। স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জীবন-স্মৃতি’। ‘রাশিয়ার চিঠি’ পত্র-সাহিত্যের, ‘সাহিত্যের পথে’ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের উদাহরণ।

আত্মগত = নিজের সম্বন্ধে।
প্রকৃষ্ট = বিশেষ উপযুক্ত।
প্রাবন্ধিক = প্রবন্ধ লেখেন যিনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.4

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :
  (১) প্রবন্ধকে ক'টি ভাগে ভাগ করা যায়?
  (২) বিষয়গত প্রবন্ধে কার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়?
  (৩) একটি বিষয়গত প্রবন্ধের উদাহরণ দিন।
  (৪) একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উদাহরণ দিন।
  (৫) তিনজন প্রাবন্ধিকের নাম লিখুন।

খ) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :
  (১) প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কী?
  (২) বিষয়গত প্রবন্ধ কাকে বলে?

(৩) ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যটি লিখুন।

(৪) বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ছাড়াও আরও দুই প্রকার প্রবন্ধের উল্লেখ করুন।

(৫) 'জীবন-স্মৃতি' কোন্ শ্রেণির প্রবন্ধের অন্তর্গত?

শব্দার্থ ও টীকা

6.3.7 নাট্যসাহিত্য :

বাংলা সাহিত্যের আর-একটি ধারা— নাটক :

বাংলায় নাটকের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। নাটক একটি দৃশ্যকাব্য। তবে তা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়। নাট্যকার ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে বাস্তবের একটি চিত্র তুলে ধরেন। দর্শকের কাছে ওই ঘটনা ও চরিত্রগুলি অতি পরিচিত বলে মনে হয়। নাট্যকার নাটকের মধ্যে দিয়ে নাটকের দ্বন্দ্বের ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন।

হুবহু = অবিকল।
চিত্রণ = আঁকা।
দ্বন্দ্ব = পরস্পরের বিরুদ্ধতা।

(i) বাংলা নাটকের শ্রেণিবিভাগ:

ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসনধর্মী প্রভৃতি নানাধরণের নাটক বাংলায় রচিত হতে থাকে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(ii) ট্রাজেডি :

একটি বিরাট চরিত্রের পতনের কাহিনিই হল ট্রাজেডি। মানুষ অজ্ঞানতাবশত কোনো ভুল বা অন্যায় করে নিশ্চিত ধ্বংস বা মৃত্যুকে ডেকে আনে। সব কিছুকে হারিয়ে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ট্রাজেডির পরিণতি বিয়োগান্ত হতে পারে, কিন্তু বিয়োগান্ত হলেই ট্রাজেডি হয় না। ট্রাজেডির চরিত্রটি হবে—

বিয়োগান্ত = মৃত্যুতেই শেষ।

ক) ভালো ও মন্দের মাঝামাঝি;

খ) চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পাবে;

গ) চরিত্রটি হবে বাস্তবসম্মত;

ঘ) চরিত্রটির আচরণ থাকবে দ্বন্দ্বময়।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' একটি সার্থক ট্রাজেডি নাটক। পরিণতিতে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে। কুঞ্জের হাতে কুকুরের কামড়ে দেওয়া এবং রক্তপাত, প্রধানের যন্ত্রণা, রাধিকার সমবেদনা একদিকে দর্শকের মনে বেদনা জাগায়, আবার দুঃখের মধ্যেও রাধিকার পতিপ্রেম দর্শকের মনে আনে এক প্রশান্তি যা ট্রাজেডির লক্ষণ।

(iii) কমেডি :

অসঙ্গতি = বেখাপ্পা।

কমেডি গ্রিক শব্দ, এর পরিণতি মিলনান্তক। কথার সঙ্গে কাজের, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির যে অসঙ্গতি, তার থেকেই জন্ম হয় কমেডির। কমেডি নাটকের পরিণতি হাস্যরস। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক', রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কমেডির উদাহরণ। কমেডিতে হাসির আড়ালে থাকে প্রচ্ছন্ন বেদনা।

(iv) প্রহসন :

প্রহসনও কমেডি পর্যায়ের। তবে এখানে থাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের প্রাধান্য। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের চমৎকার উদাহরণ।

(v) একাঙ্ক নাটক :

একটি মাত্র সমস্যা বা একটি মাত্র মুহূর্তের চিত্রণ ঘটে একাঙ্ক নাটকে। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একাঙ্ক নাটকের চমৎকার দৃষ্টান্ত। আপনার পাঠ্য বইয়ের উৎপল দত্ত রচিত 'নীলকণ্ঠ' নাটকটি একাঙ্ক নাটক।

(vi) পৌরাণিক নাটক :

সাধারণভাবে পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটককে বলা হয় পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক নাটকে দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়। তবে পুরাণের কাহিনি থাকলেই পৌরাণিক নাটক হবে না। কাহিনিতে থাকতে হবে ভক্তিরসের প্রাধান্য। দৈবশক্তির কাছে মানবশক্তি পরাজিত হয়। বাংলায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যকার। 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ছাড়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট রচয়িতা।

(vii) ঐতিহাসিক নাটক :

ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসের কাহিনি বা চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক। তবে ইতিহাসের কাহিনির মধ্যে মানব রস সঞ্চারিত না হলে ঐতিহাসিক নাটক সার্থক হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ রূপকার এবং তাঁর লেখা 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক।

(viii) সামাজিক নাটক :

যে নাটকে সমাজচিত্রের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তাকে সামাজিক নাটক বলে। সামাজিক নাটকের আঙ্গিকে মানবজীবনের দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' সামাজিক নাটকের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে', তুলসী লাহিড়ির 'ছেঁড়া তার', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক।

(ix) রূপক-সাংকেতিক নাটক :

যে নাটকে একটি বক্তব্য বা বিষয়কে প্রকাশের জন্য একটি রূপক বা সাংকেতিকতার সাহায্য নেওয়া হয় তাকে বলা হয় রূপক-সাংকেতিক নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' রূপক-সাংকেতিক নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শব্দার্থ ও টীকা

অঙ্ক = নাটকের একটি অংশ।

মাহাত্ম্য = মহিমা।

দৈবশক্তি = দেবতা প্রদত্ত বা অলৌকিক শক্তি।

সাংকেতিক = ইশারা ইঙ্গিতে বলা হয়েছে এমন।

পাঠগত প্রশ্ন : 6.5

ক) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) বাংলায় নাটকের জন্ম কোন্ সময় থেকে?

(২) নাটকের শ্রেণিবিভাগগুলি লিখুন।

(৩) একটি ট্রাজেডি নাটকের উল্লেখ করুন।

(৪) কমেডি কোন্ ভাষার শব্দ লিখুন।

(৫) কমেডি নাটকের পরিণতি কী?

(৬) 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'— এটি কোন্ ধরণের নাটক?

(৭) নীলদর্পণ কোন্ শ্রেণির নাটক?

(৮) পৌরাণিক নাটকটি কার লেখা— কোন্ শ্রেণির নাটক?

(৯) একটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম লিখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

(১০) 'প্রফুল্ল' নাটকটি কার লেখা— কোন শ্রেণির নাটক?

(১১) রূপক সাংকেতিক নাটকে বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশের জন্য নাট্যকার কীসের সাহায্য নেন?

খ) নীচের প্রশ্নগুলির দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন :

(১) নাটকে নাট্যকার কী ফুটিয়ে তোলেন?

(২) ট্রাজেডি চরিত্রের লক্ষণগুলি লিখুন।

(৩) কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(৪) ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? একটি সামাজিক নাটকের নাম লিখুন।

(৫) রূপক-সাংকেতিক নাটক কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

6.4 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা গদ্য ভাষার জন্ম-সময়ের কথা;
2. বাংলা গদ্য ভাষার জন্মের প্রথম লগ্নে কী ধরণের গদ্য রচিত হয়েছিল;
3. প্রথম দিককার বাংলা গদ্যে লেখা বইগুলির নাম;
4. গদ্য লেখকদের কথা;
5. বাংলা গদ্যের সাধু ও চলিত রীতি রূপটি সম্বন্ধে ধারণা;
6. বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন, শ্রেণিবিভাগ, বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ;
7. বাংলা ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের রূপরীতির জ্ঞান;
8. বাংলা নাটকের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যগুলির ধারণা।

6.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক আটটি বাক্যে উত্তর দিন :

1. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে অনধিক আটটি বাক্য লিখুন।
2. বাংলা গদ্যে চলিত গদ্যরীতি কখন থেকে শুরু হয়? বাংলাতে চলিত গদ্য রীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
3. উপন্যাস কী? উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
4. ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে ছোটোগল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি লিখুন।
5. বিষয়গত ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পার্থক্য লিখুন, একটি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।
6. নাটক কী? নাটকের শ্রেণিবিভাগগুলি লিখুন।
7. ট্রাজেডি ও কমেডি নাটকের পার্থক্য দেখান।
8. ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিন।

6.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

6.1

ক) (১) সাধু ও চলিত।
(২) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।
(৩) কথ্য ভাষার প্রচলিত ভঙ্গি।
(৪) (i) উহারা (সাধু) - ওরা (চলিত), (ii) লিখিত (সাধু) - লিখত (চলিত)
(৫) প্রমথ চৌধুরী।

খ) (১) (১) প্যারীচাঁদ মিত্র, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহ।
(২) 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থের ভাষা।
(৩) সংস্কৃত রীতির প্রাধান্য, চলিত গদ্যের ভঙ্গি।
(৪) 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়।

6.2

ক) (১) — (iii)
(২) — (v)
(৩) — (i)
(৪) — (ii)
(৫) — (iv)

6.3

ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন।
(২) 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায়।
(৩) 'অতিথি', 'কঙ্কাল', 'নষ্টনীড়'।
(৪) একটি।

খ) (১) 6.3.3-এর ছোটোগল্প অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(২) 6.3.3-এর ছোটোগল্প অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(৩) শুরু হঠাৎ— শেষ হঠাৎ— ব্যাপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা।

6.4

ক) (১) দুটি।
(২) বিশেষ কোনো বিষয়ের উপর।
(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’।
(৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত।

খ) (১) 6.3.5-এর প্রবন্ধ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(২) 6.3.5-এর ‘বিষয়গত প্রবন্ধে’র অংশটি দেখুন।
(৩) 6.3.6-এর ‘ব্যক্তিগত প্রবন্ধে’র অংশটি দেখুন।
(৪) (i) ভ্রমণ সাহিত্যমূলক ‘রাশিয়ার চিঠি’, (ii) সাহিত্য আলোচনামূলক ‘সাহিত্য পথে’।
(৫) স্মৃতিমূলক।

6.5

ক) (১) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ।
(২) কমেডি, প্রহসন, একাঙ্ক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রূপক-সাংকেতিক নাটক।
(৩) বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’।
(৪) গ্রিক শব্দ।
(৫) মিলনান্তক।
(৬) প্রহসন।
(৭) সামাজিক নাটিকা।
(৮) দেবতাদের।
(৯) চন্দ্রগুপ্ত।
(১০) 6.3.15 -এর ‘সামাজিক নাটক’ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।
(১১) রূপক সাংকেতিকের।

খ) (১) 6.3.7-এর ‘নাট্যসাহিত্য’ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ’টি দেখুন।
(২) ভালো মন্দের মাঝামাঝি— চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা— চরিত্রটি বাস্তবসম্মত— আচরণ দ্বন্দ্বময়।
(৩) 6.3.7-এর ‘কমেডি’ ও ‘প্রহসন’ অংশটি দেখুন।
(৪) 6.3.7-এর ‘ঐতিহাসিক নাটক’ অংশটি দেখুন।
(৫) 6.3.7-এর ‘রূপক সাংকেতিক’ অংশটি দেখুন।

সমধর্মী গ্রন্থ

1. গদ্য লেখকদের পরিচিতির জন্য পড়ুন ‘বাংলা সাহিত্য শাখা’— শিশিরকুমার দাশ।
2. গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে সমধর্মী বই— (১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— সুকুমার সেন, (২) বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা— গোপাল হালদার।

শব্দার্থ ও টীকা

7

গালিলিয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

7.1 প্রস্তাবনা

আমাদের দেশে এখনও অনেকের বিশ্বাস, সব জ্ঞান বেদ-বেদান্তের মধ্যে আছে, নতুন করে জানবার বোঝবার আর কিছু নেই। এই ধরনের মানুষ সারা পৃথিবীতেই রয়েছেন, মধ্যযুগে আরও বেশি ছিলেন। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে মন্দির ও পুরোহিতদের প্রভাব খুব বেশি ছিল, এখনও তা যথেষ্ট আছে। প্রাচীন ভারতের বরাহমিহির, তাঁর গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রথমে ঠিক কথা বলেও পরে প্রচলিত বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, বলেছেন— গ্রহণের মূল কারণ হল 'পরমেশ্বর'। পরবর্তীকালে ব্রহ্মগুপ্ত গ্রহণের যথার্থ কারণ জানা সত্ত্বেও বলেছেন, গ্রহণের কারণ পরমেশ্বর নন— এটা অত্যন্ত মূর্খ ধারণা। ধর্মনেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এসব কথা তাঁরা লিখেছেন। ইউরোপেও গির্জা বা চার্চ প্রায়শই নতুন ভাবনা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য তারা কুসংস্কারকে লালন করেছে, শক্তপোক্তভাবে মানুষকে বশে রেখেছে। গালিলিয়কে চার্চ কতখানি শাস্তি দিয়েছে, হেনস্থা করেছে, রচনাটিতে বিদ্যাসাগর তা দেখিয়েছেন। এমনতরো শাস্তি আরও অনেকে পেয়েছিলেন। যেমন, মুক্তমনের বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)-কে রোম নগরে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

গালিলিয়কে লড়তে হয়েছে শক্তিশালী চার্চের বিরুদ্ধে। আর-একটি লড়াই ছিল তাঁর নিজের মধ্যে। গির্জার চাপে তিনি যেমন কখনও কখনও আপস করেছেন, তেমনি সেই কৃতকর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব হল, এই দু-রকম দ্বন্দ্বই তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে অগ্রগামী চিন্তার, গালিলিয়র বিজ্ঞান-ভাবনার।

7.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি :

- গালিলিয়র সময়ে ইটালিসহ ইউরোপের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- তৎকালীন ইউরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থার তুলনা করতে পারবেন;

- গালিলিয়র পূর্বসূরিদের বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- গালিলিয়র মতো বিজ্ঞানীরা গোঁড়া ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মনেতাদের হাতে কতখানি নির্যাতিত হয়েছেন জানতে পারবেন;
- বিজ্ঞান-জগতে গালিলিয়র দানের কথা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- গালিলিয় কেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক তা বোঝাতে পারবেন;
- গালিলিয়র অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে পারবেন।

7.3 মূল পাঠ

7.3.1 ইটালির . . . উঠিলেন।

ইটালির অন্তঃপাতী পিসা নগরে, ১৫৬৪ খ্রি: অব্দে গালিলিয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা টস্কানি দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না।

তিনি গালিলিয়কে, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, সেই নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। পঠদ্দশাতেই, অরিস্টটলের দর্শনশাস্ত্র নিতান্ত যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, সুতরাং তদবধি তিনি তন্মতের ঘোরতর প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

অরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) = এখন লেখা হয় অ্যারিস্টট্‌ল (Aristotle)। তিনি বলেছিলেন, ভারী জিনিস হালকা বস্তুর চেয়ে তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নীচে নামে। তবে মনে রাখতে হবে অ্যারিস্টট্‌ল অসাধারণ মনীষী। উদ্ভিদবিদ্যায় ও জীববিদ্যায় তাঁর দান অসামান্য। জীবজগতে মানুষের অবস্থান কোথায় তাও তিনি দেখিয়েছেন।

7.3.2 গণিতশাস্ত্রে . . . লাগিলেন।

গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি হওয়াতে ১৬৮৯ খ্রি: অব্দে, তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যার অধ্যাপকরূপে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তিনি, সেই অযথাভূত দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত, প্রকৃতির নিয়মসকল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা, সমবেত বহুসংখ্যক দর্শকসমক্ষে, তিনি তত্রব্য প্রধান দেবালয়ের উপরিভাগে বারংবার পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন, গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে। ইহাতে অরিস্টটলের মতাবলম্বীরা তাঁহার এমন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন যে, দুই বৎসর পরে তাঁহাকে অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

এইরূপে পিসা নগর হইতে অপসারিত হইয়া, গালিলিয় বিষয়কর্মশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা :
গুরুত্ব পতননিয়ামক নহে = বস্তুর ভার কম-বেশি হবার উপর উঁচু থেকে নীচে পড়ার গতিবেগ নির্ভর করে না।

শব্দার্থ ও টীকা

গালিলিয় (Galileo) = জন্ম-১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু-১৬৪২।
ইটালি = দক্ষিণ ইউরোপের একটি দেশ, রাজধানী রোম।
অন্তঃপাতী = অন্তর্গত।
নিয়োজিত করেন = ভরতি করান।
পঠদ্দশাতে = পড়াশুনোর সময়।
দর্শনশাস্ত্রে = যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা বা তত্ত্ব। আগেকার দিনে বিজ্ঞানকেও দর্শন বলা হত।
দৃঢ় প্রত্যয় = গভীর বিশ্বাস।
তন্মতের = তাঁর (অরিস্টটলের) মতের।

প্রতিপত্তি = এখানে অর্থ জ্ঞান।
অধিরূঢ় = আসীন, নিযুক্ত।
অযথাভূত = যে-রকম হওয়া উচিত সে রকম নয়।
তত্রব্য = তথাকার, সেখানকার।
দেবালয় = এখানে অর্থ - গির্জা।
গুরুত্ব = এখানে অর্থ - ভার বা ওজন।
বিষয়কর্মশূন্য = কর্মহীন, বেকার।

7.3.3 কিন্তু ইটালির . . . লাগিলেন।

কিন্তু ইটালীর প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খ্রি: অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থলে তিনি সুচারু রূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইউরোপের দূরতর প্রদেশ হইতেও শিষ্যমণ্ডলী উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্বত্র লাটিনভাষাতেই উপদেশ দিতেন। গালিলিয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইটালীয় ভাষা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে এই নূতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল-প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত। তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসংকুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুষঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

একপ্রকার সাহসের . . . হইয়াছিল = অপ্রচলিত ল্যাটিনে নয়, মাতৃভাষা ইটালীয়তে গালিলিয় ছাত্রদের পড়াতেন।

শব্দার্থ ও টীকা
প্রদেশান্তরীয় প্রদেশের।
সুচারুরূপে = সুন্দরভাবে।
ল্যাটিন ভাষা = রোম-দেশের প্রাচীন ভাষা।
পরিগণিত = বিবেচিত, গণ্য।
অশঙ্কিত = নির্ভয়, নিঃশঙ্ক।
অসংকুচিত = দ্বিধাহীন।

7.3.4 জেন্‌সন . . . হইয়াছে।

জেন্‌সন নামক এক ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্দারা অবলোকন করিলে দূরবর্তী পদার্থ সকল সন্নিহিত বোধ হয়। গালিলিয় ওইরূপ যন্ত্রের উদ্ভাবন বিষয়ে প্রস্তুত প্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে, ১৬০৯ খ্রি: অব্দে, তিনি শুনিবামাত্র, উহা কী কী উপাদানে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং এক দিবসও বিলম্ব না করিয়া, তদপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম তথাবিধ এক যন্ত্র নির্মাণ করিলেন। এইরূপে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইল। ইহা পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক উপকারক।।

গালিলিয়, এই দৃষ্টিপোষক নলাকার নূতন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করিয়া, দেখিতে পাইলেন চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর; সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ হয়; ছায়াপথ সূক্ষ্ম তারকাস্তবক মাত্র; বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিক চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত; শুক্রগ্রহের, চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি আছে; শনৈশ্চরের উভয় পার্শ্বে পক্ষাকার কোনো পদার্থ আছে। ওই পক্ষ এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ওলন্দাজ = হল্যান্ড দেশের অধিবাসী।
তথাবিধ = সেই রকম।
দৃষ্টিপোষক = দৃষ্টি-সহায়ক।
নভোমণ্ডলে = আকাশের দিকে (নভ - আকাশ)।
কলঙ্কিত লক্ষ হয় = কালো দাগ দেখা যায়।
ছায়াপথ = আকাশগঙ্গা। অসংখ্য তারাজগতের মধ্যে আমরা বাস করি যে-তারাজগতে তার নাম ছায়াপথ বা 'মিলকি ওয়ে' (Milky Way)।

শব্দার্থ ও টীকা :

সূক্ষ্মতারকাস্তবক = অতিশয় ক্ষুদ্র তারার ঝাঁক।
বৃহস্পতি = একটি গ্রহের নাম।
বৃহস্পতি . . . পরিবেষ্টিত = সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি। গালিলিয় বৃহস্পতি গ্রহের চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। উপগ্রহগুলির নাম আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড, ক্যালিস্টো। এই চারটিকে এখন বলা হয় গালিলিয়র চাঁদ।
শনৈশ্চরের = শনিগ্রহের।
পক্ষাকার = পাখনার মতো (পক্ষ + আকার)।
অঙ্গুরীয় = আঙটি; এখানে বলয়।

7.3.5 বোধ হয় . . . প্রচারিত হইল।

বোধ হয় গালিলিয় বহুকালাবধি মনে করিতেন, নভস্তলস্থিত বস্তুসকল যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। কিন্তু কোনো কালে যে এই গূঢ় তত্ত্বের মর্মোদ্ভেদ করিতে পারিবেন, তাঁহার এমন আশা ছিল না। এক্ষণে, এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ কী অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা কোনো রূপেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

১৬১১ খ্রি: অব্দে, যখন তিনি এই সকল বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে টস্কানির অধীশ্বরের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, পিসা প্রত্যাগমনপূর্বক, সমধিক বেতনে গণিতধ্যাপকের পদ পুনর্গ্রহণ করেন; সুতরাং তাঁহার উদ্ভাবিত বিষয়সকল ওই নগরে প্রথম প্রচারিত হইল।

শব্দার্থ ও টীকা

সিদ্ধান্তিত = আবিষ্কৃত, নির্ধারিত।
নভস্তলস্থিত = আকাশে অবস্থিত। (নভ - আকাশ)
মর্মোদ্ভেদ = গভীরে অবস্থিত বিষয়ের আবিষ্কার।
অনির্বচনীয় = যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

শব্দার্থ ও টীকা :

অধীশ্বরের = অধিপতির, রাজার।
অনুরোধপরতন্ত্র = অনুরোধের বশবর্তী।
প্রত্যাগমনপূর্বক = ফিরে এসে।

7.3.6 কোপর্নিকস . . . ভোগ করিতে হইত।

কোপর্নিকস কেবল দৈবগত্যা যে সকল নিগ্রহ, অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এক্ষণে গালিলিয়কে তৎসমুদায় বিলক্ষণ রূপে ভোগ করিতে হইল। তৎকালে তিনি এক গ্রন্থ প্রচার করেন; তাহাতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, আমি যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছি তাদ্দ্বারা কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর যথার্থতা সপ্রমাণ হইয়াছে।

ইহাতে এই ঘটিল যে, যাজকেরা তাঁহার নামে ধর্মবিপ্লাবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করাতে, ১৬১৫ খ্রি: অব্দে তাঁহাকে রোম নগরীর ধর্মসভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। সভাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, আর আমি এরূপ সংঘাতক মত কদাচ মুখে আনিব না। ইহাও নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যাসত্যের নিশ্চয় নাই, সভাধ্যক্ষেরা এই উপলক্ষে তাঁহাকে পাঁচ মাস কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন; আর টস্কানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্পণ না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

কোপর্নিকস = এখন লেখা হয় কোপার্নিকাস (Copernicus)। তাঁর জন্ম পোল্যান্ডে, ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত একটি গির্জার যাজক। সে-সময়ে দূরবিনের আবিষ্কার হয়নি; তবু তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবী ও সূর্যের অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। পরে বড়ো আকারে প্রকাশ পায়। ছাপা বইটি যেদিন কোপার্নিকাসের হাতে আসে সেইদিনই তাঁর মৃত্যু হয়।

শব্দার্থ ও টীকা :

দৈবগত্যা = দৈবাৎ, অদৃষ্টক্রমে।
যাজক = খ্রিস্টান পুরোহিত।
ধর্মবিপ্লাবক = ধর্মীয় মতামতের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়িয়েছেন।
প্রতিজ্ঞাশৃঙ্খলে = প্রতিজ্ঞার সাহায্যে আষ্টেপৃষ্ঠে।
সংঘাতক = সাংঘাতিক, ভয়ানক।
হস্তার্পণ না করিলে = বাধা না দিলে।
নিগ্রহ = অত্যাচার।

7.3.7 গালিলিয় ধর্মসভার . . . পাইলেন।

গালিলিয় ধর্মসভার অগ্রে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কয়েক বৎসর পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার যে যথার্থ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে বিরত হইলেন না।

জ্যোতির্বিদ্যা = গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিদ্যা।

পরিশেষে তিনি কোপর্নিকসের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিস্তর বিবরণ ভূমণ্ডলে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু কুসংস্কারাবিষ্ট বিপক্ষবর্গের বিদ্বেষভয়ে স্পষ্ট রূপে আত্মমত ব্যক্ত না করিয়া তিনজনের কথোপকথনাত্মক এক গ্রন্থ লিখিলেন।

তৎকালে গালিলিয়র বয়ঃক্রম ছেষট্টি বৎসর, তথাপি স্বয়ং সেই গ্রন্থ লইয়া, ১৬৩০ খ্রি: অব্দে, রোম নগরে গমন করিলেন। তিনি ধর্মাধ্যক্ষদিগের অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় সহকারে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অনুমতি পাইলেন।

শব্দার্থ ও টীকা :

কথোপকথনাত্মক = পরস্পরের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত। 'কথোপকথনাত্মক' বইটি প্রকাশিত হয় ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে।
ধর্মাধ্যক্ষ = ধর্মীয় প্রধান।
অসম্ভাবনীয় = যা সম্ভব নয়।
অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহোদয় = যে-দয়া সম্ভব ছিল না সেই দয়ার প্রকাশ।

শব্দার্থ ও টীকা

সবিস্তর = সুবিস্তৃত, ভালোমতো।
উৎসুক = আগ্রহী।
কুসংস্কার = যুক্তিহীন ভুল ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস।
কুসংস্কারাবিষ্ট = (কুসংস্কার + আবিষ্ট) কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।
বিদ্বেষ = হিংসা, শত্রুতা।
আত্মমত = নিজের মত বা বক্তব্য।
ব্যক্ত = প্রকাশ।

7.3.8 কিন্তু উক্ত . . . নিক্ষিপ্ত করিলেন।

কিন্তু, উক্ত পুস্তক রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে প্রচারিত হইবামাত্র অরিস্টটলের মতাবলম্বীরা এককালে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে পিসার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সর্বাপেক্ষা অধিক বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদয় কার্ডিনল মংক ও গণিতজ্ঞগণের উপর গালিলিয়র গ্রন্থ পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা, অসন্দিগ্ধ চিত্তে সেই গ্রন্থকে ঘোরতর ধর্মবিপ্লাবক স্থির করিয়া, রোম নগরে ধর্মসভার অগ্রে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

গালিলিয় তৎকালে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।, এবং তাঁহার প্রতিপোষক বন্ধু দ্বিতীয় কস্‌মো পরলোকযাত্রা করাতে, নিতান্ত নিঃসহায় হইয়াছিলেন; সুতরাং এই সমস্ত অসম্ভাবিত বিপৎপাত তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল।

বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খ্রি: অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোম নগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

মতাবলম্বীরা = মত যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁরা।
কার্ডিনল = খ্রিস্টধর্মের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে বলা হয় পোপ। পোপের ঠিক নীচের পদে যাঁরা থাকেন তাঁদের পদবি কার্ডিনল (Cardinal)।
মংক = খ্রিস্টানদের মধ্যে ঘর-সংসার ছেড়ে যাঁরা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন তাঁরা মংক (Monk)।
অসন্দিগ্ধ = সন্দেহ না-করা।

শব্দার্থ ও টীকা :

আজ্ঞা = আদেশ।
প্রতিপোষক = সমর্থনকারী।
নিঃসহায় = অসহায়
অসম্ভাবিত = ঘটবে বলে ভাবা যায়নি এমন, অপ্রত্যাশিত।
বিপৎপাত = বিপদের আবির্ভাব, বিপদ-ঘটা।
যৎপরোনাস্তি = যারপরনাই, অত্যন্ত।
উৎপীড়ন = অত্যাচার।

শব্দার্থ ও টীকা

অবস্থিতির পর = থাকবার পর।
নীত হইলে = নিয়ে আসা হলে।
হাঁটু গাড়িয়া = হাঁটু গেড়ে।
প্রতিপন্ন = নির্ধারিত, যুক্তি দিয়ে সমর্থন।
অস্বর্গ্য = অপবিত্র।
অশ্রদ্ধেয় = সম্মানিত হবার অযোগ্য।

7.3.9 কয়েক মাস . . . এখনও চলিতেছে।

কয়েক মাস তথায় অবস্থিতির পর, বিচারকর্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, তোমাকে আমাদের সম্মুখে হাঁটু পাড়িয়া ও বাইবেল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদয় অস্বর্গ্য, অশ্রদ্ধেয়, ধর্মবিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গালিলিয়, সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম করিলাম, এই ভাবিয়া মনোমধ্যে ঘৃণারোষসহকৃত যৎপরোনাস্তি অনুতাপ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে।

শব্দার্থ ও টীকা :

ধর্মবিদ্বিষ্ট = ধর্মের প্রতি শত্রুতামূলক।
ভ্রান্তিমূলক = ভুল।
যথোক্ত = যা বলা হয়েছে। (যথা + উক্ত)।
গাত্রোত্থান করা = দাঁড়ানো।
দৃঢ় = গভীর, অটল।
প্রত্যয় = বিশ্বাস।
ঘৃণারোষসহকৃত = ঘৃণা ও রাগের সঙ্গে।
ইহা এখনও চলিতেছে = পৃথিবী এখনও ঘুরছে।

7.4 বিষয়ের রূপরেখা

7.4.1 বক্তব্যসার:

ইটালির মধ্যে পিসা নগর। সেখানে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে (১৫ ফেব্রুয়ারি) গালিলিয়র জন্ম। তাঁর বাবা টস্কানি দেশের সম্মানীয় মানুষ, মধ্যবিত্ত।

বাবা তাঁকে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে পাঠালেন। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর বিশ্বাস জন্মাল, অ্যারিস্টট্‌লের বৈজ্ঞানিক মতামত যুক্তিসঙ্গত নয়। তখন থেকেই তিনি অ্যারিস্টট্‌লের ঘোর বিরোধী।

7.4.2 মন্তব্য:

১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর বাবার আশা ছিল, ছেলে ডাক্তারি পড়ার পর ভালো রোজগার করবে। কিন্তু গালিলিয়র মন গেল গণিত ও পদার্থবিদ্যার দিকে।

পাঠগত প্রশ্ন 7.1

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয় জন্মেছিলেন .... নগরে।

(খ) পিসা নগর ছিল .... মধ্যে।

(গ) ছাত্র অবস্থাতেই গালিলিয়র বিশ্বাস জন্মাল, ... তত্ত্ব ভুল।

(ঘ) অ্যারিস্টট্‌লের মতে চাঁদ ....।

শব্দার্থ ও টীকা

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) গালিলিয় কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন? (পিসার/ পেডুয়ার/ ভেনিসের/ রোমের)

(খ) গালিলিয় কী পড়তে গিয়েছিলেন? (আইন/ চিকিৎসাবিদ্যা/ দর্শন/ বিজ্ঞান)

৩) এক কথায় উত্তর দিন—

(ক) অ্যারিস্টট্‌ল কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) অ্যারিস্টট্‌ল কোন্ দেশের অধিবাসী?

(গ) গালিলিয় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

(ঘ) গালিলিয়র কোন্ বছর মৃত্যু হয়?

(ঙ) 'সম্ভ্রান্ত' কথাটির অর্থ কী?

৪) গালিলিয় অ্যারিস্টট্‌লের বিরোধী হলেন কেন? (দুটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.4.3 বক্তব্যসার:

পিসা বিদ্যালয়ে গালিলিয়কে ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকপদ দেওয়া হল। এই সুযোগে তিনি প্রকাশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখালেন, প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে অ্যারিস্টট্‌লের বক্তব্যের মিল নেই।

গালিলিয়র বহুজনের সামনে পিসার প্রধান মন্দিরের উপর থেকে পরীক্ষা করে দেখালেন, দুটি অসম ভারের বস্তু একই মুহূর্তে নীচে ফেললে তারা একই সঙ্গে মাটিতে পড়বে। এই পরীক্ষা অ্যারিস্টট্‌লপক্ষীয়দের চটিয়ে দিল। পরিণামে অধ্যাপকপদ ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন।

7.4.4 মন্তব্য:

বিদ্যাসাগর পিসার হেলানো গম্বুজের উপর থেকে গালিলিয়র পরীক্ষার কথা বলেছেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, একটি পাথরের টুকরো ও একটি পালক বায়ুশূন্য অবস্থায় একই সঙ্গে নীচে পড়বে। অবশ্য গালিলিয় নিজের অনেক পরীক্ষার কথা লিখে গেছেন, কিন্তু এই পরীক্ষার কথা কোথাও লেখেননি।

পাঠগত প্রশ্ন 7.2

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গালিলিয় .... অধ্যাপক ছিলেন।

(খ) প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে .... বক্তব্যের মিল নেই।

(গ) .... হেলানো গম্বুজ থেকে গালিলিয় পরীক্ষা করেছিলেন।

(ঘ) গালিলিয় প্রমাণ করলেন, শব্দের .... পরিমাপ করা যায়।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) পিসা বিদ্যালয়ে গালিলিয় কত সালে অধাপক-পদে যোগ দেন? (১৮৫৭/ ১৫৮৮/ ১৫৮৯/ ১৫৯০)

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) অধ্যাপক-পদে কত বছরের জন্য গালিলিয় চুক্তিবন্ধ ছিলেন? (এক/ দুই/ তিন/ চার)।

৩) আলোচ্য রচনায় 'প্রতিপত্তি' শব্দটিকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে?

৪) অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—
(ক) গালিলিয়কে কেন অধ্যাপক-পদ ছেড়ে দিতে হয়েছিল?
(খ) গালিলিয়র বিখ্যাত পরীক্ষাটির বিবরণ দিন।

7.4.5 বক্তব্যসার:

ইটালির অন্য প্রদেশে গালিলিয়র গুণমুগ্ধ প্রভাবশালী বন্ধুরা ছিলেন। তাঁদেরই কেউ কেউ তাঁকে ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসের পেডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করলেন। এখানে গালিলিয়র পড়ানোর পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপের নানা দেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে আসেন। ইউরোপে তখন প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। গালিলিয় সেই রীতি ত্যাগ করে ইটালীয় ভাষায় শিক্ষা দিতে থাকেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

পেডুয়াতে তিনি আঠারো বছর পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন নিয়ম তিনি তখন আবিষ্কার করেন। এই সব আবিষ্কার ছিল সে-সময়ের প্রচলিত মতামতের বিরোধী। তবু তিনি ছিলেন নির্ভীক।

7.4.6 মন্তব্য:

পেডুয়াতে তিনি হাতে কলমে দেখাতেন কোন্ বস্তু কীভাবে কাজ করছে। ছাত্ররা তাতে আকৃষ্ট হত। গণিতবিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তিনি ছাত্রদের নানা জিনিস শিখিয়েছেন। যেমন, কীভাবে সেতু বাঁধতে হবে, কীভাবে অট্টালিকা মজবুত করতে হবে। এইভাবে বিজ্ঞান-পাঠের নতুন দিক তিনি খুলে দিয়েছিলেন।

পাঠগত প্রশ্ন 7.3

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—
(ক) পেডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছিল .... প্রদেশে।
(খ) পেডুয়ায় গালিলিয় ছিলেন .... অধ্যাপক।
(গ) ইউরোপে তখন .... ভাষায় পড়ানোর রীতি ছিল।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—
গালিলিয় পেডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কত খ্রিস্টাব্দে যোগ দিয়েছেন? (১৫৯২/ ১৫৯৩/ ১৫৯৪/১৫৯৫)
৩) পেডুয়াতে গালিলিয় কত বছর অধ্যাপনা করেন? (এক কথায় উত্তর দিন)
৪) গালিলিয়র পড়ানো ছাত্রদের আকৃষ্ট করত কেন? (অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)

শব্দার্থ ও টীকা

7.4.7 বক্তব্যসার:

হল্যান্ড দেশের অধিবাসী জেন্‌সন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তার মধ্য দিয়ে দেখলে দূরের জিনিস কাছের বলে মনে হয়। সে-সময়ে গালিলিয়ও ওই রকম যন্ত্র আবিষ্কারে প্রায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, কোন্ কোন্ উপকরণে তৈরি হয়েছে হল্যান্ডবাসীর যন্ত্র। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রস্তুত করে ফেললেন সমরূপ কিন্তু আরও উন্নত একটি যন্ত্র, আজ যার নাম দূরবীক্ষণ বা দূরবিন।

দূরবিনের নলের মধ্য দিয়ে মহাকাশ দেখলেন গালিলিয়। তিনি জানালেন, চাঁদের উপরিভাগ উঁচুনীচু, সূর্যে মাঝে-মাঝে কলঙ্ক দেখা দেয়, ছায়াপথ হল অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ঝাঁক, বৃহস্পতিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে চারটি উপগ্রহ, শুক্রগ্রহের আছে চাঁদের মতো কমা-বাড়া, শনিগ্রহের দু-পাশে আছে পাখনা— যাকে বলা হয় শনির বলয়।

7.4.8 মন্তব্য:

মহাকাশ পর্যবেক্ষণে দূরবিনের সাহায্য নিয়ে গালিলিয় বিজ্ঞান গবেষণায় নতুন পথ দেখালেন। আজ অসাধারণ শক্তিশালী দূরবিন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দূরবিনের সাহায্যে আকাশ দেখার সূত্রপাত করেছিলেন গালিলিয়।

পাঠগত প্রশ্ন 7.4

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) হল্যান্ড দেশের অধিবাসী .... এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

(খ) .... খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন।

(গ) বৃহস্পতিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে .... উপগ্রহ।

(ঘ) যে-তারামণ্ডলে পৃথিবী অবস্থিত তার নাম .... ।

(ঙ) সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো গ্রহের নাম .... ।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) ছায়াপথের আর-একটি নাম কী? (আকাশগঙ্গা/ আকাশপথ/ নভোমণ্ডল)

(খ) চাঁদের উপরিতল কী রকম? (কাঁকুরে/ পাথুরে/ বন্ধুর/ মসৃণ)

(গ) সূর্যের গায়ে মাঝে মাঝে কী দেখা যায়? (কলঙ্ক/ ছিদ্র/ রামধনু/ বুদ্‌বুদ)

7.4.9 বক্তব্যসার:

গালিলিয় বোধ হয় বহুদিন ধরে ভাবছিলেন, মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিকে যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তারা তেমনটি নয়। কিন্তু তিনি কখনও আশা করেননি, ওই বস্তুগুলি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। তা যখন পারলেন তখন কী অপূর্ব আনন্দ যে তিনি লাভ করেছিলেন, তা অনুভব করা দুঃসাধ্য।

১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মহাকাশের বস্তু নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু হয়। ওই সময় টস্কানির রাজা তাঁকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার গণিতের অধ্যাপক পদ নিতে অনুরোধ করেন। গালিলিয় পিসায় ফিরে আসেন। ফলে এই প্রথম তাঁর আবিষ্কারের বৃত্তান্ত পিসার মানুষ জানতে পারে।

7.4.10 মন্তব্য:

গালিলিয় খালি চোখে গ্রহ-নক্ষত্র দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি চাইছিলেন অন্য উপায়ে দেখতে। সেই দেখা সম্ভব করল দূরবিন। বিজ্ঞানীদের থাকা চাই দূরদৃষ্টি বা কল্পনাশক্তি। তবেই সম্ভব হয় নতুন নতুন আবিষ্কার। দূরবিনের সাহায্যে তিনি তাঁর কল্পনাকে বাস্তব চেহারায় দেখতে পেলেন। কঠিন কাজ সুসম্পন্ন করতে পারলে মানুষ অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে। গ্রহ-উপগ্রহের যথার্থ রূপ দেখে, সেই অনির্বচনীয় আনন্দ গালিলিয় পেলেন।

পাঠগত প্রশ্ন 7.5

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) মহাকাশের জ্যোতিষ্কদের খালি চোখে যেমন দেখা যায় তারা .... নয়।

(খ) গালিলিয় মহাকাশের বস্তু নিয়ে নিয়মিত গবেষণা শুরু করেন .... খ্রিস্টাব্দে।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

পিসায় ফিরে এসে গালিলিয় কোন্ বিষয়ের অধ্যাপক হলেন? (গণিতশাস্ত্রের/ জ্যোতির্বিদ্যার/ পদার্থবিদ্যার)

৩) গালিলিয় কেন অনির্বচনীয় আনন্দ পেলেন (দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)?

7.4.11 বক্তব্যসার:

কোপার্নিকাস দৈবাৎ শাস্তি পাননি। কিন্তু গালিলিয়কে শাস্তি ভোগ করতে হল। কারণ, তিনি তখন একটি বই প্রকাশ করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট লিখেছিলেন, তাঁর আবিষ্কার প্রমাণ করছে কোপার্নিকাসের বক্তব্য যথার্থ।

বইটি প্রকাশিত হলে যাজকরা অভিযোগ করল, গালিলিয় ধর্মের শত্রু। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে গালিলিয়কে হাজির হতে হল রোম-নগরের ধর্মসভায়, সেখানে তাঁর বিচার হবে। বিচারকর্তারা তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন, এ-রকম ভয়ংকর মতামত তিনি আর কখনও প্রচার করবেন না। বিচারক বা ধর্মনেতাদের নির্দেশে গালিলিয়কে সম্ভবত পাঁচমাস কারাগারে থাকতে হয়। টস্কানির রাজা তাঁর পক্ষ না-নিলে তাঁকে গুরুতর শাস্তি পেতে হত।

7.4.12 মন্তব্য:

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আওতায় ছিল রোমান চার্চ। খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যেকার এই বিশেষ সম্প্রদায় ছিল খুব প্রভাবশালী। ধর্মের ব্যাপারে চার্চের প্রধানরা ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া। তাঁদের চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে কেউ আঘাত

শব্দার্থ ও টীকা

করলে তাঁরা সহ্য করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে বসবাসের জন্য দিয়েছেন এই পৃথিবী, পৃথিবী স্থির হয়ে রয়েছে যাবতীয় সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে, আর চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীর চারপাশে পাক খাচ্ছে অনুগত সেবকের মতো। চার্চের এই ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করল কোপার্নিকাস ও গালিলিয়র তত্ত্ব। সুতরাং গালিলিয়র উপর রোমান ক্যাথলিক চার্চ খড়্গহস্ত হয়ে উঠল।

পাঠগত প্রশ্ন 7.6

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) কোপার্নিকাসের জন্ম হয় .... খ্রিস্টাব্দে।

(খ) গালিলিয়র আবিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে .... বক্তব্য যথার্থ।

(গ) .... খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় রোমের ধর্মসভায় হাজির হয়েছিলেন।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) কোপার্নিকাসের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয় কোন্ খ্রিস্টাব্দে? (১৫৩০/ ১৫৪০/ ১৫৫০/ ১৫৫২)

(খ) কোপার্নিকাস কোন্ দেশে জন্মেছিলেন? (ইটালিতে/ পোল্যান্ডে/ হল্যান্ডে)।

(গ) গালিলিয় কতদিন কারারুদ্ধ ছিলেন? (চারমাস/ পাঁচমাস/ এক বছর/ যাবজ্জীবন)।

(ঘ) গালিলিয়র বিরুদ্ধে কারা অভিযোগ করেছিলেন? (কার্ডিনাল/ টস্কানির রাজা/ পোপ/ যাজকেরা)

৩) রোমান চার্চ কেন গালিলিয়কে শাস্তি দিল? (দুটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.4.13 বক্তব্যসার:

গালিলিয় ধর্মসভার কাছে প্রতিজ্ঞামতো কয়েক বছর চুপচাপ থাকলেন। কিন্তু নিজের মত অনুযায়ী তিনি গবেষণা করে গেলেন। শেষে কোপার্নিকাসের মতামত প্রচার করতে তিনি খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি জানতেন তাঁর বিপক্ষে আছেন কুসংস্কারে অন্ধ প্রভাবশালী মানুষ, তাঁরা শত্রুতা করবেন। সুতরাং সরাসরি নিজের মত তিনি প্রকাশ করতে পারেননি। তিনি একটি বই লিখলেন যেখানে তিনটি চরিত্র পরস্পর কথা বলছে।

তখন গালিলিয়র বয়স ছেষট্টি বছর। এত বয়সেও ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে গেলেন। সেখানকার ধর্মীয় নেতারা তাঁকে বইটি প্রকাশ করতে অনুমতি দিলেন। এই অনুমতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তবু যা অসম্ভব তা-ই সম্ভব হল।

অনুমতি পাবার পর ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

7.4.14 মন্তব্য:

গালিলিয় নিজের মতামত প্রকাশের পথ খুঁজছিলেন। তিনি তা পেলেন। কথোপকথনের ঢঙে বইটি লিখে তিনি বিপক্ষের চোখে ধুলো দিতে চাইলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি সফলও হলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 7.7

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয় নিজের মত অনুসারে .... চালিয়ে গেলেন।

(খ) গালিলিয়র বিপক্ষে ছিলেন .... অন্ধ প্রভাবশালী মানুষ।

(গ) কথোপকথনাত্মক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় .... খ্রিস্টাব্দে।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) গালিলিয়র বইয়ে কার চরিত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল? (যে-চরিত্র কোপার্নিকাসের পক্ষে/ যে-চরিত্র অ্যারিস্টট্‌লের পক্ষে/ যে-চরিত্র নিরপেক্ষ)

(খ) গ্রন্থ-প্রকাশের অনুমতি চাইতে গালিলিয় কত খ্রিস্টাব্দে রোমে গিয়েছিলেন? (১৬৩০/ ১৬৩২/ ১৬৩৪/ ১৬৩৬)

৩) গালিলিয়র বই কেন কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা হল? (অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.4.15 বক্তব্যসার:

বইটি রোম ও ফ্লোরেন্স নগরে ভীষণ বিরোধিতার জন্ম দিল। সবচেয়ে বেশি শত্রুতা করলেন পিসায় দর্শনশাস্ত্রের এক নামকরা অধ্যাপক। সমস্ত কার্ডিনল, মংক ও গণিতজ্ঞদের বইটি সম্পর্কে রায় দিতে বলা হল। তাঁরা একবাক্যে বললেন, বইটি সাংঘাতিক ধর্মবিরোধী। তখন রোমের ধর্মসভার সামনে হাজির হবার জন্য গালিলিয়কে আদেশ দেওয়া হল।

গালিলিয় তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। তার ওপর তাঁর বিশিষ্ট প্রভাবশালী বন্ধু দ্বিতীয় কস্‌মোর মৃত্যু হয়েছে। অসহায় গালিলিয় ভয়ংকর বিপদে পড়লেন। তাঁর শত্রুরা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করলেন। গালিলিয় বাধ্য হলেন ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে রোমে হাজির হতে। সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মীয় প্রধানরা তাঁকে জেলখানায় পাঠালেন।

7.4.16 মন্তব্য:

রোমান চার্চের পদস্থ ব্যক্তিরা ছিলেন গালিলিয়র বইটির বিচারক। পণ্ডিতরা ছিলেন চার্চের সহায়ক। সুতরাং গালিলিয়কে শাস্তি পেতেই হল। যাঁরা শাস্তি দিলেন তাঁরা এতই অমানবিক যে বৃদ্ধ মানুষকে অব্যাহতি দেবার কথা তাঁরা ভাবলেনও না।

পাঠগত প্রশ্ন 7.8

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয়র বই প্রকাশিত হলে ভীষণ বিরোধিতা এল .... এবং .... নগর থেকে।

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) গালিলিয়র বইটি সম্পর্কে রায় দিতে বলা হল কার্ডিনল, ... এবং ....।

(গ) গালিলিয় .... খ্রিস্টাব্দে বাধ্য হয়েছেন রোমে হাজির হতে।

২) এক কথায় উত্তর দিন—

(ক) গালিলিয়র সবচেয়ে বেশি শত্রুতা যিনি করেছেন তিনি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?

(খ) কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু গালিলিয়কে নিঃসহায় করেছে?

৩) অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন—

(ক) গালিলিয়কে কখন জেলখানায় যেতে হল?

(খ) গালিলিয়কে কখন রোমের ধর্মসভায় হাজির হতে হল?

7.4.17 বক্তব্যসার:

কারাগারে গালিলিয়র কয়েক মাস কাটল। তারপর তাঁকে আনা হল বিচারকদের সামনে। বিচারকরা আবার তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করে বললেন, গালিলিয়কে তাঁদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বাইবেল ছুঁয়ে বলতে হবে, তিনি তাঁর বইয়ে যা বলেছেন সবই অপবিত্র, শ্রদ্ধার অযোগ্য, ধর্মবিরোধী এবং ভুল। গালিলিয়র কাছে এ হল এক ভীষণ সংকটের সময়। তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন, বিচারকরা যেভাবে যা বলতে বলেছেন তা-ই করলেন।

কিন্তু উঠে দাঁড়ানোমাত্র তিনি নিজেকে ধিক্কার দিলেন। নিজের ওপরই জাগল তাঁর ক্রোধ। তিনি তীব্র অনুতাপের সঙ্গে মাটিতে পা ঠুকলেন; উচ্চকণ্ঠে বললেন, পৃথিবী এখনও চলছে।

7.4.18 মন্তব্য:

গালিলিয়র যাঁরা প্রতিপক্ষ তাঁরা দ্বিতীয়বার তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। বোঝা যায়, গালিলিয় তাঁদের সংস্কারে যে-ঘা দিয়েছেন তা কতখানি মোক্ষম। গালিলিয় বাধ্য হলেন হাঁটু গেড়ে বসে বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করতে। ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানের বিশ্বাস, বাইবেল স্পর্শ করে মিথ্যা-বলার সাহস কারও নেই। কিন্তু দাঁড়িয়ে ওঠার পরেই গালিলিয়র যা প্রতিক্রিয়া তাতে বোঝা গেল, তিনি নিজের মতে অবিচল। আমরা দেখলাম সংস্কারমুক্ত গালিলিয়কে। আমরা বুঝলাম, ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করা যদি-বা যায়, কিন্তু যা সত্য তা মিথ্যা হয় না। গালিলিয়র পদাঘাত থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি অত্যন্ত অস্থির।

পাঠগত প্রশ্ন 7.9

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) গালিলিয় .... মাস কারাগারে ছিলেন।

(খ) বিচারকরা গালিলিয়কে বললেন, তোমাকে .... ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

(গ) গালিলিয় পূর্বনির্দিষ্ট .... উচ্চারণ করলেন।

(ঘ) খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ....।

২) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) বিচারকদের নির্দেশের পর গালিলিয় মনের দিক থেকে কী অবস্থায় ছিলেন? (অনুতপ্ত/ ক্রুদ্ধ/ দুর্বল)

(খ) মাটিতে পদাঘাত করে গালিলিয় কী বলেছিলেন? (চাঁদ ঘুরছে/ সূর্য স্থির/ পৃথিবী চলছে)

৩) গালিলিয়কে কেন বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করতে বলা হল? (অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দিন)

7.5 আপনি যা শিখলেন

1. গালিলিয়র জীবনকথা;
2. তখনকার সামাজিক অবস্থার কথা;
3. গালিলিয়র পূর্বসূরি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বৃত্তান্ত;
4. ধর্মীয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে গালিলিয়র দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও তাৎপর্য;
5. গালিলিয়র অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়;
6. বিদ্যাসাগরের যুক্তিশীল মানসিকতার কী বৈশিষ্ট্য;
7. আধুনিক বিজ্ঞানের জনকরূপে গালিলিয়র পরিচয়।

পাঠান্ত প্রশ্ন

1. অ্যারিস্টট্‌লের কোন্ কোন্ বক্তব্য গ্যালিলিয় ভুল প্রমাণ করেন?
2. গালিলিয়র যুগে ইউরোপের অবস্থা ও আমাদের দেশের অবস্থার মধ্যে কী মিল আপনি দেখতে পান?
3. গালিলিয়কে যে-দুটি দিকে লড়াই করতে হয়েছে উদাহরণ সহ তার পরিচয় দিন।
4. দূরবীক্ষণের সাহায্যে গালিলিয় কী কী আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি লিখুন।
5. গালিলিয়র দূরবিন তৈরির ইতিহাস বর্ণনা করুন।
6. ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় কর্তাব্যক্তিরা গালিলিয়কে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?
7. গালিলিয়র আবিষ্কার রোমান চার্চের কোন্ ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছিল লিখুন।
8. কোপার্নিকাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
9. কার্ডিনল কারা?
10. মংক কারা?
11. কথোপকথনাত্মক বইটি প্রকাশের পর গালিলিয় কী শাস্তি পেয়েছিলেন?
12. ‘ইহা এখনও চলিতেছে’— কী মানসিক অবস্থায় গালিলিয় এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন?

7.8 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

7.1

১) (ক) পিসা
(খ) ইটালির
(গ) অ্যারিস্টট্‌লের
(ঘ) মসৃণ

২) (ক) পিসার
(খ) চিকিৎসাবিদ্যা

৩) (ক) ৪২৭ খ্রি: পূর্বাব্দে
(খ) গ্রিস
(গ) ১৬৫৪
(ঘ) ১৬৪২
(ঙ) অভিজাত

৪) অ্যারিস্টট্‌লের বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না।

7.2

১) (ক) গণিতশাস্ত্রের
(খ) অ্যারিস্টট্‌লের
(গ) পিসার
(ঘ) গতিবেগ

২) (ক) ১৫৮৯
(খ) তিন

৩) জ্ঞান

৪) (ক) পিসার হেলানো গম্বুজ থেকে পরীক্ষা— হালকা ও ভারী বস্তু একই সঙ্গে নীচে পড়ল।
(খ) গালিলিয়র পরীক্ষায় প্রমাণিত হল অ্যারিস্টট্‌লের বক্তব্য অসঙ্গত— বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক্রোধ ও গালিলিয়র পদচ্যুতি।

7.3

১) (ক) ভেনিস
(খ) গণিতের
(গ) ল্যাটিন

২) ১৫৯২

৩) আঠারো

৪) গালিলিয় হাতে-কলমে কাজ করে দেখাতেন— গণিতবিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতেন— এই পদ্ধতি ছাত্রদের আকৃষ্ট করত।

7.4

১) (ক) জেন্‌সন
(খ) ১৬০৯
(গ) চারটি
(ঘ) ছায়াপথ
(ঙ) বৃহস্পতি

২) (ক) আকাশগঙ্গা
(খ) বন্ধুর
(গ) কলঙ্ক

7.5

১) (ক) তেমন
(খ) ১৬১১

২) গণিতশাস্ত্রের

৩) গালিলিয় ধারণা করেছিলেন, খালিচোখে গ্রহ-উপগ্রহ-সূর্যকে যেভাবে দেখা যায় তারা আসলে তা নয়। দূরবিনের মধ্য দিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর ধারণা ঠিক। তখন অনির্বচনীয় আনন্দ।

7.6

১) (ক) ১৪৭৩
(খ) কোপার্নিকাসের
(গ) ১৬১৫

২) (ক) ১৫৪০
(খ) হল্যান্ডে
(গ) পাঁচমাস
(ঘ) যাজকরা

৩) রোমান চার্চের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত পড়েছিল, তাই শাস্তি।

7.7

১) (ক) গবেষণা
(খ) কুসংস্কারে
(গ) ১৬৩২

২) (ক) যে-চরিত্র কোপার্নিকাসের পক্ষে
(খ) ১৬৩০

৩) গালিলিয় চাইছিলেন তাঁর বক্তব্য ধর্মীয় প্রধানরা যেন না-বুঝতে পারেন। তাই বিশেষ ধরণে বইটি লিখলেন।

7.8

১) (ক) রোম, ফ্লোরেন্স
(খ) মংক, গণিতজ্ঞদের
(গ) ১৬৩৩
২) (ক) পিসা
(খ) দ্বিতীয় কস্‌মোর
৩) (ক) কার্ডিনল, মংক, গণিতজ্ঞদের; গালিলিয়র বন্ধু কসমোর মৃত্যু
(খ) ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে শত্রুদের অত্যাচারে

7.9

১) (ক) কয়েক
(খ) বাইবেল
(গ) প্রতিজ্ঞাবাক্য
(ঘ) বাইবেল
২) (ক) দুর্বল
(খ) পৃথিবী চলছে
৩) (ক) ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে গালিলিয় রোমে যেতে বাধ্য হলেন— তখন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হল।
(খ) বাইবেলের মধ্যে আছে ঈশ্বরের বাণী— বাইবেলের পবিত্রতা। বাইবেল ছুয়ে শপথ নেবার নির্দেশ।

লেখক পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২৬.০৯.১৮২০-২৯.০৭.১৮৯১)-এর জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মা ভগবতী দেবী। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা শেষ করেন তখন তাঁর উপাধি 'বিদ্যাসাগর'। তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক। বিধবাবিবাহ প্রচলনের ও বহুবিবাহ বন্ধের জন্য বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম স্মরণীয় হয়ে আছে। শিক্ষাপ্রসারে, বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে, তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তাঁকে বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। বাংলা গদ্যের মধ্যে ছন্দের যে-দোলা আছে তা তাঁর কানে ধরা পড়ে। তাঁর গদ্যে এই ছন্দবোধের পরিচয় আছে। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন: বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, জীবনচরিত, চরিতাবলি ইত্যাদি। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই হল অসমাপ্ত আত্মচরিত এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। তাঁর 'জীবনচরিত' গ্রন্থে বিজ্ঞানীদের জীবনী তিনি পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থটি থেকেই 'গালিলিয়' নামক রচনাটি নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিভাষা দরকার হয়। বিদ্যাসাগরকে পরিভাষা সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে। যেমন দূরবীক্ষণ, ছায়াপথ ইত্যাদি। এই সব পরিভাষার অনেকগুলি আমরা আজ ব্যবহার করছি। বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর।

সমধর্মী রচনা

"প্রশ্ন হচ্ছে, কী নিরীক্ষণ করব, কী ভাবে নিরীক্ষণ করব। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে প্রায় গোটা সময়টা

ধরেই এই দুটি প্রশ্নের উত্তর ছিল অতি সরল— আলো দেখা হবে, দেখা হবে খালি চোখে। সেই দেখার ফল তারপর লিখে রাখা হবে খাতায়।

এই অবস্থার প্রথম বড়ো বদল ঘটল সপ্তদশ শতকের গোড়ায়। খেলনাওয়ালাদের কাছে একটি দূরবিন দেখে ইতালীয় বিজ্ঞানী গালিলিয় গালিলেই বুঝতে পারলেন, জ্যোতির্বিদ্যার কাজে এটিকে যদি যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আকাশের জ্যোতিষ্কদের সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য জানা যাবে যা খালি চোখে দেখে জানতে পারা সম্ভব নয়। নিজেই এ-কাজে উদ্যোগী হলেন তিনি, ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে চাঁদের দিকে দূরবিন তাক করে দেখতে পেলেন চাঁদের পাহাড় চাঁদের খাদ। বৃহস্পতির যে উপগ্রহ রয়েছে সে-কথাও জানতে পারলেন।

গালিলিয় ঠিক যে-ভাবে দূরবিন বানিয়েছিলেন সেই নকশা অবশ্য চালু রইল না খুব বেশি দিন। গালিলিয়র সমসাময়িক কালেই আর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ইয়োহানেস কেপলার আর-একভাবে দূরবিন বানানোর প্রস্তাব দিলেন, তাতে সুবিধে আরও বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দে আইজ্যাক নিউটন বললেন, এমন দূরবিনও বানানো সম্ভব যার মূল উপাদান হবে একটি বড়ো অবতল আয়না— মানে যে-আয়নার মাঝখানটা নীচু। তখন থেকে এখন পর্যন্ত গবেষণার কাজে যে-সমস্ত দূরবিন ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রায় সবই এইভাবে বানানো।

দূরবিনের নকশা যতই বদলাক, মাপ যতই বড়ো হোক, একটা ব্যাপারে গালিলিয়র আমল থেকে আর কোনো বদল হয়নি। জ্যোতির্বিদ্যায় নিরীক্ষণের ব্যাপারে যে দুটি মূল প্রশ্ন আগে তোলা হয়েছিল— কী নিরীক্ষণ করা হবে, কীভাবে করা হবে, তাদের একটির উত্তর বদলে গেল পাকাপাকিভাবে। গালিলিয়র আমলের পরেও বহুদিন তথ্য পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল আলো, কিন্তু সে-আলো দেখার কাজে খালি চোখের ব্যবহার আর কোনো দিনই হয়নি।”

— পলাশবরণ পাল: ‘বিজ্ঞান: ব্যক্তি যুক্তি সময় সমাজ’।

শব্দার্থ ও টীকা

8

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

8.1 প্রস্তাবনা

বাল্যকালে আপনারা এমন অনেক গল্প পড়েছেন যেখানে জীবজন্তুদের কাণ্ডকারখানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার গল্প হিসেবেও এগুলি চমৎকার। সেখানে জন্তুরা যেমন নিজেদের মধ্যে তেমনি মানুষের সঙ্গে কথা বলে। পঞ্চতন্ত্রে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশমূলক গল্প আছে। আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের এই আদলটি গ্রহণ করেছেন তাঁর ''কমলাকান্তের দপ্তর''-এর ''বিড়াল'' গল্পটিতে। এখানে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথোপকথন চলেছে। বিড়াল বর্তমান সমাজ সম্পর্কে গুরুতর সব অভিযোগ তুলেছে।

আসলে বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্রের মনের কথাগুলিই বলেছে। বঙ্কিমের দুঃখ-যন্ত্রণা, সমালোচনা, অভিযোগ বিড়ালের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। বিড়াল বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছদ্মবেশ। দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য বিড়াল যে উপদেশগুলি দিয়েছে তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই উপদেশ।

গল্পে কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের কথাবার্তা হচ্ছে। কমলাকান্ত যেন বিড়ালের প্রতিপক্ষ। সে ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক লোক নয়। অল্প বিস্তর আফিম সে খায়। তার চালচুলো নেই, নসিবাবুর বৈঠকখানায় থাকে। লোকে তাকে পাগলা বলে। আফিমের নেশার ঝোঁকে সে আধা বাস্তব আধা স্বপ্নকল্পনায় বিচরণ করে। এমন একজন লোক ছাড়া বিড়ালের সঙ্গে কথাবার্তা কী করে সম্ভব হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন। প্রচুর প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। কিন্তু সেখানে তো যুক্তি তথ্য সাজিয়ে লেখা। আর কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনের দরজা হাট করে খুলে ধরেছেন। হাস্য পরিহাস, ঠাট্টাতামাসার আবরণে সমাজের ক্ষতগুলিকে ব্যঙ্গবিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ।

কমলাকান্ত চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ১৮৭৫ সালে কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। তার কুড়ি বছর আগে ইংরেজি সাহিত্যে ডি. কুইনসি লেখেন 'The Confession of an English Opium Eater'। কিন্তু এক আফিম খাওয়া বাদে কমলাকান্তের সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই।

শব্দার্থ ও টীকা

8.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পাঠ করে আপনারা —

- বুঝতে পারবেন যে, আমাদের সমাজ দরিদ্র ও ধনীতে বিভক্ত। ধনীরা ক্রমাগত ধনসম্পদ বাড়িয়ে চলে আর গরিবেরা অনাহারে থাকে;
- দরিদ্রদের দুঃখ-দৈন্য উপলব্ধি করতে পারবেন;
- দরিদ্রদের শোষণ করেই যে ধনীরা বড়লোক হয় তা বুঝতে পারবেন;
- মানুষ যে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে তার কারণ যে তাদের দারিদ্র্য তাও বুঝতে পারবেন;
- সমাজের উন্নতি হলেই যে দারিদ্র্য ঘুচে যায় না — সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন;
- এই চমৎকার গল্পটি পাঠ করে আনন্দলাভ করতে পারবেন। একটি গুরুতর বিষয়কে হাসি তামাসার মধ্য দিয়ে কী করে মানুষের মনে এঁকে দিতে পারা যায় তাও উপলব্ধি করতে পারবেন।

8.3 মূল পাঠ

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

8.3.1

(1)

আমি শয়নগৃহে, চারপাই'র উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে — দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই — এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা। এমন সময় একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, ''ম্যাও!''

চাহিয়া দেখিলাম — হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথেচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, ''ম্যাও!''

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, ''ম্যাও!'' বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতরে একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, ''কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।'' বুঝি, সে ''ম্যাও!'' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি, বিড়ালের মনের ভাব, ''তোমার দুধ তো খাইয়া বসিয়া আছি — এখন বল কী?''

চারপাই = চারটি পায়াওয়ালা খাট, খাটিয়া।
প্রেতবৎ = প্রেতের মতো।
নিমীলিতলোচনে = চোখ বুঁজে।
নেপোলিয়ন = ফরাসি দেশের বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা।
ওয়াটার্লু = বেলজিয়ামের একটি স্থান।
ওয়েলিংটন = ডিউক অফ ওয়েলিংটন - ইংল্যান্ডের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ।
ডিউক = (পূর্বোক্ত)
অপরিমিত = খুব বেশি।
মার্জার = বিড়াল।
নির্জল দুগ্ধ = জল না মেশানো দুধ।

বলি কী? আমি তো ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। না জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, ‘‘ম্যাও!’’ প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

8.3.2

(2)

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, ‘‘মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখো দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে — আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ করো। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এতদিন এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

‘‘দেখো, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল — অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী, — আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা করো। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

‘‘দেখো আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখো, যাঁহারা বড়ো বড়ো সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে — চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

‘‘দেখো, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে ম্যাও ম্যাও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের

শব্দার্থ ও টীকা

উদরসাৎ = পেটে পোরা।
ব্যূহ = সৈন্য সাজানো।
চিরাগত = বহুদিন ধরে চলে আসা।
অবমাননা = অপমান।
মনুষ্যকুল = মানুষজাতি।
কুলাঙ্গার = বংশের কলঙ্ক।
স্বজাতিমণ্ডলে = নিজের জাতের মধ্যে।
বিধেয় = উচিত।
সকাতর চিত্তে = দুঃখিত মনে।
যষ্ঠি = লাঠি।
ধাবমান = তাড়া (করা)।
দিব্যকর্ণ = ভগবানের দেওয়া শোনার ক্ষমতা।

ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধাতৃষ্ণা।
শাস্ত্রানুসারে = নীতি মেনে।
ঠেঙা = লাঠি।
আইস = এসো।
বিজ্ঞ = জ্ঞানী।
চতুষ্পদ = পশু
জ্ঞানোন্নতি = জ্ঞানের উন্নতি।
উপায়ান্তর = অন্য উপায়।
আহরিত = সংগৃহীত।
সিদ্ধ = পূরণ।
ধর্মসঞ্চয় = ধর্মলাভ।
মূলীভূত = আসল।
সাধ = ইচ্ছা।
প্রয়োজনাতীত = প্রয়োজনের অতিরিক্ত।
তদপেক্ষা = তার চেয়ে।
দণ্ড = শাস্তি।

কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই, যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড়ো রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না — সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটোলোকের দুঃখে কাতর! ছিঃ! কে হইবে?

“দেখো, যদি অমুক শিরোমণি, কী অমুক ন্যায়ালংকার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড় হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড়ো মান্য লোক; পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা তো নয় — তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ — দরিদ্রের দুঃখ কেহ বোঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর — আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর — ছি! ছি!

“দেখো আমাদিগের দশা দেখো, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, ম্যাও ম্যাও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি— কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল — গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতি ভার্যার সহোদর বা মুর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল — তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

আর আমাদিগের দশা দেখো — আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে — জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে — অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, “ম্যাও! ম্যাও! খাইতে পাই না —” আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও — নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ ম্যাও ম্যাও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না আফিমখোর; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন-না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

8.3.3

আমি আর সহ্য করিতে না পরিয়া বলিলাম, “থামো! থামো মার্জারপণ্ডিত! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।”

মার্জার বলিল, “না হইল তো আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধন বৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?”

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধন বৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।” বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?”

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে

শব্দার্থ ও টীকা

অগৌরব = নিন্দা।
মুষ্টিভিক্ষা = সামান্য দান।
ফাঁপরে = বিপদে।
শিরোমণি, ন্যায়ালঙ্কার = সংস্কৃতে ও শাস্ত্রে পণ্ডিত।
মান্য = শ্রদ্ধেয়, নামী।
সোহাগের = আদরের।
ভার্যা = বউ।
শতরঞ্চ = দাবাখেলা।
আহারাভাবে = না-খেয়ে।
কৃশ = রোগা।
অস্থি = হাড়।
পরিদৃশ্যমান = দেখা যাচ্ছে।
লাঙ্গুল = লেজ।
বিনত = ঝুলে পড়া।
কৃষ্ণ = কালো।
দূরদর্শী = যিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান।

মার্জারপণ্ডিত = হে বিড়ালপণ্ডিত।
সোশিয়ালিস্টিক = সমাজতন্ত্রবাদীর মতো। সমাজতন্ত্র এক ধরনের সমাজ দর্শন। ওই দর্শনের মতে সকলেই সামাজিক সম্পদের সমান অধিকারী।
নৈয়ায়িক = ন্যায় বা তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত।
কস্মিনকালে = কোনও কালে।

না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, ''সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।''

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, ''চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম করো। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁর চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখো। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠ্যাঙাইয়া মারিয়ো, আমি আপত্তি করিব না।''

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, ''এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে — আর কিছু হউক বা না হউক, আফিমের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন করো, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিয়ো, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইয়ো না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্বার আসিয়ো, এক সরিসাভোর আফিম দিব।''

মার্জার বলিল, ''আফিমের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।''

মার্জার বিদায় লইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড়ো আনন্দ হইল।

শব্দার্থ ও টীকা

নীতিবিরুদ্ধ = অনৈতিক।

হাঁড়ি খাওয়া = হাঁড়ি থেকে চুরি করে খাওয়া।

সরিষাভোর = সরষের পরিমাণ।

স্বচ্ছন্দে = অনায়াসে।

ভাণ্ডারঘর = ভাঁড়ার ঘর।

8.4 বিষয়ের রূপরেখা

একটি বিড়ালের দুধ চুরি করে খাওয়াকে কেন্দ্র করে এই গল্পের কাহিনি। ক্ষুধার্ত বিড়ালের চুরি করে খাওয়া উচিত কী অনুচিত তাই নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে। ক্রমে বিড়াল হয়ে উঠেছে দরিদ্র জনসাধারণের রূপক। এই তর্কে উঠে এসেছে আমাদের সমাজে ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রায় আসমান জমিন ফারাকের কথা। একদিকে ধনবানের ভোগসুখ, আরাম আয়েশ, ধন দৌলতের শেষ নেই; আর অন্যদিকে গরিবের দুমুঠো ভাতের জোগাড় নেই। ফলে বেঁচে থাকার জন্য তারা যদি কোনো অনৈতিক কাজেও লিপ্ত হয় তার জন্য দায়ী ধনীরাই। কারণ পাঁচশ দরিদ্রকে শোষণ করে একজন বড়লোক হয়। এই বিতর্কে সমাজের প্রকৃত উন্নতি কাকে বলে সে প্রসঙ্গও এসেছে। সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, ধনীর ধন বৃদ্ধির পথ করে দেওয়া এবং তার ধনকে নিরাপদ রাখাকে যদি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বলে তবে সেই শ্রীবৃদ্ধিতে দরিদ্রের কোনো প্রয়োজন নেই। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে দরিদ্রের ক্ষোভকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা বলে থামিয়ে দেওয়া হয়, ধর্ম-কর্মে নেশাগ্রস্ত করে শান্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন লেখক।

শব্দার্থ ও টীকা

8.4.1

আমি শয়নগৃহে . . . . . বুঝিতে পারিলাম।।

বক্তব্যসার:

রাত্রিবেলা আলোআঁধারি পরিবেশে আফিম খেয়ে কমলাকান্ত নেশার ঝোঁকে কল্পনায় বুঁদ হয়েছিলেন। ভাবছিলেন - নেপোলিয়নের বদলে তিনি হলে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয় করতে পারতেন কি না। একটা বিড়ালের ডাক শুনে তিনি ভাবলেন, ইংরেজ রাজপুরুষ ওয়াটার্লু জয়ের জন্য আরও কিছু পুরস্কার চান কি না। আবার বিড়ালের ডাক শুনে তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখতে পেলেন, তাঁর খাওয়ার জন্য যে দুধ গোয়ালিনি রেখে গিয়েছিল তা পান করে একটি বিড়াল তৃপ্তির ডাক ডাকছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি চুরির জন্য বিড়ালকে শাস্তি দেওয়া উচিত কি না ভাবতে লাগলেন। প্রথমে মনে হল — এ দুধ তো গোরুর। সুতরাং এ দুধের মালিক তিনি হন কী করে? বিড়ালকেই বা চোর বলা যাবে কী করে। আর চোর বলে তাকে শাস্তি বা দেওয়া হবে কেন? কিন্তু সমাজে চিরকেলে প্রথা হচ্ছে চোরকে শাস্তি দেওয়া। চোর কেন চুরি করছে, তার পেছনে সত্যি কোনো কারণ আছে কি না কিংবা চুরির জন্য সমাজের ব্যবস্থা দায়ী কি না তা বিচারে বিবেচনা করা হয় না। কমলাকান্তের মন যেহেতু এই সব দ্বিধায় দুর্বল হল তাই মারা আর হয়ে উঠল না। এবার কমলাকান্ত অলৌকিকভাবে বিড়ালের বক্তব্য যেন শুনতে ও বুঝতে পারলেন।

বুঁদ = বিভোর।

মন্তব্য:

"আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম . . . . . ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা" — ফরাসী দেশের বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বহু যুদ্ধ জয় করেন। ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল তিনি দখল করেন। কিন্তু বেলজিয়ামের ওয়াটার্লু নামক স্থানে ১৮২৫ সালে তিনি পরাস্ত হন ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটনের কাছে এবং রাজ্য হারান। এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, ভারতে ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে চাকরি করেও তিনি ইংরেজদের পরাজিত করার কৌশল চিন্তা করছেন। যদিও আধ-পাগলা আফিম নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের মুখ দিয়ে কথা বলান হয়েছে তবু এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের মনোভাব বোঝা যায়। পরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, 'বন্দেমাতরম্' গানের মধ্য দিয়ে তা সরাসরি প্রকাশিত হয়েছে।

"ওয়েলিংটন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আফিম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে।" "ডিউক মহাশয়কে যথেচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে।" "অপরিমিত লোভ ভালো নহে।"

উপরের বাক্যগুলিতে ওয়াটার্লু জয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটনের কথা বলা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন; পরে পার্লামেন্টের সভ্যও ছিলেন। এখানে তাঁকে বিড়াল এবং নেশাখোর ভিক্ষুক বানানো হয়েছে। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অপরিমিত লোভী বলা হয়েছে। ইংরেজদের পররাজ্য অধিকারের লোভকে এখানে ব্যঙ্গ ও নিন্দা করা হয়েছে।

পার্লামেন্ট (Parliament) = সংসদ

অপরিমিত = অঢেল

"কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই" — একটা প্রবাদ। অর্থ হচ্ছে — যারা কষ্ট করে কোনো একটা জিনিস তৈরি করে তারা তা ভোগ করার সুযোগ পায় না। লেখক অন্য জায়গায় বলেছেন — চাষি বহু কষ্ট করে ফসল ফলায়, কিন্তু সে অনাহারে দিন কাটায়। জমিদার মহাজন সব আত্মসাৎ করে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 8.1

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

1. ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন ____________।

ক. আলেকজাণ্ডার

খ. নেপোলিয়ন

গ. ক্রমওয়েল

2. ডিউক অফ ____________কে কমলাকান্তের অপরিমিত লোভী মনে হয়েছিল।

ক. ওয়েলিংটন

খ. ক্যান্টারবেরি

গ. বার্মিংহাম

3. দুধ দিয়ে গিয়েছিল ____________ গোয়ালিনি।

ক. প্রজা

খ. দুখি

গ. প্রসন্ন

সঠিক কথাটি চিহ্নিত করুন —

4. কমলাকান্ত বিড়ালকে মারতে পারেননি, কারণ —

ক. লাঠিখানা ভাঙা ছিল

খ. তাঁর শরীর দুর্বল ছিল

গ. বিড়ালের কথা বুঝতে পারলেন।

5. যারা কষ্ট করে মাছ ধরে, তারা মাছ খেতে পায় না, কারণ —

ক. বিড়ালে মাছ খেয়ে যায়

খ. মালিক মহাজন মাছ নিয়ে যায়

গ. মাছ খেতে তারা ভালবাসে না।

অনধিক চারটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

6. কমলাকান্ত নেশার মৌজে কী কী কল্পনা করেছিলেন?

7. কমলাকান্তের কল্পনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির কী পরিচয় পান?

8. বিড়ালকে চোর বলতে কমলাকান্তের দ্বিধার কারণ কী?

8.4.2

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে . . . . . পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

বক্তব্যসার:

কমলাকান্ত এবং বিড়ালের কথোপকথন। বিড়াল তার দুধ চুরি যে অন্যায় নয় তা যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে। বিড়াল এখানে দরিদ্র জনসাধারণ থেকে অভিন্ন। তার কথা সমাজের গরিব জনসাধারণের মনের কথা। বিড়াল

বলছে — গায়ের জোর না-দেখিয়ে যুক্তি বুদ্ধি নৈতিকতা দিয়ে সামাজিক অবস্থা বিচার করা উচিত। সমাজে যারা মান্যগণ্য ধনী, তারাই কেন সমস্ত ভোগবিলাস সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে আর গরিবেরা কেন না-খেয়ে শুকিয়ে মরবে। সবারই তো ক্ষুধা তৃষ্ণা সমান। ধনীরা বেশি বেশি ভোগ করুক, কিন্তু গরিবরা কেন খুদ-কুঁড়োও পাবে না। কেন তারা কেবল মার খেয়েই যাবে।

এরপর প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে বিড়াল তা ব্যাখ্যা করেছে। পরের উপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দুধ চুরি করে খেয়ে বিড়াল প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্তকে ধর্মকর্ম করায় সাহায্য করেছে। ধনীরা দরিদ্রকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না-করে নিজেদের সাধুপুরুষ বলেন। এঁরা সবচেয়ে বড়ো অধার্মিক। এঁরা দরিদ্রদের অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য করেন। সমাজের অসামাজিক কাজের জন্য দায়ী এই অভিজাত ধনীরা। এরা রাজা মহারাজাদের তুষ্ট করতে ব্যগ্র। ধর্মব্যবসায়ীদের তোয়াজ করতে এক-পায়ে খাড়া। মোসাহেবদের পোষেন; পরগাছা শ্রেণির এই লোকদের পোষা-বিড়াল বলা হয়েছে।

বিড়াল এখানে দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণির লোকদের করুণ অবস্থার এক মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছে। খেতে না পেয়ে তাদের শরীর শুকিয়ে গেছে, পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। তারা কথা বলার শক্তি হারিয়েছে। ধনীর ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টও তারা পায় না। বিড়াল বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছে — যতদিন এই অবস্থা থাকবে ততদিন বাঁচার জন্য গরিবেরা যদি সমাজবিরোধী কাজ করে তবে তাতে কোনো অন্যায় নেই। দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করে সে বলেছে — বহু মানুষকে শোষণ করে এক-একজন ধনী হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

সাধুপুরুষ = ধার্মিক ব্যক্তি।

মর্মন্তুদ = করুণ।

মন্তব্য:

“তোমাদের বিদ্যালয় সকল . . . . . এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।” — বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এই শিক্ষাব্যবস্থা ধনীর পক্ষপাতী, দুর্বলদের প্রতি উদাসীন। প্রকৃত ধর্ম কাকে বলে তাও এই ব্যবস্থা শেখায় না।

শয্যাশায়ী মানুষ — কোনো কাজ না করে আরামে থাকে যে মানুষ; পরগাছা লোক।

ছোটোলোক — এখানে অর্থ - গরিব মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন — “মনুষ্যালয়ে বড় মানুষ বলিলে . . . আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী (মুদ্রা) বাস করেন, তাহাকেই “বড় মানুষ” বলে। যাহার ঘরে এই দেবী (মুদ্রা) স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে “ছোট লোক” বলে।”

যদি অমুক শিরোমণি, কী অমুক ন্যায়ালঙ্কার — সংস্কৃত ধর্মব্যবসায়ী বা পন্ডিত, পুরোহিতদের প্রতি বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

তেলা মাথায় তেল দেওয়া — যাদের অনেক আছে তাদের আরও পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। একটি প্রবাদ।

আমাদের দশা — দরিদ্রের অবস্থা, দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। হাসিতামাসা ব্যঙ্গবিদ্রুপ থেকে এখানে তিনি দুঃখ বেদনা যন্ত্রণায় ডুবে গেছেন। ক্ষুধার নিদারুণ ছবি তুলে ধরেছেন।

আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না — এখানে কেবল দেশীয় ধনীদের প্রতি কটাক্ষ করেননি বঙ্কিমচন্দ্র, শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ শাসকদের দরিদ্র ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার উপেক্ষাকেও ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন।

শব্দার্থ ও টীকা

সোহাগের বিড়াল — আদরের পোষা বিড়াল।

একটি সমাজচিত্র — ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা কমলাকান্তের দপ্তরের 'বিড়াল'। অধিকাংশ মানুষ তখন দরিদ্র, ক্ষুধায় জর্জরিত; অন্যদিকে কিছু ধনী, বড়লোক। দরিদ্রের প্রতি ছিটেফোঁটা সহানুভূতি নেই, সামান্য সাহায্যও করে না তাদের। ওদের আরাম, আয়েস, খানাপিনার শেষ নেই। অপচয় অপব্যয় করে, তবু দরিদ্রকে কানাকড়িও দেয় না। রাজামহারাজাদের তোষামোদ করে। ধর্মব্যবসায়ী সমাজপতিদের তোয়াজ করে। মোসাহেব পোষে। মূর্খ ধনীরা সভাকবি রাখে, তাদের গুণগান শোনার জন্য। একাধিক বিবাহ করে। বুড়ো বয়সে অল্পবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে করে। তাসপাশা খেলে সময় কাটায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 8.2

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. শ্রেষ্ঠ ধর্মকর্ম হচ্ছে ____________।
- ক. তীর্থভ্রমণ করা
- খ. পূজাআর্চা করা
- গ. পরোপকার করা

2. চুরির মূলে আছে ____________।
- ক. ধনীর কার্পণ্য,
- খ. গৃহস্থের অসাবধানতা
- গ. অসামাজিক প্রবণতা

3. পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুতে অধিকার আছে কেবল ____________।
- ক. ধনীদের
- খ. দরিদ্রদের
- গ. ধনী দরিদ্র সবার

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

4. বিড়াল বলছে, মানুষের জ্ঞানোন্নতির জন্য বিজ্ঞ ____________ কাছে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

5. শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ____________।

6. ধনীর দোষেই ____________ চোর হয়।

উত্তর সংক্ষেপে লিখুন —

7. ''তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে — আমাদের কী নাই'' — কে কাদের কেন এই প্রশ্ন করেছিল?

8. ''আমাকে প্রহার না করিয়া আমার প্রশংসা করো।'' — প্রহার না করে প্রশংসা করার পিছনে বিড়ালের যুক্তি কী?

9. ''ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়'' — বিড়াল এমন কথা বলছে কেন?

10. ''ছোট লোকের দুঃখে কাতর! ছিঃ! কে হইবে?'' — উক্তিটি কে কোন অর্থে বলেছে?

শব্দার্থ ও টীকা
কদাচার = কুৎসিত আচরণ।

8.4.3

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া . . . . . বড়ো আনন্দ হইল।

বক্তব্যসার:

এতক্ষণ বিড়াল ধনীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, অধর্ম, অনাচার-কদাচারের অভিযোগ সরাসরি ব্যক্ত করছিল। অত্যাচারিত দরিদ্রদের দুঃসহ দুরবস্থার ছবি তুলে ধরছিল। এবার শুরু হল কমলাকান্তের সঙ্গে বিড়ালের সওয়াল জবাব। কমলাকান্ত ধনীদের পক্ষের যুক্তিগুলি হাজির করছেন, এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও শ্লেষের ছুরিতে তার অন্তঃসার শূন্যতাকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন।

কমলাকান্তের বক্তব্য — বিড়ালের কথাগুলি সমাজতন্ত্রীদের কথা। এই বক্তব্য সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা ধনসম্পদ বাড়িয়েই চলবে। তাতে বাধা দিলে সমাজের উন্নতি হবে না। সমাজের উন্নতি মানে ধনীর ধন বৃদ্ধি। বিড়ালের বক্তব্য — যে উন্নতিতে গরিব না-খেয়ে মরে সে উন্নতিতে গরিবের কী প্রয়োজন? কমলাকান্ত ধনীদের সমর্থন করতে গিয়ে আসল সত্যটা প্রকাশ করে দিলেন। তা হল — সমাজের উন্নতি অর্থাৎ ধনীদের উন্নতির পথে যারা বাধা সৃষ্টি করবে, এখনকার বিচারে তাদের সাজা পেতে হবে।

বিড়াল এবার বিচারব্যবস্থার অসততাকে তুলে ধরল। সে বলল — ক্ষুধার্তের চুরি করার প্রকৃত বিচার করতে হলে বিচারককে অনাহারে থেকে ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে হবে। তবেই হবে সত্য বিচার।

তর্কে না পেরে উঠে কমলাকান্ত বিড়ালকে উপদেশ দিলেন যে এই সব সমাজ-ভাঙার কথা বলা উচিত নয়। বরং ধর্মের আফিম খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা ভোলাই ভাল।

কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করে বিড়ালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কমলাকান্ত এই কাহিনির শেষ বাক্যে এক কঠোর ব্যঙ্গে বর্তমান সমাজের ভণ্ডামিকে নগ্ন করে খুলে ধরলেন। এরা মনে করে — যারা নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করে তারা সমাজবিরোধী, আর যারা বাস্তবকে আড়াল করতে চায় তারাই মহাজ্ঞানী। কমলাকান্ত প্রশংসার ছলে তীব্র ধিক্কার ছুঁড়ে দিলেন।

মন্তব্য:

তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক। সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল।

সোশিয়ালিস্টিক — সমাজতন্ত্রবাদী। তারা চায় ধনের সমান বন্টন। সমাজে যে যেমন শ্রম দেবে সে তেমনি তার পুরো দাম পাবে। জমিজমা কলকারখানার মালিক হবে রাষ্ট্র।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতন্ত্রীদের কথা ঠিক বলে মনে করতেন।

যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না — বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন হাকিম, দেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অনাস্থা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি।

ক্ষুধার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা বন্ধ করার সবচেয়ে বড়ো দাওয়াই ধর্মকর্মে মন দেওয়া।

জন হেনরি নিউম্যান (১৮০১-৯০) একজন বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ও পাদ্রী। ধর্ম সাহিত্য রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 8.3

শূন্যস্থানে সঠিক কথা বসান —

1. কমলাকান্তের মতে সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ____________ ধনবৃদ্ধি।

ক. গরিবের

খ. ধনীর

গ. গরিব ও ধনীর

2. কমলাকান্ত মনে করে বিড়ালের না বোঝার অধিকার আছে; কারণ সে ____________।

ক. মূর্খ

খ. দরিদ্র

গ. সুবিচারক

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন —

3. সমাজের প্রয়োজনে চোরকে ____________ দেওয়া উচিত।

4. ক্ষুধার জ্বালা ভোলার জন্য ____________ পাঠ করা উচিত।

পাঠার্থে = পড়ার জন্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন —

5. কমলাকান্তের মতে সমাজের উন্নতির পন্থা কী?

6. সমাজের ধনবৃদ্ধির ব্যাপারে বিড়াল উদাসীন কেন?

7. সুষ্ঠু বিচারের জন্য সুবিচারকের কী করা কর্তব্য?

8. দুধ চুরির সমস্যার সমাধানের জন্য কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব দিয়েছিল?

8.5 আপনি যা শিখলেন

1. একটি হাস্য-পরিহাসের মজার গল্পের মধ্য দিয়ে কী করে সমাজের ভেতরের গুরুতর গলদকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় তা বুঝলেন।

2. দুটি রূপক চরিত্রের কথাবার্তা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার আকাশ-পাতাল ফারাকের কথা বুঝতে পারলেন।

3. বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে ধনবানদের কদর্য জীবনযাত্রার ছবিটা দেখতে পেলেন।

4. সোজাসাপটা বলার থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে বললে সমালোচনা যে অনেক বেশি ধারালো হয় তা বুঝতে পারলেন।

5. বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে পারলেন।

6. ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাব বুঝতে পারলেন।

7. অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের চিন্তার ত্রুটি কোথায় তা জানতে পারলেন।

8.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

অনধিক দশটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

1. 'বিড়াল' গল্পে দরিদ্রদের যে মর্মন্তুদ অবস্থা ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করুন।
2. 'বিড়াল' গল্পে ধনবানদের জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে লিখুন।
3. 'বিড়াল' গল্পে কাদের 'পতিত আত্মা' বলা হয়েছে? কোন অর্থে তা বলা হয়েছে? কাদের কাছে কেন তারা পণ্ডিত?
4. ''থামো! থামো . . . তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক'' — বিড়ালের কথাগুলিকে সোশিয়ালিস্টিক বলার কারণ কী? তাকে থামিয়ে দেওয়ারই বা কারণ কী?
5. 'বিড়াল' গল্পে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের কোন্ ধাঁচ গ্রহণ করেছেন? কেন করেছেন?
6. দরিদ্রদের সঙ্গে ধর্মাচরণের কেমন সম্পর্কের কথা 'বিড়াল' গল্পে বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
7. গল্পে ব্যবহার করা হয়েছে এমন দুটি প্রবাদ ও তার অর্থ লিখুন।

8.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

8.1

1. (খ)
2. (ক)
3. (গ)
4. (গ)
5. (খ)
6. কমলাকান্ত ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, নেপোলিয়ন, ডিউক অফ ওয়েলিংটন সম্পর্কে কল্পনা করছিলেন।
7. ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের পরিচয়।
8. চুরি সম্পর্কে কমলাকান্তের প্রশংসা।

8.2

1. (গ)
2. (ক)
3. (গ)
4. চতুষ্পদের

5. পরোপকার
6. গরিবেরা
7. ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণীমাত্রেরই থাকা সত্ত্বেও দরিদ্ররা খেতে পায় না।
8. বিড়াল চুরি করে কমলাকান্তের পরোপকারে সাহায্য করেছে।
9. ধনীরা দরিদ্রদের কিছু দেয় না বলেই তারা চুরি করতে বাধ্য হয়।
10. ধনীর বিবেকহীনতাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে।

8.3

1. (খ)
2. (গ)
3. শাস্তি
4. ধর্মগ্রন্থ
5. ধনীর ধনবৃদ্ধি ও ধনরক্ষাতেই সমাজের উন্নতি।
6. যে উন্নতিকে গরিবের কোনও সুরাহা হয় না, তাতে বিড়ালের কিছু এসে যায় না।
7. অপরাধীর অপরাধের কারণ উপলব্ধি করা।
8. ভাগ করে খাওয়ার প্রস্তাব।

8.7 লেখক পরিচিতি

বাংলা ভাষার প্রথম ও সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষাকে সুন্দর ও মধুর করে গড়ে তুলেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন তিনি। কেবল উপন্যাস নয়, নানা সমস্যা, চিন্তা ও ভাব নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা তাঁর এক অক্ষয় কীর্তি। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। পেশায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি দীর্ঘদিন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর তার মধ্যেই রচনা করে গেছেন ১৪ খানি উপন্যাস ও বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক। নির্ভীক এই উচ্চ পদাধিকারী ও সাহিত্যিক নীলকর সাহেবদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের যেমন রক্ষা করেছেন তেমনি নানা বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করতেও পিছপা হননি।

তার জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায়। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। মায়ের নাম দুর্গাসুন্দরী। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল।

তাঁর রচিত কয়েকখানি উপন্যাস — দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি তাঁরই রচনা।

শব্দার্থ ও টীকা

৪.৪ সমধর্মী রচনা

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ।

'কমলাকান্তের পত্র'

'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'

'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'

'বঙ্গদেশের কৃষক'

শব্দার্থ ও টীকা

9

শিলাইদহ থেকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

9.1 প্রস্তাবনা

এটি একটি চিঠির অংশবিশেষ। চিঠিও যে সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে এটি তার অতি সুন্দর নিদর্শন।

গুণান্বিত = গুণসম্পন্ন।

রবীন্দ্রনাথ অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলার শিলাইদহে জমিদারি পরিদর্শনের কাজে থাকার সময় এই চিঠি লিখেছিলেন তাঁর প্রিয় ভাইঝি (মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আর মেজবউদি জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা) বছর কুড়ির ইন্দিরা দেবীকে।

ওই সময় তিনি বাংলার পল্লিজীবনকে খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। তার ফলে পল্লিবাংলার প্রকৃতি আর মানুষকে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগও ঘটেছিল।

এই পত্রে মেঘলা দিনের একটি অনুপম চিত্র আঁকার পাশাপাশি কবি তাঁর হতদরিদ্র প্রজাদের অসহনীয় দুর্দশার বর্ণনা দিয়েছেন। আর সেই প্রসঙ্গে এসেছে মানুষের দুঃখমোচন আর দারিদ্র্য দূর করা নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা। সমাজবাদীরা যে গোটা পৃথিবীতে সব মানুষের মধ্যে বিত্তের সমবণ্টনের কথা বলে থাকেন তার প্রতি কবির আস্থাও প্রকাশিত হয়েছে। এর অনেক পরে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখন তিনি একই রকম কথা বলেছেন।

অনুপম = অতুলনীয়।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রখানি লিখেছেন তাঁর তখনকার আর সমস্ত গদ্যরচনা সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু চিঠিতে তিনি সহজ ও সরল চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এই পাঠটি রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এটি ৯৫ সংখ্যক পত্র।

9.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- পল্লিবাংলার বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতির কথা;

- গ্রামীণ মানুষের অসহায়তার কথা;
- সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে আশার আলোর সম্ভাবনা;
- অন্তরঙ্গ জনকে লেখা চিঠিও সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে।

9.3 মূল পাঠ

(1)

শিলাইদহ
১০ মে ১৮৯৩

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে— আর এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা ব্লটিংপ্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে। মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছিলেন, বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবোটোবো নধরনন্দন ভাব। এখনই বৃষ্টি আরম্ভ হল ব'লে— হাওয়াটা সেইরকম কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, শিমলার সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে।

ব্লটিং প্যাড = চোষ কাগজ।
অভ্রভেদী = আকাশ-ছোঁয়া, সুউচ্চ।
পর্বতশৃঙ্গ = পাহাড়ের চুড়ো।
সজলশ্যামল = জল-ভরা কালো রঙের।
টেবোটোবো = নাদুসনুদুস গোলগাল।

শব্দার্থ টীকা :
নধরনন্দন = সুপুষ্ট ও দেখতে ভালো।
পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় = দারুণ সূর্যতাপে কিংবা খরার দরুন জমিতে সরসতার অভাব ঘটার ফলে ফসল না-জন্মানোর অবস্থা।

(2)

আমার এই দরিদ্র চাষি প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে— কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।

(3)

সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের মূল আবশ্যক জিনিসও বন্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনামাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে-পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই,

সোশিয়ালিস্ট = একদল দার্শনিক যাদের মতবাদ হল : সামাজিক ভোগ্যবস্তুতে সমাজের সকলেরই সমান অধিকার।

শব্দার্থ ও টীকা

এর কোনো পথ নেই, তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায়, এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই। কিন্তু আবার এক-একবার রোদ্দুর উঠছে— পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে।

9.4 বিষয়ের রূপরেখা

9.4.1 বক্তব্যসার:

আকাশ-জুড়ে প্রচুর কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। মেঘের দাপটে চারপাশ থেকে সকালের রোদটুকু উধাও। জমাটবাঁধা মেঘের আয়োজন আর বাতাসের জোলো ভাব থেকে বোধ হচ্ছে এখনই বৃষ্টি নামল বলে।

মন্তব্য :

চিঠিলেখার তারিখ মে মাসের। গ্রীষ্মঋতু হলেও আগের দিন জোর বৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকালেও আবার বর্ষণের তোড়জোড় চলছে। পত্রলেখক তাই মেঘের দেবতার এ হেন আচরণে অপ্রসন্ন হয়েছেন।

এই পাঠ্যাংশে ‘ফুলো ফুলো’ ‘বড়ো বড়ো’ ‘কাঁদো কাঁদো’ ‘ভিজে ভিজে’ এমন শব্দদ্বৈত (অর্থাৎ একই শব্দকে পরপর দু-বার ব্যবহার করা) দিয়ে বহুবচনের ভাব বোঝানো হয়েছে। এই ধরণের শব্দদ্বৈতের সাহায্যে কোনো বিশেষ্যের কিছু গুণ বা প্রকৃতি বা অবস্থার কথা বলা হয়। যেমন, প্রথম বাক্যের ‘বড়ো বড়ো’ শব্দদ্বৈতটি মেঘ-এর প্রকৃতি নির্দেশ করছে— প্রচুর বিশাল আয়তনের মেঘ।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.1

অনুবিভাগ - ১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন—
   (ক) কাঁচা (i) .... রোদ্দুরটুকু যেন মোটা মোটা (ii) .... দিয়ে একেবারে (iii) .... তুলে নিয়েছে।

২) কোন জিনিসকে ‘ফুলো ফুলো’ ‘বড়ো বড়ো’ বলা হচ্ছে?

৩) বাতাসকে কেন ‘কাঁদো কাঁদো ভিজে ভিজে’ বলা হয়েছে?

9.4.2 আমার এই দরিদ্র . . . সমস্ত ভুলে যায়।

বক্তব্যসার:

গ্রামবাংলার চাষিরা শুধু বৃষ্টির জলের উপর ভরসা করেই ফসল ফলানোর কাজে নামে। তাই আকাশের জল আর সূর্যকিরণ যাতে ঠিকমতো পাওয়া যায় সেজন্য তারা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে। কোনো কারণে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটলে কিংবা শস্যহানি হলে তাদের হা-হুতাশ করা ছাড়া গতি থাকে না। তারপর আবার

যেই একটু সুরাহা হয় অমনি তারা ছেড়ে-আসা দিনগুলির করুণ অবস্থার কথা ভুলেই যায়।

মন্তব্য :

চিঠির গোড়ায় লেখক আকাশে মেঘের আনাগোনা আর জল-ভরা বাতাসের বর্ণনাটি সুন্দরভাবে দিয়েছেন। কিন্তু শুধু প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর মন আটকে থাকেনি, এই সময়ে তাঁর গরিব প্রজাদের অবস্থা নিয়েও তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সুউচ্চ শিমলা পাহাড়ে মা-বাবার সঙ্গে অবকাশ যাপন করছে যে পত্র-প্রাপক তাকে তিনি সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে গ্রামবাংলার প্রভূত পার্থক্যের কথা শোনাচ্ছেন। বলছেন নিম্নভূমির গরিব কৃষককুলের দুরবস্থা সেখানে বসে উপলব্ধি করা সহজ নয়। এখানকার চাষিদের শস্য ফলাবার জন্য আকাশের দয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়। উনিশ শতকের প্রায় অন্তিম লগ্নে যখন এই পত্র লেখা হচ্ছে তখন পরাধীন ভারতে ফসলখেতে সেচ বা সারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। চাষিদের জীবনযাত্রা ছিল দুঃসহ। কিন্তু কোনোক্রমে একটুমাত্র সুখের উদয় হলেই তাদের আর আগেকার দুঃখময় অবস্থার কথা মনে থাকে না।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.2

১) ঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন—

(ক) ‘বিধাতার শিশুসন্তানের মতো’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে:

(i) শিমলার অধিবাসী, (ii) পল্লির দরিদ্র চাষি প্রজা

(খ) প্রজাদের প্রতি পত্রলেখকের মনোভাব কীরকম :

(i) তারা মায়ার পাত্র, (ii) তারা সুখী মানুষ (iii) তারা প্রীতিভাজন

২) গ্রামের দীনদুঃখী মানুষ কীভাবে দিন কাটায়?

৩) ‘পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়’— এই বাক্যবন্ধের দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

9.4.3 সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত . . . যথেষ্ট জমে আছে।

বক্তব্যসার :

সোশিয়ালিস্ট বা সমাজতন্ত্রীরা চায় পৃথিবীজুড়ে মানুষের মধ্যে বিত্তের সমবণ্টনের ব্যবস্থা কায়েম করতে। বাস্তবে যদি সেটা কখনও না সম্ভব হয়ে ওঠে তবে তা মানবসমাজের পক্ষে বড়োই দুর্ভাগ্যের। অন্যদিকে কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে সারা পৃথিবীতে সবার জন্য জীবনধারণের অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির বণ্টন নিতান্তই অসম্ভব কল্পনাবিলাস। শেষোক্ত মতানুসারে বেশিরভাগ মানুষকেই চিরকাল আধপেটাই থেকে যেতে হবে। এটা অতি ভয়াবহ কথা। আসলে, দারিদ্র্য দূরীকরণ আর সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা খুবই জরুরি। আকাশে মেঘ ছেয়ে থাকাই একমাত্র ঘটনা নয়, আবার তো ঝলমলে রোদের দেখাও মেলে।

মন্তব্য :

দরিদ্র প্রজাবর্গের নিদারুণ দুঃখজর্জর দশায় লেখক গভীরভাবে মর্মাহত। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে সর্বজনের জন্য ধনের সমবণ্টন আর সুযোগসুবিধার সমানাধিকার নিয়ে যা বলা হয়েছে তার দিকে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি একান্তভাবে চান একদিকে দুঃসহ দারিদ্র্য আর অন্যদিকে সমাজের শ্রীসৌন্দর্য বৃদ্ধির এই বৈষম্যের

অবসান। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে লেখক আশার আলো দেখতে পান।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.3

১) খোপের মধ্যে দেওয়া শব্দগুলি থেকে বাছাই করে নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ বসান—

(i) দুঃখ—	(v) নিষ্ঠুর—
(ii) হতভাগ্য—	(vi) উচিত—
(iii) আবশ্যক—	(vii) ক্ষুদ্র—
(iv) উন্নতি—	(viii) সীমা—

> সৌভাগ্যবান, অবনতি, বৃহৎ, সুখ, অনুচিত, সদয়, অসীম, অনাবশ্যক।

২) অর্থ লিখুন —

অর্ধাশন—

বিধির বিধান—

নিরুপায়—

দৃশ্যপট—

সজলশ্যামল—

৩) দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখমোচনের কী উপায় হতে পারে বলে লেখক মনে করেন?

৪) কোন্ মতবাদকে লেখক ‘ভারী কঠিন কথা’ বলেছেন?

৫) ‘দুঃখমোচনের জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে’— লেখকের এই বক্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানান।

9.6 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলার পল্লিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারা;
2. গ্রামীণ দরিদ্র জনসমাজের জীবনযাপন বিষয়ে পরিচিত হওয়া;
3. দীনদুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া;
4. মানুষের দুঃখমোচনে প্রয়াসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা;
5. লেখার গুণে একটি চিঠিও যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে তা বুঝতে পারা।

পাঠান্ত প্রশ্ন

1. বৃষ্টি আসার আগে আকাশের ভাব আর হাওয়ার অবস্থা কেমন হয় তা বর্ণনা করুন।
2. 'এখানে এই মেঘ-রৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর'— এই বাক্যাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
3. 'সোসিয়ালিস্ট'দের বক্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী মতামত দিয়েছেন?

9.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

9.1

১) (i) সোনালি (ii) ব্লটিংপ্যাড (iii) চুপসে

২) আকাশের মেঘকে। বিশাল আকারে জল-ভরা মেঘের রাশি সারা আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে।

৩) বাতাসে প্রচুর জলকণা রয়েছে।

9.2

১) (ক) (i) (খ) (i)

২) তারা খুবই গরিব। ঠিকমতো বৃষ্টি হয়ে জমি চাষের উপযোগী হলে তবে তাতে ফসল ফলিয়ে তারা কোনোমতে খেয়ে-পরে বাঁচে।

৩) জলহীন খরার অবস্থা

9.3

১) (i) সুখ, (v) সদয়, (ii) সৌভাগ্যবান, (vi) অনুচিত, (iii) অনাবশ্যক, (vii) বৃহৎ, (iv) অবনতি (viii) অসীম

২) শব্দার্থ দেখুন।

৩) এজন্য সমাজের উন্নত অংশকে অবিরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৪) মতবাদটি হল : পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণধারণের জন্য জরুরি জিনিসগুলি ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেহাতই অসম্ভব ব্যাপার।

৫) আপনার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন।

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১ — ৭ আগস্ট ১৯৪১)-এর জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা-র নাম সারদা দেবী। বিশ্বজোড়া তাঁর স্বীকৃতি। এই জন্য তাঁকে বিশ্বকবি বলা

শব্দার্থ ও টীকা

হয়। তাঁর প্রতিভাস্পর্শে বাংলাভাষার মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছে। ভারত আর বাংলাদেশ দুটি রাষ্ট্রেরই জাতীয় সংগীত তাঁর রচিত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল কথা হল প্রথাগত পদ্ধতির বদলে আনন্দময় পরিবেশে বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর অনন্য কীর্তি। এই প্রতিষ্ঠান পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তিনি প্রচুর কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে: কাব্য— নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, কল্পনা, পূরবী, শেষ সপ্তক; উপন্যাস— গোরা, চোখের বালি, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে; নাটক— বিসর্জন, ডাকঘর, রাজা, রক্তকরবী, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথের আর একটি চিঠি— তাঁর প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা—

সোলাপুর
অক্টোবর ১৮৮৫

আপনি তো সব-ডেপুটি সাহেব— বন্যার মুখে বাংলা মুল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন— আমরা কলকাতায় যাচ্ছি, সে খবর রাখেন কি? এই চিঠি এবং আমরা শুক্রবারের সকালের ডাকে কলিকাতায় বিলি হব। আমাদের প্রবাসের পালা সাঙ্গ করলুম— এখানকার অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস, উদার মাঠ, বিমল শান্তি, এসব পশ্চাতে রেখে সেই বাঁশতলার গলি, জোড়াসাঁকোর মোড়, সেই ছ্যাক্‌রা গাড়ির আস্তাবল, সেই ধুলো, সেই ঘড়্‌ঘড়্ হুড়্‌মুড়্ হইহই, সেই মাছি-ভন্‌ভন্ ময়রার দোকান, সেই ঘোরতর হিজিবিজি হ-য-ব-র-ল’র মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করতে চললুম। সেখানে তিন হাজার গির্জের চুড়ো, কলের চিমনি, জাহাজের মাস্তুল নীল আকাশে যেন গুঁতো মারতে উঠেছে; কলকাতা তার সমস্ত লোষ্ট্রকাষ্ঠ দিয়ে প্রকৃতিকে গঙ্গা পার করেছে— তার উপরে আবার এক পাঁচিল দেওয়া নিমতলার ঘাট, মানুষের মরেও সুখ নেই। এখানে আমরা ক’জনে মিলে অশোক-কাননের নীড়ের মধ্যে ছিলুম, সেখানে একপ্রকার ইঁটের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম। সেখানকার সেই লক্ষ লক্ষ কয়েদির সঙ্গে municipality-র দুর্গের মধ্যে বন্দি হতে চললুম। শুনে সুখী হলেন তো?

এতদিন ভুলে ছিলেম, কিন্তু আজ আবার আমার সেই পর্দা-টানা ঘোমটা-দেওয়া ঘরটি মনে পড়ছে। কিন্তু কোথায় আপনি, কোথায় আপনার সেই ছাতা, পাপোশ-শয্যায় শয়ান সেই পুরাতন জুতোযুগল! আমার সেই হৃষ্টপুষ্ট বিরহিনী তাকিয়া— সে কি আমাদের বিরহে রোগা হয়ে গেছে, আমি তাই ভাবছি। আমার বইগুলো কাঁচের অন্তঃপুর থেকে চেয়ে আছে— কিন্তু কার দিকে চেয়ে আছে? আমার শূন্যহৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করে না। আমার সেই ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে, সে বড়ো একটা কাউকে খাতির করে না, সে কেবল সময়ের পদচিহ্নের হিসেব রাখতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমার সেই হারমোনিয়ম! সে আপনার নীরব সংগীতের উপর বনাত মুড়ি দিয়ে ভাবছে, ঘড়িটা ব্রাকেটের উপরে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি তাল দিয়ে মরছে কেন? দেয়ালগুলো তাকিয়ে আছে— ভাবছে, ঘরের প্রধান আসবাবটা গেল কোথায়? কলকাতার সেই জনতাসমুদ্রের মধ্যে আমার সেই বিরহান্ধকার ঘরটিই কেবল বিজন। তার সেই রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠছে, রবিবাবু—উ—উ—উ।

রবিবাবু আজ এখান থেকে সাড়া দিচ্ছেন, এই যা—আ—আ—ই।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না? আপনি কি এখন ইহজন্মের

মতো সব-ডেপুটিপুরে প্রয়াণ করলেন? শীঘ্র আর মুক্তির ভরসা নেই? আইনের গলগ্রহ গলায় বেঁধে আপনি কি তা হলে সর্বিস-সরোবরে একরকম ডুব মারলেন? যাক্, তা হলে আপনার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে আমরা আশমানে বিহার করি আর বলাবলি করি, 'আহা, শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'

শব্দার্থ ও টীকা

10

সব্যসাচী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

10.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন আনন্দমঠ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেন দেশবাসীর মনে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় দেন 'গোরা', 'চার অধ্যায়' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। পরাধীন জাতির মানুষের কাছে বিপ্লবীর স্থান সবার আগে। দেশের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন অনিশ্চিত বিপর্যয়ের বুকে। দেশপ্রেমের যে আগুন বিপ্লবীদের বুকে জ্বলতে থাকে তাকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করতে চান বিদেশি শাসককে, মুক্তিপথের সমস্ত অন্তরায়কে।

অন্তরায় = বাধা।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি পরাধীন ভারতের বিপ্লবী আদর্শ ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত প্রাণ এক আদর্শ বিপ্লবী। এমন অসাধারণ ও বিরল চরিত্রের বিপ্লবীকে অবিশ্বাস্য অসম্ভব চরিত্র বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এ যে কতবড়ো সত্য তা ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের রোমাঞ্চকর জীবনধারাই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বিরল = খুব কম পাওয়া যায়।

'সব্যসাচী' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের অংশবিশেষ। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

সব্যসাচী কথার অর্থ যার দু-হাত সমানে চলে। মহাভারতে অজুর্নের এক নাম সব্যসাচী। লেখক বলেছেন, সব্যসাচীর শুধু দু-হাত নয় এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি সমান বেগে চলে। সমস্ত রচনাংশ জুড়ে সব্যসাচীর অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য কর্মকৃতির পরিচয় নামকরণকে সার্থক করেছে।

কর্মকৃতি = কাজ।

10.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পাঠ করে আপনারা

- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- উপলব্ধি করতে পারবেন মুক্তিপথের সমস্ত অন্তরায়কে;
- বুঝতে পারবেন মানব জীবনের যথার্থ গৌরব ও সার্থকতা কী ও কোথায়;
- ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের ধরার জন্য কী ব্যবস্থা ছিল—সে কথাও আপনারা জানতে পারবেন;

10.3 মূল পাঠ

(1)

সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাক = ধুতি পাঞ্জাবি চাদর প্রভৃতি।
মুরুব্বি = অভিভাবক।
ইঁহার প্রসাদে = এঁর দয়ায়।

অপূর্ব্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলা দেশের একজন বড় পুলিশ কর্ম্মচারী। অপূর্ব্বর পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরুব্বি। নিমাইবাবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন এবং সেই সূত্রে অপূর্ব্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশী যুগে অপূর্ব্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহার প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর-দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েচে আর আমাকে হ'তে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত আফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

সংবর্ধনা = অভ্যর্থনা।
মর্জি = ইচ্ছা।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতো দূরে আসতে হয়েচে ; তাঁর মর্জ্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবারও সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কি না তাই ভাবছি।

চার্জ = অভিযোগ।
পিনাল কোড = বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির আইন।
কোহিনুর = অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন বিশেষ।

অপূর্ব্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেচেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয় একথা কেউ ঠিক জানে না! এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ, যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এত বড় গভর্ণমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল।

(2)

পোলিটিক্যাল আসামী = রাজনৈতিক কারণে আসামী।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও এক সময়

বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝা যায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বার্মা মুলুকে পদার্পণ করেচেন। এখন ম্যান্ডালে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করচেন, সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সেকথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রু মিত্র সকলের মনেই তাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্য্যন্ত, এজন্মে যে এর আর পরিবর্ত্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এ দেশে এসে কোন্ পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এসব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে সাতাশ বছরের পেন্সানটি ত মারা যাবেই হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে ঘটতে পারে।

অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখন শুনেচি মনে হচ্চে না!

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জ্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই এর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারচো না। আর কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজ-শত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুণায় এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর এক দফা তিন বচ্চর জেল খেটেচেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেচে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে, —এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান, কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্ব্বাঙ্গের শিরা দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েচেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, না আছে কোন ঘর-দোর,—বাপরে বাপ! আমরাও তা এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

(3)

অপূর্ব্ব সহসা কথা বলিতে পারিল না,—শিরার মধ্য দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব্ব কহিল, ধরুন, পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষ মুহূর্ত্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তাহলে?

শব্দার্থ ও টীকা

রাজবিদ্রোহী = রাজার কর শাসনের প্রতিবাদকারী।

সুগুপ্ত = বিশেষ গোপনীয়।

পদ্মানদী = বাংলার বিখ্যাত এক নদী।

চট্টগ্রাম = পূর্ব বাংলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

মুলুকে = অঞ্চলে।

মাণ্ডাল = মান্দালয় (বার্মায় অবস্থিত)।

রেঙ্গুন = ব্রহ্মদেশের (মায়ানমারের) রাজধানী।

পঞ্চভূতে লীন = মৃত্যু হওয়া।

সম্যক = ঠিকভাবে।

পুণা = মহারাষ্ট্রের একটি শহর।

সিঙ্গাপুর = মালয় উপ-দ্বীপের দক্ষিণের একটি শহর।

তাস-পাশা খেলার সামিল = অতিশয় সহজ ব্যাপার।

রিক্রিয়েশান = আনন্দ।

অ্যারেস্ট = (ইং শব্দ) গ্রেপ্তার।

শব্দার্থ ও টীকা

চোখে চোখে রাখা = তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবার হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ করার মূল্য বেশি,—এই ত সম্প্রতি গভর্ণমেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ, তিনি যাই হোন। তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। কহিল, এর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে?

এইটিই ভারি আশ্চর্য্য বাবা। এত বড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই বলা যায় না অপূর্ব্ব। এঁরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এঁরই ভুল কি আমাদের ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।

সর্ব্বান্তঃকরণে = সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে।

অপূর্ব্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু।

জেটি = স্টীমার, জাহাজ নোঙর করার নির্দিষ্ট জায়গা।
দ্রুতপদে = তাড়াতাড়ি পায়ে।
উপক্রম = উদ্যত।

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে একথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিস? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সামনের জেটিতেই বোধহয় এদের স্টীমার লাগে,—আচ্ছা তোমার আবার অফিসের সময় হয়ে এল, নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ অফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চিনে। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

(4)

ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ সকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব্ব। এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

মুচকিয়া হাসিলেন = মৃদু হাসলেন।
সঞ্চিত = জমা।
ইরাবতী = বর্মার একটি নদী।
ইঙ্গিত = ইশারা।
নিমিত্ত = জন্য।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেননি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেচেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই মনে করিয়া অপূর্ব্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টীমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ- সাতজন পুলিশ-কর্ম্মচারী সাদা পোষাকে পূর্ব্ব

হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্ম্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে-চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াতেই অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই, হয়ত ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক-চক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্ব্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপ্‌সা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে, এত নর-নারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা নাই, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয় ; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ও শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

(5)

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানব ত সে কি পালায়? প্রায় শ তিনেক যাত্রী, বিশ- পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ-দেড়েক হবে, বাকি বর্মী—সে যে কার পোষাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা না জানন্তি—বুঝলে না বাবাজি—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন-কয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্য্যন্ত,—সে নয়। যাবে না কি

শব্দার্থ ও টীকা

করতলগত = হাতের মুঠোয়।
প্রচ্ছন্ন = গোপন।
দীপ্তি = উজ্জ্বলতা।
খালাসীরা = জাহাজের মালপত্র ওঠানামার কাজ করে যারা।
উদ্‌গ্রীব = খুব আগ্রহী।
ব্যগ্রতা = ব্যস্ততা।
উৎসুক = আগ্রহী।
দুর্গম = যাওয়া যেখানে দুঃসাধ্য।
গুরুভার = কঠিন দায়িত্ব।
মুক্তি পথের অগ্রদূত = অগ্রগামী নেতা যিনি দেশকে মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
উচ্ছ্বসিত = উচ্ছলিত।
অবিচ্ছিন্ন = ক্রমাগত।
গণ্ড = গাল।
দেবা না জানন্তি = দেবতাও জানেন না।
জো = উপায়।

শব্দার্থ ও টীকা

বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্ব্বর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম, আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুঁজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্ত্তব্য করতে এসেচেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েচে, হয়েচে। চল, একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্চে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

তোরঙ্গ = বাক্স।
তদারক = পরীক্ষা।

পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট = রাজনৈতিকভাবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হল-ঘরে জন-ছয়েক বাঙালী মোটঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তর-ব্রহ্মে বর্ম্মা-অয়েল কোম্পানীর তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানে জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল।

(6)

সংসারের মিয়াদ = বাঁচার সময়ের পরিধি।
দুরারোগ্য = সেরে ওঠা দুঃসাধ্য।

লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্ব্বল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে সংসারের মিয়াদ আর তাহার দীর্ঘদিন আছে, ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা, কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন, এ সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহার কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না—কেবল এই জন্যেই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু সখ ষোল আনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ব্ব?

তৈল নিষিক্ত = তৈলাক্ত।

উত্তরীয় = চাদর।

এতক্ষণে অপূর্ব্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি—অপর্য্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত কঠিন রুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু-রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি, তাহার বুকপকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরণে বিলাতি মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি, পায়ে সবুজ-রঙের ফুল-মোজা। হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ করা পাম্প-শু, তলাটা

মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি,—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে— ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই ছেড়ে দিন— যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব্ব কহিল, আর যাই হোক, যাকে খুঁজচেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে, গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স-বিছানা ত খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁক এবং পকেটে কি আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

জগদীশবাবু এইসময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কলকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেচেন। দেখি বাবা তোমার হাতটি? এই বলিয়া সেই প্রবীণ, সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী মহাপাত্রের ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, অনেক গাঁজা তৈরির চিহ্ন এইখানে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে,—এই ত তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললেই দিই,—এই মাত্র। নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দিই, নিজে খাইনে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা ; তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল-ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্ম্মায় এসেচে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে!

বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাহার ভাঙা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীর মন্থর পদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

ধকলে = কাজের চাপ।

কালচার (culture) = সংস্কৃতি, রুচিবোধ

খানাতল্লাসী = আপত্তিকর জিনিসের অনুসন্ধান।

ফুটরুল (foot rule) = একফুট লম্বা মাপকাঠি।

সদাশয় = উদার।

অঙ্গুষ্ঠ = বুড়ো আঙুল।

বিদ্যমান = বর্তমান।

মাইরি = শপথ।

মেল-ট্রেন = ডাক বহন করে যে ট্রেন।

ওয়াচ (watch) = পাহারা।

মন্থর = ধীর।

প্রস্থান = চলে যাওয়া।

শব্দার্থ ও টীকা

10.4 বিষয়ের রূপরেখা

10.4.1 অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল .... হিমসিম খেয়ে গেল।

বক্তব্যসার:

রেঙ্গুনে চাকরি করছে বাঙালি যুবক অপূর্ব। একদিন সে দেখল সাধারণ ভদ্র বাঙালির পোশাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন বাংলাদেশের এক জবরদস্ত পুলিশ কর্মচারী। অপূর্বর যিনি পূর্ব পরিচিত। অপূর্ব তাঁকে নিমাইকাকা বলে সম্বোধন করে। নিমাইবাবুর সঙ্গে অপূর্বর কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। অপূর্বর বাবা ছিলেন নিমাইবাবুর বন্ধু, তিনিই নিমাইবাবুর চাকরি করে দিয়েছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাবশে ছাত্রজীবনে স্বদেশি করে অপূর্ব ধরা পড়লেও নিমাইবাবু তাকে শাস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। নিমাইবাবু অপূর্বর বাবাকে দাদা বলতেন। তাই অপূর্বরা সবাই তাঁকে নিমাইকাকা বলে ডাকত।

নিষ্কৃতি = রেহাই

অপূর্ব রেঙ্গুনে চাকরি পাবার সংবাদ নিমাইবাবুকে জানায় এবং জিজ্ঞেস করে জানতে পারে নিমাইবাবু এখানে এক বিপ্লবীকে তাঁর ভাষায় 'মহাপুরুষ'কে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। বিপ্লবীটির ফটোগ্রাফ, বিবরণ সবকিছু পুলিশের হস্তগত। তবু তাঁকে ধরা বড়ো শক্ত। কারণ বিপ্লবীদের জীবন, কাজকর্ম, গতিবিধি সবই রহস্যময়। তাই নিমাইবাবু বিপ্লবী সব্যসাচী সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি যে কী এবং কী নয়, তা বলা শক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো চার্জ নেই, অথচ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নেপথ্যে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তাই পুলিশের ভাষায়, তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জ আছে তা পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে গভর্নমেন্ট নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

মন্তব্য:

মহাপুরুষ বলতে আমরা সেরকম ব্যক্তিকেই বুঝি যিনি অপরের জন্য নিবেদিত প্রাণ। দেশপ্রেমী সব্যসাচী লৌকিক অর্থে সাধু-সন্ত বা মোক্ষকামী নন।

স্বদেশী যুগ = ১৯৩০ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাই-ই হল স্বদেশি আন্দোলন। বাংলার মানুষ সোচ্চার হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বহু তরুণ এ আন্দোলনে অংশ নেন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়াস ছিল। সেই আন্দোলনের যুগকেই স্বদেশি যুগ বলে।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.1

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন:**

তিনিই ছিলেন ইঁহার ____________। নিমাইবাবু তাঁহাকে ____________ বলতেন এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে ____________ বলিয়া ডাকিত।

২. **একটি বাক্যে উত্তর করুন:**

(ক) নিমাইবাবু কে?

(খ) অপূর্বর সঙ্গে নিমাইবাবুর যখন দেখা হল, তখন তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

(গ) তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে।—কার মর্জির ওপর?

৩. **সংক্ষেপে উত্তর দিন:**

(ক) 'পুলিশের বাবার সাধ্য নেই তাঁর গায়ে হাত দেয়।'—'পুলিশের বাবার সাধ্য নেই' কথাটিতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(খ) 'সব্যসাচীকে পিনাল কোডের কোহিনুর'— কোহিনুর কী?

(গ) 'স্বদেশী যুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহার প্রসাদে।'—'ইঁহার প্রসাদে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

10.4.2 অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল .... বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

বক্তব্যসার:

সব্যসাচী প্রতিভাবান এক বিপ্লবী। সাধারণ এক পোলিটিক্যাল আসামি তিনি নন। তিনি রাজার শত্রু, রাজবিদ্রোহী। অর্জুনের মতো তাঁর শুধু দুই হাতই সমান চলে না, দশ ইন্দ্রিয়ই সমান সজাগ। বন্দুক পিস্তলে এঁর লক্ষ্য অভ্রান্ত। পদ্মানদী তিনি সাঁতরে পার হন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের পাহাড় ডিঙিয়ে বর্মায় এসেছেন। আর খবর পাওয়া গেছে তিনি মান্দালয় থেকে রেঙ্গুনে আসবেন—জলপথে অথবা স্থলপথে। নিমাইবাবু অপূর্বকে জানালেন যে সব্যসাচী পুনায় একবার তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে আর-একবার তিন বছর জেল খেটেছেন।

সব্যসাচী সম্পর্কে নিমাইবাবুর তথ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন শিক্ষিত এবং সর্ববিদ্যা- বিশারদ। তিনি দশ-বারোটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। পৃথিবীর অনেক দেশে তিনি থেকেছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। জার্মানি থেকে ডাক্তারি, ফ্রান্স থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, বিলেত থেকে আইন এবং আমেরিকা থেকেও অন্য কোনো ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। এগুলো সবই ছিল তাঁর কাছে তাস-পাশা খেলার মতো সহজ ব্যাপার।

সাধারণত বাঙালিদের অলস, ভীরু প্রকৃতির বলে একটা বদনাম আছে। নিমাইবাবুর মতে সেই অর্থে সব্যসাচী সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী চরিত্র।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

গৃহমুখী এবং কর্মবিমুখ বলে বাঙালি চরিত্রের যে অপবাদ রয়েছে তা হয়তো দূর হতে পারে সব্যসাচী চরিত্রের ভূমিকায়। নিমাইবাবু পেশায় স্বদেশিদের শত্রু হলেও তাঁর অন্তরে ছিল তাঁদের প্রতি গোপন সমর্থন ও শ্রদ্ধা। অপূর্ব স্বয়ং সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তাঁরই অনুগ্রহে সে মুক্তি পায়। সব্যসাচীর গুণপনার তিনি সঠিক মূল্যায়ন করেন ব্যাজস্তুতির ভঙ্গিতে। সব্যসাচীর অগাধ পাণ্ডিত্য, বহু ভাষায় পারদর্শিতা, দুর্গম পথে অভিযানের সফলতা এবং ব্রিটিশ রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করার কাহিনি তিনি যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাতে বেশ বোঝা যায় তিনি সব্যসাচীর মতো বীর যোদ্ধার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল।

ব্যাজস্তুতি = ব্যঙ্গের আড়ালে গভীর অর্থ।
পর্যুদস্ত = পরাস্ত।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.2

১. **ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:**

সব্যসাচী আইন পাশ করেছে—জার্মানিতে / ফ্রান্সে / বিলেতে।

২. **একটি বাক্যে লিখুন:**

(ক) সব্যসাচীকে রাজবিদ্রোহী বলা হয়েছে কেন?

(খ) সব্যসাচী সিঙ্গাপুরে কত বছর জেল খেটেছেন?

(গ) কোন্ নদী সব্যসাচী সাঁতার কেটে পার হন?

(ঘ) 'বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে'—কার প্রতিভা প্রশংসাযোগ্য মনে করা হচ্ছে?

৩. **উত্তর সংক্ষেপে দিন:**

(ক) 'কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না'—ছেলেটি সম্পর্কে বক্তা এরকম মন্তব্য করেছেন কেন?

(খ) 'এ সব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না।'—বক্তা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন কেন?

(গ) 'এ সব বোধ করি এঁর তাস-পাশা খেলার সামিল'—তাস-পাশা খেলার সামিল বলা হল কেন?

10.4.3 অপূর্ব সহসা কথা বলিতে পারিল না .... তবুও তো একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

বক্তব্যসার:

সব্যসাচীকে অ্যারেস্ট করা নিমাইবাবুর উদ্দেশ্য কি না অপূর্ব জানতে চায়। নিমাইবাবু বলেন, 'আগে তো সন্ধান পাওয়া যাক। সরকারের কাছে ধরার চেয়ে ওয়াচ করার মূল্য বেশি।'

সব্যসাচীর বয়স তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে হবে। দেখতে সে একেবারেই সাধারণ মানুষ। চেহারায় কোনো ভয়ংকরত্ব নেই। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসার পিছনে ধরা পড়ার আশঙ্কা কারণ হিসাবে থাকতে পারে অথবা পথটা চিনে রাখার মতলবও থাকতে পারে। এসব মানুষরা সোজা হিসেবের পথের পথিক নয়। এমনও হতে পারে তাকে ধরা গেল না—ব্যর্থ হল সব ছোটাছুটি। নিমাইবাবুর এসব কথা শুনে অপূর্ব জানায়—'ভগবান করুন, যেন তাই হয়।' নিমাইবাবু হেসে স্নেহের সুরে মৃদু ধমক দিয়ে অপূর্বকে বললেন, পুলিশের কাছে এমন কথা বলতে নেই। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে অপূর্বকে তিনি এবার নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত না দেখে অপূর্ব চলে যেতে চাইল না।

মন্তব্য:

সমাজে দু রকমের মানুষ আছে। একদল অতি সাধারণভাবেই জীবনযাপন করে সন্তুষ্ট থাকে। তারা নিজেদের ছোটো সংসারেই থাকে আবদ্ধ। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই তাদের লক্ষ্য। এ ধরনের বিষয়ী মানুষেরা জীবনকে সহজভাবে সোজাপথে দেখতেই অভ্যস্ত। সংসার জীবনে যোগ-বিয়োগের হিসেব কষে লাভের দিকেই এদের সমস্ত ঝোঁক।

আর দ্বিতীয় দলের মানুষ হচ্ছেন সব্যসাচী জাতীয় অসাধারণ মানুষেরা। তাঁরা সর্বত্যাগী ঋষির মতো। ব্যক্তিস্বার্থ, সংকীর্ণ গৃহকোণ—এঁদের কাছে কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। দেশের জন্য, দশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এমনকি জীবন বিসর্জন দিয়েও এঁরা নিজেদের ধন্য মনে করেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মাপকাঠি দিয়ে এঁদের মূল্যায়ন করা যায় না কখনও। এঁদের জীবনে চলার পথ কণ্টকময়, আত্মত্যাগই এঁদের জীবনের চরম ব্রত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 10.3

১. **একটি বাক্যে লিখুন:**

(ক) 'না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়'—কোন্ বিষয়টিকে সহজ বস্তু নয় বলা হয়েছে?

(খ) এই ত সম্প্রতি গভর্নমেন্টের ধারণা—কোন্ গভর্নমেন্ট?

(গ) সব্যসাচীর বয়স কত?

(ঘ) ভগবানের কাছে অপূর্বর প্রার্থনাটা কী?

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:**

(ক) 'তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত।'—চেনা ও ধরা শক্ত কেন?

(খ) 'সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এঁদের হিসেব মেলে না।'—'সহজ মানুষের সোজা হিসেব' বাক্যাংশটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) 'শিরার মধ্য দিয়া তাঁহার যেন আগুন ছুটিতে লাগিল।'—'আগুন ছুটিতে লাগল' বলে আসলে কী বোঝানো হয়েছে?

10.4.4 ইচ্ছা না থাকিলেও .... যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

বক্তব্যসার:

জাহাজ এসে জেটিতে লাগতেই সুরু হয়ে গেল চারপাশের কোলাহল। যাত্রীদের কলরবে, খালাসিদের ব্যস্ততায় তখন মুখরিত জাহাজঘাট। বিদ্রোহী শিকারের আনন্দ আর উত্তেজনা পুলিশবাহিনীর চোখেমুখে। খালাসিরা জেটির ওপর দড়ি ছুঁড়ে ফেলছে। জেটির গায়ে জাহাজ লাগলে নিমাইবাবু দলবল নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দু ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা একে একে নেমে আসছে। অপূর্ব কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল পাথর হয়ে। পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহীকে সে মনে মনে শত কোটি প্রণাম জানায়। অচেনা অজানা বিপ্লবী মানুষটি এবার শৃঙ্খলিত হবেন, সকলের সামনে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে—এ কথা ভেবে অপূর্ব আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। চোখ থেকে অজস্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে। গাল দুটো তার ভিজে যায়। এমন সময় নিমাইবাবু জানালেন তাঁর আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। ধরা গেল না সব্যসাচীকে। সে পালিয়েছে।

মন্তব্য:

স্বদেশিযুগে এক অর্থে প্রায় সমস্ত বাঙালি যুবকই ছিল বিপ্লবী—কেউ ছিল সক্রিয় কর্মী, অন্যেরা জানিয়েছে নৈতিক সমর্থন। অপূর্বও ছিল এদের দলে। ছাত্রজীবনে স্বদেশি দলে যোগ দিয়েও শাস্তির হাত থেকে সে বেঁচে গেছে নিমাইবাবুর কৃপায়। তাই নিমাইবাবুর মুখে সব্যসাচীর দেশপ্রেম, ও অন্যান্য গুণের কথা শুনে তার মন শ্রদ্ধায় ভরে যায়। অপূর্ব তখন ভাবে জনসমক্ষে ধরা পড়ার পর কীভাবে তিনি অপমানিত হবেন, মানুষ বুঝতে পারবে না তাদেরই জন্য তাঁর এই নির্যাতন, তখন তার চোখ দুটি হয়ে উঠল—অশ্রুভারাক্রান্ত। লেখক শরৎচন্দ্র অপূর্বকে নরম- কোমল মনের মানুষ করেই এঁকেছেন। স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশবৎসলতা, সহানুভূতি-মমত্ব-সহমর্মিতা তার চরিত্রের অন্যতম গুণাবলি। সে ভাবপ্রবণ আবেগপ্রবণ ঠিকই, তবে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, মুক্তিপথের বীর

যোদ্ধার জন্য তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন একান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.4

১. একটি বাক্যে উত্তর দিন:

(ক) 'ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়'—কাদের কথা বলা হয়েছে?

(খ) 'রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে।'—তারা কী দেখছিল?

(গ) যা ভয় করেছিলাম তাই!—বক্তা কী ভয় করেছিলেন?

(ঘ) কোন্ নদীর জেটিতে স্টিমার এসে ভিড়ল?

২. অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন:

(ক) 'মুক্তিপথের অগ্রদূত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(খ) সব্যসাচীকে রাজবিদ্রোহী বলা হয়েছে কেন?

(গ) জাহাজ ঘাটের দৃশ্য দেখে অপূর্বর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল কেন?

10.4.5 কী করে পালালো? .... হাজির করা হইল।

বক্তব্যসার:

যার উদ্দেশ্যে নিমাইবাবুর এই অভিযান—যে জন্য রেঙ্গুনে তাঁকে ছুটে আসতে হল —তা তো সফল হল না। সে কী করে পালাল নিমাইবাবু জানেন না। তবে সন্দেহভাজন কয়েকজন বাঙালি যাত্রীকে 'সব্যসাচী' সন্দেহ করে জগদীশবাবু থানায় ধরে নিয়ে গেছেন। তারা সবাই উত্তর-ব্রহ্মে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেলের খনিতে কাজ করত। সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তারা কাজের সন্ধানে চলে এসেছে রেঙ্গুনে। এদের মধ্যে একজনের চেহারার সঙ্গে সব্যসাচীর চেহারার খানিকটা মিলও রয়েছে।

থানায় ওদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হবে না এ কথা জেনে অপূর্ব নিমাইবাবুর সঙ্গে থানার পথে পা বাড়াল। থানায় গিয়েই দেখল সন্দেহভাজন জনা দুয়েক লোক তাদের টিনের বাক্স আর ছোটো বড়ো পুঁটলি নিয়ে বসে আছে। জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাদের জিনিসপত্র তল্লাশি করে ফেলেছেন। কেবল একজনকেই রাখা হয়েছে আলাদা একটি ঘরে। নাম যার সব্যসাচী মল্লিক। এবার অন্যদের নাম ঠিকানা লিখে ছেড়ে দেওয়া হল আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সব্যসাচী মল্লিককে হাজির করা হল নিমাইবাবুর কাছে।

মন্তব্য:

সব্যসাচী কাহিনিটি ছোটো গল্প নয়, 'পথের দাবী' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ মাত্র। কিন্তু উদ্ধৃত এই অংশটি রচনানৈপুণ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হয়ে উঠেছে।

কাহিনিটির চমৎকারিত্ব দেশপ্রেমিক সব্যসাচীর চরিত্র বর্ণনায়। আর সে বর্ণনা এসেছে নিমাইবাবু ও অপূর্বর কথাবার্তার মাধ্যমে। নিমাইবাবু পুলিশের জবরদস্ত এক অফিসার। তিনি রেঙ্গুনে এসেছেন পিনাল কোডের

কোহিনুর অর্থাৎ অসংখ্য অপরাধে অভিযুক্ত রাজবিদ্রোহী সব্যসাচীকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু এ কাহিনির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নিমাইবাবুর বক্তব্যে রয়েছে সব্যসাচীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা— কখনও তা প্রকাশ পেয়েছে সরাসরি, আবার কখনও বা ভিন্ন কৌশলে নিন্দার ছলে তিনি আগাগোড়া সব্যসাচীর প্রশংসাই করে গেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.5

১. একটি বাক্যে লিখুন:

(ক) জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক কতজন ছিল?

(খ) 'লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে'—কোন্ লোকগুলো?

(গ) থানায় যাদের নিয়ে আসা হয়েছে তারা রেঙ্গুনে এসেছে কেন?

২. উত্তর লিখুন:

(ক) 'দেবা ন জানন্তি'—বাক্যাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

(খ) জগদীশবাবু কয়েকজন যাত্রীকে থানায় নিয়ে এসেছিলেন কেন?

10.4.6 লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল .... সোজা প্রস্থান করিল।

বক্তব্যসার:

গিরিশ মহাপাত্র থানায় প্রবেশ করল কাশতে কাশতে। বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়। যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। হাঁপাচ্ছিল সে। মনে হল কঠিন কোনো রোগে আক্রান্ত,ক্রমশ তার জীবনের মেয়াদ বুঝি শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি বড়োই আশ্চর্যের। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো বড়ো বড়ো, পেছনে আর কানের পাশে চুল নেই বললেই চলে। মাথায় চেরা সিঁথি, জবজবে তেল। লেবুর তেলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে। গায়ে জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের পাঞ্জাবি। বুক পকেটে বাঘ আঁকা রূমাল, পরনে বিলিতি মিলের কালো মখমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ি। পায়ে বার্নিশ করা পাম্পশু, হাতে হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের একটা ছড়ি।

তার বিছানা বাক্স তল্লাশি করে কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু ট্যাঁক থেকে বেরুলো এক টাকা ছ- গণ্ডা পয়সা আর পকেট থেকে পাওয়া গেল একটা লোহার কম্পাস, ফুট রুল, বিড়ি, দেশলাই আর একটি গাঁজার কলকে।

নিমাইবাবুর প্রশ্নের জবাবে সে জানায়—গাঁজা সে খায় না—পথে কলকেটা পেয়েছে—তাই রেখে দিয়েছে যদি কারও কাজে লাগে।

কিন্তু হাতে গাঁজা তৈরির চিহ্ন দেখে নিমাইবাবু তাকে তিরস্কার করেন।

তবু গিরীশ মহাপাত্র বলল—কেউ খেতে চাইলে সে সেজে দেয় বলেই আঙুলে তার দাগ হয়েছে।

নিমাইবাবু এবার জগদীশবাবুর অনুমতি নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু আরও কিছুদিন শহরটাকে নজর রাখা দরকার বলে জানালেন তিনি। এবার অপূর্ব বেরিয়ে যাবার জন্য উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গিরীশ মহাপাত্রও তার ভাঙা টিনের বাক্স ও চাটাই জড়ানো ময়লা বিছানা বগলে চেপে ধীর লয়ে উত্তর দিকের রাস্তা ধরে বেরিয়ে গেল থানা থেকে।

মন্তব্য:

সব্যসাচীই এ কাহিনির নায়ক। তাঁকে দেখতে না পেলেও নিমাইবাবুর বর্ণনায় তিনি আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মত্যাগের কথা, উপস্থিত বুদ্ধির কথা, সাহসিকতার কথা, দেশ- বিদেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা ডিগ্রি লাভের কথা আমাদের চমকে দেয়।

কাহিনির শেষ অংশে গিরীশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশে আমরা সব্যসাচীকে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর শৌখিন বেশ, মাথায় নেবুর তেলের গন্ধ, পকেটে গাঁজার কলকে নিয়ে মিথ্যাভাষণ হাস্যরসের এক অনবদ্য উদাহরণ।

এ কাহিনির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল সব্যসাচীর উপস্থিতিই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সে-ই এ কাহিনির প্রাণপুরুষ। সুতরাং কাহিনিটির নামকরণও যথাযথ ও সার্থক।

পাঠগত প্রশ্ন : 10.6

১. **পাঠ থেকে শব্দ নিয়ে ভুল সংশোধন করুন:**

লোকটি হাসিতে হাসিতে আসিল। বয়স কুড়ি-বাইশের অধিক নয়, কিন্তু যেমন রোগা তেমনি সবল।

২. **ঠিক চিহ্নে টিক (✓) চিহ্ন দিন:**

(ক) বুক পকেটের রুমালে কোন্ জন্তুর চিহ্ন আঁকা ছিল? (বাঘের / শিয়ালের / হাতির)

(খ) জুতো টিকসই করতে আগাগোড়া নাল বাঁধানো (স্টিলের / লোহার / কাঠের)

৩. **পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন:**

(ক) পায়ে ____________ রঙের মোজা।

(খ) বুড়োমানুষের ____________ শুনো।

৪. **সংক্ষেপে উত্তর লিখুন:**

(ক) গিরীশ মহাপাত্র নামে লোকটিকে সব্যসাচী বলে সন্দেহ করল কেন?

(খ) 'কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ করার দরকার নেই বড়বাবু'—তাকে কেন জানোয়ার বলা হয়েছে?

(গ) 'আর যাই হোক, যাকে খুঁজচেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।'—কালচার বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

10.5 আপনি যা শিখলেন

1. জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করা। কিন্তু সে পথে অনেক বাধা।

2. কূপমণ্ডুক ও ভীরু না হয়ে ঘরের সংকীর্ণ সীমার বাইরে যে বৃহত্তর কর্মময় জগৎ আছে সেখানে নিজেকে যুক্ত করতে হবে।

3. আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে দেশ ও দশের জন্য বিপদসঙ্কুল পথের পথিক হয়ে, আত্মবলিদানে প্রস্তুত

শব্দার্থ ও টীকা

থাকতে হবে।

4. প্রকৃত দেশপ্রেমিককে নানা বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে, নানা অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

10.6 : পাঠান্ত প্রশ্ন

অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন ঃ

1. লেখককে অনুসরণ করে সব্যসাচী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।
2. এ কাহিনিতে সব্যসাচীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও তাঁর নামেই কাহিনিটির নামকরণ করা হল কেন?
3. গিরীশ মহাপাত্রের চেহারা ও পরিচ্ছদের বর্ণনা দিন।
4. পিনাল কোড কী? সব্যসাচীকে পিনাল কোডের কোহিনূর কেন বলা হয়েছে?
5. পুলিশ অফিসার নিমাইবাবুর চরিত্র আলোচনা করুন।
6. 'তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত'—সব্যসাচীকে চেনা ও ধরা শক্ত কেন বুঝিয়ে দিন।
7. ব্যক্তিটির সব্যসাচী নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

10.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

10.1

১. মুরুব্বি, দাদা, নিমাই কাকা

২. ক। বড়ো পুলিশ কর্মচারী

খ। জাহাজ ঘাটে

গ। সব্যসাচী মল্লিকের

৩. ক। পুলিশের সমস্ত শক্তির অসাধ্য

খ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি

গ। কৃপায়

10.2

১. বিলেতে

২. ক। রাজার শত্রু

খ। তিন

গ। পদ্মা

ঘ। ছেলেটির নামকরণ যিনি করেছেন

৩. ক। বাঙালির ব্যতিক্রমী চরিত্র

খ। চাকরির নিরাপত্তা

গ। অবসর বিনোদনের মতো সহজ সরল

10.3

১. ক। গ্রেপ্তার করা

খ। ব্রিটিশ

গ। ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে

ঘ। ব্যর্থ ছোটাছুটি

২. ক। সাদামাঠা চেহারা, বহু ভাষাবিদ, ছদ্মবেশ ধারণে দক্ষ

খ। দেশের কথা ভুলে আত্মসর্বস্বতার জীবনে বিভোর

গ। উত্তেজনার আগুন

10.4

১. ক। পুলিশ কর্মচারী

খ। দড়ি ছোঁড়া

গ। ছোটাছুটি বৃথা

ঘ। ইরাবতী

২. ক। ইংরেজ শাসনের পতনের পথ প্রদর্শক

খ। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

গ। সব্যসাচীর কথা ভেবে

10.5

১. ক। প্রায় শ তিনেক

খ। থানায় টেনে আনা সন্দেহভাজন লোকগুলো

গ। অসুস্থতা, চাকরির সন্ধান

২. ক। পালানোর কারণ দেবতারও অজানা

খ। জেরা করবার জন্য

10.6

১. হাসিতে হাসিতে নয়, কাশিতে কাশিতে

কুড়ি-বাইশের নয়, তিরিশ-বত্রিশের

সবল নয়, দুর্বল

২. ক। বাঘের

খ। লোহার

৩. ক। সবুজ

খ। কথাটা

৪. ক। বাঙালি, চেহারার মিল, চোখের দৃষ্টি

খ। বৈচিত্র্যপূর্ণ চেহারা, বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্য

গ। শিক্ষাদীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভব্যতা-সভ্যতা

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) জন্মগ্রহণ করেন হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মা হলেন ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি / দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'। শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমর আসনেই আসীন শুধু নন, অন্য ভারতীয় ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনূদিত হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও পাঠকদের চিত্ত সমভাবেই জয় করেছে। তাঁর 'পথের দাবী' ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহের বাণী প্রচারের অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেছিল। অত্যন্ত জনপ্রিয় কয়েকটি গ্রন্থ তিনি লিখে গেছেন, যেমন—শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দত্তা, শেষ প্রশ্ন, নববিধান, পল্লীসমাজ, দেনা পাওনা প্রভৃতি।

তাঁর কালজয়ী গল্পগুলির মধ্যে রামের সুমতি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি প্রভৃতি শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ সমাজ-সচেতনতার দিশারী। 'নারীর মূল্য', 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি। ছোটোদের জন্যও বিশেষ রচনা তাঁর সাহিত্য-কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

সমধর্মী রচনা

(১) **‘চার অধ্যায়’**—লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) **‘জাগরী’**—লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী।

(৩) **‘ভুলি নাই’**—লেখক মনোজ বসু।

(৪) **‘বদনাম’**—গল্প, লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

11

অতীতের বোঝা

এস. ওয়াজেদ আলি

11.1 প্রস্তাবনা

ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। এই সভ্যতা বৈদিক যুগের।ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই বৈদিক যুগের উন্নত সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই কিছু গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তাই বলে অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই চলবে না। সভ্যতার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই নিজ নিজ জড়তা, অভিমান ত্যাগ করে একত্রে কাজ করতে হবে, তাহলেই জাতির পরিত্রাণ।

এই প্রসঙ্গে লেখক পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেমন গ্রিক, মিশরীয় এবং আরবীয়দের কথা বলেছেন। গ্রিকরাও একদিন উন্নতির শিখরে উঠেছিল। কিন্তু প্রাচীনের প্রতি মোহ তাদের পতন ডেকে আনে। পক্ষান্তরে আরব জাতি এক মেষপালক জাতি ছিল। হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের ফলে সেদেশে অগ্রগতি শুরু হয় এবং প্রায় ৪০০ বছর আরবীয় সভ্যতা উন্নতির শিখরে ছিল। এমনকি ইউরোপীয় সভ্যতা আরবদের সংস্পর্শে এসেই উন্নত হয়। তারপর তারা এগিয়ে চলে। কিন্তু প্রাচীনতার বাঁধ আরবদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক (বাধা) হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে বিভেদ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই গ্রাস করেছে। অতীতের বোঝা নিয়ে উভয়েই আজ বিভেদের জটাজালে আবদ্ধ।

11.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পড়ে আপনারা —

- জাতীয় সংহতি বিষয়ে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

11.3 মূল পাঠ

(1)

পুরাতত্ত্ববিদদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইংরেজদের পূর্ব-পুরুষেরা যখন নানা রকম রং মেখে সং সেজে উলঙ্গ শরীরে বন্য পশুর ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তখন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হত। এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই। কেউ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়লে তখনই কোনো না কোনো বিদ্যা-দিগ্‌গজ চোখ রাঙিয়ে উত্তর দেন, ''ওসব আর বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে না। ও-সব এবং আরও অনেকরকম জিনিস এদেশে ছিল। পরের কাছে শেখবার আমাদের আর কিছু নেই। যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক যুগে সবই ছিল। গোলযোগ ঘটেছে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুগে। তাই বলি আমাদের নূতন কিছু করতে হবে না, পুরোনো জিনিসগুলোর পুনরুদ্ধার করলেই সব চুকে যাবে।'' বক্তৃতার সঙ্গে কতগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিশমিশ মিশিয়ে পণ্ডিতমশায় নিরীহ শ্রোতার মানসিক ভোজনের মুখরোচক ব্যবস্থা করেন। শ্রোতা সাদাসিধা লোক, এত বক্তৃতা, এত শ্লোক আওড়ানো, হাত-পা নাড়া এবং মুখ ভেঙচানো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতর কিছু সার না থাকলে পণ্ডিত-প্রবর এতটা বাচালতা আর এতটা আত্মতুষ্টি কখনোই দেখাতে পারতেন না। শ্রোতার অত-শত ভাববার সময় নেই, পড়বারও সময় নেই, আর আলোচনা করবার সময় তো নেই-ই। তাছাড়া বেচারি সংসারী লোক, রুটিনের বাইরে যাবার ইচ্ছাও কম, আর সাহসও অল্প। পণ্ডিতের কথা তার মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসতার অনুকূল হওয়ায় সে মাছের টোপ গেলার মতো টপ করে সেটাকে গিলে ফেলল। ফলে পণ্ডিতের মর্যাদা বাড়ল, নব্যতান্ত্রিকদের যথেষ্ট নির্যাতন হল, এবং জনসাধারণের পক্ষে নিরুদ্বেগে নিদ্রাদেবীর আরাধনার সুযোগ ঘটল।

ক্ষতি হল কিন্তু দেশের। প্রকৃতির এই একটা মহা দোষ যে, সে বক্তৃতা শোনে না। প্রকৃতি কোন্ দয়াময় সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছে, কী অণু-পরমাণুগুলোর উদ্দেশ্যবিহীন আকস্মিক সংযোগে ঘটেছে, সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মস্ত মতভেদ আছে। আমার কিন্তু ধারণা যে বঙ্গদেশীয়দের পক্ষে প্রকৃতির এই বক্তৃতার প্রতি বিরাগই তার অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্যহীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতির যদি মাথামুণ্ড থাকত, তাহলে এত বড়ো বড়ো বক্তৃতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এ দুরবস্থা হবে কেন?

সত্য কথা এই যে, আমাদের এত জ্ঞানগরিমা সত্ত্বেও, সত্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা বক্তৃতা করতে শিখেছি, বিকট মুখভঙ্গি করে ইংরেজি শব্দরাজির অপূর্ব সমাবেশ করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান করতে, তাকে নতশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে শিখিনি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাকত তাহলে ঐতিহাসিক কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীনকাল থেকে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসম্ভব তথ্য আমাদের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ করবার জন্য বার করবার ভান করতাম না এবং সেইগুলো নিয়ে অহংকারে স্ফীত হয়ে আধুনিক সমস্যা সকলকে উপেক্ষা করে 'তাইরে-নারে-না' গেয়ে ঘুরে বেড়াতুম না। এরূপ ব্যবহার ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। যদি কিছুর পরিচায়ক হয় তো সে জাতীয় দুর্বলতার ও নিস্তেজতার।

শব্দার্থ ও টীকা

পুরাতত্ত্ববিদ = প্রাচীনকালের ইতিহাসে পণ্ডিত ব্যক্তি।

নীতিশাস্ত্র = ন্যায়-অন্যায় ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে বিচার বিষয়ক গ্রন্থ।

বিদ্যাদিগ্‌গজ = অতিমূর্খ (বিদ্রূপে)।

আত্মসন্তুষ্টি = যথেষ্ট তৃপ্তির ভাব।

নৈতিক = নীতি বিষয়ক।

সামাজিক = সমাজের বিষয়ে।

নব্যতান্ত্রিক = নতুন বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

বিরাগ = বিরক্তি।

অনৈশ্বরিক = ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নয়।

অনুসন্ধান = খোঁজ-খবর।

কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন = কুয়াশা-আবৃত।

স্ফীত = ফেঁপে ওঠা।

(2)

পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন যে, প্রাচীনদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করলেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙা হল? আমার উত্তর এই যে, প্রাচীনকালের নজিরকে উপরোক্ত রূপ ভয়-ভক্তি-বিহ্বলনেত্রে দেখা এবং তার বিধানের পায়ে সসম্ভ্রমে আত্মসমর্পণ করা উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবী পরিবর্তনশীল, দুই মুহূর্তের অবস্থা কখনও এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে তার সমষ্টি আজ-কে কাল থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন করে ফেলেছে; তার দরুণই আজ হচ্ছে আজ আর কাল হচ্ছে কাল; কোনো পার্থক্য না থাকলে আমরা আজ আর কালের মধ্যে কোনো মতেই প্রভেদ করতে পারতাম না। বৈজ্ঞানিকের নজরে পৃথিবীর এক পলের অবস্থা আর এক পলের অবস্থা থেকে ভিন্ন। একথা যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতের কিংবা বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাতে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এসব সূক্ষ্ম তর্ক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সত্যের ওপর নির্ভর করে বিচার করা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভারতের দুই যুগের অবস্থাতে প্রভেদ বিস্তর ও বিরাট। প্রাচীনকালে (যথা— মনুর যুগে) ভারতে এক হিন্দুজাতিরই বাস ছিল। মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে ছিল না। তখনকার নীতিপ্রবর্তকদের কেবল এক হিন্দুসমাজের কথা ভাবতে হয়েছে। এখন কিন্তু দেশের অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। এখন এদেশে হিন্দু ছাড়া মুসলমান, পারসি প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা বাস করছে। বিদেশিরা এখন এদেশের রাজা হয়েছেন। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এখন এদেশের লোকের পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। এইসব নূতন ঘটনা ঘটাতে দেশে নূতন নূতন জীবন-সমস্যা এসে জুটেছে। এসব সমস্যার কিরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু এবং তাঁর সমসাময়িকদের ভাববার সুযোগ হয়নি; সুতরাং এসব বিষয় তাঁরা কিছুই লিখে যাননি। এখন হিন্দুদের উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যেই এসব সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। মনু যখন হিন্দুর সামাজিক শ্রেণি-বিভাগের প্রবর্তন করেন, তখন ইউরোপের democratic হাওয়া এদেশে আসেনি, এখন কিন্তু এসেছে এবং তেড়েই এসেছে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে থাকে তাহলে ভারতবর্ষ থেকে তার লোপ পাবার সম্ভাবনাই বেড়ে যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ-সকল সত্য থেকে কেবল একটিমাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং সেটা এই যে নূতন যুগের নূতন সমস্যার নূতন মীমাংসার দরকার।

প্রাচীন গ্রিসের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিত সোলোনকে (Solon) বলেন ''তোমাদের গ্রিকদের চরিত্র বালকের মতো; তোমাদের মধ্যে না-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।'' মিশরি যাকে নিন্দনীয় বলে বিদ্রূপ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রিস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল; তাদের বাল-সুলভ চঞ্চলতা ও অসন্তোষই তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে তুলেছিল। যে-দিন এই বালস্বভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে-দিন তারা জাতীয় কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে পূর্বকীর্তির চর্বিত চর্বণে প্রবৃত্ত হল সেইদিন থেকে গ্রিসের অধঃপতনও শুরু হল।

যা গ্রিসে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষপালক বর্বর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ''আল্লাহো আকবর'' রবে সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। মহাপুরুষদত্ত মন্ত্রের ভীমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাষ্পনির্মিত সৌধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল; আরব সভ্যজগতে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন হয়ে মৃতপ্রায় সভ্যতাকে নবজীবন দান করল। দেশ বিদেশ দমন করে, পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে, সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্থন করে আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্ব। আরবের এই উন্নতি পৈতৃক প্রথার অনুসরণে হয়নি। হজরত মোহাম্মদের পূর্বকালীন অবস্থাকে তারা ''আইয়ামে জাহেলিয়াৎ'' (অন্ধকার যুগ) বলত। হজরতের সময় থেকে

শব্দার্থ ও টীকা

বিহ্বলনেত্রে = [illegible]ভূত চোখে

এক পলের = এক মুহূর্তের।

মনু = ইনি ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত। সেইজন্য এঁর নাম স্বয়ম্ভু-মনু। মনে করা হয় এঁর পুত্রকন্যাগণ থেকে মানুষ জাতির বিস্তার, তাই তাদের বলা হয় 'মানব'। ইনি ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই ধর্মশাস্ত্রই ''মনুসংহিতা'' নামে খ্যাত। মনুর যুগ বলতে এই ঋষির সমসাময়িক যুগকেই বোঝানো হয়েছে। মনুর যুগে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল।

democratic = গণতন্ত্র সম্পর্কীয়।

মীমাংসা = বিরোধ সমস্যা প্রভৃতির সমাধান।

রঙ্গমঞ্চে = যুদ্ধক্ষেত্রে।

ভীমনাদ = উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা।

মন্থন = মন্থিত করা।

হজরত মোহাম্মদ = আল্লার প্রেরিত দূত। ইনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। তাঁকে পয়গম্বর নামে অভিহিত করা হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

experiment = অনুসন্ধান, পরীক্ষা।

ইজ্জত = সম্মান।

আরম্ভ করে প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত আরবেরা ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিত্যনতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিল এবং নানা দিকে নূতন নূতন experiment করেছিল। তার পর প্রাচীনতার বাঁধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহারজীবী (ফকিহ্) এবং পুরাতত্ত্ববিদদের (মেহাদ্দেস প্রভৃতি) ইজ্জত বেশি হল। এইখান থেকেই আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

(3)

তামসিক = ঘোর অন্ধকার।

authority = কর্তৃপক্ষ, শাসক।

Aristotle = প্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্য তত্ত্বের স্রষ্টা।

সভ্যতা দেখতে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর-এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায়, তার দোষে। আরবের জরা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত স্রোতস্বতীর ন্যায় তাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। সে স্রোত এখনও থামেনি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মতোই authority -র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মতো অটল ভক্তি ছিল। Aristotle -এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেছে। এখন জীবনের আদর্শের সঙ্গে অতীতের বিধি-নিষেধের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না। তাঁরা এখন নিত্যনতুন জিনিসকে নিয়ে experiment করছেন, এক নীতি ছেড়ে অন্য নীতি ধরছেন, এইরূপে তাদের আশা ও উদ্যমপূর্ণ জীবন কেটে যাচ্ছে। রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়ছে বই কমছে না।

ষোড়শোপচারে = ঘটা করে।

ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়। ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যেও একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তখন তাদের মধ্যে বার্ধক্যের দুর্বলতা আসেনি। যৌবন-সুলভ চঞ্চলতার প্রসাদে তারা নানা নীতির অনুসরণ করেছিল, নানা মতের প্রবর্তন করেছিল, নানাবিধ সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করেছিল এবং নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কাব্য ও কলাবিষয়ক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় experiment করেছিল। ক্রমে তাদেরও বার্ধক্য উপস্থিত হল। জীবনে জড়তা এসে পড়ল। ষোড়শোপচারে প্রাচীনতার পুজো আরম্ভ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দুজাতি নির্জীবতার একটা মস্ত উদাহরণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

Nation = জাতি।

উদ্ভাবন = আবিষ্কার।

আমাদের Nation — হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুয়ে মিলে গঠিত। এই দুই সমাজই নিজেদের জীবনের মূল্য ভুলে গিয়ে প্রাচীন প্রথার অনুসরণের বৃথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করছে। এর ফল যে বিষময় হচ্ছে, সে বিষয় সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। চোখ খুলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে এ পৃথিবী এক অনন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র। এখানে মানুষে-মানুষে, মানুষে-পশুতে এবং পশুতে-পশুতে অবিরাম জীবন সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়, অন্যেরা লোপ পেয়ে যায়। অতীতের গুরুভার ঘাড়ে করে যার পক্ষে চলাই কঠিন, তার পক্ষে এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আশা কোথায়? আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে আর ক'দিন চলবে? অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না? কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি বিশেষ করে হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ করছি। এদেশে হিন্দু-মুসলমান দুজনেই নিজ নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েছে, দুজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে দুর্দশা।

(সংক্ষেপিত)

11.4 বিষয়ের রূপরেখা

11.4.1 পুরাতত্ত্ববিদদের মুখে . . . . . জাতীয় দুর্বলতার ও নিস্তেজতার

বক্তব্যসার:

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান অসামান্য অগ্রগতির প্রশ্ন তুললেই পুরাতন ব্যবস্থার গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা বৈদিকযুগের উদাহরণ দেন। মনুর যুগে ভারত উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল বলে অহংকার করেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে এমন জটিল করে তোলেন যে শ্রোতারা বক্তার পাণ্ডিত্বের আস্ফালনে ভীত হয়ে চুপ করে থাকে। আসল সত্য চাপা পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সত্যের আশ্রয়ে জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

দুর্দশা = খারাপ অবস্থা।

মন্তব্য:

প্রাচীন সংস্কারকে গ্রহণ করে, প্রাচীন পথকে অনুসরণ করে চললে মানুষের ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত কিম্বা জাতিগত কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। কারণ জগতে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটছে। মনুর যুগ আর আজকের যুগ এক নয়। মনুর যুগের সামাজিক শ্রেণিবিভাগ বর্তমানে শ্রেণিসংঘর্ষ তৈরি করছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বর্ণবিভেদ মেনে নেওয়া যায় না। বর্ণবিভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ তৈরি করে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

শুধু ভারত নয়, গ্রিস দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। এই সারল্য নিয়েই তারা উন্নতির শিখরে উঠেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা তাদের স্বভাব পরিত্যাগ করে পূর্বের সংস্কারে মন দিল, তখনই তাদের জাতীয় উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হল।

প্রাচীন আরবদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই সত্য লক্ষিত হয়। সরল মেষপালক এক জাতি হজরত মোহাম্মদের প্রভাবে সভ্যতার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু সে মাত্র ৪০০ বছর। যেই মাত্র তারা প্রাচীন পথের অনুসরণ শুরু করল, অমনি আরব সভ্যতার উন্নতি খর্ব হতে শুরু করল। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার, আরবের কাছ থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে এক সুসভ্য জাতি হিসাবে প্রশংসা লাভ করেছে।

শ্রেণীসংঘর্ষ = দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিরোধ।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.1

পাঠ্যাংশটুকু ভাল করে পড়ুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. প্রাচীন যুগ বলতে কোন্ যুগের কথা বলা হয়েছে?
2. ভারতের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে?
3. আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ কী?
4. ঐতিহাসিক কুহেলিকা বলতে লেখক কী বলতে চেয়েছেন?

খর্ব = হ্রাস পাওয়া।

11.4.2 পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন যে . . . . . আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

বক্তব্যসার:

পরিবর্তনশীল এই জগৎ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নানা প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার, সামাজিক রীতিনীতির প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ আজ আর কোনো ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রাচীন গ্রিস ও মিশরীয় সভ্যতার পরিবর্তন ঘটেছে। আরব সভ্যতাও মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল।

মন্তব্য:

প্রাচীন সংস্কারকে গ্রহণ করে, প্রাচীন পথকে অনুসরণ করে চলতে মানুষের ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত কিংবা জাতিগত কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। কারণ জগতে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটছে। মনুর যুগ আর আজকের যুগ এক নয়। মনুর যুগের সামাজিক শ্রেণিবিভাগ বর্তমানে শ্রেণিসংঘর্ষ তৈরি করছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বর্ণবিভেদ মেনে নেওয়া যায় না। বর্ণবিভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ তৈরি করে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

শুধু ভারত নয়, গ্রিস দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা সকলেই ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা তাদের স্বভাব পরিত্যাগ করে পূর্বের সংস্কারে মন দিল, তখনই তাদের জাতীয় উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হল।

প্রাচীন আরবেরাও হজরত মোহাম্মদের প্রভাবে সভ্যতার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু সে মাত্র ৪০০ বছর। যেই মাত্র তারা প্রাচীন পথের অনুসরণ শুরু করল, অমনি আরব সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হল।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.2

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখুন। একটি উত্তর করে দেখানো হল।

1. প্রাচীনকালের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করলেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙা হল?

   হ্যাঁ / না
   ✓
2. বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার কোনো পার্থক্য নেই।
3. প্রাচীনকালে মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে (ভারতে) ছিল না।
4. পাঠে বর্ণিত সমস্যার কীরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু কিছুই লিখে যাননি।
5. মনু হিন্দুর সামাজিক শ্রেণি-বিভাগের প্রবর্তন করেন।
6. মিশরি সোলোন গ্রিকদের কতগুলি গুণকে নিন্দনীয় বলে বিদ্রুপ করেছিলেন, তার ফলে গ্রিসের অবস্থা কী হয়েছিল?
7. প্রাচীন আরবীয়রা কীরূপ জাতি ছিল?
8. কে মৃতপ্রায় আরবসভ্যতাকে নবজীবন দান করেছিলেন?
9. 'আইয়ামে জাহেলিয়ৎ' শব্দের অর্থ কী? আরব দেশে কোন্ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ বলা হত?

10. আরবের উন্নত অবস্থা কোন্ সময় থেকে আরম্ভ হল এবং কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল?

11. আরবীয়দের উন্নতির প্রবাহ কীভাবে বন্ধ হল?

11.4.3 সভ্যতা দেখতে পাই কালক্রমে . . . . . এবং সে দশার নাম হচ্ছে দূর্দশা।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

আরবীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় সভ্যতা উজ্জীবিত হল। তা উন্নতির চরম শিখরে উঠল। অথচ আরবে উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা কিন্তু authoritarian অর্থাৎ স্বৈরতান্ত্রিক ছিল। অ্যারিস্টটলের ছিল অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব। এখন ইউরোপীয়দের সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তারা তাদের সভ্যতা নিয়ে গর্বিত।

সার্বভৌম = সর্বাধিক।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দু'য়ে মিলে ছিল এক জাতি, এক প্রাণ, মহান ভারতীয় (জাতি)। কিন্তু বর্তমানে আমরা ভারতবাসীরা সে-কথা ভুলে পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত। এখন হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই নিজেদের বিভেদ ভুলে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই প্রকৃত জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব।

মন্তব্য:

প্রবন্ধটি ভারত বিভাগের পূর্ববর্তী সময়ের রচনা। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়। জন্ম নেয় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ। পাকিস্তান আবার ১৯৭১/৭২ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। লেখক অবিভক্ত ভারতবর্ষের অগ্রগতির বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.3

সঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন ঃ—

1. ''ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল।' —
   'তামসিক যুগ' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে —
   (i) সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে এমন যুগ।
   (ii) যে যুগে উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হয়েছে এমন।
   (iii) অন্ধকার যুগ।

2. ''রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়ছে বই কমছে না।'' — 'আত্মশক্তি' বলতে বোঝায় —
   (i) নিত্যনতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার শক্তি।
   (ii) নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা।
   (iii) নিজেদের সভ্যতার অগ্রগতির শক্তি।

3. ''ক্রমে তাদেরও বার্ধক্য উপস্থিত হল'' — এখানে 'বার্ধক্য উপস্থিত হল' বলতে বোঝান হয়েছে —
   (i) জীবনে জড়তা এসে পড়ল।
   (ii) সভ্যতার অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ হল।

(iii) প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

4. '' অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না।' অতীতের বোঝা বলতে এখানে বোঝান হয়েছে —
   (i) প্রাচীন প্রথার অনুসরণ।
   (ii) অবিরাম জীবন-সংগ্রামের ব্যর্থতার ভার।
   (iii) অতীতের পূর্বসূরিদের দুর্দশার ভার মোচন।

5. 'ইউরোপে তামসিক যুগের অবসান হল।' ইউরোপের 'তামসিক যুগ' বলতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে?

6. 'ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেছে।' এখানে 'সে মনোভাব' বলতে কোন্ মনোভাবের কথা বলা হয়েছে?

7. 'ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়।'' — 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

8. 'আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে আর ক'দিন চলবে?'' — 'আমরা যেভাবে চলছি' বলতে লেখক আমাদের কীভাবে চলার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

11.5 আপনি যা শিখলেন

1. বিভিন্ন জাতি একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব।
2. প্রাচীন ভারতে একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।
3. প্রাচীন ভারতে বৈদিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, পরবর্তী মধ্যযুগে মুসলিম এবং তারপরে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়।
4. ইউরোপে যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, ভারতে তখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়নি। এখন ভারতে গণতান্ত্রিক (Democratic) ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।
5. ভারতবর্ষে বর্তমানে সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে।

11.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ভারতের বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, আলোচনা করুন।
2. ভারতবর্ষের যুগবৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখুন।
3. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ভারতে বর্তমানে কোন্ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?
4. ''এর ফল যে বিষময় হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।' — 'এর ফলে' বলতে কোন্ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। কীভাবেই বা জীবন বিষময় হয়ে উঠছে — আলোচনা করুন।
5. ''অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না?'' — অতীতের বোঝা বলতে এখানে কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলা হয়েছে, আলোচনা করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

11.8 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

11.1

1. ভারতবর্ষে বৈদিক যুগকে প্রাচীন যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে।
2. ভারতের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে — যথা (ক) প্রাচীন যুগ; (খ) মধ্যযুগ; (গ) আধুনিক যুগ।
3. সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দূরবস্থার প্রধান কারণ।
4. সত্যের প্রতি অনুসন্ধান করতে শেখা, তাকে নতশিরে মেনে নেওয়া এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া আমাদের উচিত। এই শিক্ষা আমাদের নেই। লেখক সেই অভাবজনিত কারণকেই ঐতিহাসিক 'কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন' বলেছেন।

11.2

1. না,
2. না,
3. হ্যাঁ,
4. হ্যাঁ,
5. হ্যাঁ,
6. গ্রিস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল।
7. প্রাচীন আরবীয়রা মেষপালক বর্বর জাতি ছিল।
8. হজরত মোহাম্মদ মৃতপ্রায় আরবকে নবজীবন দান করেছিলেন।
9. 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ' — এর অর্থ অন্ধকার যুগ।
10. হজরতের সময় থেকে আরবের উন্নত অবস্থা শুরু হল। এই অবস্থা প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত ছিল।
11. তারপর যখন তারা (আরবীয়রা) প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করতে শুরু করল তখন তাদের উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল।

11.3

1. (ii)
2. (ii)
3. (i)
4. (i)
5. আরবদের হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের সুসভ্য করে গড়ে তুলল। তাদের তামসিক যুগের অবসান হল।
6. ইউরোপের 'সে মনোভাব' বলতে ইউরোপের প্রাচীন authoritarian বা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে রাজা যা বলত, তাই গ্রাহ্য হত। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে।
7. পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। জগৎ পরিবর্তনশীল। ভারতবাসীকে এ-সত্য মানতে হবে। প্রাচীন গৌরব নিয়ে গর্ব করলে চলবে না।
8. আমরা যেভাবে চলছি বলতে আমরা এখনও প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করে চলেছি। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই একাত্মতা ভুলে পৃথক পৃথকভাবে অতীতের অনুশীলন, অতীতের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জাগতিক উন্নতির কোনো প্রভাবই আমাদের উপর পড়ছে না। কাজে কাজেই আমরা নিজেদের কৃত দুর্দশার পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছি।

লেখক পরিচিতি

১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে হুগলি জেলার বড়জাতপুর অঞ্চলে এস. ওয়াজেদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসের ৬ তারিখে। কেমব্রিজ থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একজন লেখক হিসাবে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, রম্যরচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। 'মাশুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস' প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি গ্রন্থের তিনি লেখক। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'ভবিষ্যতের বাঙালী'। ইংরেজি ভাষাতেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

সমধর্মী রচনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরাসী মনীষী গিজো ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাঁহার মত নিম্নে উদ্ধৃত করি।

''তিনি বলেন, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তীকালে, কি এশিয়ায় কি অন্যত্র, এমনকি প্রাচীন গ্রিস-রোমেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উঠিয়াছে এবং একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, তাহার আচারে বিচারে, তাহার অবয়ব বিকাশে, সেই একটি স্থায়ী ভাবেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়। যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিত শাসনতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচারব্যবহারে, তাহার কীর্তিস্তম্ভগুলি ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

''সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃভাবের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

''এইরূপ এক ভাবের কর্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রিস অতি আশ্চর্য দ্রুতবেগে এক অপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোনো জাতিই এত অল্পকালের মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রিস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড়ো আকস্মিক। যে মূলভাবে গ্রিক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল; আর কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না।

''অপরপক্ষে, ভারতবর্ষে ও ইজিপ্টেও সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল; তাহার সরলতায় সমস্ত যেন একঘেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টিকিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই এক জায়গায় আসিয়া বন্ধ হইয়া গেল।''

ভাষা পাঠ

12. ভাষা পাঠ--- বাংলা শব্দভাণ্ডার

13. শব্দ গঠন

14. ভাষা রীতি

15. বাক্যের রূপান্তর

12

ভাষাপাঠ

বাংলা শব্দভাণ্ডার

12.1 প্রস্তাবনা

ভাষাপাঠ বলতে বোঝায় ভাষার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পড়াশুনা। এই সব নিয়ম-কানুনের মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলি কোথা থেকে এসেছে তার পরিচয় নিয়ে। বিষয়টি অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ।

বংশধারার দিক থেকে বাংলা ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষাবংশের সঙ্গে যুক্ত। এই ভাষাবংশের প্রাচীনতম ভাষারূপ পাওয়া যায় বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে। বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হতে হতে আধুনিক ভারতের অনেকগুলি ভাষার সৃষ্টি করেছে। বাংলা তাদের মধ্যে একটি। তবে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মূলে সংস্কৃত ভাষা থাকলেও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্যদের আসার আগে বাংলা দেশে বসবাসকারী কিছু প্রাক্-আর্য জাতির আদিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষার শব্দ। এছাড়াও বহু বিদেশি ভাষার শব্দও বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে — বলায় ও লেখায়। এই সবটা নিয়েই বাংলার **শব্দভাণ্ডার**।

12.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়লে করলে আপনি —

- বাংলা শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলতে ও জানাতে পারবেন;
- বাংলা শব্দের ভাণ্ডার যে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দে পূর্ণ সে বিষয় বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণির শব্দকে শনাক্ত করতে পারবেন;
- শনাক্ত করা বিভিন্ন শ্রেণির শব্দকে ঠিক ঠিক ভাবে বাক্যে ব্যবহার করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখাতে পারবেন;
- আলোচনার সময় কাজে লাগাতে পারবেন।

12.3 বিষয়ের রূপরেখা

12.3.1 বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগ

উৎস অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দ প্রধানত চার শ্রেণিতে বিভক্ত — ১) মৌলিক ২) আগন্তুক ৩) সংকর বা মিশ্র দেশি শব্দ, ৪) দেশি শব্দ।

১) **মৌলিক শব্দ :** আগেই বলা হয়েছে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মূলে একদিকে রয়েছে সংস্কৃত ও তার বিবর্তিত ভাষারূপ। এইগুলিই মৌলিক শব্দ। এই শব্দ তিন রকম : (ক) তৎসম, (খ) তদ্ভব, (গ) অর্ধতৎসম।

২) **আগন্তুক শব্দ :** বাংলা ভাষার উদ্ভবের পর বাংলা দেশের বাইরে থেকে আসা মানুষদের ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে সেগুলি আগন্তুক শব্দ। আগন্তুক শব্দ দুরকম : (১) বিদেশি (২) প্রতিবেশী

৩) **সংকর বা মিশ্র শব্দ :** বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের মিশ্রণে তৈরি শব্দ।

৪) **দেশি শব্দ :** বাংলা ভাষায় এমন শব্দ আছে যারা কোথা থেকে এসেছে জানা যায় না। তাছাড়া প্রাচীনতম অধিবাসীদের ভাষা (যেমন - কোল, ভিল, সাঁওতালি ইত্যাদি) থেকে অনেক শব্দ এসেছে। এগুলি দেশি শব্দ।

12.3.2 মৌলিক শব্দ — (১) তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দ : 'তৎ' এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হল 'সেই'। তৎসম = তার সমান, সংস্কৃতের মতো।

সুতরাং বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অপরিবর্তিত বা অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে এবং এখনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসছে, তাদের বলে তৎসম শব্দ।

যেমন, নদী, চন্দ্র, বায়ু, জল, কৃষ্ণ, বৃক্ষ, লতা, হস্ত, হস্তী, পক্ষী, অশ্ব, মাতা, পিতা, পুষ্প, শয্যা, অরণ্য, পৃথিবী, ধরিত্রী, কন্যা, প্রকৃতি, জীব, জন্তু, মৃত্যু, জন্ম, পদ, কষ্ট ইত্যাদি। এমন হাজার হাজার তৎসম শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.1

১. **নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি তৎসম শব্দ তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন। যেগুলি তৎসম শব্দ নয়, তাতে (✗) চিহ্ন দিন :**

(i) বৃক্ষ — ( )	(iv) পুত্র — ( )
(ii) আজ — ( )	(v) হাতি — ( )
(iii) নক্ষত্র — ( )	(vi) চন্দ্র — ( )

12.3.3 অর্ধতৎসম শব্দ

<u>কেষ্টা</u> আয়রে কাছে।

শব্দার্থ ও টীকা

আজ <u>বেস্পতিবার</u>।

<u>পুরুত</u> চলেছেন পুজোয়।

কেষ্টা, বেস্পতিবার, পুরুত এই শব্দ তিনটির মূলে রয়েছে কৃষ্ণ/ বৃহস্পতিবার/ পুরোহিত, এই তিনটি তৎসম শব্দ। এমন বদল ঘটল কীভাবে? উচ্চারণের দোষে মূল সংস্কৃত শব্দের এমন বদল হয়েছে। এগুলো পুরো তৎসম নয়, আধা তৎসম শব্দ।

সুতরাং, যে সকল সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণের দোষে কিছুটা বিকৃত হয়ে বা রূপান্তরিত হয়ে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে জায়গা করে নিয়েছে, তাদের বলা হয় অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ।

যেমন, জ্যোৎস্না > জোছনা; রৌদ্র > রোদ্দুর; ঘৃণা > ঘেন্না; সূর্য > সুজ্জি; মিত্র > মিত্তির; স্পর্শ > পরশ; প্রাণ > পরান; বৈদ্য > বদ্যি; শ্রী > ছিরি ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.2

1. **নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি অর্ধতৎসম তাতে টিক (✓) চিহ্ন এবং তৎসম শব্দে (✗) চিহ্ন দিন।**

   (i) বিদ্যে — ( ) (iv) তৃষ্ণা — ( )

   (ii) বেস্পতি — ( ) (v) মিথ্যে — ( )

   (iii) গ্রাম — ( ) (vi) বিচ্ছিরি — ( )

2. **ঠিক উত্তরটির পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরে 'না' লিখুন ঃ**

   (a) অর্ধতৎসম শব্দ তৎসম শব্দেরই অন্যরূপ। ( )

   (b) অর্ধতৎসম শব্দের উৎপত্তি হয় তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে। ( )

   (c) তৎসম শব্দ থেকে অন্য পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে অর্ধতৎসম শব্দের উৎপত্তি হয়। ( )

12.3.4 তদ্ভব

১ ২ ৩

কৃষ্ণ > কণ্হ > কানু

সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ

হস্ত > হত্থ > হাথ > হাত

সর্প > সপ্প > সাপ

উদাহরণের শব্দগুলো ১, ২, ৩ — এই তিনটি স্তরে সাজানো আছে। ১ নং স্তরের শব্দগুলো তৎসম। ২ নং স্তরের শব্দগুলো ১ নং স্তরের তৎসম শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এখন আমরা ব্যবহার করি না। ৩ নং স্তরের শব্দগুলো আমাদের খুবই পরিচিত। এগুলো আমরা ব্যবহার করি। এই ৩ নং স্তরের শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি আসেনি। এসেছে পরবর্তী বংশধর হিসেবে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে। বংশধর হিসেবে তৎ (সংস্কৃত) থেকে এদের ভব (উদ্ভব বা জন্ম), এই জন্য এদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ।

যেমন, হস্তী (সং) > হত্থী (প্রা) > হাতি (তদ্ভব/বাংলা)।

অলক্তক (সং) > অলত্তঅ (প্রা) > আলতা (তদ্ভব/বাংলা)।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.3

1. **ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং ভুল উত্তরে (✗) দিন।**
   - (i) তদ্ভব শব্দ থেকে তৎসম শব্দের উৎপত্তি — (   )
   - (ii) তৎসম থেকে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি — (   )
   - (iii) তদ্ভব আর বাংলা শব্দ একই — (   )
   - (iv) তদ্ভব শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে — (   )

12.3.5 দেশি শব্দ

চিংড়ি মাছের মালাইকারি।

টঙে বসে আছ কেন?

ঢেউ খেলে যায় নদীর কূলে।

ঝাঁটা মেরে ধুলো ওড়াই।

গ্রাম্য বধূটি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন।

এখানে চিংড়ি, টঙ, ঢেউ, ঝাঁটা, ঢেঁকি এ শব্দগুলো বাংলা ভাষায় যখন-তখনই ব্যবহার করি। এদের বলা হয় দেশি শব্দ।

টঙ্গ, টাক, খোকা, ঢ্যাঙা, কুড়ি, খুকি ইত্যাদি দেশি শব্দ।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.4

1. **'দেশি' শব্দে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং বাকিতে (✗) দিন :**

(i) ঝাঁটা — ( )	(iv) জল — ( )
(ii) গ্রাম — ( )	(v) ঢেঁকি — ( )
(iii) ডিঙি — ( )	(vi) তেঁতুল — ( )

12.3.6 আগন্তুক শব্দ

বিদেশি শব্দ : আরবি, ফারসি, তুর্কি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইংরেজি, ফরাসি, চিনা, জাপানি, রুশ, বর্মি, গ্রিক, জার্মান, অস্ট্রেলীয়, স্পেনীয়, ব্রহ্মদেশীয়, মালয়ী, ইতালীয় ইত্যাদি।

উদাহরণ :

বাজারে আজ অনেক মাছ।

স্টেশনে দাঁড়িয়েই রইলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

পেয়ারাটা বেশি পাকা।

কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি।

নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলি আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা প্রায়ই ব্যবহার করি বলায় এবং লেখায়। বাংলা অক্ষরে লিখি বলে মনে হয় এগুলি বাংলার নিজস্ব শব্দ। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকে ধার করা। সেজন্য এ শব্দগুলিকে **বিদেশি শব্দ** বলা হয়।

সুতরাং, ভারতবর্ষের বাইরের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দ সোজাসুজি বা কিছুটা বিকৃত করে বাংলায় ব্যবহৃত হয় বলে এদের **বিদেশি শব্দ** বলা হয়।

যেমন : ইস্টিশন (station), হাসপাতাল (hospital), দরদ (দর্দ), ডাক্তার (doctor), রেস্তোরাঁ (restaurant), হাকিম ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.5

1. **শূন্যস্থানে ঠিক উত্তরটি বসান : (ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে)**

   (i) বিদেশি শব্দ ____________ শব্দের মধ্যে পড়ে। (তৎসম, আগন্তুক, তদ্ভব)

2. **বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলান মাঝখানের ফাঁকে ডানদিকের উত্তরের ঠিক সংখ্যা বসিয়ে :**

A	উত্তরের সংখ্যা	B
(a) বাংলায় বিদেশি শব্দ এসেছে —	________	(i) বাংলা অক্ষরে
(b) বাংলায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে —	________	(ii) আর্যদের এদেশে আসার অনেক পরে।
(c) ইংরেজি শব্দ বাংলা লেখায় ব্যবহৃত হয় —	________	(iii) ভারতের বাইরের দেশ থেকে।

12.3.7 প্রতিবেশী শব্দ।

আমার কোনো চাহিদা নেই।

শিবুর কথা বোলো না, ও একটা ফালতু লোক।

কাল নাকি হরতাল?

আমরা প্রায়ই এ শব্দগুলো বাংলা শব্দ ভেবে বাংলায় ব্যবহার করি। আসলে এরা বাংলার বাইরের বিভিন্ন রাজ্যের শব্দ। যেমন, চাহিদা - পাঞ্জাবি শব্দ, ফালতু - হিন্দি শব্দ, হরতাল - গুজরাটি শব্দ। এমনি কথাবার্তায়, এমনকি লেখায়ও বাঙালিরা বাংলার বাইরের ভিনরাজ্যে ব্যবহৃত ভাষার অনেক শব্দ বলে থাকে।

প্রতিশব্দের আরও উদাহরণ :

হিন্দি শব্দ = ইস্তক, পুরি, কচুরি, খাটা, খানা, লাগাতার, আপস, চানাচুর, বন্ধ্, ঝান্ডা, টহল, দাঙ্গা, তাগড়া, ডেরা, বেলচা, লাগাতার, চামেলি, ঝাড়ু, লোহা ইত্যাদি।

গুজরাটি শব্দ = খাদি, গরবা, তকলি ইত্যাদি।

পাঞ্জাবি শব্দ = শিখ, ধাবা ইত্যাদি।

মারাঠি শব্দ = চৌথ, বর্গি, পাটিল, কুলকার্নি ইত্যাদি।

তামিল শব্দ = চুরুট, পিলে (ছেলেপিলে), খোকা, খুকু ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.6

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং ঠিক না হলে (✗) দিন।

(i) ভিনপ্রদেশের মানুষের ব্যবহৃত শব্দ বাঙালি গ্রহণ করেছে। — ( )

(ii) 'চাহিদা' শব্দটি হিন্দি শব্দ — ( )

(iii) অন্য যে কোনো ভারতীয় শব্দকেই দেশি শব্দ বলা যায় — ( )

(iv) 'কাহিনি' শব্দটি বাংলা শব্দ নয় — ( )

2. নীচের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লিখুন :

(a) 'আগন্তুক শব্দ' বলতে কী বোঝায়?

(b) সাধারণত কোন্ কোন্ ভাষার বেশি শব্দ বাংলায় এসেছে?

(c) আগন্তুক শব্দ হিসেবে ভারতের বাইরের দেশের এবং ভারতের অভ্যন্তরের রাজ্যে ব্যবহৃত শব্দের পার্থক্য কী?

(d) বাংলা এবং ভারতের অন্য রাজ্যের ভাষার লেনদেনের ফল কী হয়েছে?

12.3.7 সংকর বা মিশ্র শব্দ :

কাজ-কারবারে মন্দা চলছে এখন।

স্কুলশিক্ষককে সকলেই সম্মান করে।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখছেন।

দেখা যাচ্ছে একাধিক শব্দ মিলে একশব্দে ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি বাক্যে।

কাজ-কারবার — কাজ (তদ্ভব শব্দ), কারবার (বিদেশি শব্দ);

স্কুলশিক্ষক — স্কুল (বিদেশি শব্দ), শিক্ষক (তৎসম শব্দ);

ডাক্তারবাবু — ডাক্তার (বিদেশি শব্দের বিকৃত রূপ), বাবু (দেশি) — এভাবে শব্দগুলি মিলে গিয়ে একটি শব্দে পরিণত হবার ফলে এদের বলা হয় **সংকর** বা **মিশ্র শব্দ**।

সুতরাং তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের একের সঙ্গে অন্য শব্দের কিংবা এক শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে যে শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে **সংকর** বা **মিশ্র শব্দ**। যেমন, **বাবুগিরি** — বাবু (দেশি) + গিরি (বিদেশি প্রত্যয়); **বে-হাত** — বে (বিদেশি উপসর্গ) + হাত (তদ্ভব) ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 12.7

1. **শূন্যস্থানে ঠিক উত্তরটি বসান : (ডানদিকের বন্ধনী থেকে)**

   (i) সংকর শব্দ বাংলা ভাষার ____________ তৈরি শব্দ। (নিজের/ ধার করা/ কিনে আনা।)

   (ii) সংকর শব্দ আর আগন্তুক শব্দ ____________ শব্দ নয়। (বিদেশি শব্দ/ একজাতীয়/ ইংরেজি শব্দ)

   (iii) 'ডাক্তারবাবু' হল ____________ শব্দ। (বিদেশি শব্দ/ মিশ্র শব্দ/ ইংরেজি শব্দ)

   (iv) সংকর শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষা ____________ হয়েছে। (দুর্বল/ সমৃদ্ধ/ ক্ষতিগ্রস্ত)

12.4 আপনি যা শিখলেন

(i) সংস্কৃত ভাষা বাংলার আদি ভাষা, প্রতিবেশি রাজ্যের ভাষা, বিদেশিভাষা— এ সব রকম ভাষা মিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার।

(ii) বাংলা ভাষায় যোগ হয়েছে দেশ-বিদেশের বহু শব্দ।

(iii) বাংলা ভাষা অন্য ভাষার শব্দগ্রহণের ফলে সেই সেই দেশের মানুষের সঙ্গে মনের যোগ তৈরি হয়েছে।

(iv) অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার লেনদেনের ফলে অন্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে।

(v) বিভিন্ন দেশের মানুষের ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে।

(vi) বাংলা ভাষা অন্য দেশের ভাষাকে গ্রহণ করে একেবারে নিজের করে নিয়েছে।

12.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

1. বাংলা শব্দভাণ্ডারে উৎসবিচারে কতরকমের শব্দ আছে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

2. উদাহরণসহ নীচের বিষয়গুলির পার্থক্য দেখান :

   (a) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দ;

   (b) তৎসম ও তদ্ভব শব্দ;

   (c) মৌলিক ও আগন্তুক শব্দ;

   (d) দেশি ও বিদেশি শব্দ;

   (e) তদ্ভব ও দেশি শব্দ।

3. সংকর শব্দের অর্থ কী? এ জাতীয় শব্দ কীভাবে তৈরি হয়েছে? দুটি উদাহরণ দিন।

4. সাধারণত কোন্ কোন্ অ-বাংলা ভারতীয় শব্দ বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে? এর ফলে কী হয়েছে?

5. বিদেশি শব্দ গ্রহণ করার ফলে বাংলা ভাষা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে কি? এর পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মতামত দিন।

6. নীচের শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলায় প্রচলিত আগন্তুক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করুন।
পেয়ালা, কেদারা, ছবি, লেখনী, আদেশ।

7. নিজের তৈরি দশটি বিভিন্ন শ্রেণির একটি তালিকা তৈরি করুন:

12.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

12.1

1. (i) ✓ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✓ (v) ✗ (vi) ✓

12.2

1. (i) ✓ (ii) ✓ (iii) ✗ (iv) ✗ (v) ✓ (vi) ✓
2. (a) না; (b) হ্যাঁ; (c) না।

12.3

1. (i) ✗ (ii) ✓ (iii) ✓ (iv) ✗

12.4

1. (i) ✓ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✗ (v) ✓ (vi) ✓

12.5

1. (i) আগন্তুক (ii) বিচার ও শাসনব্যবস্থা (iii) গ্রিক (iv) পোর্তুগিজ।
2. (a) (iv) (b) (iii) (c) (ii) (d) বাংলা অক্ষরে।

12.6

1. (i) ✗ (ii) ✗ (iii) ✗ (iv) ✓
2. (a) যে শব্দ বাংলার বাইরের অন্য রাজ্য থেকে বা ভারতের বাইরের অন্য দেশ থেকে বাংলা ভাষায় মিশে গেছে তাকে বলে আগন্তুক শব্দ।
   (b) সাধারণত হিন্দি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি শব্দ বাংলায় এসেছে।
   (c) ভারতের বাইরের দেশের শব্দ সম্পূর্ণভাবে বিদেশি শব্দ আর ভারতের অন্য রাজ্যের ভাষা বাংলা না হলেও আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ভাষা।
   (d) বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্য ভাষার মিলনের ফলে একদিকে যেমন অন্য রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক মিলনও ঘটেছে।

12.7

1. (i) নিজের; (ii) একজাতীয়; (iii) মিশ্রশব্দ; (iv) সমৃদ্ধ।

13

শব্দগঠন

(ক. প্রত্যয় যোগে খ. সমাস যোগে)

13.1 প্রস্তাবনা

আগের অধ্যায়ে আপনারা জেনেছেন বাংলা ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো এসেছে নানা উৎস থেকে। এবার কি জানতে ইচ্ছা হয় না যে শব্দ তৈরি হয় কীভাবে? তারও জবাব ভাষার পণ্ডিতেরা দিয়েছেন। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক :

(১) চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি হয়েছে।

(২) ডাকাতদল যাত্রীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়েছে।

১ নং উদাহরণে দুটি শব্দ আছে — 'চলন্ত' ও 'ডাকাতি', এবং ২ নং উদাহরণেও দুটি শব্দ আছে — 'ডাকাতদল' ও 'আগ্নেয়াস্ত্র'। কিন্তু দুই উদাহরণে শব্দগুলো একভাবে তৈরি হয়নি। ১ নং উদাহরণে 'চল্' ধাতুর সঙ্গে 'অন্ত' এই চিহ্ন যোগ করে 'চলন্ত' এবং 'ডাকাত' শব্দের সঙ্গে 'ই' - এই চিহ্ন যোগ করে শব্দ দুটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ২ নং উদাহরণের দুটি শব্দের মধ্যেই দুটো করে শব্দ একত্রে জুড়ে গিয়েছে : ডাকাত + দল। আগ্নেয় + অস্ত্র। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় শব্দ তৈরি হয় দুভাবে। (১) ধাতু ও শব্দের সঙ্গে চিহ্ন যোগ করে ও (২) দুই বা তার বেশি শব্দকে একত্র জুড়ে দিয়ে। শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে যে চিহ্ন যোগ করে শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে প্রত্যয়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিশ্বাস, ধারণা বা বোধ। এই ধরনের চিহ্ন ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগঠনের মাধ্যমে একটা ধারণা বা বোধ তৈরি করে বলে এই ধরণের চিহ্নকে বলে প্রত্যয়। আর **২ নং উদাহরণে** একাধিক শব্দকে ছোটো করে একটা শব্দে পরিণত করা হয়েছে। ছড়িয়ে-থাকা কথাকে ছোট্ট একটা কথায় রূপ দেওয়াকে ভাষার পণ্ডিতেরা বলেছেন সমাস। কারণ 'সমাস' শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট্ট করে গুটিয়ে আনা। [সমাস = সম্ (সংহতভাবে) + আস (থাকা)।]

13.2 উদ্দেশ্য

আপনি এই পাঠটি পড়লে—

- বাংলা শব্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রত্যয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারবেন;
- ধাতু ও শব্দের শেষে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারবেন;

- শব্দ ভেঙে প্রত্যয় (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) আলাদা করতে পারবেন;
- শব্দ ভেঙে কোন্‌টি কী জাতীয় প্রত্যয় তা শনাক্ত করতে পারবেন;
- বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সমাসের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারবেন;
- সমাসবদ্ধ শব্দকে ভেঙে ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- নিজে সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করে নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

13.3 বিষয়ের রূপরেখা

13.3.1 প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন

দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক —

ক) অঙ্কুরিত বীজই গাছ তৈরি করে।

খ) চলন্ত ট্রেন থেকে নেমো না।

ক) এখানে 'অঙ্কুরিত' শব্দটিকে ভাঙলে হয় — অঙ্কুর + ইত। 'অঙ্কুর শব্দটি একটি বিশেষ্য পদ। এর সঙ্গে 'ইত' (বর্ণসমষ্টি) যোগ হয়ে তৈরি হল 'অঙ্কুরিত'। এটি বিশেষণ পদ। 'ইত' শব্দটি হল শব্দ প্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়। আর 'অঙ্কুরিত' শব্দটি হল তদ্ধিতান্ত শব্দ।

তেমনি, নীল (বিশেষ্যপদ) + ইমা = নীলিমা। এটিও তদ্ধিতান্ত শব্দ, কিন্তু এটি বিশেষ্য হয়েছে।

খ) চলন্ত = চল্ + অন্ত। 'চল্' ধাতুর সঙ্গে 'অন্ত' বর্ণসমষ্টি যোগ হয়ে নতুন শব্দ 'চলন্ত' শব্দটি তৈরি হয়েছে। ধাতুর সঙ্গে হয়েছে বলে একে বলে ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয় এবং 'চলন্ত' শব্দটি হল কৃদন্ত শব্দ। এটি বিশেষণের কাজ করছে। ধাতু-প্রত্যয় থেকে বিশেষ্যও তৈরি হতে পারে। যেমন, শী + অন = শয়ন (বিশেষ্য); শম্ + তি = শান্তি, কাঁপ্ + উনি = কাঁপুনি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় এভাবে বহু শব্দ তৈরি হয়েছে এবং সেগুলি বলে বা লিখে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দকে ভাঙলে প্রথমে যে অংশটি পাওয়া যাবে, সেটি হয় নামপদ (বিশেষ্য ইত্যাদি) অথবা ধাতু (ক্রিয়ার মূল)। দ্বিতীয় অংশটি (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) হল প্রত্যয়। ভাঙা শব্দের প্রথম অংশ ধরেই প্রত্যয়ের নামকরণ — প্রথমে শব্দ থাকলে শব্দ বা তদ্ধিত প্রত্যয় এবং প্রথমে ধাতু থাকলে ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয় হয়। এভাবেই প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ গঠন করতে হয়। আবার প্রত্যয়ের ঠিক পরিচয় জানবার জন্যে নতুন শব্দটিকে ভেঙে দেখাতে হয়।

১। নীচে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দেওয়া হল; এগুলো নিয়ে কীভাবে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে তাও দেখানো হল। মনে রাখতে হবে, ওগুলি শব্দের সঙ্গে বসানো হলে শব্দ প্রত্যয় এবং ধাতুর সঙ্গে বসানো হলে ধাতু প্রত্যয় হয়েছে।

(ক) কৃৎ বা ধাতু প্রত্যয় : (ধাতুর চিহ্ন = √)

আন > √শী + আন = শয়ন;

মান > √সেব্ + মান = সেবমান;

তা > √দা + তা = দাতা; ইষ্ণু > √বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু;

শব্দার্থ ও টীকা

অন > √চল্ + অন = চলন; তি > √দৃশ্ + তি = দৃষ্টি;

অণীয় > √কৃ + অণীয় = করণীয়; য্ > √দা + য্ = দেয়;

অক > √পচ্ + অক = পাচক; অ > √ঝুল্ + অ = ঝুল;

অত > √ফির্ + অত = ফিরত/ফেরত;

অন্ত > √জীব্ + অন্ত = জীবন্ত;

আন > √জানা + আন = জানান (জানানো);

উনি > √ঝাঁক্ + উনি = ঝাঁকুনি; ইয়ে > √নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে; উক > √মিশ্ + উক = মিশুক; উয়া > √পড়্ + উয়া = পড়ুয়া।

মন্ > √জন্ + মন্ = জন্ম; √ধৃ + মন্ = ধর্ম

অ > √গ্রহ্ + অ = গ্রহ; √ত্যজ্ + অ = ত্যাগ

অ > পরি + √ত্যজ্ + অ = পরিত্যাগ

র > √চন্দ্ + র = চন্দ্র; য > √সৃ + য = সূর্য

অন > √গম্ + অন = গমন

ত > যথা + √বচ্ + ত = যথোক্ত (যথা+উক্ত)

উ > √বন্ধ্ + উ = বন্ধু;

ইতে > √কর্ + ইতে = করিতে

(খ) তদ্ধিত বা শব্দ প্রত্যয় :

অ > মনু + অ = মানব; পাণ্ডু + অ = পাণ্ডব; পৃথিবী+অ= পার্থিব;

য > দিতি + য = দৈত্য; বিচিত্র + য = বৈচিত্র্য;
পণ্ডিত + য = পাণ্ডিত্য

ই > রাবণ + ই = রাবণি; সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি

এয় > গঙ্গা + এয় = গাঙ্গেয়; অগ্নি + এয় = আগ্নেয়;

আয়ন > নার + আয়ন = নারায়ণ; রাম + আয়ন = রামায়ণ;
দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন;

ঈয় > ভারত + ঈয় = ভারতীয়; দেশ + ঈয় = দেশীয়;

ইক > ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক; শরীর + ইক = শারীরিক

ইত > পুষ্প + ইত = পুষ্পিত; পিপাসা + ইত = পিপাসিত

ইন্ > সুখ + ইন্ = সুখী; রথ + ইন্ = রথী

ঈন > কুল + ঈন = কুলীন; গ্রাম + ঈন্ = গ্রামীন

বিন্ > মেধা + বিন্ = মেধাবী; তেজস্ (তেজঃ) + বিন্ = তেজস্বী।

ময় > মৃৎ + ময় = মৃণ্ময়; জল + ময় = জলময়।

মান/বান > শ্রী + মান = শ্রীমান; জ্ঞান + বান = জ্ঞানবান।

ইন্ > ঐশ্বর্যশাল + ইন্ = ঐশ্বর্যশালী;

ইয় > অঙ্গুরি + ইয় = অঙ্গুরীয়

অ > সহস্ (বল বা তেজ) + অ = সাহস

ইক > অন্তর + ইক = আন্তরিক

ইমা > গুরু + ইমা = গরিমা; রক্ত + ইমা = রক্তিমা।

ল > মাংস + ল = মাংসল; শ্যাম + ল = শ্যামল।

আমি/মি/মো/আমো > জেঠা + আমি = জেঠামি।

ই > মাস্টার + ই = মাস্টারি; দালাল + ই = দালালি।

ইয়া (এ) > জোগাড় + ইয়া = জোগাড়ে; মাটি + ইয়া = মেটে।

উয়া (ও) > মাছ + উয়া = মেছো; বন + উয়া = বুনো।

উক > ভাব + উক = ভাবুক; লাজ + উক = লাজুক।

টিয়া (টে) > ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটে; ঝগড়া + টিয়া = ঝগড়াটে।

পানা/পারা > চাঁদ + পানা = চাঁদপানা; পাগল + পারা = পাগলপারা।

আই > কান + আই = কানাই; খাড়া + আই = খাড়াই।

মন্ত/ বন্ত > ভাগ্য + বন্ত = ভাগ্যবন্ত; শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত।

পনা > গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা; দুরন্ত + পনা = দূরন্তপনা।

(গ) বিদেশি প্রত্যয়

আনা > বিবি + আনা = বিবিয়ানা; মালিক + আনা = মালিকানা
আনি > বাবু + আনি = বাবুয়ানি।

ওয়ান > দ্বার + ওয়ান = দারোয়ান; কোচ + ওয়ান = কোচোয়ান।
গর > জাদু + গর = জাদুগর; কারি + গর = কারিগর।
খোর > নেশা + খোর = নেশাখোর; গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর।

চি > কলম + চি = কলমচি; তবল + চি = তবলচি।

দান/দানি > কলম + দান = কলমদান; ধূপ + দানি = ধূপদানি।

দার > খবর + দার = খবরদার; দোকান + দার = দোকানদার।

শব্দার্থ ও টীকা

গিরি > কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি; বাবু + গিরি = বাবুগিরি।

নবিশ > শিক্ষা + নবিশ = শিক্ষানবিশ; পত্র + নবিশ = পত্রনবিশ।

সই > প্রমাণ + সই = প্রমাণসই; মানান + সই = মানানসই

ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.3

1. **নীচে শব্দ ও প্রত্যয় দেওয়া আছে। দুটো যোগ করে শব্দ গঠন করুন:**

(i) রাম + আয়ন = (ii) বিচিত্র + য় = (iii) জাতি + ঈয় =

(iv) কলুষ + ইত = (v) সুখ + ইন্ = (vi) সুখ + ময় =

(vii) কীর্তি + মান = (viii) ধন + বান = (ix) মানব + ইক =

2. **ধাতু ও প্রত্যয় দেওয়া হল। দুটো যোগ করে শব্দ গঠন করুন:**

(i) চল্ + অন্ত = (ii) দৃশ্ + তি = (iii) কৃ + তব্য =

(iv) গম্ + অন = (v) বন্ধ্ + উ = (vi) পড়্ + উয়া =

(vii) পঠ্ + ইত = (viii) ঝাঁক্ + উনি = (ix) দা + তা =

3. **নীচের বাক্যের প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি বেছে নিন:**

(i) তাঁর পাণ্ডিত্য সকলেই জানে।

(ii) দিল্লিতে দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই আছে।

(iii) বর্ষায় হল কর্ষণ হয়।

(iv) তোমার মতো বিত্তবান কজন আর আছে।

(v) অনেকে এই মাসিক পত্রিকার পাঠক।

(vi) চিত্রল হরিণ আরণ্যক প্রাণী।

13.3.2 সমাস যোগে শব্দগঠন :

এই বিদ্যালয় বহু প্রাচীন।

গাছপাকা আম খেতে ভারী মজা।

দাগ দেওয়া শব্দ দুটি 'বিদ্যালয়' এবং 'গাছপাকা'কে একটি করে শব্দ মনে হলেও আসলে এরা দুটি করে শব্দের মিলনে তৈরি হয়েছে। শব্দ দুটি ভাঙলে এমনি হয় — বিদ্যার যে আলয় এবং গাছে পাকা। শব্দগুলি যথাক্রমে হল - 'বিদ্যা ও আলয়' এবং 'গাছ ও পাকা'। দুটি করে শব্দ মিশে একটি শব্দে পরিণত হওয়ার এই নিয়মকে বলে **সমাস**। 'সমাস' কথার অর্থ হল 'সংক্ষেপ করা'।

কিন্তু একটি কথা, যে কোনো দুটি শব্দের মিলনেই সমাস হয় না। পাশাপাশি শব্দ-দুটির মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে এবং শব্দ দুটির অর্থ থাকতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক — শিবনাথ ঘরে নেই। এখানে

'শিবনাথ' এবং 'ঘর' শব্দ দুটির অর্থ আছে আর এরা পাশাপাশি বসেছেও। কিন্তু এদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। এ শব্দ দুটিকে মিলিয়ে যদি বলা হয় 'শিবনাথঘর', তাহলে কোনো মানেই হয় না। অতএব এটি কোনো অবস্থাতেই সমাসবদ্ধ পদ নয়।

সুতরাং পরস্পর অর্থসহ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশি পদের মিলনে গঠিত একপদের নাম হল সমাস।

আবার, 'বিলেতফেরত' এই সমাসবদ্ধ পদটিকে ভেঙে দেখালে এমনি হয় — 'বিলেত থেকে ফেরত'। 'থেকে' বলে একটি বাড়তি শব্দ এনে শব্দ দুটির মিলন ঘটানো হয়েছে। এই ভেঙে দেখানো প্রক্রিয়াকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। যে পদ দুটি নিয়ে সমাস তৈরি হল, তাদের বলে সমাসবদ্ধ পদ। এখানে বিলেত - পূর্বপদ এবং ফেরত - পরপদ হল সমস্যমান পদ (যে পদগুলি নিয়ে সমাস তৈরি হয়) আর দুটি পদের মিলিত রূপ অর্থাৎ 'বিলাত-ফেরত' পদটি হল সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ।

সমাস প্রধানত পাঁচ রকমের হতে পারে। যেমন, (১) কর্মধারয়, (২) তৎপুরুষ, (৩) দ্বন্দ্ব, (৪) বহুব্রীহি ও (৫) দ্বিগু। এদের আবার নানা উপবিভাগ আছে। বর্তমানে অত বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে সমাসের নামের উল্লেখেরও প্রয়োজন নেই। সাহিত্যপাঠের সময়ে সমাসবদ্ধ পদের দেখা মিললে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে — কোন্ কোন্ শব্দের মিলনে এবং কীভাবে (অর্থাৎ ব্যাসবাক্য) তৈরি হয়েছে। এই জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য সমস্তরকম সমাসেরই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে প্রয়োজনে আপনারা সমাস সম্বন্ধে কৌতূহল মেটাতে পারবেন এবং নিজেরাই সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য তৈরি করতে এবং সম্বন্ধযুক্ত দুটি বা তার বেশি পদের মিলন ঘটিয়ে সমাস তৈরি করতে পারবেন।

A . বিভিন্ন সমাসের উদাহরণ দেওয়া হল ব্যাসবাক্য করে :

1) নীল যে কমল = নীলকমল।

2) যা কাঁচা তাই মিঠে = কাঁচামিঠে।

3) কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো।

4) মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

5) প্রাণরূপ পাখি = প্রাণপাখি

6) কীর্তি প্রকাশক মন্দির = কীর্তিমন্দির

7) বীজকে বোনা = বীজবোনা

8) দা দিয়ে কাটা = দা-কাটা

9) রান্নার নিমিত্ত (জন্য) ঘর = রান্নাঘর

10) লোক থেকে লজ্জা = লোকলজ্জা

11) বিশ্বের স্রষ্টা = বিশ্বস্রষ্টা

12) জগতে বিখ্যাত = জগৎবিখ্যাত

13) অ (নয়) সুস্থ = অসুস্থ

14) মধুপান করে যে = মধুপ

15) জীবন পর্যন্ত = আজীবন

16) আধ (অর্ধ) ভাবে ময়লা = আধময়লা

17) মানবকে অতিক্রম করে যে = অতিমানব

18) সত্য বলে যে = সত্যবাদী

19) মড়ার জন্য কান্না = মড়াকান্না

20) যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত = যন্ত্রচালিত

21) মা ও বাবা = মা-বাবা

22) পীত অম্বর (কাপড়) যার = পীতাম্বর

23) চৌ (চার) রাস্তার সমাহার (মিলন) = চৌরাস্তা

24) অন্য ভাষা = ভাষান্তর

25) তেল দিয়ে ভাজা = তেলেভাজা

13.4 আপনি যা শিখলেন

(i) শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে বর্ণ (চিহ্ন) যোগ করে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে প্রত্যয়;

(ii) শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হয় শব্দপ্রত্যয়, আর ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হয় ধাতু প্রত্যয়;

(iii) প্রত্যয় দিয়ে শব্দ তৈরি হবার ফলে মূল শব্দ বা ধাতুর চেহারার বদল হয়;

(iv) শব্দ ভেঙে প্রত্যয় আলাদা করার রীতি প্রকৃতি;

(v) প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের নিয়ম;

(vi) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদের মিলনের নাম হল সমাস;

(vii) সমাসবন্ধ পদকে ভেঙে দেখানোকে বলা হয় ব্যাসবাক্য;

(viii) যে পদগুলি দিয়ে সমাস হয়, তাদের বলে সমস্যমান পদ;

(ix) বাক্যে সমাসবন্ধ পদ একদিকে যেমন বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে, অন্যদিকে তা বাক্যের সৌন্দর্য বাড়াতেও সাহায্য করে;

(x) ব্যাসবাক্য সহ সমাস করার নিয়ম;

(xi) বাক্যে সমাসবন্ধ পদের ব্যবহার করতে।

শব্দার্থ ও টীকা

13.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

A.

1. প্রত্যয় কাকে বলে? কত রকমের ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

2. কৃৎ প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন শব্দকে কী বলে? তদ্ধিত প্রত্যয় থেকে নিষ্পন্ন শব্দকে কী বলে? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দিন।

3. পদ গঠনে প্রত্যয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (৫-৬টি বাক্যে)

4. নীচের প্রত্যয়গুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করুন :

   আমি, অন, টে, আই, অন্ত, এয়, ইত, এ, ওয়ালা, টন, খানা, দার, খোর।

5. প্রত্যয় ভেঙে দেখান :

   a) জ্ঞাতি — .... + ...

   b) দেহখানা— .... + ...

   c) দৃশ্যমান — .... + ...

   d) খানিক — .... + ...

   e) গ্রাম্য — .... + ...

   f) ক্রুদ্ধ — .... + ...

   g) মুখর — .... + ...

   h) দারিদ্র্য — .... + ...

   i) কর্তব্য — .... + ...

   j) আদেশ — .... + ...

   k) গ্রহণ — .... + ...

   l) খেলোয়াড় — .... + ...

   m) দারোয়ান — .... + ...

   n) ঢাকাই — .... + ...

6. প্রত্যয় নির্ণয় করুন : (শুধু প্রত্যয়ের নাম উল্লেখ করবেন)

   তৃপ্ত, বাস্তবিক, দৈব, পাক্ষিক, পূজনীয়, কৃত।

শব্দার্থ ও টীকা

B. নীচে কয়েকটি সমাসের ব্যাসবাক্য করে দেওয়া হল। এদের সমাসবদ্ধ করুন:

1. নীল যে কমল =
2. শৈশব পর্যন্ত =
3. বৌ ভাত দেয় যে অনুষ্ঠানে =
4. পুত্রের সঙ্গে বর্তমান =
5. মাজা ও ঘষা =
6. জন্ম পর্যন্ত =
7. মানব রূপে জন্ম =
8. অন্য মন যার =
9. নিঃ (নেই) তরঙ্গ যার =
10. অন (নয়) আচার =
11. ইষ্টকে অতিক্রম না করে =
12. ময়ূরের কণ্ঠের মতো বর্ণ যার =
13. কীর্তির কলাপ (সমূহ) =
14. পুত্রের বধূ =
15. সুভাষ নামে কাকা =
16. দ্বৈধ যে মত =
17. বে (নেই) আন্দাজ =
18. কৌতূহল আছে যার =
19. বাক্যের অর্থ =
20. লোকের দ্বারা গড়ে ওঠা অরণ্য =

C. ব্যাসবাক্য করে সমাস নির্ণয় করুন :

অশ্রদ্ধেয়, গণিতশাস্ত্র, পদাঘাত, দেবালয়, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শকসমক্ষে, বিপদাপন্ন, সহোদর, ষোড়শ

D. নীচে কয়েকটি সমাসবদ্ধ পদ দেওয়া হল। এদের ব্যাসবাক্য করুন :

সমাসবদ্ধ পদ **ব্যাসবাক্য**

1. অসম্ভব =
2. সুভাষ-কাকিমা =

3. চাঁচাছোলা =

4. অবেলা =

5. অম্লানবদন =

6. শুক্লপক্ষ =

7. রাতবিরেত =

8. অনিচ্ছা =

9. গাছতলা =

10. অনাসক্ত =

11. শেষকৃত্য =

12. মুখভঙ্গি =

13. লেখাপড়া =

14. বামুনদিদি =

15. মনোভাব =

16. লাঠিবসানো =

17. আনাচ-কানাচ =

18. গাঁ ঘর =

19. জেনেবুঝে =

20. প্রাণপণ =

শব্দার্থ ও টীকা

14

ভাষারীতি

(সাধু ও চলিত ভাষা)

14.1 প্রস্তাবনা

আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি কথা বলে অথবা লিখে। কথা মুখেই বলি বা লিখেই বলি তার একটা চাল থাকে। বলার বিষয়টা যদি হালকা চালের হয় তবে ভাষার মধ্যেও একটা হালকা বা চটুল চাল দেখা দেয়। আর বলার বিষয় যদি একটু ভারিক্কি ধরনের হয় তবে ভাষার মধ্যেও একটা ভারিক্কি চাল থাকে। এই হল ভাষার চাল। ভাষার চালকে অন্য কথায় বলা হয় ভাষারীতি। আমাদের লেখার ভাষায় দুরকম রীতি আছে: (১) সাধুরীতি — এটা পুরনো ধরনের, (২) চলিত রীতি — এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ভারিক্কি = গম্ভীর।

আগে গদ্য লেখার তেমন চল ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যবই, সংবাদপত্র, ধর্মীয় ইস্তাহার, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি লেখার প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে গদ্য লেখার চল হল। এই সময়ে বাঙালি সমাজের সংস্কৃতজানা পন্ডিতেরা বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে ভাবলেন শিক্ষিত লোকের ভাষার চাল হালকা হওয়া উচিত নয়, গুরুগম্ভীর হওয়া উচিত। তাই তাঁরা তাঁদের লেখার ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে লাগলেন। এই ধরনের সংস্কৃতবহুল ভাষারীতিকে বলা হত সাধুভাষা। 'সাধু' শব্দটির অর্থ যা বা যে সাধন করে। এই ধরনের ভাষায় যেসব সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হত সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সাধন করত। এজন্য ওই ভাষার নাম হল সাধু ভাষা। কিন্তু সাধু রীতির ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশি-বিদেশি-তদ্ভব মেশানো হালকা চালের ভাষা ব্যবহার চলতে থাকল। তর্ক উঠল মুখের ভাষা শুনে যখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, তবে তাকে লেখার বাক্যে ব্যবহার করা যাবেনা কেন? আবার প্রশ্ন উঠল, বাংলার কোন্ এলাকার মুখের ভাষা। শেষে স্থির হল কলকাতা এলাকায় সবারই যাতায়াত আছে। তাই কলকাতা এলাকার মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই নতুন লেখার ভাষা চালু হোক। 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। শুরু হল কলকাতা এলাকার কথ্য ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন লেখার ভাষা, যাতে গম্ভীর, হালকা সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যাবে। এই নতুন রীতিতে লেখার ভাষার নাম হল চলিত ভাষা। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষই এই ভাষাকে লেখার ভাষা বলে মেনে নেওয়ায় এই ভাষাই হল মান্য চলিত বাংলা ভাষা (Standard Colloquial Bengali)।

ইস্তাহার = প্রচারপত্র।

14.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনারা—

- বাংলা লেখ্য গদ্য উপভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- সাধু ভাষারীতির প্রকৃতি বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- চলিত ভাষারীতির প্রকৃতি বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার তফাত জানতে ও বুঝতে পারবেন;
- সাধু থেকে চলিত এবং চলিত রীতির বাক্যকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন করতে পারবেন;
- বর্তমানে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রাধান্য বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে যে মান্য চলিত রীতির ব্যবহারেরই প্রাধান্য তা বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন।

14.3 বিষয়ের রূপরেখা

14.3.1

(১) কথাবার্তায়, নাটকের সংলাপে, বক্তৃতায়, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) খবরের কাগজে, রেডিয়ো ও টি.ভি.র সংবাদপাঠে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় সেটা চলিত ভাষা। আপনি বলতে পারেন প্রায় সবই যখন চলিত ভাষাতেই হচ্ছে, তখন সাধু ভাষার কথা আসছে কেন। উত্তরে বলা যায়, প্রাচীন লেখকদের ভাষার সঙ্গে যে আমাদের পরিচিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অবশ্য সাধু-চলিত দুই রীতিতেই লিখেছেন। সাধুভাষায় লেখা তাঁদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে হবে সেগুলোর বক্তব্য। তাই সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য আমাদের জানতে হবে।

(২) লিখতে গেলে, এমন-কি বলতে গেলে সাধু ও চলিত মিশে যেতে পারে। এ রকমটি ঘটলে তাকে বলে ‘গুরু চণ্ডালী দোষ’। ভাষাতে এ দোষ যাতে না ঘটে তার জন্যও সাধু-চলিত সম্বন্ধে ঠিক মতো জেনে নেওয়া দরকার।

পাঠগত প্রশ্ন : 14.1

উপরের অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর দিন —

1. নীচে সাধুভাষা / চলিত ভাষা — ঠিক জায়গায় বসান :

(a) নাটকে, কথাবার্তায় সাধারণত ____________ ব্যবহৃত হয়।

(b) বিদ্যাসাগরের লেখায় ____________ ব্যবহৃত হয়েছে।

(c) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ____________ ব্যবহৃত হয়েছে।

2. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য জানা দরকার কী জন্য? ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(a) রেডিয়োর খবর শুনে বোঝার জন্য।

(b) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিষয় জানার জন্য।

(c) বক্তৃতা দেবার জন্য।

14.3.2 কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বুঝতে পারবেন চলিত ও সাধু ভাষার ব্যবহার কী ভাবে হয়। চলিত ও সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা হবে।

(i) — কেমন আছেন হরিপদবাবু?

— এই চলে যাচ্ছে। আপনি কোথায় চললেন?

— আপনার কাছেই যাচ্ছি।

— কী ব্যাপার বলুন তো?

— সাধু আর চলিত ভাষা রীতির বিষয়ে একটু কথা ছিল।

(— এটি সাধারণ কথাবার্তার নমুনা।) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(ii) (বনপথ। একটি বাঘ খাঁচায় আটকে পড়েছে। একজন লোক সে পথ দিয়ে আসছে।)

বাঘ — ও ভাই, একটু শুনবে। একটু এ দিকে আসবে ভাই।

লোক — এই বনে-বাদাড়ে ভাই ডাকছে কে? গলাটা তো মানুষের মতো নয়।

বাঘ — এই যে আমি। আমি ডাকছি তোমায়।

লোক — ও! এযে খাঁচায় পড়েছে। তাহলে যাই একবার (খাঁচার কাছে গেল) — বলো — কী বলছিলে?

বাঘ — এই খাঁচার দরজাটা একটু খুলে দেবে?

লোক — বটে! আমি খাঁচা খুলে দিই, আর বাইরে এসে তুমি আমার ঘাড় মটকাবে, তাই না!

(এটি 'দুষ্টের শাস্তি' নাটিকার সংলাপ। নাট্যকার - উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(iii) কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি :

প্রবীণ জননেতা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর স্মরণে, শ্রদ্ধায় আজ শহরের সব পথ মিশে যাবে শহিদ মিনার ময়দানে। সন্দেহ নেই অনেকেই ঢুকতে পারবেন না মূল ময়দানে। তবু পথ হাঁটবেন ফুল হাতে। (সংবাদ) (চলিত রীতির উদাহরণ)

(iv) তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্বিত বাক্যে বলিল, মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য সদ্ব্যবহারের বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।

('সভ্য ও অসভ্য' - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) (সাধু রীতির উদাহরণ)

(v) বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, ''মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না — ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে?''

('সাগরসঙ্গমে নবকুমার' - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) (সাধু রীতির উদাহরণ)

পাঠগত প্রশ্ন : 14.2

উদাহরণ (i) - (v) পড়ে নিয়ে উত্তর করুন —

B. ৩. ডানদিকে ভাষারীতি উল্লেখ করুন —

লেখা	ভাষারীতি
(a) বাঘ — এই খাঁচার দরজাটা একটু খুলে দেবে?	________
(b) ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে?	________
(c) আপনার কাছেই যাই।	________
(d) তবু পথ হাঁটবেন ফুল হাতে।	________
(e) অসভ্যজাতি সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।	________

14.3.3 সাধু ও চলিতের রূপগত তফাত আছে। এই তফাত দুই রীতির ভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গ (থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা) ও অন্যান্য কয়েকটি অব্যয়, বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতির রূপ দেখলে বোঝা যায়।

নীচে দুদিকের ক্রিয়াগুলির রূপ ভালো করে লক্ষ করুন :

(i) মহাদেব সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যেত।	মহাদেব সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছাইয়া যাইত।
(ii) তাহলে লক্ষ্যটা ফস্কে যেত না।	তাহা হইলে লক্ষ্যটি ফস্কাইয়া যাইত না।
(iii) তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।	তিনি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।
এই অংশের ক্রিয়াপদ	এই অংশের ক্রিয়াপদ
পৌঁছে	পৌঁছাইয়া
যেত	যাইত
হয়ে	হইয়া
পড়েছিলেন	পড়িয়াছিলেন

পাঠগত প্রশ্ন : 14.3

উদাহরণ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. নীচের দুদিকের অংশের সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি চিহ্নিত করুন —

(i) তিনি প্রহার করিতে লাগিলেন।	তিনি প্রহার করতে লাগলেন।
(ii) অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকিবে।	অনেকে নির্দেশ করে থাকবে।
(iii) সে ঘুড়ি উড়াইতে চাহিল।	সে ঘুড়ি ওড়াতে চাইল।
(iv) সব আনিতে হইত।	সব আনতে হত।
(v) তুমি বলিয়া বেড়াইতেছ।	তুমি বলে বেড়াচ্ছ।
(vi) এটি দেখিতে পাইয়াছি।	এটি দেখতে পেয়েছি।

ক্রিয়ার সাধুরূপ		ক্রিয়ার চলিতরূপ	
(1)	(2)	(1)	(1) ....
(3)	(4)	(3)	(4) ....
(5)	(6)	(5)	(6) ....
(7)	(8)	(7)	(8) ....
(9)	(10)	(9)	(10) ....
(11)	(12)	(11)	(12) ....
(13)	(14)	(13)	(14) ....

৫. **বাঁদিকের ক্রিয়ার সাধুরূপ অনুযায়ী ডানদিকের চলিত রূপটিতে টিক (✓) দিন :**

(a) গাহিতে	গাইতে / গেতে
(b) খাইয়াছি	খাচ্ছি / খেয়েছি
(c) করিলেন	করলেন / করেছিলেন
(d) করিতেছিলেন	করলেন / করছিলেন

14.3.4 সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদের রূপের। ক্রিয়া দু'রকমের — **অসমাপিকা** ও **সমাপিকা** ক্রিয়া।

অসমাপিকা ক্রিয়া (যে ক্রিয়া বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে না) : সাধুভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার — বিভক্তি ইয়া, ইতে, ইলে। চলিত ভাষায় যথাক্রমে এ, তে, লে, হয়।

যেমন,	ইয়া > এ		ইতে > তে		ইলে > লে	
	সাধু —	চলিত	সাধু —	চলিত	সাধু —	চলিত
	বলিয়া	বলে	পড়িতে	পড়তে	চলিলে	চললে
	করিয়া	করে	যাইতে	যেতে	দেখিলে	দেখলে

সমাপিকা ক্রিয়া (যে ক্রিয়া বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে : মনে রাখবেন, সাধারণ বর্তমানকালের সাধু ও চলিত-এর ক্রিয়ারূপ এক। বাকি জায়গায় পরিবর্তন করা যায়।

ক) ঘটমান বর্তমান : উদাহরণ

সাধু —	চলিত	সাধু —	চলিত
ইতেছ,	ছ, চ্ছে	যাইতেছ	যাচ্ছ
ইতেছে	ছে, চ্ছে	হাঁটিতেছে	হাঁটছে
ইতেছি	ছি, চ্ছি	বলিতেছে	বলছে
দেখাইতেছে	দেখাচ্ছে	পড়াইতেছি	পড়াচ্ছি

খ) ঘটমান অতীত : উদাহরণ—

সাধু —	চলিত	সাধু —	চলিত
যাইতেছিলে	যাচ্ছিলে	বলিতেছিলাম	বলছিলাম
করিতেছিল	করছিল	শুনিতেছিলাম	শুনেছিলাম

গ) পুরাঘটিত বর্তমান : উদাহরণ—

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইয়াছি		এছি	বলিয়াছ		বলেছ
ইয়াছে		এছে	করিয়াছে		করেছে
ইয়াছ		এছ	দেখিয়াছ		দেখেছ

ঘ) পুরাঘটিত অতীত : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইয়াছিল		এছিল	করিয়াছিল		করেছিল
ইয়াছিলাম		এছিলাম	বলিয়াছিলাম		বলেছিলাম

ঘ) সাধারণ অতীত/ভবিষ্যৎ : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইল		ল	করিল		করল
ইলাম		লাম	বলিলাম		বললাম
ইব		ব	দেখিব		দেখব
ইবে		বে	শুনিবে		শুনবে
ইলে		লে	পড়িলে		পড়লে

ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত : উদাহরণ —

সাধু	—	চলিত	সাধু	—	চলিত
ইত		ত	করিত		করত
ইতে		তে	করিতে		করতে
ইতাম		তাম	বলিতাম		বলতাম

14.3.5 সাধু চলিতের সর্বনামের রূপের তফাত।

নীচের দু-দিকের সর্বনামগুলি দেখলে তাদের রূপের তফাতটা ধরতে পারবেন :

সাধু	**চলিত**
তাহাদের মতলব ছিল খারাপ।	তাদের মতলব ছিল খারাপ।
কাহারো হাতে বাঁশের লাঠি।	কারো হাতে বাঁশের লাঠি
ভূষণ কাহাকে ধরে?	ভূষণ কাকে ধরে?
ইহার নাম কী?	এর নাম কী?
উহা তো জানা ছিল না।	ওটা তো জানা ছিল না।

সর্বনামের সাধুরূপ	**সর্বনামের চলিত রূপ**
তাহাদের	তাদের
কাহারও	কারও

শব্দার্থ ও টীকা

কাহাকে	কাকে
ইহার	এর
উহা	ওটা
তাহার	তাঁর

কয়েকটি সর্বনামের সাধু-চলিত রূপ দেখুন :

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
যাহা	যা	তাহা	তা
ইহা	এ, এটি, এটা	উহা	ও, ওটি, ওটা
তিনি	উনি	উঁহার	ওঁর, ওনার
তাহাকে	তাকে	তাহাদিগকে	তাদেরকে, তাদের
তাঁহাকে	তাঁকে	তাঁহার	তাঁর
যাহাকে	যাকে	তাহাদের	তাদের
যাঁহাকে	যাঁকে	তাঁহাদেরকে	তাঁদেরকে
মদীয়	আমার	ত্বদীয়	তোমার
তদীয়	তার	ভবদীয়	আপনার
অন্যদীয়	অন্যের	সর্ব	সব

পাঠগত প্রশ্ন : 14.4

অনেকগুলি সর্বনাম পদের রূপ শিখলেন। এবার এগুলির সাহায্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. নীচের পদগুলির মধ্যে চলিত রীতির সর্বনাম পদ আছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে লিখুন।

তাহাকে
তাঁহার
তাদের
তাহাদের
তাঁকে

2. নীচের পদগুলির মধ্যে সাধু রীতির সর্বনাম পদ আছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে লিখুন।

ওর
তাঁদের
ওঁর
তোমাদিগের
তাকে

3. নীচের বাক্যগুলির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি চিহ্নিত করে শূন্যস্থানে লিখুন :

(i) তুমি ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইতেছ। ....

(ii) আর কেহ না জানিলেও আমি তাহা জানি। ....

(iii) আপনি ওইটাকে আবার কোথায় পাইলেন? ....

(iv) তাহাতে কিছু হইবে না। ....

14.3.6 সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপের তফাত দেখা গেছে। সাধু-চলিতের অনুসর্গেরও কিছু পার্থক্য আছে। নীচের বাক্যগুলি দেখলে তা বোঝা যাবে।

গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল।	গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল।
ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।	ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল।
লোকটির কাছে গেল।	লোকটির নিকটে গেল।
রাতের চেয়ে দিন ভালো।	রাত অপেক্ষা দিন ভালো।

উপরের চলিত অনুসর্গ	উপরের সাধু অনুসর্গ
থেকে	হইতে
দিয়ে	দিয়া
কাছে	নিকটে
চেয়ে	অপেক্ষা

সাধু রীতির ও চলিত রীতির কয়েকটি অনুসর্গ দেখুন :

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
সহিত/সমভিব্যাহারে	সঙ্গে, সাথে	হইতে / অপেক্ষা/ চাহিতে/ ন্যায়	চেয়ে
নিমিত্ত	জন্য		
অনন্তর	তারপর	সদৃশ, তুল্য	মতন/মতো/মত
		অভিমুখে	দিকে

এমন দু-একটি অনুসর্গ আছে, যেগুলো সাধু-চলিত দুই রীতিতেই চলে। লক্ষ্য করুন—

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
জন্য	জন্য
পরে	পরে
সঙ্গে	সঙ্গে

পাঠগত প্রশ্ন 14.5

উদাহরণ ৭.৬ - ৭.৮ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. **নীচের বাক্যগুলিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গগুলো চিহ্নিত করে শূন্যস্থানে বসান ঃ**

   (i) তাহার সহিত আবার ঝগড়া করিলে। ....

(ii) সে তো তোমার নিমিত্ত অনেক করিয়াছে। ....

(iii) তুমি নদী অভিমুখে যাইতেছিলে। ....

(iv) সে অন্যদিক দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ....

শব্দার্থ ও টীকা

14.3.7 এরকম আরও কয়েকটি শব্দ আছে যেগুলির সাধু রূপ ও চলিত রূপে তফাত দেখা যায়। তবে এরকম শব্দ সাধু-চলিত দুই রীতিতেই ব্যবহার হতে দেখা যায়। সেজন্য এই সাধু ও চলিতের তফাত বোঝার পক্ষে খুব একটা দরকারি নয়।

সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে	সাধু রীতিতে	চলিত রীতিতে
ভিতর	ভেতর	পূজা	পুজো
তুলা	তুলো	শৃগাল	শেয়াল
মাহিনা	মাইনে	বানর	বাঁদর
পূর্ব	পুব	মূর্খ	মুখ্যু
সন্ধ্যা	সন্ধে	তিনটা	তিনটে
মহাশয়	মশায়	বৎসর	বছর
প্রাতঃকাল	সকাল		

পাঠগত প্রশ্ন : 14.6

উদাহরণ পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

1. চিহ্নিত শব্দগুলি পরিবর্তন করে নীচের বাক্যগুলি ডান দিকে চলিত ভাষায় লিখুন :

(i) **প্রাতঃকাল** **হইতে** বৃষ্টি **পড়িতেছে**। (i) ....

(ii) **তাহারা** **কেহই** কাজে **বাহির** **হইতে** পারে **নাই**। (ii) ....

(iii) **সকলেই** ঘরের **ভিতর** **বসিয়া** আছে। (iii) ....

পাঠগত প্রশ্ন : 14.7

উদাহরণ পড়ে নিয়ে উত্তর দিন :

1. নীচের যে বাক্যে সাধু-চলিতের মিশে যাবার ফলে ভাষার গুরু-চণ্ডালী দোষ ঘটছে তার পাশে কাটা (✗) চিহ্ন, এবং যেখানে দোষ হয়নি তার পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন :

(a) এটা কে লিখেছে? ☐

(b) আমি তো এটা লিখি নাই। ☐

(c) আমি বললাম, ‘ভালো করে দেখুন’। ☐

(d) তিনি পূর্বপাড়া থেকে পুত্র সমভিব্যাহারে আসছিলেন। ☐

(e) প্রত্যহ কিছুক্ষণ হাঁটিয়া আসিলে ভালো হয়। ☐

(f) 'আবার আসিব ফিরে . . . এই বাংলায়।' — জীবনানন্দ দাশ ☐

(g) তখন হইতে খালি বকবক করিয়া যাচ্ছ। ☐

(h) খুলিতে এসেছি সকল বন্ধ দ্বার। — কাজী নজরুল ইসলাম ☐

(i) প্রহর চলিয়া যায় বেলা পড়ে আসে। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ☐

14.4 আপনি যা শিখলেন

(i) সাধুরীতির ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও ওই রীতিতে লেখবার ও বলবার পদ্ধতি।

(ii) চলিতরীতির ভাষার কিছু বিশেষত্ব ও ওই রীতিতে বলবার ও লেখবার কৌশল।

(iii) সাধুরীতি ও চলিতরীতির ভাষার প্রভেদ।

(iv) দুটি রীতিতেই ভিন্নভাবে লেখবার ও বলবার কৌশল।

(v) বর্তমানে বলা বা লেখা, উভয় ক্ষেত্রেই চলিত রীতির ব্যবহার।

(vi) সাধুরীতির ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

পাঠান্ত প্রশ্ন : 14.5

1. নীচে অনেকগুলি ক্রিয়াপদ দেওয়া আছে। তাদের মধ্যে যেগুলি সাধুরীতিতে লেখা সেগুলি বেছে নিয়ে সাধু চিহ্নিত শূন্যস্থানগুলিতে বসান এবং যেগুলি চলিত রীতিতে লেখা সেগুলি বেছে নিয়ে চলিত চিহ্নিত শূন্যস্থানগুলিতে বসান।

	সাধু	চলিত
তাকাতেই, খাইয়া	(a) ____________	(d) ____________
চলতে, পড়িয়াছি	(b) ____________	(e) ____________
ফেলিবার, ধরবার	(c) ____________	(f) ____________

2. **নীচে থেকে চলিতরীতিতে লেখা অনুসর্গগুলি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান:**

হইতে, থেকে, দিয়ে, দ্বারা	(a) __________	(c) __________
কাছে, ন্যায়, নিকট, পরে	(b) __________	(d) __________

শব্দার্থ ও টীকা

3. **নীচে (ক) গুচ্ছে সাধুরীতির পদ ও (খ) গুচ্ছে চলিতরীতির পদ দেওয়া আছে। বাঁ দিকের সংখ্যা দিয়ে পদগুলি মেলান। আপনাদের সুবিধার জন্য একটি দেখিয়ে দেওয়া হল :**

(ক) গুচ্ছ	(খ) গুচ্ছ	
1. করিল	করতে	( )
2. করিয়াছিল	করত	( )
3. করিতেছিল	করছে	( )
4. করিবে	করছিল	( )
5. করিত	করল	( )
6. করিতেছে	করবে	( )
7. করিতে	করেছিল	( )

4. **নীচের চলিতরীতির বাক্যগুলিকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন করুন :**

a) মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন।

b) তখন মনে হত বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই।

c) এই সুরেশদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন।

d) একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

e) চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন।

f) উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না।

5. **নীচের সাধুরীতির বাক্যগুলিকে চলিতরীতিতে পরিবর্তন করুন :**

a) যে যাহার কর্মফল লইয়া আসিয়াছে, ভোগ না করিয়া উপায় কী?

b) আমার সহিত কি আপনারা কেহ যাইবেন পিসিমা?

c) সে কথা পূর্বে খেয়াল হয় নাই, খেয়াল হইল সুভাষ-কাকিমার দরজায় আসিয়া।

d) — আসিয়াছ তো ভালোই হইয়াছে ভাই — বলিয়াই থামিলেন —

e) সুভাষ-কাকিমা একমুহূর্ত চুপ পরিয়া থাকিলেন, তাহার পর বলিলেন — কী জানি বুঝিতে পারিতেছি না।

f) ভাবিতেছি কী করিয়া পারিলেন?

g) পেডুয়াতে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়া, তিনি পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত যে-সকল নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবিত করেন, তাহা তৎকাল-প্রচলিত মতের নিতান্ত বিপরীত।

h) বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করাতে, ১৬৩৩ খ্রি: অব্দের শীতকালে, তাঁহাকে রোমনগরে গমন করিতে হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

i) কিন্তু ইটালির প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া, ১৫৯২ খ্রিঃ অব্দে, তাঁহাকে পেডুয়ার বিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিলেন।

6. **সাধুকে চলিতে এবং চলিতকে সাধুতে পরিবর্তিত করুন :**

a) নিযুক্ত করিলেন —

b) প্রদেশ হইতেও —

c) প্রচারিত হইবামাত্র —

d) প্রদর্শন করিতেছিলেন —

e) ভার অর্পিত হইল —

f) আসিয়া গিয়াছে —

g) তাঁর —

h) বুঝতে পেরে —

i) তাঁকে —

j) পরীক্ষা করলেন —

k) না-ছুঁয়ে বললে —

14.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

14.1

(a) — চলিত ভাষা

(b) — সাধু ভাষা

(c) — সাধু ভাষা

14.2 (b)

14.3

	সাধুরূপ		চলিতরূপ
(i)	করিতে, লাগিলেন	(i)	করতে, লাগলেন
(ii)	করিয়া, থাকিবে	(ii)	করে, থাকবে
(iii)	উড়াইতে, চাহিল	(iii)	ওড়াতে, চাইল
(iv)	আনিতে, হইত	(iv)	আনতে, হত
(v)	বলিয়া, বেড়াইতেছে	(v)	বলে, বেড়াচ্ছ
(vi)	চলিয়া যাইতে, পারিব	(vi)	চলে যেতে, পারব
(vii)	দেখিতে, পাইয়াছি	(vii)	দেখতে, পেয়েছি

14.3

(a) — গাইতে

(b) — খেয়েছি

(c) — করলেন

(d) — করছিলেন

14.4

(a) — তাঁকে, তাঁদের।

14.4

(a) — তোমাদিগের

14.4

(i) তুমি— ডুবিয়া, খাইতেছ

(ii) কেহ, আমি, তাহা— জানিলে, জানি

(iii) আপনি, ওইটাকে— পাইলেন

(iv) তাহাতে— হইবে

14.5

(i) করিলে — তাহার — সহিত

(ii) করিয়াছে— সে, তোমার — নিমিত্ত

(iii) যাইতেছিলে — তুমি — অভিমুখে

(iv) অগ্রসর হইতেছিল— সে— দিয়া

14.6

(i) সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে।

(ii) তারা কেউই কাজে বের হতে পারে নি।

(iii)সবাই ঘরের ভেতর বসে আছে।

14.7

(a) ✓

(b) ✗

(c) ✓

(d) ✗

(e) ✓

(f) ✗

(g) ✗

(h) ✗

(i) ✗

শব্দার্থ ও টীকা

15

বাক্যের রূপান্তর

(ক) গঠনগত, (খ) অর্থগত

15.1 প্রস্তাবনা

ভাষা ভাবের বাহন। ভাষা গঠিত হয় বাক্য নিয়ে। বাক্যই ভাবকে বহন করে। মনের বিচিত্র ভাব কিন্তু একরকম বাক্যে প্রকাশিত হয় না। তার নানান চেহারা, নানান ভাব। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক বিভিন্ন রকম বাক্যের প্রকৃতি। — (ক) আমি বই পড়ি। (খ) তুমি কী করছ? (গ) উঃ! কী শীত! (ঘ) তুমি গল্প বলো। (ঙ) তুমি গেলে আমি যাব। (চ) সীমা কাল বাড়ি যাবে। (ছ) যদি তুমি যাও তবে আমি যাব। (জ) তুমি যাবে কিন্তু আমি যাব না।

এই বাক্যগুলির মধ্যে (ক) থেকে (ঙ) পর্যন্ত বাক্যে তার বিভিন্ন চেহারার পরিচয় রয়েছে, আর (চ) থেকে (জ) পর্যন্ত বাক্যে তার বিভিন্ন ভাব বা অর্থের প্রকাশ ঘটেছে। এই হিসেবে বাক্যের দুটি রূপ — (ক) একটি গঠনগত, অন্যটি (খ) অর্থগত।

আমরা এই দুটি দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

15.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি আলোচনা করলে আপনারা :

- বাক্যের গঠনগত শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য যে বিষয় ও ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তা জেনে বাক্যের রূপান্তর করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন;
- প্রদত্ত বাক্যের শ্রেণি শনাক্ত করতে পারবেন;
- প্রদত্ত বাক্যের বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

- এই পাঠটি শিখলে অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবৈচিত্র্য জানতে পারবেন;
- বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- নিজেও এই অর্থের বাক্যকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারবেন।

15.3 বিষয়ের রূপরেখা

15.3.1 বাক্যের গঠনগত রূপ

গঠনগত দিক থেকে বাক্য চার রকমের — (ক) সরল বাক্য; (খ) যৌগিক বাক্য; (গ) জটিল বাক্য; এবং (ঘ) মিশ্রবাক্য।

(ক) সরলবাক্য : (সরল = সরাসরি)

(i) সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। (ii) সন্ধে হলে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

বাক্য দুটিতে 'ওড়াচ্ছে' এবং 'ফিরলাম' দুটি সমাপিকা ক্রিয়া। দুটি বাক্যের কর্তা 'সে' এবং 'আমরা'-র কাজ সম্পন্ন করছে। এ বাক্য দুটিকে বলে সরলবাক্য। কেননা এতে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) এবং একটি বিধেয় (ক্রিয়া) রয়েছে।

সুতরাং যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে বলে সরলবাক্য।

সরলবাক্য অর্থ কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক।

(খ) যৌগিক বাক্য : (যোগ করে গঠিত)

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক —

তিনি একাই পাহাড়ে উঠলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু উঠতে পারলেন না।

এখানে 'তিনি' কর্তার ক্রিয়া হল 'উঠলেন' আর 'তাঁর বন্ধু' কর্তার ক্রিয়া হচ্ছে 'পারলেন না'। দেখা যাচ্ছে দুটি সরল বাক্য একসঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে এবং বাক্য দুটিকে যুক্ত করতে সাহায্য করেছে 'কিন্তু' এই অব্যয় বা সংযোজক শব্দটি।

সুতরাং, একাধিক সরল বা স্বাধীন খণ্ডবাক্য যখন সংযোজক শব্দ বা বিভিন্ন জাতীয় অব্যয়পদ দিয়ে যুক্ত হয় এবং একটি পূর্ণবাক্যে পরিণত হয়, তাকে বলে যৌগিক বাক্য।

(গ) জটিলবাক্য :

একটি উদাহরণ — যে মেয়েটি এখানে এসেছিল, সে সতীর বোন ছিল না।

এখানে কর্তা 'মেয়েটি'র ক্রিয়া হল 'এসেছিল' এবং 'সে' কর্তার ক্রিয়া হল 'ছিল'। দুটি আলাদা বাক্য একসঙ্গে বসেছে ঠিক, কিন্তু বাক্যদুটিই প্রধান নয়। 'সে সতীর বোন ছিল না' বললে মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে। এটি একটি স্বাধীন খণ্ডবাক্য। কিন্তু 'যে মেয়েটি এখানে এসেছিল' বললে প্রশ্ন থেকে যায় 'কোন মেয়েটি?' সুতরাং এ খণ্ডবাক্যটি অন্য খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় একে বলে অপ্রধান খণ্ডবাক্য।

শব্দার্থ ও টীকা

একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য মিলে একটি পূর্ণবাক্য গঠন করলে তাকে বলে জটিল বাক্য।

(ঘ) মিশ্রবাক্য :

একটি উদাহরণ , 'বাড়িতে আরও জায়গা ছিল, কিন্তু সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই।' — এখানে 'বাড়িতে . . . ছিল' সরল বাক্য, 'সেটা . . . পারি নাই' জটিল বাক্য এবং 'কিন্তু' দুটি বাক্যকে যোগ করেছে। এটি মিশ্রবাক্য।

এভাবে মিশ্রবাক্য তৈরি হতে পারে — (i) সরল ও জটিল এর মিশ্রণে; (ii) যৌগিক ও জটিল বাক্যের মিশ্রণে; (iii) যৌগিক ও যৌগিক বাক্যের মিশ্রণে; এবং (iv) সরল ও যৌগিক বাক্যের মিশ্রণে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

(ক) জটিল : তাতে এই ঘটনা ঘটল যে তাঁর নামে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযোগ তোলা হল। (সরলবাক্য)
সরল : তাতে তাঁর নামে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযোগ তোলার ঘটনা ঘটল।

(খ) সরল : শীতকালে তাঁকে রোমনগরে যেতে হল। (জটিলবাক্য)
জটিল : যখন শীতকাল তখন তাঁকে রোমনগরে যেতে হল।

(গ) সরল : গালিলিয় নতুন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করে অনেক কিছু দেখতে পেলেন। (যৌগিকবাক্য)
জটিল : গালিলিয় নতুন যন্ত্র নভোমণ্ডলে প্রয়োগ করলেন এবং অনেক কিছু দেখতে পেলেন।

(ঘ) জটিল : তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যে-যথার্থ মত অবলম্বন করেছিলেন তার অনুশীলনে বিরত হননি। (যৌগিক বাক্য)
যৌগিক : তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে যথার্থ মত অবলম্বন করেছিলেন এবং তার অনুশীলনে বিরত হননি।

(ঙ) সরল : জেন্‌সন নামক এক ওলন্দাজ এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। (জটিলবাক্য)
জটিল : জেন্‌সন নামে একজন ওলন্দাজ ছিলেন যিনি এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 15.1

1. ডানদিক থেকে বেছে ঠিক উত্তরটি শূন্যস্থানে বসান :

(ক) বাক্য ___________ শ্রেণিতে বিভক্ত। (দুই/ তিন/ চার)

(খ) সরলবাক্যে থাকে ___________ ক্রিয়া। (একাধিক সমাপিকা/ একটি সমাপিকা/ একটি অসমাপিকা)

(গ) যৌগিক বাক্য গঠনে দুটি বাক্যকে যুক্ত করা হয় ___________ দিয়ে। (বিশেষ্য পদ/ সর্বনাম পদ/ অব্যয় পদ।)

(ঘ) জটিল বাক্য গঠিত হয় ___________ দিয়ে। (একটি প্রধান ও এক বা একাধিক খণ্ড বাক্য/ দুটি

শব্দার্থ ও টীকা

প্রধান খণ্ডবাক্য/ দুটি অপ্রধান খণ্ডবাক্য)

(ঙ) মিশ্রবাক্য হল __________ অন্যরূপ। (যৌগিক বাক্যের/ জটিল বাক্যের/ গঠনগত বাক্যের)

2. গঠনগত দিকে বাক্য কত রকমের ও কী কী?

3. একটি বাক্যে একাধিক ক্রিয়া থাকলে কী কী বাক্য হতে পারে?

4. **ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন। ভুল হলে (✗) চিহ্ন দিন :**

(ক) একটি অসমাপিকা ক্রিয়া একটি বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে পারে। (   )

(খ) সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য সম্পূর্ণ হতে পারে না। (   )

(গ) কোনো সংযোজক শব্দ ছাড়া যৌগিক বাক্য তৈরি হতে পারে না।(   )

(ঘ) জটিল বাক্যের দুটি বাক্যাংশই দুটি প্রধান খণ্ডবাক্য। (   )

(ঙ) একটি যৌগিক বাক্যকে সরলবাক্যে রূপান্তরের সময়ে দুটি সমাপিকা ক্রিয়াকেই অপরিবর্তিত রাখা যায়। (   )

15.3.2 বাক্যের অর্থগত দিক :

অর্থের দিক দিয়ে বাক্যকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল — (একটি ছকে দেখানো হল):

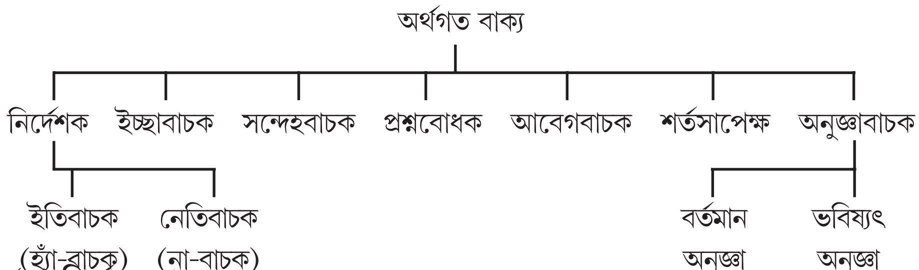

(ক) নির্দেশক বাক্য :

(i) আমি বাড়ি যাই। (ii) আমি বাড়ি যাই না।

বাক্যদুটির মধ্য দিয়ে দুটি আলাদা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা বলা হয়েছে আর অন্যটিতে না-যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলা হয় নির্দেশক বাক্য।

যে বাক্যে কোনো বক্তব্য সাধারণভাবে নির্দেশ করা হয় বা সাধারণভাবে বর্ণনা দেওয়া হয় তাকে বলে **নির্দেশক বাক্য**।

আবার যে নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছুর অস্তিত্ব 'আছে' এটা এই অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **ইতিবাচক নির্দেশক বাক্য** বা **হ্যাঁ-বাচক নির্দেশক বাক্য**।

আর, যে নির্দেশক বাক্যে কোনো কিছু সম্বন্ধে অস্বীকার বা নিষেধ করা বোঝায়, তাকে বলে **নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য বা না-বাচক নির্দেশক বাক্য**।

ওপরের (i) বাক্যটি অর্থাৎ 'আমি বাড়ি যাই' হল ইতিবাচক নির্দেশক বাক্য এবং (ii) বাক্য, অর্থাৎ 'আমি

শব্দার্থ ও টীকা

বাড়ি যাই না' হল নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য।

(খ) ইচ্ছাবাচক বাক্য :

(i) দীর্ঘজীবী হও। (ii) ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। (iii) 'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

তিনটি বাক্যের মধ্যে বক্তার ইচ্ছা, প্রার্থনা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলা হয় **ইচ্ছাবাচক বাক্য**।

(গ) সন্দেহবাচক বাক্য :

(i) সম্ভবত সে অসুস্থ। (ii) বোধহয় তোমাকে দিয়ে কাজ হবে।

বাক্যদুটির মধ্যে সম্ভাবনার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, নিশ্চয়তা নয়। (কিছুটা সংশয় থেকে যাচ্ছে — হতেও পারে, আবার না হতেও পারে, এমন)। এ জাতীয় বাক্যকে সন্দেহবাচক বাক্য বলে।

যে বাক্যে সন্দেহ, সম্ভাবনা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **সন্দেহবাচক বাক্য**।

(ঘ) প্রশ্নবোধক বাক্য :

(i) আপনি যাবেন কি? (ii) শশী কোন্ কাজটা করতে পারে না?

বাক্যদুটিতে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **প্রশ্নবোধক বাক্য**।

যে বাক্য দিয়ে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাকে বলে প্রশ্নবোধক বাক্য।

(ঙ) আবেগবাচক বাক্য :

(i) আহা! কী সুন্দরই না মেয়েটি! (ii) ছি:! একাজ তোমার!

প্রথম বাক্যে বক্তার মুগ্ধ হবার ভাব প্রকাশ পেয়েছে, আর (ii) বাক্যে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এজাতীয় বাক্যকে বলে **আবেগসূচক বাক্য**।

যে বাক্যে মনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, মুগ্ধতা ইত্যাদি ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে বলে **আবেগসূচক বাক্য**।

(চ) শর্তসাপেক্ষ বাক্য :

(i) যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি এ কাজ করতে পারি। (ii) যদি কথা না শুনি, তাহলে তুমি কিছুই করতে পার না।

বাক্য-দুটিতে 'যদি - তবে', 'যদি - তাহলে' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি কাজের ওপর আর একটি কাজের নির্ভর করা বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ একটা শর্ত থাকছে। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **শর্তসাপেক্ষ বাক্য**।

যে বাক্যে 'যদি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে দুটি বিষয়ের মধ্যে শর্ত আরোপ করা হয় তাকে বলে **শর্তসাপেক্ষ বাক্য**।

(ছ) অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :

(i) কী করতে হবে বলুন। (ii) তুমি সেখানে যেও (যাবে)।

বাক্যদুটির (i) তে অনুরোধ করা এবং (ii) তে আদেশ করা বোঝাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা দুটি দুটি কালের — প্রথমটি বর্তমান কালের, আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ কালের। এ জাতীয় বাক্যকে বলে **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য**।

যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বলে **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য**।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য আবার দুটি কাল-এ ব্যবহৃত হতে পারে — বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য কেবল মধ্যম পুরুষেই ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান অনুজ্ঞা : বর্তমান কালের যে বাক্যে আদেশ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলে **বর্তমান অনুজ্ঞা**। যেমন: তুমি এ বইটা পড়ো তো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত যে বাক্যে অনুরোধ, উপদেশ, ইত্যাদি বোঝায় তাকে বলে **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা**। যেমন, তুমি বইটা পোড়ো। বর্তমান অনুজ্ঞায় 'পড়ো' শব্দে আদেশ বা অনুরোধ এবং 'পোড়ো' শব্দে অনুরোধ বা আদেশ প্রকাশ পাচ্ছে।

সাধারণত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় 'ব', 'বে', 'বা' ব্যবহৃত হয়। এখানে 'পোড়ো' শব্দটি 'পড়িও' শব্দের চলিত রূপ। 'ব', 'বে' না থাকলেও অর্থের দিক দিয়ে 'পোড়ো' অর্থে 'পড়িবে' বলা হয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

(ক) বিস্ময়সূচক বাক্য : তাঁর অন্তঃকরণ কী অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল!
নির্দেশক বাক্য : তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হল।

(খ) হ্যাঁ-বাচক (সদর্থক) বাক্য : চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যন্ত বন্ধুর।
না-বাচক (নঞর্থক) বাক্য : চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ আদৌ মসৃণ নয়।

(গ) নঞর্থক : তিনি তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না।
সদর্থক : তিনি কম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন।

(ঘ) আবেগসূচক বাক্য : কী অসাধারণ তাঁর গবেষণা!
নির্দেশক বাক্য : তাঁর গবেষণা ছিল অসাধারণ।

(ঙ) হ্যাঁ-বাচক বাক্য : বাইবেল ছুঁয়ে বলতে হবে।
না-বাচক বাক্য : বাইবেল না-ছুঁয়ে বলা চলবে না।

(চ) এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাক। (নির্দেশক বাক্যে)।
নির্দেশক বাক্য : এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকতে বলছি।

(ছ) মানুষ মরতে চায় না। (প্রশ্নবাচক বাক্যে)
প্রশ্নবাচক বাক্য : মানুষ কি মরতে চায়?

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 15.2

1. ঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন। ভুল হলে (✗) চিহ্ন দিন :

(i) অর্থগত দিকে বাক্য হল ছ-রকমের। ( )

(ii) অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে থাকে ইচ্ছার ভাব। ( )

(iii) প্রশ্নবোধক বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হয়। ( )

(iv) নির্দেশক বাক্যে স্বীকার অস্বীকার দুটোই করা যায়। ( )

(v) আবেগবাচক বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। ( )

2. অর্থগত বাক্য গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

3. নীচের বাক্যগুলিতে অর্থের দিক দিয়ে কী ভাব প্রকাশ পেয়েছে? ডানদিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে মাঝের বন্ধনীতে তার সংখ্যাটি বসান :

(a) সন্দেহবাচক বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে	( )	(i)	একটি বিষয়ের ওপর আর-একটি বিষয়ের নির্ভরতার ভাব।
(b) আবেগসূচক বাক্যে রয়েছে	( )	(ii)	আকাঙ্ক্ষার ভাব।
(c) ইচ্ছাবাচক বাক্য প্রকাশ করছে	( )	(iii)	উপদেশের ভাব।
(d) শর্তসাপেক্ষ বাক্য হল	( )	(iv)	ঘৃণার ভাব।
(e) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য প্রকাশ করে	( )	(v)	সংশয়ের ভাব।

4. ইচ্ছাবাচক ও আবেগবাচক বাক্যের উদাহরণসহ পার্থক্য দেখান।

15.4 আপনি যা শিখলেন

1. গঠনগত দিকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ;
2. বাক্যের শ্রেণিবিভাগে বাক্যের চেহারার পরিবর্তন;
3. বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের ব্যবহারে মনের ভাব বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার রীতিপ্রকৃতি;
4. বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যের ব্যবহারে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যের পরিচয়
5. বিভিন্ন বাক্যের রূপান্তর করার নিয়মকানুন;
6. অর্থগত দিকে বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণির কথা;
7. অর্থের দিক থেকে একটি বাক্য অন্যটির তুলনায় চেহারায় আলাদা হলেও অর্থ একই বজায় রাখে;
8. অর্থগত দিকে বিভিন্ন বাক্যের পারস্পরিক পরিবর্তনের নিয়মরীতি;

9. বিভিন্ন বাক্যের রূপান্তর করে মনের ভাবের বৈচিত্র্য প্রকাশ করার বিষয়;
10. অর্থগত দিকের বাক্যের সঙ্গে গঠনগত বাক্যের পার্থক্যের কথা।

15.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

বাক্যের গঠনগত রূপ বিষয়ক:

1. শ্রেণিগত দিকে বাক্য কত রকমের? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের একটি করে উদাহরণ দিন।

2. গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে ক'ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

3. যৌগিক ও জটিল বাক্য কীভাবে গঠিত হয়। একটি করে উদাহরণ দিয়ে দু-প্রকার বাক্যের পার্থক্য দেখান।

4. গঠন-অনুসারে তৈরি বাক্যগুলিকে নির্দেশমতো পরিবর্তন করুন :

(ক) সুভাষ-কাকিমা আমাকে ডেকেছেন কাজেই আমি যাব। (সরলবাক্যে)

(খ) জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। (যৌগিকবাক্যে)

(গ) দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনাকতক মিলে সেই আলোচনাই চালাচ্ছে। (যৌগিকবাক্যে)

(ঘ) তোমাদের পরিচিত সুরেনদা এখনই আসবেন। (জটিলবাক্যে)

(ঙ) উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। (জটিলবাক্যে)

(চ) খবরটা বুড়োর কানে উঠলেই তো — মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত। (জটিলবাক্যে)

বাক্যের অর্থগত রূপ বিষয়ক:

1. অর্থগত দিক দিয়ে বাক্য কত রকমের? প্রত্যেক রকম বাক্যের একটি করে উদাহরণ দিন।

2. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য কোন্ কোন্ কালে ব্যবহার করা যায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

3. নীচের বাক্যগুলিতে যে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার উল্লেখ করুন :

(a)	আপনারা বসে পড়ুন।	আদেশ
(b)	কোথা থেকে এলেন আপনি?	________
(c)	আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।	________
(d)	যদি তুমি একথা বল তাহলে আমাকেও কিছু বলতে হবে।	________
(e)	বেঁচে থাকো বাবা।	________
(f)	সে আসবে কিনা কে জানে।	________

শব্দার্থ ও টীকা

4. নির্দেশক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

5. অর্থগত দিকে বিভিন্ন বাক্যের নির্দেশমতো রূপান্তর করুন :

(ক) কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? (নির্দেশকবাক্যে)

(খ) এতদিনে সবাই জানতে পারল কথাটা। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

(গ) এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি আমি। (হ্যাঁ-বাচক বাক্যে)

(ঘ) জগতের কেউ কখনও শুনেছে? (সন্দেহবাচক বাক্যে)

(ঙ) সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। (হ্যাঁ-বাচক বাক্যে)

(চ) আমি উঠে পড়লাম। (না-বাচক বাক্যে)

(ছ) এসব কথা বলা অনুচিত। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

(জ) আমাকে আমার কাজ করতে দেওয়া হোক। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে)

(ঝ) লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয়। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

15.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

15.1

1. (ক) দুই

(খ) একটি সমাপিকা

(গ) অব্যয় পদ

(ঘ) একটি প্রধান ও এক বা একাধিক খণ্ডবাক্য

(ঙ) গঠনগত বাক্যের

2. চার রকমের। সরলবাক্য, যৌগিকবাক্য, জটিলবাক্য ও মিশ্রবাক্য।

3. জটিল, যৌগিক ও মিশ্র।

4. (ক) ✗ (খ) ✓ (গ) ✓ (ঘ) ✗ (ঙ) ✗

15.2

1. (i) ✗ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✓ (v) ✓

2. চেহারার পরিবর্তন হলেও অর্থের দিক দিয়ে একই থাকে।

3. (a) (v) (b) (iv) (c) (ii) (d) (i) (e) (iii)

শব্দার্থ ও টীকা

4. ইচ্ছাবাচক বাক্যে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে আর আবেগবাচক বাক্যে প্রকাশ পায় বিস্ময়, ভয়, ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি। উদাহরণ :

ইচ্ছাবাচক বাক্য : তুমি দীর্ঘজীবী হও।

আবেগবাচক বাক্য : হায়! এ কী হল!

কবিতা পাঠ

16. এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে
17. নারী
18. বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে
19. নাজমা

শব্দার্থ ও টীকা

16

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

16.1 প্রস্তাবনা

কবি জীবনানন্দ দাশ একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। তাঁর কাব্যে বাংলার নদ-নদী, বাংলার পশুপাখি, শঙ্খচিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে ভোরের আকাশে নবীন সূর্যের উদয় আকাশকে রক্তরাঙ্গা করে তোলে। গঙ্গাসাগরের বুকে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে পুণ্য বারুণীর স্নানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য অর্জন করে। আবার বর্ষায় কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গীর মতো নদীগুলি কানায় কানায় জলে ভরে ওঠে। প্রকৃতিকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। তখন ধানের গন্ধে লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে আসে। গাছের শাখা সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাসের উপর নত হয়ে পড়ে। প্রকৃতির এইসব অপরূপ রূপের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে ভেসে ওঠে বাংলায় অগণিত রূপকথার কাহিনি। কবি বর্ণিত এইসব লৌকিক কাহিনি, রূপকথা একদিন বিস্তারলাভ করেছিল বাংলার কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল গাছের ছত্রছায়ায়। এইভাবে কবি কল্পিত নায়িকা শঙ্খমালারও আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই নায়িকা একদিন বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে।

16.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠ করলে আপনারা —

- বাংলার পল্লি প্রকৃতির অপরূপ রূপের আভাস পাবেন।
- কবিতায় উল্লিখিত বাংলার নদনদী ও গাছপালা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলার বিভিন্ন পাখির সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রূপকথার কিছু প্রচলিত কাহিনি জানতে পারবেন।

16.3 মূল পাঠ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, — সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —
শঙ্খমালা নাম তার; এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে পাবে নাকো — বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

শব্দার্থ ও টীকা

ডাঙা = উচ্চভূমি, স্থল।

নাটা = গোলাকার ছোট ফল বা তার বীজ, করঞ্জের বীচি।

বারুণী = সমুদ্র, জল, বৃষ্টি ও পশ্চিমদিকের অধিদেবতা।

সুদর্শন = চিল

শঙ্খমালা = নায়িকা।

বিশালাক্ষী = আয়তলোচনা, দুর্গাদেবী।

16.4 বিষয়ের রূপরেখা

16.4.1

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সব চেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, — সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

গদ্যরূপ:

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও করুণ এক স্থান আছে। সেখানকার সবুজ ডাঙা সবসময় মধুকূপী ঘাসে ভরে আছে। সেখানে কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল নামে গাছ আছে। সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো সূর্য জেগে ওঠে। সেখানে গঙ্গাসাগরের বুকে জলের দেবতা বারুণী থাকে। তাই কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গীর বুকে সব সময় জল পাওয়া যায়। সেখানে শঙ্খচিল পানের বনের হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

সেখানে নতুন ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট তরুণ লক্ষ্মীপেঁচার আবির্ভাব ঘটে।

বক্তব্যসার:

বাংলার রূপমুগ্ধ কবি আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলার অপরূপ রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন — বাংলার রূপ সবচেয়ে সুন্দর করুণ। বাংলার ধানসিড়ি নদী, বাংলার রূপশালী ধান, বাংলার শ্যামা, দোয়েল, খঞ্জনা পাখি, বাংলার কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গী নদী এবং বাংলার জাম, বট, অশ্বত্থ, হিজলের গাছ কবিমনে আনন্দের হিন্দোল জাগায়। আবার বাংলার করুণ কাহিনি বা রূপকথার শঙ্খমালা, মানিকমালা সেইসব বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন সংস্কৃতি কবির মনকে সকরুণ করে তোলে। তাই বাংলার রূপ কবির কাছে সুন্দর, করুণ। এখানে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গা সাগরের বুকে পুণ্য সাগর-স্নান অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগরজলে স্নান করেন। বরুণদেব বাংলার নদীকে প্রচুর জলে ভরে দেন।

সেখানে রুদ্র বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহের পর মৃদুমন্দ বাতাসে কচিৎ কখনও পানের বন দুলে ওঠে, তেমনি অকস্মাৎ শঙ্খচিলের ঘটে আবির্ভাব। আবার নবীন ধানের গন্ধে লক্ষ্মীর শুভবার্তা নিয়ে আবির্ভাব ঘটে লক্ষ্মীপেঁচার।

পাঠগত প্রশ্ন : 16.1

ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন:

1. ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ — স্থানটি
   (i) ম্লান অকরুণ।
   (ii) সুন্দর করুণ।
   (iii) অস্ফুট তরুণ।
2. সেখানে বারুণী থাকে —
   (i) বঙ্গোপসাগরের বুকে।
   (ii) ভারত মহাসাগরের বুকে।
   (iii) গঙ্গাসাগরের বুকে।
3. “সেখানে কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল” — কে অবিরল জল দেয়—
   (i) অরুণ।
   (ii) বারুণী।
   (iii) বরুণ।
4. **প্রতিটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ—**
   (i) “এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — সবচেয়ে সুন্দর করুণ” — কবি স্থানটি একবার বলেছেন সুন্দর, আবার বলেছেন করুণ। কেন বলেছেন বুঝিয়ে দিন।
   (ii) সেখানে সবুজ ডাঙা কীসে ভরে থাকে?
   (iii) ‘সেখানে গাছের নাম’ — ক্রম অনুসারে গাছগুলির নাম লিখুন।
   (iv) বরুণ দেবের দানে কোন কোন নদী জলে ভরে ওঠে?

(v) সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা কখন আসে?

শব্দার্থ ও টীকা

16.4.2

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —
শঙ্খমালা নাম তার; এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে পাবে নাকো — বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

গদ্যরূপ:

সেখানে অন্ধকার ঘাসের উপর লেবুর শাখা নুয়ে পড়ে, অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন তার ঘরে উড়ে যায়। সেখানে শঙ্খমালা নাম্নী এক রূপসীর শরীরে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে। এই বিশাল পৃথিবীর কোনও নদী ঘাসে তাকে আর তুমি খুঁজে পাবে না। (কারণ) বিশালাক্ষী তাকে বর দিয়েছিল। সেই বরে সে ঘাস আর ধান হয়ে নীল বাংলায় জন্মেছে।

বক্তব্যসার:

পরবর্তী স্তবকে কবি পূর্ববর্তী বাংলার অপরূপ রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে এনেছেন — অন্ধকারে ফলভারে আনত নেবু গাছের চিত্রকল্প, হলুদশাড়ি পরা শঙ্খমালার বর্ণনা। বাংলার লোকসাহিত্যে কথিত আছে যে দেবী বিশালাক্ষী রূপসী নায়িকা শঙ্খমালাকে বর দিয়েছিলেন শঙ্খমালা ধান আর ঘাস হয়ে রূপসী বাংলার বুকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকবে।

আনত = নুয়ে পড়া।

মন্তব্য:

কবিতাটি সনেট আকারে লেখা হলেও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রূপ বর্ণনাই কবিতাটিতে অধিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কবিতাটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে প্রকৃতি। বাংলার প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি কবিতাটিতে বাংলার রূপকথা, লোকসাহিত্য থেকে কতগুলি রূপকল্প সংগ্রহ করে কবিতাটিকে একটি উচ্চ সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এই কবিতাটিতে ব্যবহৃত কতগুলি চিত্রকল্পের উল্লেখ করা যায়।

সনেট = চতুর্দশপদী কবিতা।

চিত্রকল্প = কল্পনায় ছবি ফুটে ওঠা।

রূপকল্প = বিশেষ কোনো রূপ কল্পনা করা।

যেমন, — ১। সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ
২। শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল।
৩। লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ
৪। সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকার সন্ধার বাতাসে
৫। সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর —

কবিতাটির মূল সুর প্রকৃতি হলেও কবিতাটির নামকরণ সংগতিহীন নয়। বরঞ্চ কবিতার প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করে নামকরণ হওয়ায় তা আরও ব্যঞ্জনাধর্মী এবং যথার্থ হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 16.2

ঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন:

1. 'অন্ধকারে ঘাসের উপর নুয়ে থাকে' —
   (i) নেবুর শাখা। (ii) ধানের শিস্। (iii) বটের শাখা।
2. "শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর" — কোন্ রঙ্-এর শাড়ি?
   (i) লাল রঙ্-এর (ii) হলুদ রঙ্-এর (iii) সবুজ রঙ্-এর
3. "তারে আর তুমি খুঁজে পাবে নাকো" — কেন?
   (i) তিনি অন্যসব রূপসী নায়িকাদের মতোই কবির কল্পনার বস্তু।
   (ii) তিনি রূপকথার নায়িকাদের মতো রাজপুত্রের সঙ্গে চলে গেছেন।
   (iii) বিশালাক্ষীর বরে বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছেন।
4. (i) সেখানে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে কেন? (ii) সুদর্শন কখন তার ঘরে উড়ে যায়?
   (iii) রূপসী নায়িকার নাম কি?

16.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলার পল্লী প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের বর্ণনা;
2. নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর নাম;
3. বাংলার কয়েকটি গাছ-গাছালি ও পশুপাখির নাম;
4. বাংলার কোনও কোনও রূপকথা ও লোকগাথার কথা।

16.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. "এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে" — কবিতাটি কী ধরণের কবিতা?
2. সেখানে গঙ্গাসাগরের বুকে কী হয়ে থাকে?
3. কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা আর জলঙ্গী কী করে অবিরল জল পায়?
4. শঙ্খমালা কে? তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন?
5. বিশালাক্ষী তাকে কী বর দিয়েছিল?
6. কবিতাটির ভাষা অলংকার ও চিত্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করুন।

16.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

16.1

1. (ii) সুন্দর করুণ।
2. (iii) গঙ্গাসাগরের বুকে।
3. (iii) বরুণ।
4. (i) কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় স্থানটিকে সুন্দর বলেছেন, আবার লৌকিক কাহিনি কবিকে বিষাদমগ্ন করে, তাই এটি করুণ।
   (ii) সেখানে সবুজ ডাঙা মধুকূপী ঘাসে ভরে থাকে। (iii) কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল।

(iv) কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা, জলঙ্গী। (v) নতুন ধানের গন্ধে লক্ষ্মী পেঁচা আসে।

16.2

1. (i) নেবুর শাখা।
2. (ii) হলুদ রঙ্-এর।
3. (iii) বিশালাক্ষীর বরে বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছেন।
4. (i) সেখানে ফলভারে নেবুর শাখা নুয়ে থাকে। (ii) অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়।
   (iii) রূপসী নায়িকার নাম শঙ্খমালা।

কবি পরিচিতি

কবি জীবনানন্দ দাশ একালের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ, মাতা কুসুমকুমারী। বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ থেকে পাশ করে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজি সাহিত্যে সাম্মানিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। তিনি কলকাতা সিটি কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ঝরাপালক', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সাতটি তারার তিমির' এবং 'রূপসী বাংলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি 'মাল্যবান' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন।

১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউতে এক শোচনীয় ট্রাম দুর্ঘটনায় কবি আহত হয়ে পরলোক গমন করেন।

16.8 সমধর্মী রচনা

কোথাও দেখি নি, আহা, এমন বিজন ঘাস — প্রান্তরের পারে

— জীবনানন্দ দাশ

কোথাও দেখিনি, আহা, এমন বিজন ঘাস — প্রান্তরের পারে
নরম বিমর্ষ চোখে চেয়ে আছে — নীল বুকে আছে তাহাদের
গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচপোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা ঢের,
হিজলের ক্লান্ত পাতা — বটের অজস্র ফল ঝরে বারে বারে
তাহাদের শ্যাম বুকে; — পাড়াগাঁর কিশোরেরা যখন কান্তারে
বেতের নরম ফল, নাটাফল খেতে আসে, ধুন্দুল বীজের
খোঁজ করে ঘাসে ঘাসে, — বক তাহা জানে নাকো, পায় নাকো টের
শালিখ খঞ্জনা তাহা; — লক্ষ লক্ষ ঘাস এই নদীর দু'ধারে

নরম কান্তারে এই পাড়াগাঁর বুকে শুয়ে সে কোন দিনের
কথা ভাবে; তখন এ জলসিড়ি শুকায় নি, মজে নি আকাশ,
বল্লাল সেনের ঘোড়া — ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হ'ত এই পথে — আরো আগে রাজপুত্র কত দিন রাশ
টেনে টেনে এই পথে — কি যেন খুঁজেছে, আহা হয়েছে উদাস;
আজ আর খোঁজাখুঁজি নাই কিছু — নাটাফলে মিটিতেছে আশ —

শব্দার্থ ও টীকা

17

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

17.1 প্রস্তাবনা

আপনারা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রায় রোজই বধূহত্যা, বধূনির্যাতন, নারীনিগ্রহ, কন্যাভ্রূণহত্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির খবর দেখেন। আমাদের সমাজে নারীরা দীর্ঘকাল যাবৎ নানা রকমের অত্যাচার-অবিচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে আসছেন। মধ্যযুগ থেকে তার সূত্রপাত, আজও তা শেষ হয়নি। সমাজে পরিবারে পুরুষেরা যে সব অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ ভোগ করেন নারীরা তা অনেক ক্ষেত্রে পান না। এই বৈষম্যের অবসান আজও হয়নি। কাজী নজরুল ইসলাম এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন ‘নারী’ কবিতায়। তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

বৈষম্য = প্রভেদ।

‘নারী’ সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের একটি অংশ। সাম্যবাদী প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। নজরুল তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির একজন নেতা এবং ঐ দলের মুখপত্র ‘লাঙল’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুরো ‘সাম্যবাদী’ কবিতা প্রকাশিত হয়। কেবল নারী পুরুষের অসাম্য নয়, ধনী দরিদ্রের অসাম্য, মালিক শ্রমিকের অসাম্য দূর করার দাবিও তিনি করেছেন সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের বিভিন্ন কবিতায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় — সবচেয়ে আগে অধিকার হারিয়েছে নারী। নানা বাধা-নিষেধে তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন শুরুই হয়েছে নারীমুক্তির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। রাজা রামমোহন রায় আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে আন্দোলন করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেয়েদের উপর অত্যাচার বন্ধের জন্য বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেন। রবীন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছেন নানা কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে।

সতীদাহ = সদ্য বিধবাদের মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করা।

‘নারী’ কবিতায় একদিকে নারীর প্রতি বহু যুগ ধরে চলে আসা অত্যাচার লাঞ্ছনার চিত্র যেমন আঁকা হয়েছে, তেমনি নারীর গুণ, মহত্ত্ব প্রবল আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই অবিচার বন্ধ করার ডাক দেওয়া হয়েছে। কবি অত্যন্ত চড়া গলায় তাঁর বিশ্বাস ও দাবি উত্থাপন করেছেন। এ কবিতা কেবল উপভোগের নয়, এ কবিতা বাঁধন ছেঁড়ার প্রেরণা জোগায়। এ কবিতা নারী মুক্তির সনদ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক নজরুলের প্রথম যুগের কবিতাগুলি আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে; আবেগ পাঠকের মনকে স্পর্শ করেছে। বহু উপমায় তিনি নারী জাতির মহিমা ফুটিয়ে

প্রত্যয় = গভীর বিশ্বাস।

শব্দার্থ ও টীকা

তুলেছেন। নারী বিদ্বেষীদের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করেছেন।

17.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পাঠ করে আপনারা—

- এতকাল সমাজের ভালমন্দ যা কিছু হয়েছে তা পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলেই করেছে। যে সব কাজ করার ক্ষমতা পুরুষের আছে তা নারীরও আছে তা উপলব্ধি করতে পারবেন;
- মেয়েরা কোনো কাজে পুরুষের থেকে যে অযোগ্য নয় সে বিষয়ে সচেতন হবেন;
- সমাজের অর্ধেক মানুষ নারী। তাদের পিছিয়ে রেখে যে সমাজের অগ্রগতি হতে পারে না তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন;
- আজ যে শাসনব্যবস্থায় নারীদের বিশেষ স্থান দেবার চেষ্টা চলছে তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন;
- নারীর মর্যাদা ও সমান অধিকারের জন্য যে চেষ্টা চলেছে তা শক্তিশালী করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবেন।

17.3 মূল পাঠ

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ-কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী। অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা' করে নারী হেয় জ্ঞান?
তারে বল আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে — শয়তান যে — নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।

শব্দার্থ ও টীকা:

তোমা = তোমাকে।
অথবা পাপ যে = এখানে পাপী বোঝাতে পাপ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
আদি পাপ = প্রথমে যে মানুষ পাপ করেছিল।

সাম্য = সমতা, সমান অধিকার।
সাম্যের গান = সাম্যের গুণকীর্তন করা বা তাকে সমর্থন করা।
ভেদাভেদ = পার্থক্য।
চির-কল্যাণকর = চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক।
পাপ = খারাপ কাজ।
তাপ = হিংসাত্মক কাজ অর্থে।
অশ্রুবারি = ব্যথা, দুঃখ।
নরক-কুণ্ড = (কুণ্ড - গর্ত) জঘন্য বস্তু।
হেয় জ্ঞান = অবজ্ঞা।
ক্লীব = যাদের মধ্যে পুরুষের বা নারীর কোনও গুণ নেই।
রহে = (গদ্যে) থাকে।

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শাজাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী গানের লক্ষ্মী শস্যলক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।

সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাক' নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি'।

শব্দার্থ ও টীকা

তাহে = তাহাতে (গদ্যে)।
সুনির্মল = বিশুদ্ধ।
ফিরিছে = বিকিরণ করছে।
সঞ্চারি = (গদ্যে) সঞ্চারণ করে, ছড়িয়ে দিয়ে।
'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী' = জ্ঞান, বিদ্যা, গানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
শস্যলক্ষ্মী = লক্ষ্মীকে বলা হয় শস্য বা ধন সম্পদের দেবী।
সুষমা লক্ষ্মী = সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী।

বাসি = পুরানো, এখানে অর্থ অতীত।
ছিল নাক = ছিল না, (আঞ্চলিক বাংলায় ব্যবহৃত হয়)।
আছিল = ছিল, (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হত)।
দাস = কেনা গোলাম।
দাসী = চাকরানি।
ডঙ্কা = জয়ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা।
বাজি = বেজে, ধ্বনিত হয়ে।

17.4 বিষয়ের রূপরেখা

'নারী' কবিতায় কবি বলেছেন — সভ্যতার অগ্রগতির জন্য আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মহৎ কাজ হয়েছে, যত সৃষ্টিশীল কীর্তি, উন্নত ভাব পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছে তাতে পুরুষের অবদান যতটা নারীরও ততটাই। আবার যত হীন, ধ্বংসাত্মক কাজ হয়েছে তার জন্য নারী ও পুরুষ সমানভাবে দায়ী। নারী বা পুরুষ কাউকেই জাতিগতভাবে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করা অন্যায়। শয়তান পুরুষও নয়, নারীও নয়, শয়তানের জাতই আলাদা। মানুষের মনকে সুন্দর, কোমল-মধুর করে গড়ে তোলায় নারীর ভূমিকাই সব থেকে বেশি। অতীতে নারী ছিল পরাধীন, অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আধুনিক যুগ হল সমান অধিকারের যুগ, নারী মুক্তির যুগ। নারীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছে। তাদের আর পদানত রাখা চলবে না।

17.4.1 সাম্যের গান গাই . . . . . . সমান মিশিয়া রহে

গদ্যরূপ:

(আমি) সাম্যের গান গাই। আমার চক্ষে পুরুষ (ও) রমণী(-র মধ্যে) কোনো ভেদাভেদ নাই। বিশ্বে যা কিছু মহান ও চির কল্যাণকর সৃষ্টি তার অর্ধেক নারী করিয়াছে। তার (আর) অর্ধেক পুরুষ (করিয়াছে)। বিশ্বে যা কিছু পাপ, তাপ, বেদনা, অশ্রুবারি তার অর্ধেক নর আনিয়াছে। তার (আর) অর্ধেক নারী (আনিয়াছে)। (হে) নারী, তোমা (কে) নরককুন্ড বলিয়া কে হেয়জ্ঞান করে? তারে বল — আদি পাপী যে সে নারী নহে, সে যে শয়তান নর। অথবা যে পাপী যে শয়তান সে নর(-ও) নহে, নারী(-ও) নহে, সে ক্লীব; তাই সে নর ও নারীর (মধ্যে) সমান (ভাবে) মিশিয়া রহিয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার :

মানব সমাজের অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ আর অর্ধেক নারী। উভয়ের মধ্যেই একই রকমের গুণ, ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। কেউ কোনও অংশে কারো থেকে ছোটো বা বড়ো নয়। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের যেমন ভূমিকা আছে, নারীরও রয়েছে তেমনই ভূমিকা। আবার পৃথিবীতে নিকৃষ্ট কাজ যারা করেছে তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী দুই-ই রয়েছে। তাই কারুকে শ্রেষ্ঠ আর কারুকে নিকৃষ্ট বলাটা অযৌক্তিক ও অসংগত। সমাজে অপরাধমূলক কাজ যারা করে তাদের পুরুষ বা নারী বলে চিহ্নিত না করে তাদের অপরাধী বা শয়তান শ্রেণির লোক বলাই উচিত। কারণ পুরুষ বা নারীর কোনও গুণেরই অধিকারী তারা নয়। পুরাকালে নারীজাতিকে হীন নীচ বলে গণ্য করা হত। এটা মিথ্যা শুধু নয়, নারীর প্রতি অবিচার, পুরুষপ্রধান সমাজে নারীকে পদানত রাখার চেষ্টা।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.1

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. নারী কবিতায় কবি ____________ গান গেয়েছেন।

ক. প্রেমের

খ. পূজার

গ. সাম্যের

2. পৃথিবীর যত মহৎ কাজ হয়েছে তা করেছে ____________।

ক. পুরুষেরা

খ. পুরুষ ও নারী মিলে

গ. নারীরা

একটি বাক্যে উত্তর দিন —

3. ‘আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই’ — কার চক্ষে?

4. ‘তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে’ — কাকে বলতে হবে?

5. **তিনটি বা চারটি বাক্যে উত্তর লিখুন —**

i) নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই তা কবিতার কোন্ অংশে বলা হয়েছে?

ii) পুরাকালে নারীকে নরককুণ্ড বলা ঠিক নয় কেন?

iii) শয়তানদের কবি কোন্ শ্রেণিতে ফেলেছেন?

iv) নারী ও পুরুষ যে একই রকম ক্ষমতার অধিকারী তার একটি দৃষ্টান্ত দিন।

17.4.2 এ বিশ্বে যত ফুল . . . . . রূপে রূপে সঞ্চারি

গদ্যরূপ:

এ বিশ্বে যত ফুল ফুটেছে, যত ফল ফলেছে তাতে নারী সুনির্মল রূপ-রস-মধু-গন্ধ দিল। তাজমহলের

পাথর দেখেছ, তার প্রাণ দেখেছ। (তার) বাইরে শাজাহান (কিন্তু) তার অন্তরে নারী — মোম্‌তাজ। নারী (হচ্ছে) জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী। নারীই রূপে রূপে সুষমা-লক্ষ্মী সঞ্চার করে ফিরেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

ফুলে আছে নিষ্পাপ সৌন্দর্য। তার রঙ, রূপ ও গন্ধ মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। নারীর প্রেম স্নেহ ভালবাসা সেইরকম নির্মল, সুন্দর, তৃপ্তিদায়ক। নারীজাতির মন সুমিষ্ট ফলের মত মধুর। তার মাধুর্যে পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠে। তাজমহলের অনবদ্য ইমারত নির্মাণ করেছিলেন শাজাহান। শ্বেত পাথরের এই আশ্চর্য সৌধ দেখতে সুন্দর। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা তো কেবল এর স্থির স্থাপত্য সৌন্দর্যই দেখে। সবাই শাজাহানের নির্মাণটাই দেখে। বাইরের এই সৌন্দর্য শাজাহান ও তার পত্নী মমতাজের অমর প্রেমের স্পর্শে জীবন্ত। এ কেবল পাথরের ইমারত নয়, প্রেমের সৌধ। মমতাজই তার প্রাণ। নারীকে কল্পনা করা হয়েছে জ্ঞান, বিদ্যা, সংগীতের দেবী রূপে। লক্ষ্মীর মতো শান্ত শিষ্ট ধ্যান মগ্ন এই দেবী। আবার শস্য ও ধন সম্পদের দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী, তিনিও নারী। কবি কল্পনা করছেন — পৃথিবীর যেখানে যত সৌন্দর্য তার মূলে রয়েছে নারীর স্পর্শ। নারীই নানারূপে পৃথিবীকে সুন্দর করেছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.2

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. তাজমহল নির্মিত হয়েছিল ____________ স্মৃতিরক্ষার জন্য।

(ক) নূরজাহানের
(ক) জাহানারার
(গ) মমতাজের

2. শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন ____________।

(ক) সরস্বতী
(ক) লক্ষ্মী
(গ) দুর্গা

3. উত্তর লিখুন —

(i) নারীর প্রকৃতির সঙ্গে ফুলের ও ফলের কেমন সাদৃশ্য কবি দেখেছেন?

(ii) কবি নারীকে কোন্‌ অর্থে 'গানের লক্ষ্মী' বলেছেন?

(iii) তাজমহলের 'পাথর' ও 'প্রাণ'কে কবি কীভাবে দেখেছেন?

17.4.3 সে যুগ হয়েছে বাসি . . . . . ডঙ্কা বাজি।

গদ্যরূপ :

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না, (কিন্তু) নারীরা দাসী ছিল সে যুগ বাসি হয়েছে। আজ বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ। (আজ) ডঙ্কা বেজে উঠেছে। (এ যুগে) কেউ কারও বন্দি থাকবে না।

বক্তব্যসার:

সমাজে পরিবারে পুরুষের ছিল আধিপত্য; তারা ছিল স্বাধীন। কিন্তু নারীদের জীবনে কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তারা ছিল পুরুষের পরাধীন। নানারকম বিধিনিষেধ, প্রথা ও আচারের বন্ধনে তাদের বেঁধে রাখা হত। কিন্তু আধুনিক যুগ হল গণতন্ত্রের যুগ, মানবাধিকারের যুগ, সমানাধিকারের যুগ। এ যুগে কেউ কাউকে পদানত রাখতে পারে না। নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা, সমান অধিকার, সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই প্রকৃত মানবিকতা, প্রকৃত গণতন্ত্র। আমাদের সমাজে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। লড়াইয়ের কষ্ট দুঃখ বরণ করতে হবে। আজ চারিদিকে সেই লড়াই-এর ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। কবিও সেই লড়াই-এর ডাক দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.3

সঠিক উত্তরে টিক দিন—

1. অতীতে পুরুষ যখন স্বাধীন ছিল নারীরাও তখন স্বাধীন ছিল। হ্যাঁ / না
2. বর্তমানে চলছে গণতন্ত্রের যুগ। হ্যাঁ / না
3. **তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন —**
   (i) বর্তমান যুগকে কবি 'বেদনার যুগ' বলেছেন কেন?
   (ii) আজকের যুগকে কবি 'মানুষের যুগ' বলেছেন কেন?
   (iii) 'উঠিছে ডঙ্কা বাজি' — কিসের ডঙ্কা কেন বেজে উঠেছে?

17.5 আপনি যা শিখলেন

1. নারীর জীবন যাপনে বৈষম্যের অতীত ইতিহাস জানতে পারলেন।
2. মানব জীবনে নারীর বিশেষ ভূমিকা উপলব্ধি করলেন।
3. সমাজে নারীর সমানাধিকারের যৌক্তিকতা বুঝতে পারলেন।
4. জনসংখ্যার অর্ধেককে দাবিয়ে রেখে সমাজ যে এগিয়ে যেতে পারে না তাও বুঝতে পারলেন।
5. বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র, সাম্য ও মানবতার স্বার্থে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যে সারা পৃথিবীতে চলছে তাও জানতে পারলেন।

17.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

1. পুরুষ ও নারীর মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয় তার স্বপক্ষে 'নারী' কবিতায় কোন্ কোন্ যুক্তি দেখানো হয়েছে?
2. 'নারী' কবিতায় কবি শয়তানদের 'ক্লীব' বলা হয়েছে কেন তা ব্যাখ্যা করুন।
3. বর্তমান যুগকে 'বেদনার যুগ' বলা হয়েছে কেন?

4. ‘মানুষের যুগ’ ‘সাম্যের যুগের’ সঙ্গে নারী-স্বাধীনতার সম্পর্ক কী?

5. নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া উচিত — এ সম্পর্কে আপনার মতামত কারণসহ লিখুন।

17.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

17.1

1. (গ)

2. (খ)

3. কবি নজরুল ইসলামের

4. যে নারীকে নিন্দা করে

5. (i) পৃথিবীতে ভাল ও মন্দ সকল কাজেই উভয়ের ভূমিকা সমান।

(ii) পুরুষ প্রধান সমাজে নারীকে পদানত রাখার এটি একটি কৌশল। মা ভালো না হলে ছেলে ভাল হবে কী করে?

(iii) পুরুষ বা নারীর কোনো সদ্‌গুণ যাদের নেই — তাদের মানসিকভাবেভাবে ক্লীব বলা যায়।

(iv) পুরুষ ও নারী যে একই রকম গুণের অধিকারী তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরি।

17.2

1. (গ)

2. (খ)

3. (i) নারীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুন্দর ফুল ও সুস্বাদু ফলের কমনীয়তার মিল রয়েছে।

(ii) লক্ষ্মী একদিকে দেবী, শব্দটি আবার শান্তশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়।

(iii) বাইরে থেকে দেখলে তাজমহল শ্বেত পাথরের সৌধ মাত্র। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে গভীর এক ভালোবাসার বেদনা।

17.3

1. না

2. হ্যাঁ।

3. (i) যে কোনো বাধার বিরুদ্ধে লড়াই-ই কষ্টকর, পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই আরো কঠিন।

(ii) বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের — তার মানে সমান অধিকারের — সব মানুষকে সমান ভাবে দেখার।

(iii) সারা পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ভেরি বেজে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। বাল্যে পিতৃহারা নজরুলকে খুব অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারের জন্য বেরিয়ে পড়তে হয়। পরে বেশি বয়সে আবার পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে করাচির সেনানিবাসে চলে যান। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা, গল্প, নাটক, গান লেখা ও গান গাওয়ায় পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকেন। সৈনিকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য রচনাও করে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। উদ্দীপনাময় কবিতা, গান লিখে, গান গেয়ে, সংবাদপত্র প্রকাশ করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ইংরেজ সরকার তাঁর কবিতা, সংগীতের বই নিষিদ্ধ করে। তাঁকে কারাগারে বন্দি করে। নানা ভাবের বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। অজস্র গান তিনি লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়েছেন। সমাজের অচল অনড় নিয়ম-কানুন, আচাব-আচরণ, বৈষম্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন বলে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। বাংলাদেশ তাঁকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়েছে।

শেষ জীবনে তিনি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট বাংলাদেশেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ - অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সর্বহারা, ছায়ানট ইত্যাদি।

সমধর্মী রচনা

কবিতা — ‘সবলা’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটো গল্প — ‘স্ত্রীর পত্র’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শব্দার্থ ও টীকা

18

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রাহমান

18.1 প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। দীর্ঘকাল ধরে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপ্ন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য একটা গভীর ব্যাকুলতা তাঁরা লালন করেছেন। 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতাটিতে কবি শামসুর রাহমান বাঙালির সেই প্রত্যাশা পূরণের ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন। মাতৃভাষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আবাল্য মধুর স্মৃতিতে কবিচিত্ত বিভোর; মর্মস্পর্শী আবেগ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে। পড়লে বোঝা যায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাঙালির কত প্রিয়। শৈশবের শিক্ষা, প্রিয়জনের আদর প্রভৃতি যেন স্মৃতিতে নতুন করে জেগে ওঠে কবিতার উচ্চারণে।

বাংলা ভাষা কবির আজন্মের সঙ্গী। বাংলা ভাষা তাঁর সত্তা জুড়ে। নিকানো উঠোন, সকালের রোদ যেন বাংলা ভাষার আলপনা; বাউলের গান, নদীর চলা, শৈশবে মায়ের, দাদির বাৎসল্য এবং সেই সঙ্গে একুশে ফ্রেবুয়ারি বাংলা ভাষার মুক্তিক্ষণ কবি চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। শহিদ ভাষা-প্রেমীদের বুকের রক্তে রাঙা সেই সকাল কবির কাছে আজও অলৌকিক ভোর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাংলা ভাষা দিবসকে ইউনেস্কো বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস বলে ঘোষণা করেছে। বাংলা ভাষার এই মহৎ মর্যাদালাভ প্রধানত বাংলাদেশের চেষ্টায় ও আন্তরিক উদ্যোগে।

18.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- বাংলা ভাষার প্রতি কবির ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলার পল্লি ও প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগের কথা অনুভব করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালি শিশুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় বুঝতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের কথা স্মরণ করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথা অনুভব করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

নিকানো = মেঝে, দেওয়াল লেপা।

বাউল = এক বিশেষ শ্রেণির গায়ক ও সাধক সম্প্রদায়।

গো-রাখাল = গরু চরায় যারা।

'কাননে কুসুমকলি ফোটে' = বাল্যশিক্ষা বই-এর অন্তর্গত 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার একটি লাইন। মূল লাইনটি 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল'।

ঘুম পাড়ানিয়া গান = যে গান গেয়ে, মা তার শিশুকে ঘুম পাড়ায়।

সত্তা = অস্তিত্ব।

আশাবরী = সংগীতের প্রাতঃকালীন রাগিনীবিশেষ।

বিষাদ সিন্ধু = মীর মোশারফ হোসেনের লেখা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিষয় কারবালা প্রান্তরে হাসান আর হোসেনের সঙ্গে এজিদের যুদ্ধের ঘটনা।

18.3 মূল পাঠ

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রাহমান

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকোনো উঠোনে ঝরে
রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুমকলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি: মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুমপাড়ানির ছড়া কোন্ সে সুদূরে; সত্তা তার
আশাবরী। নানি বিষাদসিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে
রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরি— অলৌকিক ভোর।

শব্দার্থ ও টীকা:

রমজানি সাঁঝ = ইদল ফেতরের আগের একমাস সময়কে বলা হয় রমজান মাস। মুসলমানদের কাছে এই একমাস খুব পবিত্র মাস। এইসময় তাঁরা দিনের বেলা উপোস করেন সন্ধ্যার পর উপবাস ভেঙে খাওয়া-দাওয়া করেন। রমজান মাসের প্রতিটি সন্ধ্যা 'রমজানি সাঁঝ'।

18.4 বিষয়ের রূপরেখা

18.4.1 বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে . . . পুকুরে কলস ভাসে।

গদ্যরূপ:

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে রৌদ্র ঝরে। বারান্দায় জ্যোৎস্নার চন্দন লাগে। বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে উদার গৈরিক মাঠে বাজে অন্ধ বাউলের একতারা। খোলা পথে, উত্তাল নদীর বাঁকে বাঁকে নদীও হয় নর্তকী। যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী তার 'বাংলা শিক্ষার' অক্ষর লেখে 'কাননে কুসুমকলি ফোটে'। গো রাখালের বাঁশি হাওয়াকে মেঠো সুর বানায়। পুকুরে কলস ভাসে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

‘বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে’ কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের ‘কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি শামসুর রাহমানের বাংলাদেশ ও বাংলাভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ভাষা কবির আজন্মের সখা, তাঁর সত্তায়। বাংলা ভাষার কথা উচ্চারিত হলেই কবির চোখে ভেসে ওঠে নিকানো উঠোনে ঝলমলে রোদের আল্পনা আঁকা আর রাতের বারান্দায় জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো। বাংলা ভাষার কথা হলে কবির চোখে ফুটে ওঠে বাংলার প্রকৃতি, নদী, মাঠ পরিচিত ছবি। মনে যেন বেজে ওঠে অন্ধ বাউলের একতারার সুর। কবির মনে পড়ে যায় সেই শৈশবের কথা। সংস্কৃত পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কবিতা ‘কাননে কুসুমকলি’ ফোটার কাহিনিটি। মনে পড়ে যায় পল্লী বাংলার মেয়েদের কলস নিয়ে জল আনতে যাওয়া, গল্পে মসগুল মেয়েদের পুকুরে কলস ভেসে যাওয়ার পরিচিত দৃশ্য।

মন্তব্য:

বাংলা ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি, বাংলা ভাষা আপামর বাঙালির মতো কবিরও মাতৃভাষা। বাংলা ভাষার কথা হলেই কবির স্মৃতিতে ফুটে ওঠে শৈশবের শিক্ষা, বাংলার মাঠ ঘাট প্রভৃতি। কবিতায় সেই ছবিটি ফুটে উঠেছে।

পাঠগত প্রশ্ন 18.1

1) নীচের শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবি নিকোন উঠোনে ‘................ ....’।

(ii) বাউলের একতারার সুরে ‘নদীও ....’।

(iii) রাখালের বাঁশি হাওয়াকে বানায় ....’।

2) নীচের শব্দগুলির অর্থ ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে পাশে পাশে লিখুন—

(i)	উঠোন	(a)	প্রভাতে
(ii)	উত্তাল	(b)	আঙিনা
(iii)	সকালে	(c)	ভয়ানক তরঙ্গপূর্ণ
(iv)	কুসুমকলি	(d)	ফুলের কুঁড়ি

3) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর হ্যাঁ বা না দিন—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবির নিকানো উঠোনে ঝরে রোদ।

(ii) কবিতাটিতে কবির ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

(iii) বারান্দায় লাগে সূর্যের আলো।

(iv) রাখালের বাঁশির সুরে তরুলতা হয় নর্তকী।

4) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন—

(i) কবি জ্যোৎস্নার সঙ্গে কীসের তুলনা করেছেন?

(ii) কবিতায় বাড়ির উঠোন আর বারান্দায় কোন ছবি ফুটে উঠেছে?

(iii) 'গৈরিক' কথাটির সঙ্গে কার সম্পর্কের উল্লেখ আছে?

(iv) কবিতায় গো-রাখালের কোন্ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে?

5) প্রত্যেকের সম্বন্ধে লিখুন—

(i) বাউল

(ii) বাল্যশিক্ষা

(iii) গো-রাখাল

18.4.2 বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে . . . অলৌকিক ভোর।

গদ্যরূপ:

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কত চেনা ছবি ভেসে ওঠে। কোন সে সুদূরে আমার মা সেই ছোটোবেলায় দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কাটছেন। তার সত্তা (যেন) আশাবরী। নানি রমজানের সাঁঝে 'বিষাদসিন্ধু'র স্পন্দে দুলে দুলে ভাজেন ডালের বড়া। একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি (যেন) অলৌকিক ভোর।

বক্তব্যসার:

বাংলা ভাষার উচ্চারণে কবির স্মৃতিতে জেগে ওঠে শৈশবের কত চেনা ছবি। মায়ের ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া। ছেলেবেলার সেই স্মৃতিতে কবি দেখেন মা দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ানিয়া গানের ছড়া কাটছেন আশাবরী রাগে। শিশু মায়ের বাংলা ভাষার সুরটি হৃদয়ে গেঁথে ফেলে। এভাবেই সে পরিচিত হয় মায়ের সঙ্গে আপনজনের সঙ্গে। গড়ে ওঠে মাতৃভাষার সঙ্গে শিশুর যোগ। রমজানি সন্ধ্যার স্মৃতিও কবি ভুলতে পারেন না। নানি রমজানি সন্ধ্যায় মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র সুরটিতে দুলে দুলে ভাজেন ডালের বড়া। সেই সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মুক্তিযুদ্ধ কবির চিত্তকে মথিত করে। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমেছিল ভাষাপ্রেমীদের স্রোত। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অধীন। পাকিস্তানের শাসক বর্গের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের ওপর শাসক গোষ্ঠীর নির্বিচার গুলিতে সেদিন সকালে ফুলের মত অনেক প্রাণ ঝরে গিয়েছিল। সেই একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরকে অলৌকিক ভোর রূপে কবির স্মৃতিকে আন্দোলিত করে।

মন্তব্য:

বাংলা ভাষার সঙ্গে কবির নাড়ির যোগ। বাংলা ভাষার কথা হলে কত চেনা ছবি স্মৃতিতে ভেসে ওঠে— মায়ের স্নেহ, নানির আদর, ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই খন্ডিত বাংলার পূর্ব অংশের নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। শাসকবর্গ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার বিরুদ্ধে মাতৃভাষাপ্রেমী পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাস্তায় নেমেছিল ভাষাপ্রেমীদের স্রোত। পাকিস্তানের শাসকবর্গের বাংলা ভাষা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চলে। পুলিশের নির্বিচার গুলিতে সেদিন সকালে নিহত হয় বরকত, সালাম, রফিক, জব্বর, শফিউল্লাহ। একুশে ফেব্রুয়ারির ভোর কবির সেই স্মৃতিতে আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 18.2

1) নীচের বাক্যগুলির মধ্যে রেখাঙ্কিত শব্দগুলির শূন্যস্থানে ঠিকমতো লিখুন—

(i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে ________

(ii) ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া ________

(iii) নানি ________ ভাজেন ডালের বড়া।

(a) রমজানি সাঁঝে

(b) নিকোনো উঠোনে ঝরে রোদ

(c) কোন্ সে সুদূরে

2) নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লিখুন—

(i) ভেসে—

(ii) চেনা—

(iii) দূরে—

(iv) সাঁঝে—

3) নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দিন—

(i) কখন কবির চোখে চেনা ছবি ভেসে ওঠে?

(ii) আশাবরী কী?

(iii) নানির কোন স্মৃতি কবির চোখে ভেসে ওঠে?

(iv) কোন বছরের একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরির কথা স্মৃতিকে আন্দোলিত করে?

4) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

(i) বিষাদসিন্ধু কী?

(ii) রমজানি সাঁঝ বলতে কী বোঝান হয়েছে?

(iii) কবি একুশের প্রথম প্রভাত ফেরির কী গুরুত্ব বুঝিয়েছেন?

18.7 আপনি যা শিখলেন

1. বাংলা ও বাংলাদেশের প্রতি বাংলাভাষী মানুষ ও কবির ভালোবাসা;
2. বাংলাদেশের প্রকৃতি, মাঠ, ঘাট, নদী, প্রভৃতির প্রতি কবির অনুরাগের দৃষ্টান্ত;
3. বাংলার লোকসংস্কৃতির কিছু পরিচয়;
4. বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন।

18.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ৮টি বাক্যে উত্তর দিন—

1. 'নদী ও নর্তকী হয়'— অন্ধ বাউলের একতারার সুরে নদীও কীভাবে নর্তকী হয়, 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতাটি অবলম্বনে লিখুন।
2. বাংলা অক্ষর পরিচয়ের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীটি কী ভাবে বাংলা ভাষার জ্ঞান অর্জন করে লিখুন।
3. 'কাননে কুসুমকলি ফোটে'— এই অংশটিতে কবি শৈশবের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন?

4. বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে কবির চোখে কোন চেনা ছবি ফুটে ওঠে?

5. 'রমজানি সাঁঝের' সঙ্গে কবির কোন্ স্মৃতি জড়িয়ে আছে লিখুন।

6. 'একুশের প্রথম প্রভাতফেরী'— লাইনটির মধ্যে দিয়ে কবি যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা লিখুন।

18.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

18.1

1) (i) ঝরে রোদ
   (ii) নর্তকী হয়
   (iii) মেঠো সুর

2) (i) (b)
   (ii) (c)
   (iii) (a)
   (iv) (d)

3) (i) হ্যাঁ।
   (ii) না।
   (iii) না।
   (iv) না।

4) (i) চন্দনের।
   (ii) মাঠের রোদ, বারান্দায় জ্যোৎস্নার আলো।
   (iii) মাঠের।
   (iv) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার কথা।
   (v) হাওয়াকে মেঠো সুর বানানোর কথা।

5) (i) বাউল উদাসকণ্ঠে একতারা বাজিয়ে গান গায়।

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) বাল্যশিক্ষা রামসুন্দর বসাকের লেখা শিশুশিক্ষার বই।

(iii) গো রাখাল— গোরু চরাবার কাজে নিযুক্ত যারা।

18.2

1) (i) (b)

(ii) (c)

(iii) (a)

2) (i) ডুবে।

(ii) অচেনা।

(iii) কাছে।

(iv) সকালে।

(v) লৌকিক।

3) (i) বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে।

(ii) সঙ্গীতের একটি রাগ বিশেষ।

(iii) রমজানি সাঁঝে দুলে দুলে বিষাদসিন্ধুর সুর।

(iv) ১৯৫২-র।

কবি পরিচিতি

কবি শামসুর রাহমান-এর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকার মাহুটুলিতে। কবি ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৫৩তে বি.এ. পাশ করে এম.এ.তে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেননি। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক ছিলেন, বাংলা আকাদেমির সভাপতি ছিলেন। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিশু সাহিত্য রচনায় দক্ষতা অর্জন করলেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি একজন কবি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি 'প্রথম গান', 'দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দী-শিবির থেকে', 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘর', 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবি নিজের দেশে এবং বিদেশে বহুবার বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কারগুলি হল 'আদমজি পুরস্কার', 'বাংলা আকাদেমি পুরস্কার', 'জীবনানন্দ পুরস্কার', 'মিতসুবিসি পুরস্কার' প্রভৃতি।

শব্দার্থ ও টীকা

সমধর্মী কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি সমধর্মী কবিতা উল্লেখিত হল—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, ফাগুনে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে। নদীর কূলে কূলে।

19

নাজমা

নবনীতা দেবসেন

19.1 প্রস্তাবনা

মাঝে মাঝে আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখি—এক ধর্মের কিছু মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

ধর্ম মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। কিন্তু ধর্মান্ধতা অনেক সময়েই মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। এরই ফলে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা।

এক সম্প্রদায়ের মানুষ তখন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে সহ্য করতে পারে না।

সাম্প্রতিককালে গুজরাট শহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তারই পটভূমিকায় ২০০২ সালের জুলাই মাসে কবি নবনীতা দেবসেন ‘নাজমা’ কবিতাটি লেখেন। কবিতাটি কবির রচিত ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

নাজমা নামক একটি মেয়ের তরুণ স্বামীকে দিনের বেলা প্রকাশ্য রাজপথে বিভেদ সৃষ্টিকারী কিছু বর্বর মানুষ হত্যা করে। গায়ে পেট্রল ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারে। আমাদের দেশের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আজ চলছে এরকম পৈশাচিক হত্যালীলা, যার ফলে নাজমার স্বামীর মতো অনেক মানুষকেই বিনা কারণে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কবি এখানে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

19.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়ার পর:

- সাম্প্রদায়িক বিভেদের নগ্ন রূপের সঙ্গে পরিচিত হবেন;
- ধর্মান্ধ মানুষেরা অনেক সময়ই নিজেদের মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে অপর মানুষের খুনি হয়ে

ওঠে—একথা আপনারা জানতে পারবেন;

- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষার পার্থক্য ভুলে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে সচেতন করবেন;
- সুস্থ জীবন গঠনে সাধারণ মানুষই যে শেষ কথা বলে একথা আপনারা বোঝাতে পারবেন।

19.3 মূল পাঠ

সেই মেয়েটির অনেক দূরে বাসা
সেই মেয়েটির তরুণ যুবক স্বামী
হঠাৎ উধাও অফিস যাবার পথে
ঠিক ছিল আজ বিকেল বেলায় ফিরে
বউকে নিয়ে টিভি কিনতে যাবে
বউ জানে না, যায়নি অফিস স্বামী
জানে না, তাই নাস্তা রেডি করা—
অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখে
মান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে বউয়ের
আজকেও তার কাজের তাড়া এত?
আজকে ওরা কিনবে রঙিন টিভি
অফিস থেকে ধার-পাওয়া খুব সোজা
সদ্য ধারে কিনেছে লাল স্কুটার
এই তো সবে ঘর-সংসার শুরু
অল্পে-স্বল্পে হিসেব করে চলা
সকাল সকাল ফিরতে হবে কিনা
যাচ্ছিল তাই সকাল সকাল উঠে
অফিস আবার তিরিশ কিলোমিটার
বাসার থেকে অনেকটা পথ দূরে
আসতে যেতেই নষ্ট সময় বহু

হঠাৎ কারা ধরল পথের মাঝে
হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল নীচে
একটা, দুটো, দশটা মানুষ—কারা?
ওদের সঙ্গে নেই তো চেনাশোনা
ওদের সঙ্গে নেই তো রেষারেষি?
কী হল যে, কিছুই হল কিনা
বোঝার আগেই পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে
তেল বেরুলো যুবক স্বামীর গায়ে
তেল ছড়ালো ফুল ছড়ানোর মতো

শব্দার্থ ও টীকা

বাসা = বাসস্থান।

উধাও = নিরুদ্দেশ।

টিভি = টেলিভিশন ; বাংলাতে বলে দূরদর্শন।

নাস্তা = টিফিন / জলখাবার।

মান = অভিমান।

সদ্য = সবে / সম্প্রতি।

সকাল সকাল = তাড়াতাড়ি।

আসতে যেতেই = যাওয়া আসাতেই।

হ্যাঁচকা = হঠাৎ টান মারা।

রেষারেষি = শত্রুতা।

পেট্রোল ট্যাঙ্ক = পেট্রোল রাখার ট্যাঙ্ক বা পাত্র।

কে ছোঁয়ালো দেশলাইটার কাঠি?
জ্বললো শরীর জ্বললো যুবক স্বামী
ছটফটিয়ে ছটফটিয়ে খাক্
অট্টহাস্যে মাতলো বালক বুড়ো
জ্যান্ত মানুষ দ্যাখনা কেমন বাজির মতন পোড়ে।
সেই মেয়েটির অনেক দূরে বাসা
জানলা ধরে দাঁড়িয়ে গোটা রাতে
পাশের বাড়ির কেউ বলেনি তাকে
বর ফেরেনি অফিস থেকে কেন—
জানত সবাই—নাজমা একা বাদে
পরের দিনেই কাঁপলো গোটা পাড়া
পুলিশ এলেন, এন. জি. ও. রাও এলেন
নাজমা দ্যাখো এই ছবিটা কার?
—‘‘এই ছবিটা? মানুষ নাকি এটা—’’
নাজমা বলে, ‘‘নাঃ চিনিনা একে।’’
নাজমা, তবে এই যে স্কুটারখানা
এই নম্বর, এইটে চেনো নাকি?
হাহাকারের দুরন্ত ঝড় তুলে
জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ে মেয়ে—
ওই স্কুটারের সওয়ার যে তার চেনা।
এই তো সবে কিনলো আজিজ ওটা।
বাচ্চা হবে এই সেপ্টেম্বরে
ছোটাছুটির অনেক আছে কিনা
নরোদা থেকে তিরিশ কিলোমিটার
দূরের অফিস, তাইতো স্কুটার কেনা।

নাজমা তবু সাবধানে খুব থাকে
খুব চেষ্টায় ভয় তাড়িয়ে বাঁচে
সরস্বতী কেন বলেছেন তাকে
—‘‘হার মেনো না, শক্ত হয়ে থাকো
এই পৃথিবীর বদল হতেই হবে।’’
নাজমা, ওটাই নয়, নয় শেষ কথা
আমরা আছি হাত ধরে তোর পাশে
পাপের ভরা পূর্ণ পৃথিবীতে
এবার বাঁচার একটাই পথ ; ওঠা।
অধঃপাতের ঠাঁই আছে আর কোথা?
আর গতি নেই ঊর্ধ্বগতি ছাড়া
নাজমা, তোমার ভাঙলে তো চলবে না

শব্দার্থ ও টীকা

ছটফটিয়ে = ছটফট করতে করতে
অট্টহাস্য = অতি উচ্চ বা বিকট হাসিতে।
জ্যান্ত = জীবিত।
পোড়ে = জ্বলে, দগ্ধ হয়।
গোটা রাত = সারা রাত।
বাদে = ছাড়া।
এন. জি. ও. = বেসরকারি সংস্থা। ইংরেজি শব্দটি হল Non-Government Organisation।
স্কুটার = দু-চাকার একধরনের যান।
দুরন্ত = অশান্ত, প্রবল, প্রচণ্ড।
হাহাকার = আর্তনাদ, শোকধ্বনি।
জ্ঞান = চেতনা।
আছড়ে পড়ে = বেগে মাটিতে পড়ে যাওয়া।
সওয়ার = আরোহী

তাড়িয়ে = দূর করে।
হার মেনো না = পরাজয় স্বীকার কর না।
শক্ত হয়ে থাকো = মনটাকে দৃঢ় করো।
বদল = পরিবর্তন।

অধঃপাত = মান, সম্মান, বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়েছে যে মানুষেরা
ঠাঁই = স্থান, ঠিকানা।

শব্দার্থ ও টীকা

বৃক্ষ—গাছ। এখানে মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো।

অন্য জগৎ— মানুষের বাঁচার উপযোগী জগৎ।

বজ্র—বাজ, অশনি।

নাজমা, তোমায় বৃক্ষ হতেই হবে
ভালোবাসায় ভর করে তুই দাঁড়া,
আমরা হব পায়ের তলার মাটি—
আমরা এক অন্য জগৎ দেব
প্রতিজ্ঞাতে বুক বেঁধে তুই দাঁড়া
অন্য জগৎ এই মাটিতেই আছে
আমরা ওকে আস্ত আকাশ দেব
নাজমা, আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না!

(সংক্ষেপিত)

19.4 বিষয়ের রূপরেখা

দাঙ্গায় নিহত স্বামীর এক হতভাগ্য স্ত্রীর নিদারুণ দুঃখ এবং তাকে পরের জন্য লড়াইয়ের কাহিনি এই কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলা যখন তার ঘর-সংসারকে আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করছে তখন তার ভরসাস্থল যে স্বামী তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীরা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করল। প্রিয় স্বামীর দগ্ধ বিকৃত মূর্তি দেখে সে একেবারে ভেঙে পড়ল, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তখন অন্য মহিলাদের প্রেরণায় সে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি পেল। তার ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য হিংসা ও পাপমুক্ত পরিবেশ গড়ার সংকল্প ঘোষিত হল।

19.4.1 সেই মেয়েটির .... নষ্ট সময় বহু

গদ্যরূপ:

সেই মেয়েটির বাড়ি অনেক দূরে। সেই মেয়েটির তরুণ যুবক স্বামী অফিস যাবার পথে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। (তার) আজ বিকেলবেলায় বউকে নিয়ে টিভি কিনতে যাবার কথা ছিল।

তার স্বামী অফিস যায়নি বউ জানে না। তাই নাস্তা রেডি করা আছে। অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখে তার অভিমান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে। আজকেও তার কাজের এত তাড়া কেন?

আজ ওরা রঙিন টিভি কিনবে। অফিস থেকে ধার-পাওয়া খুব সোজা। অফিস থেকে ধার করেই লাল স্কুটারটা কিনেছে। সদ্য তারা ঘর-সংসার শুরু করে অল্প-স্বল্প হিসেব করেই (সংসার) চালাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলেই তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে। আসা-যাওয়া করতেই সময় অনেক নষ্ট হয়।

বক্তব্যসার:

একটি বিবাহিত মেয়ে আর তার স্বামী শহর থেকে অনেক দূরে বাস করে। স্বামী তরুণ যুবক, কাজ করে শহরেরই এক অফিসে। অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে তার টিভি কিনতে যাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অফিস

যাবার পথেই সে উধাও হয়ে যায়।

মেয়েটি তো আর জানে না যে তার স্বামী অফিসেই যায়নি। স্বামী ফিরে এসে যাবে বলে তার জন্য নাস্তা তৈরি করে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে এখনও কেন এল না সে। তাই খুব সঙ্গত কারণেই সে অভিমানী হয়েছে।

ওদের বিবাহিত জীবন সবে শুরু। টানাটানির সংসার। হিসেব করেই চলতে হয়। অফিস থেকে টাকা ধার করে স্কুটার কিনেছে কদিন আগে। আজও ধার করেই একটা রঙিন টিভি কেনার পরিকল্পনা।

অফিসটা তার দূরে, বাড়ি থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ। যেতে আসতে সময় চলে যায় অনেক। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলে অন্যদিন থেকে আরও আগেই আজ সে অফিসে রওনা হয়েছিল।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 19.1

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) 'নাজমা' কবিতার কবির নাম হল:

(অ) মল্লিকা সেন (আ) নবনীতা দেবসেন (ই) রাধারাণী দেবী

(খ) সেই মেয়েটির স্বামী বয়সে [(অ) বৃদ্ধ / (আ) যুবক / (ই) মাঝ বয়সী]

(গ) তার স্কুটারটি [(অ) নগদে কেনা / (আ) লটারিতে পাওয়া / (ই) ধারে কেনা]

(ঘ) তাদের টিভি কিনতে যাবার কথা [(অ) সকালে / (আ) দুপুরে / (ই) বিকেলে]

(ঙ) তার বাড়ি থেকে অফিস কত কিলোমিটার দূরে [(অ) তিরিশ / (আ) পঁচিশ / (ই) কুড়ি]

(চ) নাজমার স্বামী স্কুটারে করে কোথায় যাচ্ছিল? [(অ) দোকানে / (আ) বন্ধুর বাড়িতে / (ই) অফিসে]

2. একটি বাক্যে উত্তর লিখুন ঃ

(ক) 'বউ জানে না' — বউ কী জানে না?

(খ) 'মান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে বউয়ের' — এর কারণ কী?

(গ) 'আসতে যেতেই নষ্ট সময় বহু'—কোথায় যেতে কেন সময় নষ্ট হয়?

19.4.2 হঠাৎ কারা .... নাজমা একা বাদে

গদ্যরূপ:

হঠাৎ কারা পথের মাঝখানে তাকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে (স্কুটার থেকে) নীচে নামাল। একটা, দুটো, দশটা মানুষ (যারা ওকে ধরতে এল) তাদের সঙ্গে ওর কোনও চেনাশোনা ও রেষারেষি নেই।

(এরপর) কী যে হল বোঝার আগেই পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে তেল বেরুল যুবক স্বামীর গায়ে ফুল ছড়ানোর মত তেল ছড়াল। (তারপর) কে যেন দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দিল।

যুবক স্বামীর শরীর জ্বললে (সে) ছটফট করতে থাকে। বালক বুড়ো অট্টহাস্যে মাতল। জ্যান্ত মানুষ বাজির মতন পোড়ে বলে (এবার) চেঁচাল।

সেই মেয়েটির বাড়ি অনেক দূরে। সারা রাত সে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে (ওর অপেক্ষায়)। তার বর অফিস থেকে ফেরেনি কেন পাশের বাড়ির কেউ তাকে জানায় না। নাজমা ছাড়া অন্য সবাই জানত (তার ফিরে না আসার কারণ)।

বক্তব্যসার:

অফিস যাবার সময় পথের মাঝেই কিছু অচেনা লোক তার পথ আটকায়। জোর করেই তাকে স্কুটার থেকে রাস্তায় নামায়। না, তাদের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা ছিল না। এমনকি তারা তার আগেকার কোনো পরিচিত মানুষও নয়।

কিছু বোঝার আগেই অতর্কিতে তারা গায়ে পেট্রোল ছড়িয়ে দিল—ফুল ছড়াবার মতো। আর তারপরই দেশলাই জ্বালিয়ে তার গায়ে আগুন লাগাল তারা।

সেই আগুনে পুড়ে গেল তার সমস্ত শরীর। জ্যান্ত শরীরটাকে ছটফট করতে করতে শেষ হয়ে যেতে দেখে ধর্মের ধ্বজাধারী ওই অসভ্য মানুষগুলোর কী আনন্দ! পৈশাচিক উল্লাসে তারা মেতে উঠল।

প্রকাশ্য দিনের আলোয় জনসমক্ষেই তাকে খুন হতে হল! মেয়েটির বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে বলেই সে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি জানতে পারেনি। স্বামীর বাড়ি ফেরার প্রতীক্ষায় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়েই তাকে রাত কাটাতে হয়। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তার খুন হবার কথা জানলেও কেউই নাজমাকে সে-কথা জানাতে পারেনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.2

1. পাঠ্য কবিতা থেকে শব্দ চয়ন করে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(অ) তেল ছড়াল, —— ছড়ানোর মতো।

(আ) জ্বললো শরীর —— যুবক স্বামী।

(ই) জ্যান্ত মানুষ দ্যাখ্‌না কেমন —— মতন পোড়ে।

(ঈ) জানলা ধরে দাঁড়িয়ে —— রাতে।

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) **'নামিয়ে নিল নীচে'**—কোথা থেকে নামাল?

(অ) বিছানা থেকে (আ) বাস থেকে (ই) স্কুটার থেকে

(খ) **তাকে নামিয়ে কী করল?**

(অ) অফিসে পৌঁছে দিল (আ) পুড়িয়ে মারল (ই) বাড়ি পৌঁছে দিল

3. (ক) **হঠাৎ কারা ধরল পথের মাঝে** — এখানে 'কারা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

(অ) প্রতিবেশীদের (আ) ধর্মান্ধ মানুষের দলকে (ই) পুলিশ ও এন. জি. ও.-দের

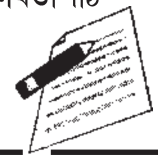

(খ) **'জানত সবাই'**—সবাই কী জানত?
(অ) নাজমার বাড়ি থেকে ওর স্বামীর অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে
(আ) বউকে নিয়ে নাজমার স্বামী টিভি কিনতে যাবে
(ই) নাজমার বর অফিস থেকে বাড়ি ফিরল না কেন

(গ) **ওদের সঙ্গে নেইতো চেনাশোনা**—'ওদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
(অ) নাজমার প্রতিবেশীদের (আ) প্রশাসনের কর্মচারীদের (ই) ধর্মান্ধ নিষ্ঠুর মানুষদের।

(ঘ) **ওদের সঙ্গে কার চেনাশোনা নেই?**
(অ) নাজমার (আ) নাজমার স্বামীর (ই) পুলিশ কর্মচারীদের।

19.4.3 পরের দিনই .... এই কী তোমার স্বামী

গদ্যরূপ:

পরের দিনেই পুলিশ ও এন. জি. ও.-রাও আসাতে সমস্ত পাড়া কেঁপে উঠল। 'নাজমা, এই ছবিটা কার, দেখো' —'এই ছবিটা? এ কী মানুষ' নাজমা বলে, 'না, চিনিনা ওকে।'

'নাজমা, তবে এই স্কুটারের নম্বরটা কী চেনা' (নম্বরটা দেখেই) চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি। (কারণ) ওই স্কুটারের আরোহী যে তার চেনা।

আজিজ তো সদ্য কিনলো ওটা। সেপ্টেম্বর মাসে (মেয়েটির) বাচ্চা হবে। নরোদা থেকে (আজিজের) অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে। অনেক ছোটাছুটি আছে বলেই স্কুটারটি কেনা।

বক্তব্যসার:

পরদিন পুলিশ এল। এল এন. জি. ও.-র অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। তাই গোটা এলাকাতেই আলোড়ন সৃষ্টি হল। প্রশাসনিক ব্যক্তিরা নাজমাকে একটা ছবি দেখাল। কিন্তু ছবিটি দেখে স্বামীকে সনাক্ত করা নাজমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এবার তারা একটা স্কুটার দেখাল। স্কুটারের নম্বর নাজমা চিনতে পারল। ওই স্কুটারটা তো তার স্বামীর। আর তাতেই প্রবল শোকে, মহাশূন্যতার হাহাকারে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

নাজমা সন্তানসম্ভবা। আগামী সেপ্টেম্বরেই তার সন্তান প্রসবের কথা। তাই এখন তার স্বামীকে অনেক ছোটাছুটি করতে হবে। অফিসটাও তার বাড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে বলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্কুটারটা তাকে কিনতে হয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.3

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) নাজমার স্বামীর নাম কী?
(অ) আজিজ (আ) আজিম (ই) কাসেম

(খ) **'ওই স্কুটারের সওয়ার যে তার চেনা'**—এখানে কার চেনা?

(অ) নাজমার (আ) নাজমার প্রতিবেশীর (ই) নাজমার স্বামীর

(গ) **সওয়ার কে ছিলেন?**

(অ) নাজমার স্বামী (আ) জনৈক পুলিশ কর্মচারী (ই) নাজমার এক প্রতিবেশী

(ঘ) **সেই সওয়ারের পরিণতি কী হয়েছিল?**

(অ) তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল।

(আ) তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

(ই) পথচারীরা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।

2. উত্তর লিখুন:

(ক) **'এই ছবিটা? মানুষ নাকি এটা'**— ছবিটা মানুষের নয় বলে বক্তার মনে সন্দেহ জাগল কেন?

(খ) **'পরের দিনেই কাঁপলো গোটা পাড়া।'**— সেদিন পাড়া কাঁপল কেন?

19.4.4 নাজমা তবু .... আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না

গদ্যরূপ:

নাজমা ভীতি দূর করে সাবধানেই থাকে। সরস্বতী তাকে বলেছেন—হার না মানতে, শক্ত হয়ে থাকতে। এই পৃথিবী বদলাবেই।

নাজমা, ওটাই শেষ কথা নয়—পাপে ভরা এই পৃথিবীতে। তোর হাত ধরে আমরা তোর পাশে আছি। এখন ওঠাই হল বাঁচার একমাত্র পথ। অধঃপাতের স্থান আর কোথায় আছে?

ঊর্ধ্বগতি ছাড়া আর গতি নেই। নাজমা, তোমায় ভাঙলে চলবে না, তোমায় বৃক্ষ হতেই হবে। ভালোবাসায় ভর করে তোকে দাঁড়াতে হবে, আমরা পায়ের তলার মাটি হব।

তুই প্রতিজ্ঞায় বুক বেঁধে দাঁড়া। আমরা তোকে অন্য জগৎ দেব। অন্য জগৎ এই মাটিতেই আছে। আমরা তোকে গোটা আকাশ দেব নাজমা, আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না।

বক্তব্যসার:

নাজমা বাঁচার চেষ্টা করে। মন থেকে ভয়ভীতি দূর করতে চায়। প্রতিবেশী জনৈকা মহিলা তাকে বেঁচে থাকার সাহস জোগান। তিনি ছিলেন জীবনের প্রতীক। শক্ত হাতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা বলেন।

প্রতিবেশীরা তাকে জানায় অশুভ শক্তিই শেষ কথা নয়। তার স্বামীর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনার হলেও এ মৃত্যু জীবনের ছন্দ নষ্ট করতে পারে না। নাজমার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। অধঃপতিতদের বিদায় করাই এখন হবে বাঁচার একমাত্র পথ।

তাই তারা নাজমাকে অশুভ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বলে। মাটি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে যেমন একটি গাছ উপরের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তেমনি দাঁড়াতে হবে নাজমাকে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের ভালোবাসাই হবে তার পায়ের তলার মাটি। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই হবে জীবনের মূলমন্ত্র।

নাজমার কোলে যে নতুন মানুষ আসছে তাকে বাঁচার মতো নতুন এক পৃথিবী দেবার শপথ নিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই মাটিতেই বর্বরতা ও মানুষের মমত্ববোধ—এই দুইয়ের সহ অবস্থান আছে। নাজমাকে কঠিন কঠোর হয়ে যেমন বর্বরতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়তে হবে, তেমনি এক সস্নেহ মমতায় তার শিশুর জন্য গড়ে তুলতে হবে এক সুন্দর বলিষ্ঠ পৃথিবী। সে পৃথিবীকে বর্বরেরা ভেঙে টুকরো টুকরো করতে পারবে না। এক পরিপূর্ণ মানবিক স্নেহ ভালোবাসায় বেঁচে থাকবে নতুন প্রজন্মের মানুষ। তাই মা নাজমার সামনে একদিকে মানুষের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই আর একদিকে মানবিক পৃথিবী গড়ার নতুন দায়িত্ব।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.4

1. কবিতা থেকে শূন্যস্থান পূরণ করুন:

(অ) এই পৃথিবীর ——— হতেই হবে।

(আ) অধঃপাতের ——— আছে আর কোথা?

(ই) আমরা ওকে ——— আকাশ দেব।

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে অন্য শব্দ দেওয়া আছে। পাঠ্যাংশ থেকে সঠিক শব্দটি ওখানে বসান:

(অ) আমরা থাকব হাত ধরে তোর পাশে।

(আ) আমরা হলাম পায়ের তলার মাটি।

(ই) অন্য পৃথিবী এই মাটিতেই আছে।

3. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) **'আমরা ওকে অন্য জগৎ দেব',**—'আমরা' বলতে কারা?

(অ) নাজমার স্বামীর সহকর্মীরা

(আ) প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা

(ই) নাজমার প্রতিবেশীরা।

(খ) **'ওকে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?**

(অ) নাজমার স্বামীর (আ) নাজমার (ই) যে শিশুটির জন্ম হতে যাচ্ছে তার

(গ) **'অন্য জগৎ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

(অ) সাম্প্রদায়িকতার জগৎ

(আ) অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জগৎ

(ই) মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের জগৎ।

4. 'এবার বাঁচার একটাই পথ'—কী রকম বেঁচে থাকার কথা কবি বলেছেন?

5. কবি এই কবিতায় নাজমাকে নিজের মনের বল বাড়াতে বলেছেন কেন?

6. 'আমরা হব পায়ের তলার মাটি'—'পায়ের তলার মাটি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

19.5 আপনি যা শিখলেন

1. ধর্ম অনেক সময়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সেতু না হয়ে বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
2. ধর্মান্ধ মানুষেরা নিজেদের মনুষ্যত্ববোধ নষ্ট করে ও অপরেকেও খুন করে।
3. ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় সমাজ ভাগাভাগি হয়ে যায়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
4. খুনিদের খুন করার লিপ্সা কখনই মনুষ্যজীবনকে স্তব্ধ করতে পারে না, পারে না তার এগিয়ে চলার ছন্দকে নষ্ট করতে।
5. বেঁচে থাকার জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার তার মনুষ্যত্ব।
6. সুস্থ জীবন গঠনে সাধারণ মানুষই শেষ কথা বলে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে।

19.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. এই কবিতায় নাজমার প্রতিবেশিনীর যে ছবি ফুটে উঠেছে তা দশটি বাক্যে লিখুন।
2. নাজমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কারা—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত দশটি বাক্যে লিখুন।

19.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

19.1

প্রশ্ন		উত্তর সংকেত
1. (ক)	———	(আ)
(খ)	———	(আ)
(গ)	———	(ই)
(ঘ)	———	(ই)
(ঙ)	———	(অ)
(চ)	———	(ই)
2. (ক)	———	স্বামী অফিস যায়নি
(খ)	———	স্বামী ফিরতে দেরি করছে
(গ)	———	অফিস যেতে আসতে

19.2

প্রশ্ন		উত্তর সংকেত
1. (অ)	———	ফুল

(আ) ——— জ্বললো
(ই) ——— বাজির
(ঈ) ——— গোটা

2. (ক) ——— ই
(খ) ——— আ

3. (ক) ——— আ
(খ) ——— ই
(গ) ——— ই
(ঘ) ——— আ

19.3

1. (ক) ——— অ
(খ) ——— অ
(গ) ——— অ
(ঘ) ——— আ

2. (ক) ——— গোটা শরীর পুড়ে বিকৃত হয়েছিল বলে
(খ) ——— পুলিশ এবং এন.জি.ও.-রা এল বলে

19.4

প্রশ্ন **উত্তর সংকেত**

1. (অ) ——— বদল
(আ) ——— ঠাঁই
(ই) ——— আস্ত

2. (অ) ——— থাকব → আছি
(আ) ——— হলাম → হব
(ই) ——— পৃথিবী → জগৎ

3. (অ) ——— ই
(আ) ——— ই
(ই) ——— ই

4. ——— সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ানো

5. ——— তার ভাবী সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য

6. ——— সহযোদ্ধা

কবি পরিচিতি

নবনীতা দেবসেন সাহিত্য রচনা শুরু করেন কবিতা দিয়ে। খুব ছোটো বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। পিতা নরেন্দ্র দেব এবং মাতা রাধারানি দেবী—এই দুই বিখ্যাত কবির সন্তান হয়ে সাহিত্য- ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা যেন উত্তরাধিকার অর্জন করা।

নবনীতার প্রথম বই '**প্রথম প্রত্যয়**' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তাঁর দ্বিতীয় বইও কবিতার বই— '**স্বাগত দেবদূত**'।

নবনীতা দেবসেন অনেকগুলো ভাষা জানেন। বাংলা, ইংরেজি ভাষা ছাড়াও হিন্দি, উড়িয়া, ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন। কেবল কবিতাই নয়, উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নানা ধরনের সাহিত্যচর্চা করেন তিনি।

নবনীতা দেবসেনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম হল : 'আমি অনুপম', 'প্রবাসে দৈবের বশে', 'অন্য দ্বীপ', 'স্বভূমি', 'একটি দুপুর', 'দেশান্তর', 'দ্বিরাগমন', 'রামধন মিত্র লেন' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটোগল্প হল : গল্পগুজব, ভালোবাসা কারে কয়, খগেনবাবুর পৃথিবী, গল্পসংগ্রহ—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, রাগ-অনুরাগ ও অন্যান্য গল্প, বাছাই গল্প প্রভৃতি।

সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁর রয়েছে অনায়াস বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নাটক, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা, রূপকথা, সাহিত্য সমালোচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ প্রভৃতি। তাঁর অনেক গ্রন্থই বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। শিক্ষাবিদ নবনীতা কেবল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স এবং জাপানের নানা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ধর্মমোহ' কবিতা।

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা '৪৬-৪৭'।

আর একটি হল সমরেশ বসুর লেখা 'আদাব' গল্প।

গদ্য পাঠ

20. কালাপাহাড়

21. শিল্পী

22. অনাচার

23. টেরা ইন্‌কগ্‌নিটা

24. নীলকণ্ঠ (নাটক)

শব্দার্থ ও টীকা

20

কালাপাহাড়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

20.1 প্রস্তাবনা

হাল-বলদের সঙ্গে বাংলার চাষিদের যোগসূত্র চিরকালের। বাংলার চাষি চাষ ছাড়া অন্য জীবিকায় তেমন পোক্ত নয়। আর চাষ করতে প্রথম দরকার মাটির, তারপর হালের। আর এর পরেই দরকার বলদের। বলদ ও মোষ ছাড়া হাল টানবে কে? আবার ফসল ফলালেই চলে না। তাকে করতে হবে খামারজাত। সেজন্য লাগে একটা গাড়ি আর একজোড়া বলদ ; কখনও বা একজোড়া মোষ। কৃষিপ্রধান এ রাজ্যে তাই বলদ চাষির পরিবারের একজন। সে যেমন প্রাণান্ত খেটে জলে-কাদায় মাটি চষে তেমনি চাষি আর তার বউ বা বাড়ির লোক তাকে সযত্নে স্নান করায়, সাঁঝবেলা সাঁজাল দিয়ে মশা-মাছি তাড়ায়। এটা করতে করতে চাষি ও তার পরিবার ভুলে যায় যে বলদ বা মোষ এক জন্তু বিশেষ। তারা তাদের মনের মতো নামকরণ করে। সুখে- দুঃখে তাদের সঙ্গে আপনজন ভেবে ঘরের কথা বলে। এমনিভাবে চলতে চলতে বলদের পশুত্ব যায় ঘুচে, সে হয়ে ওঠে পরিবারের সাথি ও আপনজন।

সাঁজাল = মশা তাড়াবার ধোঁয়া।

তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' পল্লিবাংলার খেত-খামারের এক চিরন্তনী গল্প। পশুদের প্রতি প্রেম এখানে খুবই আন্তরিক ও সজীব ভাষায় প্রকাশিত। এ যুগে মানুষ যখন টাকা-পয়সা, ধনদৌলতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, পরিবেশ ও পরিবেশের চারদিকে যে সব প্রাণীরা আমাদের নিত্যসঙ্গী তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করছে তখন এ গল্প পড়ে জীবজন্তুর প্রতি মমতা দেখানোর গুরুত্ব বাড়বে।

শুধু তাই নয়, মানুষের সঙ্গে পশুর বা পশুতে পশুতে নির্বাক ভালোবাসার যে ছবি লেখক এ গল্পে তুলে ধরেছেন তা সকলের বুক ছুঁয়ে যায়।

এ যুগের মানুষের ভেতর অনেকক্ষেত্রেই মানবিক গুণের অভাব দেখা যায়—পশুদের এই নীরব প্রেম সেখানেও কিছু ভালোবাসার ছোঁওয়া এনে দিতে পারে।

20.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়ার পর আপনারা—

- জানতে পারবেন যে কৃষি প্রধান এ রাজ্যে বলদ বা মোষ চাষি পরিবারেরই একজন;

- পশুর সঙ্গে পশুর সম্পর্কের কথা জানতে পারবেন;
- মানুষের প্রতি নির্বাক পশুর নীরব প্রেমের কথাও জানতে পারবেন।

20.3 মূল পাঠ

(1)

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই, বয়স্ক অবুঝ শিশুর চেয়ে অনেক বেশি বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, শান্ত না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মতো ভুলিতেও চায় না।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে, যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল, তবে তুমি যা মনে কর তাই কর গে যাও, দুটো হাতি কিনে আন গে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, হাতি—হাতি। বলি ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথারও কোন জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল, গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, হাতি কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মতো ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা লম্বা শিষ। চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনই মুখ্যুই হয় কিনা! বলি, হ্যাঁ রে মুখ্যু, ভালো গোরু না হলে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রংলাল ধরিয়াছে, এবার সে গোরু কিনিবে। এই গোরু কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েক দিন হইতেই কথা-কাটাকাটি চলিতেছিল। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণির। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম ; বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মতো—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গোরুর উপরেও তাহার প্রচণ্ড শখ। তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর,—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিং, সাপের মতো লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গোরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গোরুর মতো গোরু যেন আর কাহারও না থাকে। গোরুর গলায় যে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায় ; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোন দিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে, আহা, কেষ্টর জীব!

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর

শব্দার্থ ও টীকা

মিষ্টান্ন = মিষ্টিজাত খাদ্যবস্তু।
বিপত্তিকর = বিপদের।
কল্পিত = মনগড়া।
শ্লেষপূর্ণ = ব্যঙ্গাত্মক।
নেকাপড়া = পঠনপাঠন।
মুখ্যু = অজ্ঞ।
মতদ্বৈধহেতু = মত বিরোধের জন্য।
জোতজমাও = জায়গা-জমি।
অপরিসীম = সীমাহীন।
কার্পণ্য = কৃপণতা।
চাকলার = অঞ্চলের।
অসচ্ছল = টানাটানি, অভাবী।
কেষ্ট = কৃষ্ণ।
অজন্মার = ফসল না ফলার।

গতবার ধানও মন্দ হয় নাই ; এইজন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গোরু তাহার চাই-ই। এক জোড়া গোরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গোরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোন মতে বলা চলে না ; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গোরু অনেকের আছে।

যশোদা বলিতেছে, এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি ; আর এবারও যদি ধান ভালো হয়, তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশো টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা?

শব্দার্থ ও টীকা

টাকা কোথা হইতে আসিবে—সে রংলাল জানে না, তবে গোরু তাহার চাই-ই। অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোন আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গোরু-জোড়াটা তাহার ছিল সে জোড়াটা বেচিয়া হইল এক শত টাকা, বাকি এক শত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? তুমি গোরু কিনে আন না। কিনে আনলে তো কিছু বলতে লারবে!

যোগাড় = সংগ্রহ।

লারবে = পারবেনা।

রংলাল খুশি হইয়া বলিল, বেশ বলেছ, তাই করি। তার পর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে?

যশোদার মা বলিল, এ গোরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গোরু কেনো তুমি। ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায়?

সে আপনার গহনা কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উচ্ছ্বসিত = উৎফুল্ল।

(2)

যাক, রংলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গোরু-মহিষের হাটে যাইবার সংকল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মতো দুইটি গোরু সে সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মতো সাদা, নয় দধিমুখো কালো দুইটি।

পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ-মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ! এ যে—! ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা!

হাজার হাজার না হইলেও গোরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক আমদানি পাঁচুন্দির হাটে হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গোরু-মহিষের চীৎকারে, মানুষের কলরবে—সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে একফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গোরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলা চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মতো—এই যায়! এই গেল! বাঘবাচ্চা! আরবী ঘোড়া!

চকিত দৃষ্টি = ভয় পাওয়া নজর।

রংলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপনার মনের মতো সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয়, যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ঐ দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারদের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ারগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মতো। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাৎ কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতকগুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা

অবিশ্রান্ত = অবিরাম, এক নাগাড়ে।

থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানে কি আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠিগাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল, দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে!

যদি আমার গায়ে লাগত!

তা তুমার লাগত, না হয় টুকচা রক্ত পড়ত, আর কি হত?

রংলাল অবাক হইয়া গেল, রক্ত পড়ত, আর কি হত?

দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও।

রংলালকে ভালো করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছটা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল, এ কি, লাঠির প্রান্তে যে সূচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল, উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই।

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল, সূচের অগ্রভাগই বটে—একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকারেরা লাঠির ডগায় সূচ বসাইয়া রাখে, ঐ সূচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মতো ছুটিয়া বেড়ায়। উঃ!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, পাইকারটা বলিল, কি, কিনবে কি কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই! বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

শব্দার্থ ও টীকা
থকথক = ঘন তরল।
আস্ফালিত = এখানে উদ্যত।
টুকচা = একটু।

(3)

চারিপাশেই মহিষের মেলা; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনটি বসিয়া, কোনটি দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গোরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনো দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল, এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল, এক লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট ; দেখি, আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল, এ মোষ গেরস্ততে নিয়ে কি করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ।

পাইকার বলিল, আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই

হৃষ্টপুষ্ট = মোটাসোটা।
তাড়না = আঘাত।
বিপুলকায় = বিশাল আকৃতির।
রোমন্থন = জাবর কাটা, চর্বিত চর্বন।

জানোয়ার জব্দ। এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষ-জোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, আবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মণ ওজন তো স্বচ্ছন্দে ঐ খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে। কি কালো রঙ! নিকষের মতো কালো। শিং দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে, পাইকারটাও তো বলিল, পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকাই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ঐ জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রংলাল ঐ মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। ঐ টাকাতেই তাহার হইল ; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিন আবদ্ধ হইয়া আছে, সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর সম্বল নাই, তখন এক শত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়াজানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালকে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্যের মতো উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা—কি বলিবে? মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে, সে কথা কেহ জানে? রংলালের মনে হইল, মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নীরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টি সাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল, হাতিই একজোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধ হয় প্রকাণ্ড উঁচু এক জোড়া বলদ কিনিয়াছে। সে বলিল, বেশি বড় গোরু ভালো নয় বাপু! বেশ শক্ত শক্ত গিঁঠ গিঁঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল, গোরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল, মোষ?

হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল, মোষ কিনলে তুমি?

হ্যাঁ।

আর এমন ক'রে হেসো না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। যশোদার মা ঝংকার দিয়া উঠিল।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রশংসমান = সপ্রশংস।
পঙ্ক = কাদা।
স্বচ্ছন্দে = সাবলীলভাবে।
নিকষ = কালো পাথর।
আবদ্ধ = বন্দি।
বাহার = শোভা।

বিস্ফারিত = প্রসারিত।
নিরীক্ষণ = মনোযোগের সহিত দেখা।
উদর = পেট।
উদরসাৎ = খেয়ে ফেলা।

লক্ষ্মী = সম্পদের দেবী।
নীরন্ধ্র = নিশ্ছিদ্র।
আস্তরণ = ঢাকনা।
ঝাঁপিখানি = ঢাকনা।
সোঁদা সোঁদা = ভিজে ভিজে।

আহা-হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল! লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও—চল, দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো।

শব্দার্থ ও টীকা

(4)

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল, সে বলিল, নাও, এইবার চালের খড় ক-গোছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট। এক-একটির কুম্ভকর্ণের মতো খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে!

যুগিও = যোগান দিও।

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ংকর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গীতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

তির্যক = বাঁকা।
রক্তাভ = লালচে।

রংলার বলিল, দাও, পায়ে জল দাও।

বাবা রে। ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোন ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা!

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল, অ্যাই খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে—বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ্।

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল, না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মতো চেহারা!

রংলাল বলিয়া উঠিল, বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়। আর এইটার কী নাম হবে বল দেখি?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর এইটার নাম কুম্ভকর্ণ—যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে।

যশোদার মাও খুশি হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশি হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল, গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে, তাহা নয় ; এটা তাহাকে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে, এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখো। খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে, গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো

তুমি?

যশোদা বলে, যাবে কোন্ দিন সাপের কামড়ে কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের ডাক! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ঐ আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে ; কখনো কখনো বা ছুটিতে আরম্ভ করে। রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

রংলাল দুইটার গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে, পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি নাকি? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনো বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে ; রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

আগুন লাগুক = খুব খিদে পাক।
বেলাত = বিলাত (এখানে দূরত্ব বোঝাতে)।
আকণ্ঠ = গলা পর্যন্ত।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে ; রংলাল হাসে।

অবলীলা-ক্রমে = সাবলীলভাবে।
উন্মুক্ত = খোলা।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কি মনান্তর যে ঘটে ;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মতো সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন আপন শিং উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড একগাছা বাঁশের লঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকেই পিটিতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে, তারপর পৃথক ভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ, ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবি—তবে তো!

মনান্তর = মনের অমিল।
যুধ্যমান = লড়াই করছে এমন।
অবলীলাক্রমে = অনায়াসে।

(5)

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মতো গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র, লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল বেশ বুঝিতে পারিল—সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্ত অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল আঁ—আঁ—আঁ!

গুল্মা-চ্ছাদনের = লতাপাতায় ঢাকা।
লোলুপতায় = লোভে।
সংকীর্ণ = সরু।
ইতস্তত = দ্বিধা।
হামাগুড়ি = হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে চলা।

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল, আঁ—আঁ—আঁ।

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনো দেখে নাই। তাহারা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার এক দিকে কালাপাহাড়, অন্য দিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধ হয় অসহিষ্ণু হইয়াই অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিং লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালাপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মতো বাঘটার উপর নতমস্তকে উদ্যত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিং দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিং বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণাকাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মতো চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দু-একটা অতিক্ষীণ আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে। চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মতো কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

(6)

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রংলাল বলিল, জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর-হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল—দেড় শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিং বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তা হলে, হ্যাঁ।

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল, আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব! কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল, যেমন তোমাতে আমাতে!

শব্দার্থ ও টীকা

চকিত = সজাগ।

অসহিষ্ণু = অধীর।

শৃঙ্গাঘাতে = শিং-এর ঘায়ে।

তীক্ষ্ণ = শানিত।

আক্রোশে = ভীষণ রাগে।

জ্ঞানশূন্যের = পাগলের মতো।

স্পন্দিত = ধ্বনিত।

সমকক্ষ = জুড়ি।

ক্রুদ্ধ = রাগান্বিত।

জাব = গোখাদ্যের জন্য, কুচানো খড়, বিচালি ইত্যাদি

মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু।

তা বটে! রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না। তারপর বলিল, ওঠ ওঠ, চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মোড়ল মশায়, শিগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে!

সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়তো মেরেই ফেলালে!

রংলাল আসিয়া দেখিল, রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড় অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মতো পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই ; সে নির্মমভাবে নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল, ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোট আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না ; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর সে শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল, আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে, কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল, যাঃ, ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল্ দেখি—দেখি!

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল। রংলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রংলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে,—আঁ—আঁ—আঁ!

সে উর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ঐ নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গোরুর বাছুরকে সে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহু দিন অবুঝের মতো সে তাহাদের পেটতলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার

শব্দার্থ ও টীকা

পুলকিত = আনন্দিত।

ফেলালছে = ফেলেছে।

অতিরঞ্জিত = বাড়িয়ে বলা।

নির্মমভাবে = নিষ্ঠুরভাবে।

নবাগত = নতুন এসেছে যে।

আয়ত্তাধীন = নিয়ন্ত্রণে।

উত্তরোত্তর = ক্রমশ।

লারব = পারব না।

অহরহ = দিনরাত।

ডাবা = মাটির গামলা।

মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিং দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

শব্দার্থ ও টীকা

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল, ষাট টাকাই হয়তো আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায়?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

(7)

আঁ—আঁ—আঁ!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁ—আঁ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়। কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

খুঁট = ক্ষুর মাটিতে গেঁথে শক্ত হয়ে থাকা।

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল, লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধ কোশ ছুটে পালাই, তবে রক্ষে। তখন উ আপনার ফিরল, একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল, এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল, আমি পারব না।

আর কে নিয়ে যেতে পারবে, তুমি না গেলে?

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

রটাইয়াছে = প্রচারিত হয়েছে।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ঐ পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল, তবে শহরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও-হাটে বড় যায় না।

প্রায়শ্চিত্ত = পাপ খণ্ডন, কুকাজের অপরাধ থেকে মুক্তি।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়াজানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতেও পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল! মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা! এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে। হাটে একজন পাইকার

কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালোই দিল—একশো পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল, এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা-ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়তো চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল, তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল, চল্ চল্।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁ—আঁ—আঁ!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মতো চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ—এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল, আঁ—আঁ—আঁ!

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিং দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া উন্মত্তের মতো ছুটিল।

কিন্তু এ কি! এসব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা! ওটা কি?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ-হৈ করিতেছিল, কার মোষ? কার মোষ?

ও কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে, আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁ—আঁ—আঁ! কিন্তু এ কি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায়, কত দূরে তাহার বাড়ি?

শব্দার্থ ও টীকা

ছিনাইয়া = ছিঁড়ে ফেলে।

লাঠিবর্ষণ = লাঠির ঘা।

অগ্রাহ্য = অস্বীকার।

মনশ্চক্ষে = অন্ত:দৃষ্টিতে, কল্পনায়।

তারস্বরে = চেঁচিয়ে।

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে—পুলিস সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভল্‌বারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কন্‌স্টেব্‌লকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন, ডোমলোগকো বোলাও।

শব্দার্থ ও টীকা

বিক্রমে = বীরত্বে।
নিদারুণ = খুব।
ডোমলোগকো = জীবিকার জন্য যারা মৃতের সৎকার করে তাদের।
বোলাও = ডাকো।

20.4 বিষয়ের রূপরেখা

20.4.1 সংসারে অবুঝকে .... রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বক্তব্যসার:

রংলাল বেশ বড়ো চাষি। তার জমিও অনেক আর জমিগুলিও খুব ভালো, একেবারে প্রথম শ্রেণির। তার গোরু কেনার প্রয়োজন। গোরু যে তার নেই তা নয়, তবে আরও ভালো গোরু তার দরকার। সে গোরুর বয়স হবে কাঁচা, শিং দুটো সুগঠিত, সাপের মতো লেজ আর থাকবে বাহারে রং। শুধু কী তাই! এরকম আরও অনেক গুণ থাকা চাই। যাতে ওই এলাকায় অন্য কোনও চাষির সে রকম গোরু না থাকে—এটাই হল রংলালের ইচ্ছে।

রংলালের এই ইচ্ছে নিয়েই ছেলে যশোদানন্দনের সঙ্গে তার বিরোধ। কদিন ধরেই বাপ-ব্যাটায় চলছিল কথা কাটাকাটি । গত কয়েক বছর অজন্মা ছিল তার ওপর ছিল ছেলে যশোদার লেখাপড়ার খরচ। তাই রংলাল নতুন করে গোরু কেনার কথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু ছেলেতো এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেছে, তাছাড়া গত বছর ফসল হয়েছে ভালো। তাই রংলাল চায় এখনই গোরু কিনতে।

ছেলের সঙ্গে বাপের কথা কাটাকাটি গোরু কেনার সময়টা নিয়েই। ছেলে চায় সে চাকরি- বাকরি একটা পেলে সংসারে কিছু পয়সা আসবে তার ওপর আগামী বছর যদি ফসল ভালো হয় গোরু কেনার খরচটা এসে যাবে। কিনতে গেলে দুশো টাকার কমতো হবেই না, ওই টাকাটা এখন তার বাবা কোথায় পাবে।

যশোদা যে-যুক্তিই দেখাক, রংলাল সে সবে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। তার নতুন গোরু কিনতেই হবে—যে করেই হোক। বাবার জেদের কাছে শেষ পর্যন্ত ছেলেকে মাথা নোয়াতেই হল।

রংলালের স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় গোরু কেনার একটা ব্যবস্থা হল। পুরোনো গোরু দুটো বেচে দেবার কথা বলে সে ; শুধু তাই নয়, নিজের গহনা কখনও বন্ধক দিতে রংলালের হাতে তুলে দিয়ে বলে, ভালো গোরু নইলে গোয়াল মানায়? স্বাভাবিক কারণেই রংলাল খুশি হয়ে ওঠে।

মন্তব্য:

রংলালের জমি-অন্ত প্রাণ। চাষের ওপর তার যত্ন। ভালো ফসল ফলাবার জন্য তার পরিশ্রম আর চিন্তাভাবনার শেষ নেই। এ জন্যই তার নতুন গোরু কেনা জরুরি।

পাঠগত প্রশ্ন 20.1

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) দুটো হাতি কিনে আন গে—কথাটি কে বলেছে?

অ. রংলাল আ. রংলালের স্ত্রী ই. রংলালের ছেলে

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

তাহার গোরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর, কাঁচা __________, বাহারে __________, সুগঠিত __________, সাপের মতো __________।

3. দুটি শব্দে উত্তর দিন:

সে আপনার গহনা কয়েকখানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। সে কে?

4. উত্তর দিন:

(ক) চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনি মুখ্যুই হয় কিনা ঃ—এই কথাটি রংলাল তার ছেলেকে কেন বলেছিল?

(খ) রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—রংলাল আনন্দে কেন উচ্ছ্বসিত হল?

20.4.2 যাক্ রংলাল টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া .... আসিয়া উঠিল বাগানে।

বক্তব্যসার:

রংলাল খুশি, গোরু কেনার প্রয়োজনীয় টাকা তার যোগাড় হয়ে গেছে। তাই এবার সে হাটে চলল—পাঁচুন্দির হাটে। ওই হাট থেকেই সে কিনবে মনের মতো দুটো গোরু। পাঁচুন্দির হাটের ওই বিশাল প্রান্তরে পশু ও মানুষের যেন মেলা বসে গেছে। খোলা আকাশ, মাথার ওপর সূর্য—একফোঁটা ছায়া কোথাও নেই। পশুর ডাকে আর মানুষের চেঁচামেচিতে সেকি অদ্ভুত কোলাহল চারদিকে। গোরুগুলি ভয় পাওয়া চোখে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পাইকাররা খদ্দের ধরার জন্য ফেরিওয়ালার মতো চেঁচাচ্ছে। পশুদের দিকে তাকিয়ে কোনওটাকে 'বাঘের বাচ্চা' আবার কোনওটাকে 'আরবী ঘোড়া' বলে চীৎকার করছে।

অন্যদিকটায় গোলমাল আরও বেশি। রংলাল সে দিকটাতেই চলল—সেদিকে ছিল মোষের বাজার। কচি বাচ্চা থেকে বুড়ো মোষ—সবই এসেছে বিক্রির জন্য। পাইকাররা অমানবিক আচরণ করছে তাদের সঙ্গে। বড়ো বড়ো বাঁশের লাঠি দিয়ে পশুগুলিকে পেটাচ্ছে—আর তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছুটছে এদিক ওদিক। ছুটতে ছুটতে কেউবা পড়েছে পুকুরের জলে। এবার রংলাল দেখল পাইকারদের পাশবিক নিষ্ঠুরতা। তাদের লাঠির মাথায় দু-তিনটি করে সূচ ফোটানো। ওই সূচের খোঁচা খেয়েই মহিষগুলো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়ায়। কারও গায়ের চামড়া উঠে গেছে, শরীরে দেখা যাচ্ছে লাল দগদগে ঘা। পাইকারদের ওই বীভৎস নিষ্ঠুরতা দেখে রংলালের গোটা শরীরটা শিউরে ওঠে।

মন্তব্য:

জানোয়ারদের প্রতি পাইকারদের কোনও মমতা নেই, নেই কোনো ভালোবাসা। খদ্দের টানার জন্য তাদের ওপর জঘন্য অত্যাচার করে দৌড় করায়। অন্যদিকে রংলাল প্রকৃত চাষি, পশুদের প্রতি তার যথেষ্ট স্নেহ ভালোবাসা আছে। তাই ওদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারে তার প্রাণ কাঁদে। ব্যথায় তার বুক টনটন করে। লেখক খুব স্বল্প পরিসরে রংলালের চরিত্রকে যথার্থ মানবিক করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রংলাল গোরু কিনতে কোন্ হাটে গিয়েছিল?
(অ) পাঁচুন্দির হাটে (আ) রথতলার হাটে (ই) চড়কতলার হাটে।

(খ) রংলাল যখন হাটে গেল সূর্য তখন—
(অ) মেঘে ঢাকা (আ). মধ্যাকাশে (ই) অস্ত গেছে।

(গ) হাটের ভেতর পুকুরটা ছিল—
(অ) নারকেল গাছ-ঘেরা (আ) তালগাছ-ঘেরা (ই) আমগাছ-ঘেরা।

2. 'উ আর দেখে কাজ নাই'—কে বলেছে?
(অ) রংলালের ছেলে যশোদানন্দন
(আ) পাঁচুন্দির হাটের এক পাইকার
(ই) পাঁচুন্দির হাটের এক ক্রেতা।

3. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ
(ক) হয় দুধের মতো ____________ নয় দধিমুখো ____________।
(খ) মনে হয়, যেন ____________ বাধিয়াছে।
(গ) রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে ____________ গেল।

4. একটি বাক্যে উত্তর করুন ঃ

(ক) 'সে অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে'—কোলাহলটা অদ্ভুত কেন?

(খ) 'একটা শোনা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল'—কথাটি মনে পড়ায় রংলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কেন তা অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

(গ) 'রংলাল অবাক হইয়া গেল'—রংলাল অবাক হল কেন?

20.4.3 চারিপাশেই মহিষের মেলা .... চল, দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও।

বক্তব্যসার:

বাগানের শেষ দিকে এসে রংলাল একেবারে থমকে গেল। এত প্রকাণ্ড চেহারার মোষ সে দেখেনি কখনো। এতো বড়ো চেহারার মোষ কেনবার লোক কোথায়। পাইকারটি উত্তরে জানায়—রাজা এবং জমিদাররাই এ মোষ কিনবে আর কিনবে লক্ষ্মীর সন্ধানে আছে যারা অর্থাৎ লক্ষ্মী নেই যাদের ঘরে তারাই কিনবে এদের।

শব্দার্থ ও টীকা

কোনো গেরস্তের পক্ষে এ মোষ কেনা অসম্ভব কারণ এর হালের মুঠো ধরবার লোক পাওয়া যাবে না।

রংলাল এবার ভাবতে শুরু করে। মোষের দিকে প্রশংসার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। কী নিকষ কালো রং মোষ দুটোর। শিং দুটোর কী বাহার। দুটো মোষই যেন এক ছাঁচে ঢালা—যেন যমজ শিশু।

একশ আটানব্বই টাকা দিয়ে মোষ দুটো কিনে নিল। মনটা এখন খুশিতে ভরা। কল্পনায় দেখছে—এবার দেশবাসী বিস্ময়ের সঙ্গে তার মোষ দুটোকে দেখবে আর প্রশংসা করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার স্ত্রী আর ছেলের কথা মনে পড়ল। বিশেষ করে তার লেখাপড়া জানা ছেলে যশোদাকেই তার ভয় বেশি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রংলাল বাড়ির পথে এগিয়ে যায়। আবার অন্যকথাও জাগে তার মনে। তার বাড়ি, তার জমি, চাষ করতে হয় তাকে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকেই ফসল ফলাতে হয়—সুতরাং সে কেন ভাববে এত কথা। কাকে সে ভয় পাবে—মনটা তখন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বাড়িতে এসে সে স্ত্রী ও ছেলেকে মোষ কেনার কথা জানায়। মোষ দেখে ওরা অবাক! মোষ দুটিকে জল, তেল, সিঁদুর, হলুদ দিয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢোকাবার কথা স্ত্রীকে জানায় রংলাল। আগামী মরশুমে ভাল ফসল পাবার আশায় নতুন বলদ বা মোষকে চাষি পরিবারে এই ভাবে বরণ করে নেয় বাড়ির গিন্নী।

মন্তব্য:

রংলাল চরিত্রটি যথার্থ বাস্তব। চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু দৃঢ়চেতা সে। মোষ দুটোর বাহারে চেহারা দেখে অনেকে বিস্মিত হবে—এ কথা ভেবে সে যেমন পুলকিত—তেমনি বউ ছেলের মনোভাব অনুমান করেও সে ভীত। আবার চাষের কথা ভেবে সেই মুহূর্তেই সে কঠিন বাস্তবের সামনে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না। লেখক রংলাল চরিত্রটি খুবই জীবন্ত করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.3

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রংলাল মোষ দুটি কিনল—

(অ) একশ টাকায় (আ) একশ আটানব্বুই টাকায় (ই) একশ আশি টাকায়

(খ) সবচেয়ে বাহার বেশি—কীসের?

(অ) শিং দুটির (আ) চোখ দুটির (ই) কান দুটির

2. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) এ মোষ কে ____________ বাবা?

(খ) লেখাপড়া জানা ____________ তাহার বড়ো ভয়।

(গ) এত প্রকাণ্ড ____________ মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই।

3. মোষ দুটো কিনে বাড়ির কাছাকাছি এসে রংলালের মনের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল কেন?

4. রংলাল স্ত্রীকে জল, তেল, সিন্দুর, হলুদ নিদয়ে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢোকাতে বলল কেন?

20.4.4 দেখিয়া শুনিয়া যশোদার .... সে গরুই হোক আর গোঁসাইই হোক।

বক্তব্যসার:

যশোদা কিন্তু বাবাকে কথা না শুনিয়ে ছাড়ে না। মোষ দুটোর যেরকম চেহারা তাতে ওদের জন্য খাবার জোটাতে হিমশিম খেতে হবে তার বাবাকে।

আর তার মা অবাক হয়ে দেখছিল মোষ দুটো। ওরা ভয়ংকর হলেও সুন্দর একটা রূপ আছে। কালো চোখের নীচে রয়েছে লালচে সাদা অংশ—কী সুন্দর দৃষ্টি।

মোষ দুটো তখন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। কিছু কী বলতে চাইছে? রংলাল তখন স্নেহের সুরে মোষ দুটোকে শাসন করে। ওদের কাছে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে রংলাল সাবধান করে তাদের—'খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে—বাড়ির গিন্নী চিনে রাখ।'—বোবা পশুর প্রতি রংলালের অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসার পরিচয়, তাদের একান্ত আপনজন বলে গ্রহণ করার এ দৃষ্টান্ত রংলালের চরিত্রকেই যথার্থ মানবিক করে তুলেছে।

যশোদার মার কিন্তু সংশয় গেল না—অত বড়ো চেহারার পশু দুটোকে দেখে কাছে এসে তাদের তেল সিঁদুর দিয়ে বরণ করে নিতে সংকোচ প্রকাশ করছে। কিন্তু চেহারা দুটোর তারিফ করতে সে দ্বিধা করেনি। বেশি মোটা জানোয়ারটির নাম রেখেছে সে কালাপাহাড় আর অন্যটির নামকরণ করল কুম্ভকর্ণ বলে।

রংলাল বুঝেছে সাময়িক ভীতি থাকলেও মোষ দুটো দেখে যশোদার মা খুশি হয়েছে কিন্তু যশোদার মুখের গোমড়াভাব যায়নি এখনও।

মন্তব্য:

অপরের মন জয় করতে পারা মানুষের চরিত্রের অন্যতম গুণ। রংলাল চরিত্রে এ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। মোষ কেনায় যশোদার মার ছিল প্রবল আপত্তি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই মোষ দুটোকে দেখে সে কেবল খুশিই হয়নি, তাদের যথার্থ নামকরণও করেছে। পশু দুটোর উদ্দেশ্যে রংলালের উক্তিতেও লেখক যথার্থই রংলালকে একজন দরদি পশুপ্রেমী হিসাবে চিত্রিত করতে চাইছেন। কৃষক রমণী যশোদার মার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক নিবিড়। দুটো তাগড়া মোষ দেখে সে খুব খুশি হয়ে একজনের নাম কালাপাহাড় আর অন্যটিকে কুম্ভকর্ণ বলে চিহ্নিত করে। গল্পটি কালাপাহাড়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। হালের মোষই গাঁয়ের কৃষকদের জীবন জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এই লেখক এ গল্পের নাম কালাপাহাড় দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন 20.4

1. পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ গ্রহণ করে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

হোক ____________, তবুও একটা রূপ আছে যাহার ____________ মানুষকে চাহিয়া ____________ হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া ____________ ভঙ্গীতে সকলকে ____________ দেখিতেছিল।

2. প্রতিটি বাক্যে একটি ভুল শব্দ আছে, ঠিক শব্দটি লিখুন ঃ

(ক) এক একটির কালাপাহাড়ের মতো খোরাক চাই।

(খ) রংলাল বলিল, দাও গায়ে জল দাও।

(গ) ভীষণ রূপের যথাযথ দৃষ্টি।

3. একটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

(ক) যুগিও কোথা হতে যোগাবে—এখানে এমন আশঙ্কা প্রকাশ কেন করা হয়েছে?

(খ) অ্যাই খবরদার!—মা হয় তোদের.....কেন এমনভাবে পরিচয় করালেন?

(গ) ও আমি পারব না—বক্তা কেন পারবেন না?

20.4.5 রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে .... মিলে মিশে থাকবি—তবে তো!

বক্তব্যসার:

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়ে কুম্ভকর্ণকে তাড়িয়ে নিয়ে নদীর ধারে যায়। এটাই তার রোজকার কাজ। নদীর ধারে সে একটা গাছতলায় গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে আর মোষ দুটো ঘাস খেয়ে বেড়ায়। এরফলে রংলালের খড় বেঁচে যায় অনেক। বেশি দূরে খাবার জন্য রংলাল স্নেহের সুরে ওদের মৃদু বকুনি দেয়। ওরাও সে কথা বুঝতে পেরে রংলালের কাছেই শুয়ে পড়ে চোখ বুজে রোমন্থন করতে থাকে।

ওদের নিয়ে রংলাল লাঙল চালায় মাঠে। বড়ো বড়ো মাটির চাঁই কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ সহজেই তুলে ফেলে। আর রংলাল যখন ধানের বোঝা চাপিয়ে দেয় তার গাড়িতে একতলা ঘরের সমান উঁচু ধান দেখে লোকে বিস্মিত হয়, রংলালও তখন খুশি হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ওদের দুজনের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে থাকে তারা। কী ভয়ানক চেহারা হয় তখন ওদের। রংলালকে তখন বাঁশ দিয়ে তাদের প্রচণ্ড পেটাতে হয়। মার খেয়ে তারা খানিক শান্ত হয়। রংলাল কিন্তু আরও শাস্তি দেয় তাদের। দুজনকেই দুটো আলাদা গোয়ালে আটকে রাখে—সে সময় তাদের খাওয়াও জুটবে না।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে তাদের আলাদাভাবে স্নান করায়—খেতে দেয় পেট ভরে। খাওয়া হলেই তাদের একসঙ্গে মিলতে দেয়। আর তখনই শুরু হয় ওদের প্রতি রংলালের সস্নেহ উপদেশ। বাবা যেমন ছেলেমেয়েদের শাসন করেন, ভালোবাসেন—রংলালও তেমনি—ঝগড়া- ঝাটি না করে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার কথা বলে ওদের।

মন্তব্য:

মানুষ আর জানোয়ারে কত পার্থক্য। কিন্তু রংলালের জানোয়ারের প্রতি সন্তানের মতন আচরণ যেমন আমাদের অবাক করে তেমনি আমরা অবাক হই পশু দুটোও কী অদ্ভুত আচরণ করে রংলালের সঙ্গে। রংলালের গলা শুনলেই অনেক দূরে থাকলেও তাড়াতাড়ি তারা চলে আসে, দূরে যেতে না বললে কাছে শুয়ে থাকে। পরস্পর মারামারি করলে—রংলালের উপদেশ ওরা কান খাড়া করে শোনে।

পাঠগত প্রশ্ন 20.5

1. **পাঠ্যাংশ থেকে শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ**
   রংলাল দুইটার গালেই দুই ____________ একটি করিয়া ____________ বসাইয়া দিয়া বলে পেটে তোদের ____________ লাগুক। খেতে খেতে কী ____________ চলে যাবি নাকি।

2. **ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

   রংলাল মোষ দুটোকে সকালে চরাতে নিয়ে গিয়ে ফেরে কখন?
   (অ) বেলা দুটোয় (আ) বেলা তিনটেয় (ই) বেলা পাঁচটায়

3. 'যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে'—যশোদার মা কেন বিরক্ত হয়েছেন?

4. 'মহিষ দুইটা আর যায় না'—কেন যায় না?

20.4.6 যাক্ বৎসর তিনেক পরে .... তাহাকে সরাইয়া দিল।

বক্তব্যসার:

হঠাৎ ঘটে একটি দুর্ঘটনা। নদীর ধারে গাছের তলায় রংলাল ঘুমে আচ্ছন্ন। মোষ দুটোও একটু দূরে। এমন সময় এল একটি চিতাবাঘ। তার হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি রংলালের দিকে। চিতাটির গলার ফ্যাঁসফ্যাঁস আওয়াজে রংলালের ঘুম ভেঙে গেল। ভয় পায়নি সে, হামাগুড়ি দিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে সে ডেকে উঠল আঁ—আঁ—আঁ। মোষ দুটোতে সে মুহূর্তে আঁ—আঁ—আঁ করতে করতে ছুটে এল। চিতাবাঘটিকে দেখে কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণের মূর্তি তখন ভীষণ। চিতাবাঘটাকে দুদিক থেকে মোষ দুটো আক্রমণ করল। চিতাবাঘটা লাফিয়ে কুম্ভকর্ণের ওপর পড়ল। বাঁশের লাঠি দিয়ে রংলালও আঘাত করে যাচ্ছে ক্রমাগত। কিন্তু কুম্ভকর্ণের জীবন শেষ হয়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ফলে রংলাল কুম্ভকর্ণের শোকে কাঁদতে শুরু করল।

এতো গেল রংলালের মানসিক অবস্থা। আর কালাপাহাড়? কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে সে অবিরাম আঁ—আঁ—আঁ করে চীৎকার করে আর কাঁদে।

কালাপাহাড়কে শান্ত করবার জন্য দেড়শ টাকা দিয়ে রংলাল এবার তার জন্য একটি জোড় কিনে আনল। নতুনটির বয়স অল্প। কিন্তু কালাপাহাড় খুশি হয় না, তাকে দেখলেই সে যায় ক্ষেপে। শিং বাঁকিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে। দিনরাত সে ফোঁসফোঁস করে। একমাত্র রংলালকে দেখলেই তার মুখটা রংলালের কোলে তুলে দেয়। রংলাল তখন পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কিন্তু রংলাল তো সারাক্ষণ ওর কাছে থাকে না। তখন সে মুখ উঁচু করে রংলালকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়ে ডাকতে ডাকতে ওই নদীর ধারে চলে যায়। একদিন তার মেজাজ ভালো ছিল না। সেদিন একটা গোরুর বাছুরকে সে মেরে ফেলল।

মন্তব্য:

কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণের পরিচয়, একসঙ্গে মেলামেশা কয়েক বছরের। বোবা পশুদের মধ্যে যে নির্বাক ভালোবাসার ছবি লেখক এ গল্পে দেখিয়েছেন তা পাঠকদের মন ছুঁয়ে যায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 20.6

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) ‘এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে’—কার দাঁত উঠেছে?

অ. কালাপাহাড়ের আ. গোরুর বাছুরের ই. কালাপাহাড়ের জোড়-এর

(খ) ‘ওকে আর ঘরে রাখা হবে না’—কে বলেছে?

অ. রংলাল আ. যশোদা ই. রংলালের স্ত্রী

(গ) ‘কোন্ দিন হয়তো মেরেই ফেলাবে আমাকে’—কাকে মেরে ফেলবে?

অ. রাখালকে আ. যশোদাকে ই. রংলালকে

2. একটি বাক্যে লিখুন ঃ

‘ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে’—‘গরম হয়ে গিয়েছে’ অর্থ কী?

3. ‘সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে’—কুম্ভকর্ণকে কালাপাহাড় খোঁজে কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

20.4.7 যশোদা আর রংলালের .... ডোমলোগকো বোলাও।

বক্তব্যসার:

যশোদা একজন পাইকারের কাছে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। পাইকারটি কালাপাহাড়কে নিয়ে চলে যাবার একটু পরেই আঁ—আঁ—আঁ শব্দে চীৎকার করতে করতে কালা- পাহাড় ফিরে এল। কালাপাহাড়কে ফিরতে দেখে রংলাল ছুটে গেল। আর তখনই কালাপাহাড় তার কোলে মাথাটি তুলে দিল।

পাইকারটি এসেছে। মোষটি কিছুতেই যাবে না তার সঙ্গে, পাইকারটিকেই আক্রমণ করে প্রায়। ছুটে সে চলে এসেছে—কাজেই পাইকারটি তার টাকা ফেরত নিয়ে চলে গেল।

যশোদার কথামত রংলাল কালাপাহাড়কে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে পারল না, খদ্দের জুটল না বলে। এবার তাকে নিয়ে শহরের হাটে গেল রংলাল। একশ পাঁচ টাকায় কালাপাহাড়কে কিনে নিল এক পাইকার।

রংলালের চোখে তখন জল ঝরেছে। কালাপাহাড়কে ছেড়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে শহরে এসে ট্রেনে চেপে বসল।

পাইকারটির সঙ্গে কালাপাহাড় যাবে না। সে আঁ—আঁ করে চীৎকার করছে আর খুঁজছে তার আপনজন রংলালকে। পাইকারটি লোক জুটিয়েছে তাকে ধরবার জন্য, কিন্তু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে কালাপাহাড় আর চেঁচাচ্ছে আঁ—আঁ—আঁ বলে। ক্রমাগত সে রংলালকে ডেকে যাচ্ছে। সামনে আসছে একটি ঘোড়ার গাড়ি। কালাপাহাড় খানিকটা ভয় পেয়ে পাশের রাস্তা দিয়ে ছুটছে। রাস্তার লোকজন হৈ হল্লা জুড়ে দিয়েছেন—কালাপাহাড়কে ধরবার জন্য। কালাপাহাড় সামনের একটা লোককেই শিং দিয়ে গুঁতিয়ে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। সে কেবল রংলালকে ডাকে আর তারই খোঁজে ছুটতে ছুটতে চারদিকে এদিক ওদিক তাকায়।

ইতিমধ্যে পাগলা মোষের খবর পেয়ে পুলিশ সাহেবের মোটরকার এসে হাজির। কালাপাহাড় বীর বিক্রমে ছুটে গেল সেদিকে। কিন্তু পুলিশ সাহেবের রিভলবার থেকে বিকট আওয়াজ করে গুলি এসে লাগল

কালাপাহাড়ের গায়ে। কালাপাহাড় কিছু বুঝবার আগেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নিদারুণ যন্ত্রণায় কালাপাহাড়ের জীবন শেষ হয়ে গেল।

মন্তব্য:

আকৃতি ও প্রকৃতিতে 'কালাপাহাড়' একটি সার্থক ছোটো গল্প। পরিবারের অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও রংলাল জেদ করে মোষ জোড়াটা কিনে আনল। অচিরেই ওরা রংলালের সংসারের আপনজন হয়ে উঠল। যশোদা ওদের নাম দিল কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। কালাপাহাড়ের চোখের সামনে বাঘের কামড়ে কুম্ভকর্ণ মারা গেল। বোবা জীবটার হাহাকার ও আর্তনাদে সঙ্গী হারানোর গভীর যন্ত্রণা ফুটে উঠল। তাকে সঙ্গ দিতে রংলাল আর একটা মোষ কিনল ঠিকই কিন্তু ওই বোবা প্রাণীটার কাছে তার প্রাক্তন সঙ্গীর বিকল্প যে নেই তা প্রমাণ হল। বাধ্য হয়ে শহরের হাটে কালাপাহাড়কে বেচা হলেও সে তার একমাত্র জীবিত আপজন রংলালকে না পেয়ে 'গরম' হয়ে গেল। শেষে প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করল যে সে পশু হলেও তার মনে ভালোবাসার ঘাটতি নেই বরং পশু বলেই হয়তো তা কিছুটা বাঁধভাঙা। তাই জোয়ালের অন্যতম জুটি আর গোয়ালের অন্যতম সাথী কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর ঘটনাই কুম্ভকর্ণের প্রতি কালাপাহাড়ের অবুঝ ভালোবাসাও কালাপাহাড়- রংলালের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ককে আলোকিত করেছে।

রংলালের প্রতি কালাপাহাড়ের ভালোবাসা অসীম। কুম্ভকর্ণকে হারিয়ে তার জীবনে দেখা দিল এক বিরাট শূন্যতা। তারপর রংলালকে খুঁজে না পেয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন চারদিকে অন্ধকার দেখছে তখনই ঘনিয়ে এল তার অন্তিম সময়। বোবা পশু কী নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে গেল। কালাপাহাড় খুন হল এক পুলিশ সাহেবের হাতে। কিন্তু তার মৃত্যুর আসল কারণ হল কুম্ভকর্ণ ও রংলালের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা তার অবুঝ ও অশান্ত ভালোবাসাই তার মৃত্যু ডেকে আনল। লেখক তারাশঙ্কর অত্যন্ত দরদ আর সহানুভূতি দিয়ে সেই নির্বাক পশুটির চরিত্র এঁকেছেন একটি সজীব প্রাণবন্ত মানুষের মতো করেই।

পাঠগত প্রশ্ন : 20.7

1. **একটি বাক্যে উত্তর করুন ঃ**
   (ক) 'কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে'—সে কোথায় গিয়েছিল?
   (খ) 'আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়'—কে কাকে বলেছে?
   (গ) আর কে নিয়ে যেতে পারবে তুমি না গেলে?—কাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।
2. কালাপাহাড় কেন খুন হল?
3. মোষটি পাইকারের কাছ থেকে ফিরে এল কেন?

20.5 আপনি যা শিখলেন

1. হাল-বলদের সঙ্গে বাংলার চাষিদের যোগসূত্র চিরকালের।
2. পশু নির্বাক হলেও, তার ভাষা না থাকলেও সে তার ভালোবাসার কথা, তার আবেগের কথা,

তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে সক্ষম।

3. জীবজন্তুর প্রতি মমতা প্রকাশ করা মানুষের অন্যতম কর্তব্য।

শব্দার্থ ও টীকা

20.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাঁধিয়া উঠে।' —বিপদটি কী ধরনের? এই বিপদ ঘটলে রংলাল যেভাবে সামলাতো সেটা অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন।
2. 'একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল।'—দুর্ঘটনাটি আটটি বাক্যে লিখুন।
3. কালাপাহাড়ের এভাবে মৃত্যু হল কেন?—অনধিক দশটি বাক্যে লিখুন।
4. মানুষের নামে নামকরণ না করে একটি বোবা জন্তুর নামে এ কাহিনির নামকরণ করা হল কেন দশটি বাক্যে লিখুন।
5. কালাপাহাড়ের খুন হওয়ার কারণগুলি দশটি বাক্যে লিখুন।

20.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

20.1

1. ই

2. বয়স, রং, শিং, লেজ

3. রংলালের স্ত্রী

4. **ক)** ছেলেকে ব্যঙ্গ। চাষ সম্বন্ধ অজ্ঞতা। **খ)** রংলালের স্ত্রীর কাছ থেকে তার প্রস্তাবের সমর্থন ও টাকার সংস্থানে স্ত্রীর গহনা পাওয়া।

20.2

1. ক — অ, খ — আ, গ — ই

2. _______ আ

3. ক — সাদা, কালো। খ — দাঙ্গা। গ — মিশিয়া।

4. (ক) হাটে পশুদের চিৎকারে ও মানুষদের কলরবে।

(খ) পশুদের জীবন্ত দেখাতে তাদের ওপর পাইকারদের নির্মম অত্যাচারের কথা।

(গ) পাচুন্দির হাটে অসংখ্য পশুর আমদানি দেখে।

20.3

1. ক — আ। খ — অ।

2. ক — লেবে। খ — ছেলেকে। গ — বিপুলাকার।

3. লেখাপড়া জানা ছেলেকে ভয় ও মোষেদের জন্য দৈনিক প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার ভাবনায়।

4. নতুন বলদকে চাষি পরিবারে পরিচয় করানোর রীতি একেবারে আপনজন হিসাবে।

20.4

1. ভয়ঙ্কর, আকর্ষণে, দেখিতে, তির্যক, চাহিয়া

2. ক — কালাপাহাড়ের জায়গায় হবে কুম্ভকর্ণের। খ — গায়ে-র জায়গায় পায়ে

গ — যথাযথ-এর জায়গায় উপযুক্ত

3. (ক) মোষ দুটির জন্য প্রতিদিন বিশাল খোরাক যোগাড় করা। (খ) চাষি পরিবারে হালের পশুরা সংসারেরই আপনজন। (গ) মোষ জোড়াটার বিশাল চেহারায় বাড়ির গিন্নির ভয়।

20.5

1. হাতে, চড়, আগুন, বেলাত
2. আ
3. সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রংলালের মোষ চরানোতে।
4. মোষ দুটো শুয়ে চোখবুজিয়ে রোমন্থন করে অথবা জলে ডুবে থাকে।

20.6

1. ক — ই। খ — আ। গ — অ
2. মেজাজ খারাপ, রেগে গেছে।
3. দীর্ঘদিনের সঙ্গী হারানোর হাহাকার বুকে।

20.7

1. (ক) পাইকারের সঙ্গে কিছুদূর। (খ) পাইকার। (গ) কালাপাহাড়কে।
2. কুম্ভকর্ণের জন্য শোক।
3. রংলালের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ায় কালাপাহাড় উন্মাদ হয়ে তার কাছে ফিরল।

লেখক পরিচিতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৩ আগস্ট ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে অভিনন্দিত। বীরভূমের লাল মাটি আর তার মানুষগুলিকে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর রচনায়। বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, ডাকহরকরা প্রভৃতি গ্রাম্য চরিত্র এঁর সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে। উপন্যাস ও ছোটো গল্পে এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। 'কবি', 'গণদেবতা'র মতো কালজয়ী উপন্যাস এবং 'অগ্রদানী', 'জলসাঘর' প্রভৃতি যুগান্তকারী ছোটোগল্পের রচয়িতা তারাশঙ্করের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই ঃ 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ', (নাটক) 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলী বাকের উপকথা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রসকলি', 'ডাক হরকরা' প্রভৃতি। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ১৯৫৬ সালে আকাদেমি পুরস্কার পান। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান ১৯৬৬ সালে 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য। এছাড়া 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ'-এ সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে।

সমধর্মী রচনা

সমধর্মী একটি বিখ্যাত গল্পের নাম ঃ **'মহেশ'**, লেখক—**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**।

21

শিল্পী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

21.1 প্রস্তাবনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে আমরা দেখতে পাই জীবনের রুক্ষ কঠোর বাস্তব রূপ যা এসেছে তাঁর গভীর সমাজচেতনা থেকে।

'শিল্পী' গল্পটি লেখকের গল্পগ্রন্থ 'পরিস্থিতি' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পটি খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াই-এর মধ্যেও শিল্পীসত্তা বজায় রাখবার কাহিনি। গল্পটির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এ গল্পের নায়ক মদন-তাঁতির প্রকৃত শিল্পী-স্বভাব। সত্যিকার শিল্পীর কাছে দুঃখ-দৈন্য পরাজিত। এ কাহিনিতে তাঁতিপাড়ার মদন তাঁতির কাছেও দুঃখ-দৈন্য হার মেনেছে।

'শিল্পী' গল্পের ছোটো পরিসরের মধ্যেই লেখক এ কাহিনির প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ভুবন ঘোষাল, উদি, বৃন্দাবন, মদনের মাসি, গগনের বউ প্রভৃতি সব কটা চরিত্রই বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা।

'শিল্পী' গল্পটির গদ্যভাষা স্পষ্ট ও হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁতিরা যে ভাষায় কথা বলে লেখকের বর্ণনায় সেই ভাষাই উঠে এসেছে। 'বাচালের মোকে', 'তাইতো বলি মোরা', 'মেয়ে ছেলা বলতে পারে', 'পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার' প্রভৃতি শব্দ সমাজ জীবনের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশ করে। বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, প্রকাশভঙ্গি, চরিত্র সৃষ্টি ও আবেদনে 'শিল্পী' গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি।

21.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়ে আপনারা জানতে পারবেন—

- লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ চেতনার পরিচয়;
- দুঃস্থ তাঁতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সংকটের কথা;

- গরিব মানুষের ওপর মহাজনি শোষণ ও নিপীড়নের কথা;
- আর্থিক সংকটের মাঝেও তাঁতি সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের কথা

21.3 মূল পাঠ

21.3.1 (1)

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলেনা, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন-চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, রাতে ঘুম আসে না। মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাস করা কষ্টে সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনিধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্‌বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন?

শব্দার্থ ও টীকা

সেঁক = উত্তাপ।
শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল = শীতের রোদ শরীরে আরাম দেয় বলে রোদের তাপ নিচ্ছিল।
খিঁচ = পেশিতে টান।
বেতো = বাত রোগে আক্রান্ত।
ঝিলিকমারা = হঠাৎ হঠাৎ উঠে আসা তীব্র ব্যথা।
হদ্দ = চূড়ান্ত, একশেষ।
উদ্‌বেগ = উৎকণ্ঠা।

21.3.2 (2)

সকালে উঠেই মা গেছে বউকে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে বাবুর ছোটো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু-একখানা ভালো, মদন-তাঁতির নামকরা বিশেষ রকম ভালো, কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনেরই মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটা প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু-বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচ ধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

নুলো = পঙ্গু হাত কাজ করে না।
প্যাকাটি = পাটকাঠি।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা-টা।

সামালের মধ্যে = সহ্য করা যায় এমন।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে! খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয়, উঠে হাঁটো দু-পা। সেরে যাবে।

21.3.3 (3)

মদন কথা কয় না। এতক্ষণ আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি। প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতি পাড়ার মেয়ে-পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে, কী হল গো? বলি হল কী?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বনধ মদনের, বউটা তার ন-মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বউকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কি না মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ যে না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় ভুবনের দিকে দু-চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি দিয়ে সস্তা ধুতি, শাড়ি, গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কী যন্তনা, বাপ একদম যেন মিত্যু যন্তনা, এরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন পাটা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাই তো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন-তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড়ো ভয়।

শব্দার্থ ও টীকা

হুল্লোড় = বহু মানুষের একসঙ্গে চ্যাঁচামেচি।
ফারাক = তফাত, পার্থক্য।
পিত্তি জ্বালানো = রাগ জাগানো।
ন-মাস পোয়াতি = নয় মাসের অন্তঃসত্তা।

21.3.4 (4)

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও— উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার দু পাশের ডালপালা দুজনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আট হাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ার সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থমথম করছে ; শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িকভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানিনা বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

অমায়িকভাবে = অন্তরঙ্গ ভাবে।

ছেলা = ছেলে।

শব্দার্থ ও টীকা

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ও সব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন।

মুখ বাঁকিয়ে = ব্যঙ্গ করে।
ঝাঁজের সঙ্গে = রাগের সঙ্গে।

গগনের বউ বলে মুখ বাঁকিয়ে, ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।

21.3.5 (5)

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থামো না বুনোর মা? অত কথায় কাজ কী। যন্তনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

ইঙ্গিত = ইশারা।
রোজগার = উপার্জন, আয়।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এ সব কথা—এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড়ো বোকা।

ব্যঙ্গ = বিদ্রূপ, উপহাস।

মদন নিজেও সাত পুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে-কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, এ কী কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না = লাভ হয় না।
দাদন = কোনো কাজ করে দেবার জন্য আগাম নেওয়া অর্থ।
কর্জ = ধার।
পড়তা = লাভ।
বরাদ্দ = ধার্য।

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

আপশোশ = ক্ষোভ, দুঃখ।

নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কী দরে সুতো কেনা জান? ভুবন আপশোশের শ্বাস ফেলে, থাক গে, কী করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করেছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব, কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা, বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপশোশ করবে। আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

ভরসাতেই = আশাতেই, বিশ্বাসেই।
গাঁট হয়ে = চুপ করে, স্থির হয়ে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

21.3.6 (6)

গড় হয়ে = মাথা নত করে।

মাসি এসে ঘুর ঘুর করে আশেপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো

নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে মদনের পা দুটো টান হয়ে পেঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছেই, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না,মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসি বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাবা। বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা, বউ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

শব্দার্থ ও টীকা

খিঁচড়ে ওঠে = রেগে চেঁচিয়ে ওঠে।

ঠকঠকি = তাঁত চালানোর ঠকঠক শব্দ।
বিগড়েছে = খারাপ হয়েছে।
মশকরা = ঠাট্টা, তামাশা।
আকাল = দুর্ভিক্ষ।
ওঁচা = নিকৃষ্ট মানের।
ব্যাভার = ব্যবহার, আচরণ।

21.3.7 (7)

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে।

মদনের মা বউ ফিরে আসে গুটিগুটি, পেটের ভারে মদনের বউ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরোনো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনও পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জটবাঁধা চুল চোকলা ওঠা ফাটা চামড়া এ সব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি-বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনি। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা, ঝিরা, আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি। মদন তাঁতির কাপড়। বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল? বলল ওসব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড়ো বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

সাড়ে চার কুড়ির বেশি = ২০x৪+১০=৯০-এর বেশি।
মুষড়ে যায় = খারাপ হয়ে যায়, বেদনাহত হয়।

জীর্ণ = ছেঁড়া।
পাড়ের বৈচিত্র্য = শাড়ির পাড়ের কারুকার্য ও রংবাহার।
খাপি = ঠাস বুনোন।

এয়োতি = সধবা।
বশীকরণ = বশ করা।
শ্যাল = শেয়াল।
বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি = বন জঙ্গলের ভরা অখ্যাত গ্রামে শেয়াল যেমন রাজা হয়ে বসে মদনও এইটুকু ছোটো একটা গ্রামে যেন বনগাঁয় শেয়াল রাজা।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বউ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তীব্র উগ্র মন্তব্য আসে, এক পয়সা মুরোদ নেই, গর্বো কত।

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বউও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলির যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলে তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে ; মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকে তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতিপাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড়ো খামখেয়ালি একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হা-হতাশ করে, এই লম্বা চওড়া কথা কয় যেন রাজা মহারাজ।

শব্দার্থ ও টীকা

উগ্র = ঝাঁঝালো।
মুরোদ = ক্ষমতা, শক্তি।
গর্বো = গর্ব, অহংকার।
যুগ্যি = যোগ্য।
তেজ = মানসিক শক্তি।
এঁড়ে = একগুঁয়ে।
নিষ্ঠা = গভীর একাগ্রতা।
হা-হুতাশ = গভীর দুঃখপ্রকাশ।
লম্বা চওড়া কথা = বড়ো বড়ো কথা।

21.3.8 (8)

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় এর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তারপরেই মাসির গলা ; ও মদন, দ্যাখসে বউ কেমন করছে।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে, তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড়ো বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বউয়ের। কী হয়েছে মদনের বউয়ের? কী হতে পারে? গুরুতর কিছু যদি হয়.......

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পর। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে! মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব-ব্যথাটা উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য!

এখনও গেলে না যে?

যাব। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত? উদি আবদার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড়ো বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা

গোঙানি = চাপা যন্ত্রণার আওয়াজ।
দ্যাখসে = দেখে যা, দেখ।
মদন হয়তো ভাঙতে পারে = মদনের দেমাক না থাকতে পারে।
আখা = উনুন।
দুর্জয় = তীব্র।
আলিস্যে = আলসেমি।
আবদার = অনুরোধ, মিনতি।
বিচ্ছিরি = বিশ্রী, খারাপ।

সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বউ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়িকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমতো ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ ; ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু? সুতো নেই বুঝি?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসি ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?

বেনারসি? বেনারসি না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপশোশের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসি জীবনে বুনিনি।

এক ঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে। এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনিভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যথায় পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বউটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কী করবে মদন তাঁতি?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর, শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁত ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরেতো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌঁছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপল? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে?

তা ছাড়া কী আর? কেশব জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, রাত-দুপুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?

মদনের তাঁত কখন থেমে ছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি।

আয় দেখবি।

শব্দার্থ ও টীকা

জাঁকিয়ে = সগর্ব ভঙ্গিতে।
নিশ্চিন্ত = চিন্তা শূন্য।
রীতিমতো = নিয়মমতো।
ভড়কে = ভয় পেয়ে আড়ষ্ট হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া।

অধঃপতন = পদস্খলন।
আপশোশ = অনুতাপ।

ওঁচা = নিকৃষ্ট।
ট্যাঁকে = কোমরে।
সর্বাঙ্গে = সমস্ত শরীরে, সারা দেহে।

নিঝুম = নিঃশব্দ।

ঘাট = অপরাধ।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দেগা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারও চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন-তাঁতির বউটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় ; ভুবনের ঠেয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপিচুপি।

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন-তাতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

থ বনে থাকে উদি = উদি বিস্মিত হয়, বাক্যহারা হয়ে যায়।
ফিরে দেগা = ফিরিয়ে দিয়ে আয়।
উপক্রম = সম্ভাবনা।
নির্বাক = বাক্যহারা।
ঠেয়ে = কাছে, থেকে।
দুকুর = দুপুর।
কথার খেলাপ = কথা না রাখা।

21.4 বিষয়ের রূপরেখা

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশের ইংরেজ সরকার অন্যান্য জিনিসের মতো সুতোর উপরেও নিয়ন্ত্রণ আনে। বাজার থেকে উধাও হয় সুতো। দেখা দেয় সুতোর কালোবাজারি মজুতদারি। তাঁতিরা নিদারুণ অবস্থায় পড়ে। মজুতদারেরা মোটা সুতোয় মোটা কাপড়, গামছা সামান্য মজুরিতে তাঁতিদের দিয়ে বানিয়ে মস্ত মুনাফা করতে চায়। কিন্তু এই তাঁতিদের গর্ব মিহি সুতোয় শিল্পসম্মত তাঁতবস্ত্র বোনার। শিল্পসৃষ্টির সেই অহংকারকে তারা ভাতের বিনিময়েও জলাঞ্জলি দিতে নারাজ। মদন এই তাঁতশিল্পীদের সেরা এবং পথপ্রদর্শক। পঞ্চাশের মন্বন্তর ফেলেছে করাল ছায়া। ঘরে ঘরে দুটো ভাতের জন্য হাহাকার। এদিকে সুতোর অভাবে তাঁত বন্ধ। সারা বছর উদয়াস্ত তাঁত চালানোই যাদের জীবন তারা আজ শক্তিহীন, যন্ত্রণায় অধীর। এরই সুযোগ নিতে তৎপর মুনাফাখোর, কালোবাজারিরা। মিহিরবাবু আর তার দালাল ভুবন ঘোষাল। অভাবের জ্বালায় কেউ কেউ গোপনে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু মদন অনড়। তার স্ত্রী গর্ভবতী, অনাহারে অর্ধাহারে মরণোন্মুখ। তবু শিল্পীর ইজ্জত খোয়াতে নারাজ সে। কোনও দুর্বল মুহূর্তে দাদন নিয়েও তা ফেরত দেয়। মৃত্যুর চোখ-রাঙানিকে উপেক্ষা করে শিল্পধর্মের জয় ঘোষণা করে।

21.4.1 সকালে দাওয়ায় বসে .... যা সয় তা সইবে না কেন?

বক্তব্যসার:

তাঁত চালিয়ে ধুতি শাড়ি ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য বস্তু বয়ন করে তাঁতিরা জীবিকা নির্বাহ করে। খোলাবাজারে কাপড় বোনার প্রধান উপকরণ সুতো না পেয়ে মদনসহ তাঁতি-পাড়ার সবারই তাঁত বন্ধ। সাতদিন ধরে তাঁত বন্ধ থাকায় মদনের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ছেদ পড়েছে। দিনে-রাতে তাঁত চালাতে যে শারীরিক পরিশ্রম বা

শব্দার্থ ও টীকা

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হত তার অভাবে মদনের হাতে, পায়ে, কোমরে, পিঠে আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছে এবং সেই কারণে বাতের ব্যথার মতো একটা ব্যথায় সে কষ্ট পাচ্ছে। সুতোর অভাবে তাঁত চালাতে না পেরে রুজি-রোজগারও তো বন্ধ। অথচ এই দুরবস্থার জন্য তাঁতিরা কেউ দায়ী নয়। মহাজনের কারসাজিতেই খোলাবাজার থেকে সুতো উধাও হয়ে গেছে আর সেগুলি ঠাঁই পেয়েছে মহাজনের গুদাম ঘরে। মহাজনের শর্ত মেনে কম মজুরিতে কাপড় বুনে তা মহাজনের হাতে তুলে দিতে রাজি হলে মদনসহ কোনো তাঁতিকেই আর বসে থাকতে হয় না, শারীরিক মানসিক আর আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয় না।

মন্তব্য:

মদনের জীবনের এক সংকটময় পরিস্থিতির কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রমমূলক কাজের অভাবে তার সমস্ত শরীর কেমন নির্জীব, অবসন্ন হয়ে পড়ে, একটা চাপা ব্যথার স্রোত বয়ে যায়। হয়তো তার মনে আগামী দিনগুলির ভাবনা ছায়া ফেলে। কিন্তু ভেবে সে কুল- কিনারা পায় না। ফলে তার মনে এক শূন্যতার অনুভূতি জেগে ওঠে, তাকে উদাস করে তোলে এবং একটা না-বলা বেদনার অনুভবে তার মনটা কেমন টনটন করতে থাকে। কিন্তু নিরুপায় মদনকে শারীরিক ও মানসিক সব ব্যথাবেদনা, দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করে যেতে হয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.1

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন।

(ক) হঠাৎ তার ____________ খিঁচ ধরল ভীষণভাবে। (অ. কোমরে, আ. পায়ে, ই. হাতে)

(খ) গাঁটে গাঁটে ____________ কামড়ানি। (অ. প্রচণ্ড, আ. অসহ্য, ই. ঝিলিকমারা)

(গ) শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে ____________। (অ. তিনদিনে, আ. চারদিনে, ই. দুদিনে)

(ঘ) মনটা কেমন ____________ করে একধরনের উদাস করা কষ্টে। (অ. শিরশির, আ. টনটন, ই. আনচান)

(ঙ) শরীর মনের ও সব উদ্‌বেগ সয়ে ____________ থাকে মদন। (অ. চুপচাপ, আ. শান্ত, ই. স্থির)

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) সকালে মদন কোথায় বসে রোদের সেঁক খাচ্ছিল?

অ. দাওয়ায় আ. মাঠে ই. বিছানায়

(খ) মদন কতদিন তাঁত না চালানোর পর তার হাতে পায়ে আড়ষ্ট ব্যথার মতো হয়ে পড়ে ছিল?

অ. পাঁচ দিন আ. তিনিদিন ই. সাতদিন

(গ) মদনের তাঁত চলে না — কারণ:

অ. মদনের অসুস্থতা আ. সুতো মেলে না ই. মদনের স্ত্রীর অসুস্থতা

3. দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন।

(ক) খোলাবাজারে সুতো পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

21.4.2 সকালে উঠেই মা গেছে .... উঠে হাঁটো দু-পা, সেরে যাবে।

বক্তব্যসার:

মদনের পায়ে যখন খিঁচ ধরেছে তার মা আর বউ তখন গেছে বাবুদের বাড়ি, তাদের ছোটো মেয়ের বিয়েতে মদনের তাঁতে বোনা কাপড়ের বায়নার ব্যাপারে। মদনের চিৎকার শুনে তার মাসি দৌড়ে আসে মদনের ছোটো ছেলেকে নিয়ে, সঙ্গে আসে তার নিজের ছোটো মেয়ে। মাসির চ্যাঁচানোতে ভয় পেয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমেয়ে দুটোও। কিন্তু মাসির শরীরটা বড়ো রোগা, তার ওপর একটা হাত নুলো। সে কেমন করে পারবে মদনকে সুস্থ করতে। এমন সময় মহাজনের দালাল সুযোগসন্ধানী ভুবন ঘোষাল যাচ্ছিল মদনের বাড়ির সামনে দিয়েই।

মন্তব্য:

ভুবন ঘোষাল জানে, মদনকে কোনোমতে কাপড় বুনতে রাজি করাতে পারলেই অন্য তাঁতিরা তার কাছ থেকে সস্তা সুতো নিয়ে কাপড় বুনতে শুরু করবে। তাই মদনকে খুশি করার জন্য সে মদনের পা টেনেটুনে তার পায়ের খিঁচ ধরাবার ব্যথা কমিয়ে দেয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) সুতো—জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে।
অ. অনায়াসে আ. সহজে ই. বিনা পরিশ্রমে

(খ) বাড়িতে ছিল — মদনের মাসি।
অ. কেবল আ. একমাত্র ই. শুধু

(গ) শরীরটা প্যাকাটির মতো —।
অ. সরু আ. দুর্বল ই. রোগা

(ঘ) মদনের — চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে।
অ. অস্বাভাবিক আ. প্রচণ্ড ই. হাউমাউ

(ঙ) ছেলেমেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে — জুড়েছিল।
অ. চিৎকার আ. হৈচৈ ই. কান্না

2. নীচে পাঁচটি বাক্য দুটি অংশে ভাগ করে এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। দুই অংশের বাক্যাংশগুলি মেলান।

(ক) সকালে উঠেই মা গেছে বউকে সাথে নিয়ে	(ক) চার বছরের মেয়ে
(খ) খড়ি ওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায়	(খ) উঠে হাঁটো দু পা
(গ) ভুবন পরামর্শ দেয় ;	(গ) পা ঠিক করে দেয় মদনের
(ঘ) সাথে আসে মাসির	(ঘ) বাবুদের বাড়ি
(ঙ) মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে	(ঙ) শব্দ হয় শোষেরই মতো

শব্দার্থ ও টীকা

3. কম-বেশি দুটি বাক্যে লিখুন।

(ক) মদনের মা বাবুদের বাড়ি কেন গিয়েছিল?

(খ) মদনের পা ঠিক ছিল না কেন?

21.4.3 মদন কথা কয় না .... মুখকে তার বড়ো ভয়

বক্তব্যসার:

উদিকে পাড়ার কেউ পছন্দ করে না ভুবন ঘোষালের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের জন্য। মদনের চিৎকার শুনে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন এসে হাজির হয়েছে। শুধু উদি আসেনি। উদির মিষ্টি গলায় চ্যাঁচানো শুনে পাড়ার মেয়ে-পুরুষের গা যেন জ্বলে যাচ্ছিল। উদির চরিত্র যেমনই হোক্ সে কিন্তু মদনের ভালো চায়। মদনের বউ আসন্নপ্রসবা। না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় এই ভাবনায় কাল এসে চাল ডাল দিয়ে মদনের বউকে সাহায্য করেছে। জিজ্ঞেস করে গেছে তার মতি-গতির কথা, তার একগুঁয়েমির কথা।

ভুবন ঘোষাল সুতোর দালাল। তাঁতিপাড়ার সবাই জানে, সে সস্তা সুতো দিয়ে তাঁতিদের দিয়ে সস্তা কাপড় বুনিয়ে নিতে চায়। তাকে কেউ পছন্দ করে না। তাই মদনের বাড়িতে তাকে দেখে সকলেরই খুব রাগ হয়। তাদের সংশয় মদন কি ভুবনের ফাঁদে পা দিল? তাদের মুখের বদলে-যাওয়া ভাবের অর্থ বুঝতে পারে মদন। ভুবন ঘোষালের জন্যই তার মৃত্যু যন্ত্রণার উপশম হয়েছে। খিঁচ-ধরা পা-টা তার বশে এসেছে বলে উপস্থিত সবাইকে মদন জানায়। গগন-তাঁতির বউ স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পায় না। সে বলে, 'অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো'।

মন্তব্য:

উদির চরিত্রে অনেক দোষ থাকলেও তার মধ্যে দেখা যায় মমত্ব ও সমবেদনা।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.3

1. বন্ধনীর মধ্য পাঠ থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।

(ক) কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে ____________ শুনে।
(অ. চেঁচামেচি, আ. হুল্লোড়, ই. চিৎকার)

(খ) উদিই ____________ তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে।
(অ. হয়তো, আ. মনে হয়, ই. সম্ভবত)

(গ) কিছু চাল আর ডাল সে ____________ দিয়েছে কাল মদনের বউকে।
(অ. চুপিচুপি, আ. লুকিয়ে, ই. গোপনে)

(ঘ) গগন-তাঁতির বউয়ের মুখকে তার ____________ ভয়।
(অ. খুব, আ. বড়ো, ই. অত্যন্ত)

(ঙ) মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই ____________ যায়।
(অ. পালটে, আ. উলটে, ই. বদলে)

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে ভুল শব্দ দেওয়া আছে। সেটি সংশোধন করে সঠিক শব্দ বসান।

(ক) কয়েকটা আমগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে।

(খ) উদির কুঁড়ে থেকেই সে পুকুর ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে।

(গ) চারদিন তাঁত বন্ধ মদনের।

(ঘ) পিসি মাদুর এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে।

(ঙ) গগন-তাঁতির বেঁটে রোগা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে।

3. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) 'কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাইতো বলি মোরা।'—কথাটি কে বলেছে?

অ. মদনের মাসি আ. গগনের বউ ই. উদি

(খ) 'গগন তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড় ভয়।'—কার ভয়?

অ. ভুবনের আ. মদনের বউয়ের ই. মদনের

(গ) 'উনি ছুটে এসে টেনে-টুনে ঠিক করে দিলেন'—উনি কে?

অ. ভুবন ঘোষাল আ. উদি ই. মদনের মা

(ঘ) 'একগুঁয়েমি তার কাটেনি'—কথাটি কে বলেছে।

অ. উদি আ. মদনের মাসি ই. মদনের বউ

4. উদি যে মদনের হিতাকাঙ্ক্ষী তা বোঝা গেল কীভাবে?

21.4.4 বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল .... কত ঢং জানে বুড়ো

বক্তব্যসার:

বৃন্দাবনের ঘর মদনের বাড়ির পাশেই। তার শরীর জরাজীর্ণ। তাঁত চালাবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু তাঁতিপাড়ার আর সকলের যখন তাঁত বন্ধ তখন তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁত চালাতে না পেরে অভাবে আর আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া যখন থমথম করছে তখন তাঁত চলছে শুধু কেশব আর বৃন্দাবনের ঘরে। ভুবন ঘোষাল খুব কৌশলে মদনের বাড়িতে ওই জড়ো-হওয়া মানুষগুলোর সামনে সে-কথা ফাঁস করে দেয়। তাই বৃন্দাবনকে খুব অপরাধী দেখায়। ভুবন ঘোষাল বৃন্দাবনকে বলল, গামছা বোনা হয়ে গেলে যেন কেশব পয়সা নিয়ে যায়। বৃন্দাবনের মুখের চেহারা তখন করুণ, অসহায়ভাবে বলে, সে এসব কিছু জানে না; তার ছেলে জানে। গগনের বউ স্পষ্ট কথার মানুষ, তার মুখে কিছুই আটকায় না। বৃন্দাবন চলে যাওয়ার সময় গগনের বউ মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, 'কত ঢং জানে বুড়ো!'

মন্তব্য:

সবাইকে উপেক্ষা করে স্বার্থপর কুচক্রী ভুবনের কাছে বৃন্দাবনের আত্মসমর্পণের এই প্রচেষ্টাকে গগনের বউ ধিক্কার জানাতে দ্বিধা করে না।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 21.4

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) বৃন্দাবনের বড়ো ছেলের নাম কী?

(অ) কেশব
(আ) রসিক
(ই) ভুবন

(খ) তাঁতিপাড়ায় কার কার তাঁত চলছে?

(অ) কেশব আর বৃন্দাবনের
(আ) বৃন্দাবন আর শ্রীধরের
(ই) কেশব আর শ্রীধরের

(গ) 'কত ঢং জানে বুড়ো!'—কে বলেছে? বুড়োটি কে?

(অ) বলেছে গগনের বউ, বুড়োটি হল বৃন্দাবন
(আ) বলেছে মদনের মাসি, বুড়োটি হল ভোলা
(ই) বলেছে উদি, বুড়োটি হল মদনের বাপ

(ঘ) বৃন্দাবন তাঁতে বসে না কেন?

(অ) সুতোর অভাব বলে
(আ) পুরানো জীর্ণ তাঁত বলে
(ই) শরীরে ক্ষমতা নেই বলে

(ঙ) বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে।—চমকে ওঠে কেন?

(অ) মদনের পায়ে খিঁচ ধরেছে বলে
(আ) মদনের বাড়িতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষদের সমাবেশ দেখে
(ই) দালাল ভুবনের কথায় তার নিজের মাথা মুড়োনোর কথা সবার সামনে ফাঁস হওয়ায়

2. নীচের চারটি বাক্য দুই অংশে ভাগ করে এলোমেলো করে দেওয়া আছে। বাক্যগুলি মেলান।

(ক) অপরাধীর মতো	(ঙ) বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের
(খ) বয়স অনেক কম	(চ) পিছু ফিরে
(গ) মোর ছেলা বলতে পারে	(ছ) বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে
(ঘ) ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন	(জ) জানি না বাবু

2. অনধিক দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন:

(ক) 'বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো।'—কেন বৃন্দাবন অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল?

(খ) বৃন্দাবনের তাঁতে কী বোনা যায়?

21.4.5 বুড়ো ভোলা বলে .... বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা

বক্তব্যসার:

ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের আন্দোলন ভেস্তে দেবার তালে আছে। সে অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও সুযোগ- সন্ধানী। তাঁতিপাড়ার সবাই চলে যেতে সে মদনকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তাঁতিদের কাজ বন্ধ করে বোকামি করাটা নিজেদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করা। মদন জানায় দাদন নিয়ে অথবা ধার করেই তাঁতিদের তাঁত চালাতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুখে রক্ত তুলে দিনরাত তাঁত চালিয়েও তারা পোষাতে পারে না। আর ভুবনের প্রস্তাব মেনে নিলে অর্ধেক পড়তাও থাকবে না তাঁতিদের। তাঁতিদের যতই বোকা বলা হোক্ না কেন তারা কিছুতেই ভুবনের প্রস্তাব মেনে নেবে না।

ভুবন ঘোষাল দরদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলে, সে অনেক বলে কয়ে মালিক মিহিরবাবুর কাছ থেকে তাঁতিদের জন্য সুতো জোগাড় করেছিল। কিন্তু এখন তাঁতিরা সে-সুতো না নিলে পস্তাবে।

মন্তব্য:

ভুবন চালাক মানুষ। তাঁতিরা অভাবের তাড়নায় তাঁত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলে সেই তাঁত মিহির-বাবুর বেনামিতে সে নিজেই কিনে নেবে জলের দামে। এটাই ছিল তার কৌশল।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.5

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) ‘এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়।’

(i) কার ইঙ্গিত?

(অ) বৃন্দাবনেব

(আ) বুড়ো ভোলার

(ই) ভুবন ঘোষালের

(ii) কারা ভয় পায়?

(অ) রসিক আর কেশব

(আ) ভুবন আর উদি

(ই) তাঁতিপাড়ার তাঁতি সম্প্রদায়

(iii) ইঙ্গিতটা কী?

(অ) গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে

(আ) এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো

(ই) মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

(খ) ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের বোকা বলেছে কেন?

(অ) পায়ে খিঁচ ধরলে হ্যাঁচকা টান দিতে জানে না বলে

(আ) সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনবে না বলে

(ই) সুতোর বাজারদর জানে না বলে

(গ) তাঁতিপাড়ার কেউ ভুবনকে সহ্য করতে পারে না কেন?

(অ) ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের আন্দোলন ভেস্তে দেবার চক্রান্ত করছে বলে।

(আ) ভুবন ঘোষাল উদির রান্না করা ভাত খায়নি বলে।

(ই) ভুবন ঘোষাল মদনের দাওয়ায় এসে বসেছে বলে।

2. পাঠের সঠিক শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

(ক) কেশব গেলেই ____________ পাবে। (অর্থ, টাকা, পয়সা)

(খ) মদন নিজেও ____________ তাঁতি। (তিন পুরুষে, সাত পুরুষে, পাঁচ পুরুষে)

(গ) সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না ____________। (কিছুকাল, অনেককাল, চিরকাল)

(ঘ) নয়তো দুদিন বাদে তাঁত ____________ হবে তোমাদের। (কিনতে, আনতে, বেচতে)

3. তাঁতিদের রুজি-রোজগার বন্ধ। এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? যে মন্তব্যটি ঠিক সেটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) এই দুরবস্থার জন্য তাঁতিরা কেউ দায়ী নয়। মহাজনের কারসাজিতেই খোলাবাজার থেকে সুতো উধাও হয়ে গেছে আর সেগুলো ঠাঁই পেয়েছে মহাজনের গুদাম ঘরে।

(খ) রোগ ব্যাধিতে ভুগে মানুষের শরীর যেমন দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে তাঁতিদের শারীরিক অবস্থাও তেমনি! তাই শারীরিক কষ্টের জন্যই তাঁতিদের এই দুর্ভোগ।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে লিখুন :

4. তাঁতিপাড়ার তাঁতিরা সস্তা কাপড় বুনবেই না কেন?

5. সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা।—ভরসাটা কী?

শব্দার্থ ও টীকা

21.4.6 'মাসি এসে ঘুর ঘুর করে .... ব্যাভার করে ওর সঙ্গে'।

বক্তব্যসার:

মদনের মাসির মন সংস্কারাচ্ছন্ন। ভুবন ঘোষাল বামুন হয়ে মদনের পায়ে হাত দিয়েছিল। মাসির ধারণা হচ্ছে এজন্য মদনের উচিত ছিল ভুবনকে একটা প্রণাম করা। বামুন মানুষ, গুরুজন ব্যক্তিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করলে পাপ হতে পারে। এই কথাটা মদনের কানে কানে বলতে এলে মদন তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়াল। মদনের মনে কোনও সংস্কার নেই। তাই মদন রেগে যায়। মদনের মাসি বুঝতে পারে মদনের এখন মেজাজ খারাপ। তবে মদনের ওপর মাসির খুব বিশ্বাস। মদন তার বাপের নাম রেখেছে। তার বাপ ছিল নামকরা কাপড়ের কারিগর। মদনও তাঁর মতো বড়ো তাঁতি। মাসির বিয়ের সময়ে মদনের বাপ তার জন্য একটা জালের মতো শাড়ি বুনে দিয়ে মশকরা করেছিল। মদনের মাসি জানে এখন দিনকাল বদলেছে। চারিদিকে অভাব অনটন। মদন কিন্তু বদলায়নি। শত অভাবেও মদন সস্তা দামের কাপড় গামছা বুনবে না। কিন্তু সংসারের নানা টানাপোড়েনে, মদনের মা আর বউ মদনকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। সাংসারিক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে তারা মদনের সঙ্গে সুস্থ, সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কটা বজায় রাখতে পারছে না। মদনের বাবার সঙ্গে তার পরিহাস-মধুর সম্পর্ক ও ব্যবহারের কথা স্মরণ করে স্মৃতিবেদনায় মাসির মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেই সুখের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে মদনের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবেও মাসির মন ব্যথিত হয়ে ওঠে, কারণ শত অভাব অনটন সত্ত্বেও সে বাপঠাকুর্দার ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট। শিল্পী ও শিল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে

সে ফরমায়েসি ও সস্তা কাপড় বুনতে একান্তই অনিচ্ছুক। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই গুণী মানুষটির কথা, মদনের বাপের কথা বেশি করে মনে পড়ে মাসির।

মন্তব্য:

লেখক তাঁর 'শিল্পী' গল্পে একটি অপ্রধান চরিত্র মদনের মাসিকে সামান্য দু-একটি কথায় এখানে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.6

1. মদনের মাসির মন সংস্কারাচ্ছন্ন—কখন বোঝা গেল?—যে মন্তব্যটি ঠিক সেটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(অ) বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই।

(আ) বিয়ের সময় জালের মতো ছিস্তিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি।

2. 'ওটা ছুতো'—কোন্‌টা ছুতো?

(অ) ভুবনকে প্রণাম করতে বলায় রাগ হওয়া

(আ) মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি দেওয়া

3. তাঁতের কাজে কার নাম মদন বজায় রেখেছে?

(অ) বংশের নাম।

(আ) বাপের নাম।

(ই) সাতপুরুষের নাম।

4. কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল।—মাসি কার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিল?

(অ) মদনের বাবার সঙ্গে।

(আ) মদনের মার সঙ্গে।

(ই) শ্রীধর তাঁতির সঙ্গে।

5. মদনের বাপের কথা মাসির মনে পড়ে কেন?

21.4.7 'মদনের বাপ যদি .... কথা কয় যেন রাজামহারাজা'।

বক্তব্যসার:

মদনের বাবা আজ বেঁচে নেই। থাকলে তার বয়স হত নব্বুইয়ের ওপরে। মদনের মাসি শ্রীধর-তাঁতির কথাও ভাবে। শ্রীধর বড়োই দুর্ভাগা, জীবনে তার অনেক কষ্ট। সমস্ত কষ্টের অবসান হয়ে এবার বুড়োর মরে

শব্দার্থ ও টীকা

যাওয়াই ভালো মনে করে মদনের মাসি।

সূক্ষ্ম সুতোয় কারুকার্যময় দামি শাড়ি বোনাতেই মদনের আগ্রহ। মোটা সুতোয় সস্তা দামের শাড়ি বুনলে তার শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটে না। এই কারণে সে এই ধরনের কাপড় বোনে না। ঘরে তার নিত্য অভাব অনটন। বউ আসন্ন-প্রসবা, উপোস করে দিন কাটে। তবু তার শিল্পীসত্তা বিসর্জন দিতে রাজি নয়। তার বউ আর মা বাবুদের বাড়ি কিছু শাড়ির বায়না আনতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। বাবুদের বাবুর মেয়েরা টিটকারি দিয়ে তাকে 'বনগাঁর শ্যাল রাজা' বলে অভিহিত করেছে। মদন এতে কষ্ট পেলেও বিচলিত হয় না। তার হাতের কাজের প্রমাণ রয়েছে তার বউ-এর পরনের শাড়িতে। এই শাড়িটা সে বিয়ের সময় বুনেছিল। শাড়িটি অনেক বছর পরে এখনও উজ্জ্বল আছে। মিহি সুতোয় বোনা এই কাপড়খানি পরলে এত অভাব-অনটনের মধ্যেও তার উপোসী রোগা ফ্যাকাশে বউকে বাবুর বাড়ির মেয়েদের মতো লাগে। মদন কেবল বলে, 'অতি বাড় হয়েছে বাবুদের। এবার মরবে।'

মন্তব্য:

ধনীর বিরুদ্ধে মদনের অসহায় অক্ষম ক্রোধের প্রকাশ এভাবেই হয়েছে। ভুবন কৌশল করে মদনকে হাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় সে রেগে গেছে। মদন কাপড় বুনতে রাজি হলে অন্য তাঁতিরাও রাজি হত। ব্যর্থতার জ্বালায় ভুবন ভাবে মদন তাঁতির মাথার ঠিক নেই। যখন তখন রেগে যায়, আবার হাসে। তার কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে বুঝি একজন রাজা-মহারাজা।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.7

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) মদনের বাপ আজ বেঁচে থাকলে তার বয়স কত হত?

(অ) ৮০ বছরের বেশি
(আ) ৯০ বছরের বেশি
(ই) ১০০ বছরের বেশি

(খ) এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো—বুড়োটি কে? কথাটি কে বলেছে?

(অ) বুড়োটি ভুবন ঘোষাল, বলেছে উদি।
(আ) বুড়োটি শ্রীধর তাঁতি, বলেছে মদনের মাসি।
(ই) বুড়োটি বৃন্দাবন তাঁতি, বলেছে গগনের বউ।

(গ) 'এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত!'—কথাটি কে বলেছে, কার সম্পর্কে?

(অ) মদনের বউ বলেছে, মদন সম্পর্কে।
(আ) গগনের বউ বলেছে, বৃন্দাবন সম্পর্কে।
(ই) মদনের মাসি বলেছে, মদন সম্পর্কে।

2. পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) কিন্তু বুড়ির কি সে ____________ আছে।

(খ) ____________ শ্যাল রাজা মদন-তাঁতি।

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) পায়ের ধুলোর ____________ নয় তারা মদনের।

(ঘ) একটা ____________ তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের।

3. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) মদনের বউকে বাবুদের বাড়ির মেয়ে বলে মনে না হওয়ার কারণ:

(অ) তার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ রয়েছে বলে

(আ) সে থপথপ পা ফেলে হাঁটে বলে

(ই) চলতে গেলে তার টলে পড়বার উপক্রম হয় বলে

(খ) মদনের শিল্পী হাতের কাজের প্রমাণ কোথায় রয়েছে?

(অ) বেনারসি ছাড়া তুমি কী কিছু বুনবে?—ভুবনের এই জিজ্ঞাসায়।

(আ) তার বউ-এর পরনের শাড়িতে।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন:

4. মদনকে ভুবন 'রাজা-মহারাজা'র সঙ্গে তুলনা করল কেন?

21.4.8 'উঠবার সময় ভুবনের .... মদন হঠাৎ থেমে যায়'।

বক্তব্যসার:

ভুবন ঘোষাল সুযোগসন্ধানী। সে জানে মদন খুব বড়ো বিপদে পড়লে তখন তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে সস্তা দামের কাপড় বোনায় রাজি হতে পারে। তাই সে মদনের একটা বড়ো বিপদের জন্য অপেক্ষা করছে। মদনের বউ আসন্ন-প্রসবা। অনাহারে অনটনে তার শরীরে নেই কোনো শক্তি। উদি মদনের ভালো চায়। সে চায় মদন সস্তা কাপড় বুনে কিছু পয়সা পাক। কিন্তু মদন তার কথা শোনে না। তাই সে মদনকে গালাগালি দিয়ে এসছে।

ভুবন ঘোষাল বামুনের ছেলে হলেও উদির মতো তাঁতির মেয়ের ঘরে থাকে। সে ভুবনকে তার রান্না-করা ভাত খাবার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু ভুবনের জাতের গুমোর বেশি, তাই তার বক্তব্য—উদি তাকে ভাত খাওয়ার কথা ভাবল কী করে।

এরপর ভুবন মদনের দাওয়ায় এসে বসে। মদন বলে ভুবন তাকে দিয়ে দামি কিছু বোনালে সে বুনে দিতে পারে। ভুবন বলে সে কিছু সুতো পাঠাবে মদনকে। ভুবন মদনের কাছে সুতো পৌঁছে দেয়। এগুলো একেবারে সস্তা দরের সুতো, তা দেখে কান্না পায় মদনের। এই সুতো দিয়ে সে কীভাবে দামি কাপড় বুনবে। বৃন্দাবনের ছেলে কেশব বলল, মদন নিশ্চয়ই ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত চালাচ্ছে। ভোরবেলা উদি ছুটে আসে মদনের কাছে। মদন তাকে তাঁতঘরে নিয়ে দেখায়, ভুবনের দেওয়া সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। সে সারারাত খালি তাঁত চালিয়েছে। ভুবনের দেওয়া দুটি টাকা এবং সুতোর বান্ডিল উদির হাতে দিয়ে ভুবনের কাছে ফেরত পাঠায়।

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার মেয়ে-পুরুষের দল মদনের বাড়িতে আসে। সকলের মনের মধ্যে রাগ-অভিমান। মদন-তাঁতি শেষ পর্যন্ত তাঁত চালিয়ে তাদের সঙ্গে বেইমানি করল। মদন তাদের বলে, সে বিনা সুতায় সারা রাত ধরে তাঁত চালিয়েছে, পায়ের জড়তা কাটাবার জন্য। সবাইকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বাঁচার

লড়াইয়ে সে সবার সাথে আছে।

মন্তব্য:

প্রকৃত সম্পন্ন শিল্পী যে হাজার অভাব অনটন কষ্টে ও দারিদ্র্যের মধ্যেও দালালের দেওয়া টোপ গেলে না, 'শিল্পী' গল্পে মদনের চরিত্রের ভেতর দিয়ে লেখক আমাদের সে কথাই শুনিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.8

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে পাঠের ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও।

(ক) ____________ কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। (উনোনে, আখায়, চুলোয়)

(খ) তোর কথা বড়ো ____________। (খারাপ, বিশ্রী, বিচ্ছিরি)

(গ) সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে ____________ বসে। (উঠে, জাঁকিয়ে, চেপে)

(ঘ) মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার ____________ গেছে। (অজ্ঞান, মূর্ছা, জ্ঞানশূন্য)

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে ভুল শব্দ দেওয়া আছে। সেটি সংশোধন করে সঠিক শব্দ বসান।

(ক) তেমন একটা বিপদ মাথায় চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে।

(খ) উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে অধীর হয়ে ওঠে।

(গ) একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো চারবেলা উপোস।

(ঘ) বেনারসি না-বোনা যেন তারই অধঃপতন।

3. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) মদনের বউয়ের খবর নিয়ে উদি কতক্ষণ পরে ফেরে?

সঙ্গে সঙ্গে   অনেকক্ষণ   মুহূর্তক্ষণ

(খ) উদি মদনকে কী বলে গাল দিয়ে এল?

মৃত্যু হয় না,   মরণ হয় না?   যমে নেয় না?

(গ) উদি কখন ছুটে যায় মদনের কাছে?

সকালে   ভোরে   প্রত্যুষে

(ঘ) মদনের মুখে সুতোর কথা শুনে ভুবনের মনটা কেমন হয়ে ওঠে?

হাসিখুশি   খুশি খুশি   খুশি

4. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) ভুবন উদির রান্না-করা ভাত খায়নি কেন?

(অ) জাত্যভিমানের জন্য

(আ) খিধে না থাকার জন্য

(ই) তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে বলে।

(খ) সুতো দেখে কান্না আসে মদনের।

(অ) সুতো একেবারেই অল্প ছিল।

(আ) সুতো খুবই খেলো মানের ছিল।

(অ) সুতোগুলো ছিল জট পাকানো।

(গ) উদি মদনের তাঁত ঘরে গিয়ে কী দেখল?

(অ) মদন গামছা বুনেছে।

(আ) মদন শাড়ি বুনেছে।

(ই) সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

5. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) 'মদন তাঁত চালায় নাকি রে'—কে কাকে কথাটি বলেছে?

(অ) বৃন্দাবনের ছেলে বৃন্দাবনকে বলেছে।

(আ) কেশব উদিকে বলেছে।

(ই) বৃন্দাবন তার ছেলেকে বলেছে।

(খ) 'সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল।'—সে কে?

(অ) তাঁতিদের সংগ্রামের নায়ক মদন তাঁতি।

(আ) বৃন্দাবন তাঁতি।

(ই) বৃন্দাবনের বড়ো ছেলে রসিক।

(গ) 'থ বনে থাকে উদি'—উদি 'থ বনে থাকে' কেন?

(অ) মদনের বউ মূর্ছা গেছে বলে।

(আ) ভুবন মদনের রান্না-করা ভাত না খাওয়ায়।

(ই) মদন রাতে খালি তাঁত চালিয়েছে বুঝতে পেরে।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে লিখুন ঃ

6. 'মদন হয়তো ভাঙতে পারে'—মদন শেষ পর্যন্ত ভেঙেছে কিনা লিখুন।

7. 'একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ'—কাকে এঁড়ে তাঁতি বলা হয়েছে? তাকে 'এঁড়ে তাঁতি' বলা হল কেন?

21.5 আপনি যা শিখলেন

1. অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে নেই।
2. মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই।
3. মানুষের প্রতি সমব্যথী হতে হবে।
4. ঐক্যবদ্ধ যৌথ লড়াইয়ে জয় অবশ্যম্ভাবী।
5. আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে আপসহীন লড়াই করা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

21.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. মদনের বাড়িতে তাঁতিপাড়ার লোকজন এসেছিল কেন?
2. তাঁতিদের আর্থিক সংকটের কারণ কী?
3. ভুবন অনেক কৌশল ও চেষ্টা করেও তাঁতিপাড়ার জোটবদ্ধ আন্দোলন ভেঙে দিতে পারেনি কেন?
4. 'বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে'।—কী পরিস্থিতিতে মদন একথা বলেছে এবং কেন?
5. 'মদন যখন গামছা বুনবে—' এর সঙ্গে সম্ভাব্য কোন্ বাগ্‌ধারাটি জড়িয়ে আছে?
6. 'শিল্পী' গল্পের নামকরণ এরকম করা হল কেন?

21.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

21.1

1. ক — পায়ে
   খ — ঝিলিকমারা
   গ — দুদিনে
   ঘ — টনটন
   ঙ — চুপচাপ
2. ক — দাওয়ায়
   খ — সাতদিন
   গ — সুতো মেলে না
3. মহাজনের কারসাজি

21.2

1. ক — অনায়াসে
   খ — শুধু
   গ — রোগা
   ঘ — হাউমাউ
   ঙ — কান্না
2. ক — ক + ঘ
   খ — ক + ঙ
   গ — গ + খ
   ঘ — ঘ + ক
   ঙ — ঙ + গ
3. ক. কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ আদায় করতে।

খ. খিঁচ ধরেছিল।

21.3

1. ক — আ
   খ — অ
   গ — অ
   ঘ — আ
   ঙ — ই
2. ক — কলাগাছের
   খ — ডোবা
   গ — সাতদিন
   ঘ — পিঁড়ি
   ঙ — মোটা
3. ক — আ
   খ — ই
   গ — অ
   ঘ — ই
4. গোপনে চাল, ডাল দিয়ে সাহায্য করায়।

21.4

1. ক — আ
   খ — অ
   গ — অ
   ঘ — ই
   ঙ — ই
2. ক — গ + ক
   খ — ঙ + খ
   গ — জ + গ
   ঘ — চ + ঘ
3. ক. সবার তাঁত বন্ধ থাকলেও কেবল কেশব আর বৃন্দাবনের তাঁত চলছে।
   খ. গামছা আর আট-হাতি কাপড়।

21.5

1. ক i — ই
   ক ii — ই
   ক iii — অ
   খ — আ
   গ — অ

2. ক — পয়সা
   খ — সাতপুরুষে
   গ — কিছুকাল
   ঘ — বেচতে
3. ——— ক
4. পোষায় না ওদের।
5. তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে।

21.6

1. ——— অ
2. ——— আ
3. ——— আ
4. ——— আ
5. শত অভাব সত্ত্বেও মদন তার বাপ-ঠাকুর্দার ধারা বজায় রেখেছে বলে।

21.7

1. ক — আ
   খ — আ
   গ — অ
2. ক — কাণ্ডজ্ঞান
   খ — বনগাঁর
   গ — যুগ্যি
   ঘ — এঁড়ে
3. ক — অ
   খ — আ
4. মদনের কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে।

21.8

1. ক — আখায়
   খ — বিচ্ছিরি
   গ — জাঁকিয়ে
   ঘ — মূর্ছা
2. ক — ঘাড়ে
   খ — বিরক্ত
   গ — তিনবেলা
   ঘ — অপরাধ
3. ক — অনেকক্ষণ
   খ — মরণ হয় না?

গ — ভোরে
ঘ — খুশি

4. ক —— অ
খ —— আ
গ —— ই

5. ক —— ই
খ —— অ
গ —— ই

6. না।

7. মদনকে। তার একগুঁয়েমিপনা, একরোখা ও জেদি মনোভাবের জন্য।

লেখক পরিচিতি

১৯০৮ সালের মে মাসে সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকের মা নীরদাসুন্দরী দেবী। চাকুরির জন্যই মানিকের বাবা ছিলেন দুমকার অধিবাসী। আসলে মানিকের পৈতৃক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, মাজদিয়া গ্রামে।

মানিকের প্রাথমিক শিক্ষা কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে। মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর বাঁকুড়ার ওয়েসনিয়ন কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাস করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন।

একদিন বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে একটি গল্প লিখে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। গল্পটি হল 'অতসী মামী'। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। তাঁর পোশাকি নাম প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল : 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'অমৃতস্য পুত্রা', 'শহরতলী', 'চতুষ্কোণ', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী' ইত্যাদি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থগুলি হল: 'অতসী মামী', 'নেকী', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'টিকটিকি', 'মহাকালের জটার জট', 'কুষ্ঠরোগীর বউ', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'ছাঁটাই রহস্য' প্রভৃতি।

সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর জীবিকা। চাকরি-বাকরি বিশেষ করেননি। গল্প উপন্যাস লিখে যা টাকা পেতেন তাতেই কোনোমতে সংসার চালাতেন। অনেক প্রতিভাবান লেখক অর্থের দাসত্ব করতে গিয়ে তাঁদের প্রতিভার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার ব্যতিক্রম।

১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমধর্মী রচনা

এই গল্পটির একটি সমধর্মী রচনা হল : **টানাপোড়েন**, লেখক—**সমরেশ বসু**।

শব্দার্থ ও টীকা

22

অনাচার

আশাপূর্ণা দেবী

22.1 প্রস্তাবনা

আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বিশিষ্ট। বাঙালি সমাজের নারীজীবনের নানান দিক তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। নারীর জীবনে সমস্যার শেষ নেই, কী অবিবাহিত জীবনে কী বিবাহিত জীবনে। কিন্তু শত সমস্যা থাকলেও নারী সাধারণত তার কোমল স্বভাবটিকে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও বিসর্জন দেয় না। এ ভাবটি লেখিকা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন সব সময়ে।

'অনাচার' গল্পে লেখিকা সুভাষ-কাকিমা নামে সমাজে নির্যাতিতা এক নারীর মহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিধবা হিসাবে প্রায় সাতমাস ধরে সধবার জীবনযাপন সমাজের মানুষের কাছে ঘোর সামাজিক অনাচার বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মানবিক দিক দিয়ে সেটি যে অনাচার নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পটির শেষের দিকে। সুভাষ-কাকা মারা গেছেন এ সংবাদে পুত্রশোকে কাতর হয়ে শ্বশুরের মৃত্যুর সম্ভাবনা। এ থেকে তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেননি সুভাষ-কাকিমা, একথা ভেবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।

22.2 উদ্দেশ্য

অনাচার গল্পটি পড়ে আপনি —

- বাঙালি হিন্দু সমাজের (একটি বড়ো অংশের) কুসংস্কার সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারবেন;
- কীভাবে এক যুবতী বধূ সমাজ-রীতিকে না মেনে শ্বশুরের জীবনরক্ষার জন্য বিধবা হয়েও সধবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন, তা জানাতে পারবেন;
- কূপমণ্ডুক সমাজের মানুষের কাছে তাঁর আচরণ অনাচার হলেও গল্পকথক মনোতোষের কাছে এটি ঠিক কাজ বলেই মনে হয়েছে, একথা বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- গল্পটিতে লেখিকা এক নারীকে কীভাবে মহতী করে তুলেছেন সে কথা জানাতে পারবেন।

22.3 মূল পাঠ

22.3.1 (1)

সুভাষ কাকিমার নামে একেবারে ছিছিকার পড়ে গেল। মেয়েমানুষ যে এত বড়ো কঠিন প্রাণ হতে পারে এ যেন ধারণার অতীত।

মেয়েমানুষ কেন, কোনো মানুষের পক্ষেই কি সম্ভব? যে কঠোর কাজ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব, তেমন কাজ যদি কোনো মেয়েমানুষে অম্লানবদনে করতে পারে, তাহলে তাকে লোকে কী না বলবে?

কতটুকুই বা বলতে পারবে?

আমার নিজের কাকিমা আর মা বাড়ি এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন, বোধ হয় মনের ওপর কতবড়ো একটা ধাক্কার ধাক্কা সামলাতে।

সুভাষ-কাকিমারা আমাদের জ্ঞাতি নয়, কাজেই অশৌচের বালাই নেই। তাছাড়া মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে সধবা মানুষের নাকি তক্ষুণি স্নান করতে নেই। তাই মা কাকিমা কাপড় ছেড়ে বসেছেন। পিসিমা একেবারে ঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে ফিরলেন।

উঠানে দাঁড়িয়ে ভিজে থানের আঁচলটা নিঙড়ে নিঙড়ে সেই নিঙড়ানো জলটুকু দিয়ে পা ধুয়ে দালানে উঠে পিসিমা চাঁচাছোলা মাজাঘষা গলায় বলে উঠলেন — যাক, এতদিনে গিরীনখুড়োর হাড় কখানা জুড়োল। আহা, আজন্ম দুঃখী। রোগে-শোকে জরজর দেহখানা টিকে ছিল শুধু পরমায়ু ফুরোয়নি বলেই। নইলে মরেই তো ছিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

ছিছিকার = ধিক্কার।
কঠিন প্রাণ = মায়াদয়াহীন।
ধারণা = বোধ।
অম্লানবদনে = দ্বিধাহীনভাবে।
জ্ঞাতি = এক বংশের।
অশৌচ = অশুদ্ধি।
চাঁচাছোলা = মার্জিত।
মৃত্যুবাড়ি = যে বাড়িতে কোনো মৃত্যু ঘটেছে।
সধবা = যে নারীর স্বামী জীবিত।
তক্ষুণি = সঙ্গে সঙ্গে।
ঘাট = পুকুর, নদী ইত্যাদি জলাশয়ে নামার স্থান।
আজন্ম = জন্ম থেকে।
জুড়োল = শান্ত হল।
জরজর = অতিশয় ক্লেশ পাওয়া।
পরমায়ু = জীবনকাল।

22.3.2 (2)

আলনা থেকে শুকনো মটকার থানখানা পেড়ে নিয়ে পরে মার কাছাকাছি বসে পড়ে থানের আঁচলখানা দিয়েই ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন পিসিমা।

মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন — 'মানুষজন্ম' হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি!

তুমি তো সেদিনের মেয়ে বউ, তুমি শোনোনি — সে কিছু মস্ত কথা নয়। জগতের কেউ কখনও শুনেছে?

কাকিমা বললেন — আমি শুধু ভাবছি — পারল কী করে? প্রাণ ছিঁড়ে পড়ল না! একদিন নয়, আধ দিন নয়, ছ-সাত মাস। এই দুরন্ত সংবাদ চেপে রেখে স্থির থাকা, উঃ! ভাবাই যায় না!

— পাষাণে তৈরি বুক! — বললেন মা!

পিসিমা বললেন — ওগো কার ভেতরে কী থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে। সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিল, তখন মনে হত বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর — ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেল কেন, তাই বা কে বলবে? আমার মনে নিচ্ছে — বউ-এর ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছল।

মটকা = মোটা রেশমি কাপড়।
থান = সাদা পাড় কাপড়।
দুরন্ত = দুষ্টু, অশান্ত (এখানে অবাক করা)।
পাষাণ = পাথর।

22.3.3 (3)

জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না। মানুষকে ধিক্কার দেবার যত রকম ভাষা আছে, সব এঁরা একে একে ব্যবহার করবেন। শেষ পর্যন্ত সংসারের কাজের তাড়ায় যদি ওঠেন।

চুপচাপ খানিক শুয়ে অবেলায় — অন্যমনাভাবে বেরিয়ে পড়লাম।

আজ রবিবার। রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু কিছুতেই যেন ইচ্ছে হল না। সারাদিন সুভাষ-কাকিমা সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে শুনতেই বোধ করি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য জীবন, সামান্য একটু আলোচনার বস্তু পেলে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। সে জায়গায় এত বড়ো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এরপর — সুভাষ-কাকিমাকে কোন্ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হতে হবে কে জানে?

আচ্ছা, সুভাষ-কাকিমা কি কোন গর্হিত অপরাধ করেছেন? না কি কুলধর্ম নষ্ট করেছেন? না সামাজিক কোনো অনাচার করেছেন? কী যে করেছেন সে কথা বলা বড়ো শক্ত। যা করেছেন, সে কাজ বোধহয় কেউ কখনও করেনি, তাই সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখনও হয়নি?

ফিরতি পথে দেখি দীনেশ রায়ের বৈঠকখানার উঁচু রোয়াকে বসে জনাকতক মিলে ওই আলোচনাই চালাচ্ছে। রোয়াকের সিঁড়িতে তিন চারটে হ্যারিকেন লণ্ঠন নিবুনিবু অবস্থায় কমিয়ে বসানো আছে। অন্ধকারে ঠিক চেনা কাউকেই যাচ্ছে না।

শুক্লপক্ষে কেরোসিন খরচের দরকার বড়ো হয় না, রাতবিরেতে পথ হাঁটতে একটা লাঠি ঠকঠকই যথেষ্ট। কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজ গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটে গেছে, আজ সন্ধ্যার পর থেকে পথে বেরোতে হাতে একটু আগুনের ছোঁয়া থাকা ভালো।

গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে মানিক জ্বলে। আমাকে দেখে দীনেশ রায় হাঁক দিলেন — কে যাচ্ছে ওখানে? মনোতোষ না কি?

বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

সমালোচনা = দোষগুণের বিচার।
নিভবে = নির্বাপিত হবে (আগুন), অবসান করবে (সমালোচনা)।
ধিক্কার = ছি!
প্রায়শ্চিত্ত = পাপ থেকে মুক্তি পাবার অনুষ্ঠান।
গর্হিত = নিন্দিত।
কুলধর্ম = বংশের আচার আচরণ।
রোয়াক = বারান্দা।
অন্যমনা = আনমনা।
ক্লান্ত = শ্রান্ত/অবসন্ন।
নিস্তরঙ্গ = ঢেউহীন/ এখানে অর্থ উত্তেজনাহীন স্বাভাবিক জীবন।
আষ্টেপৃষ্ঠে = সর্বাঙ্গে।
স্বতন্ত্র = আলাদা।
শুক্লপক্ষ = পূর্ণিমার আগের পনেরো দিন।

22.3.4 (4)

দীনেশ রায় বললেন — আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?

বললাম — বিকেলে বেরিয়েছি।

—আচ্ছা বোসো একটু। এই সুরেনদা তো তোমাদের দোর দিয়েই যাবেন, একসঙ্গে যেয়ো, আলো ধরে দাঁড়িয়ে দেবেন অখন।

—দরকার হবে না। — বলে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে?

দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন—তোমার দরকার নেই, আমার দরকার আছে। আমি তোমায় একা আঁধারে ছেড়ে দিতে পারি না। এসো এসো। . . . তারপর আজ আর ফিরবে না বুঝি?

—আজ্ঞে না। কাল যাব।

—কাল ছুটি আছে নাকি?

লণ্ঠন = হ্যারিকেনের অন্য নাম।
অখন = 'এখন'-এর পরিবর্তিত রূপ।(মুদ্রাদোষ)।
উদারকণ্ঠে = খোলা গলায়।

শব্দার্থ ও টীকা

তাজ্জব = অবাক, অদ্ভুত।
কীর্তিকলাপ = প্রশংসনীয় কাজসমূহ, এখানে নিন্দার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
উচ্চাঙ্গের = উন্নত। কিন্তু এখানে ব্যঙ্গ করে।
কেতা = কায়দা; কৌশল।
অভ্যেস = অভ্যাস।
বিনীতভাবে = বিনয়ের সঙ্গে, নম্র ও শান্তভাবে।

—নাঃ, ছুটি কীসের?

—তবে?

জানি উত্তর দেবার স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখেও এঁরা প্রশ্ন করতে ছাড়বেন না। এই এঁদের বিশেষত্ব।

বললাম—এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।

দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন—হুঁঃ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে? দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছ একেবারে কী বলো? সুভাষের স্ত্রীর কীর্তিকলাপ শুনলে তো?

—শুনলাম।

—বলি তোমরা তো কলকাতায় থাক হে, অনেক রকম কেতা দেখা অভ্যেস; এমন কেতা দেখেছ সেখানে?

বিনীতভাবে বললাম—আজ্ঞে না।

22.3.5 **(5)**

গলা ঝেড়ে = গলা পরিষ্কার করে, খালি করে।
সাফাই = পরিষ্কার, এখানে অজুহাত।
দাগা = আঘাত।
পৈতে = উপবীত, ব্রাহ্মণ হবার সময় এটি ধারণ করতে হয়।
আত্মা = চৈতন্যময় সত্তা, এখানে কারো কারো বিশ্বাসমতে কোনো মৃত ব্যক্তির দেহহীন অস্তিত্ব।

সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন—সাফাই শুনলে তো? বলে কিনা বুড়োমানুষটার মনে দাগা লাগবে বলে—তাই! শ্বশুরের জন্যে প্রাণ ফেটে মরে যাচ্ছিলেন। ছেলে ভোলানো আর বলে কাকে! ... বলি—তুই পারলি কী করে তাই বল?

—অসৎ মেয়েদের রীতির কথা ছেড়ে দাও সুরেনদা, তারা কী পারে আর না পারে! ... খবরটা বুড়ো কানে উঠলেই তো—মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত।

মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম।

বললাম—আচ্ছা কাকা, আমি চলি।

—আঁধারেই চললে?

—হ্যাঁ।—নেমে পড়লাম।

দীনেশ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন— বলি পৈতে গাছটা গলায় আছে তো হে? না কি কলকেতার ফ্যাশানে ধোবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ? গাছতলা দিয়ে যাওয়া—মানো না তো কিছু! মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না, ঘুরে বেড়ায় বুঝলে?

গাছতলা দিয়ে যেতে যেতে আবার বাড়ির বিপরীত দিকে ঘুরলাম।

মৃত আত্মা জায়গা ছেড়ে না নড়ে যদি তিনদিন ধরে সেইখানেই ঘুরে মরে, তাহলে গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোথাও ঘুরছে। এসব ঘটনা টের পাচ্ছে, এ সব আলোচনা শুনতে পাচ্ছে।

ক্রুদ্ধ = রুষ্ট, রাগান্বিত।
অভিশাপ = অভিসম্পাত, শাপ, অন্যের খারাপ চেয়ে খারাপ কথা বলা।

কী হচ্ছে সে আত্মা? সন্তুষ্ট? না কি এইসব গ্রাম্য বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতে চাইছে? কে জানে কী।

22.3.6 (6)

সুভাষ কাকিমার প্রতি খুব বেশি স্নেহভার তো কখনও দেখিনি তাঁর। তাছাড়া— সুভাষকাকা ''সিনেমা সিনেমা'' হুজুগ করে বম্বে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তো যত দূর নয় তত দূর খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন, পুত্রবধূর ওপরও কম খাপ্পা হননি। অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।

ছটি সন্তানের মধ্যে সুভাষ তাঁর শেষ অবশিষ্ট সন্তান। সেই ছেলেও যদি বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়, তার স্ত্রীর ক্ষমতা থাকে না ধরে রাখবার, তাহলে কী করে তিনি সেই অক্ষমতাকে মার্জনা করতে পারেন? কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন বউ-এর ওপর?

বৃদ্ধ শ্বশুর আর তরুণী পুত্রবধূ—এই সংসার। শ্বশুর যদি রাগ করে সাবু বার্লি সমেত ভারি কাঁসার বাটিটা বে-আন্দাজি ছুঁড়ে মেরে বউ-এর কপাল ফাটান, তাহলেও কেউ ধরবার নেই।

প্রথম প্রথম নাকি খুব চিঠির ঘটা ছিল সুভাষকাকার, টাকাও পাঠিয়েছিলেন কবার, কিন্তু মাস ছয়-সাত আর কোনো খবর নেই।

না টাকা, না চিঠি। সংসারে দারিদ্র্যের চরম। পাড়ার গিন্নিদের দিয়ে নিজের যা একটু সোনাদানা ছিল, সবই বিক্রি করিয়েছিলেন সুভাষ-খুড়িমা।

বম্বে গিয়ে সুভাষকাকা যে, কোনো কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন, সে বিষয়ে আর কারুর মতদ্বৈধ ছিল না।

ওদের যে কী করে চলে, সেকথা গ্রামের কেউ কোনোদিন ভেবে দেখেনি, কিন্তু ওদের নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না।

একটা অসহায় মেয়েমানুষ যে নিজের জোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, স্বামী অনাসক্ত হয়ে গেছে বুঝেও ভেঙে পড়বে না, সব সময় হেসে কথা কইবে লোকের সঙ্গে, এটা সত্যিই বড়ো দৃষ্টিকটু। কিন্তু সে তো তবু সহ্যের সীমানায় ছিল। আর আজ যা জানা গেল। এ যে সহ্যের অতীত।

আজ যা জানা গেল—সেটা হচ্ছে এই—গিরীনঠাকুরদার মৃতদেহ যখন পড়ে, আর বাড়ি লোকে লোকারণ্য, তখন সুভাষ-কাকিমা পাড়ার সমস্ত মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সামনে একখানা খামের চিঠি ফেলে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন—এই নিন, এ চিঠি পড়ুন। পড়ে আমার কী কর্তব্য আদেশ দিন। যদি প্রায়শ্চিত্তের দরকার থাকে, তার ব্যবস্থাও দেবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

স্নেহভার = ভালোবাসার বন্ধন।
হুজুগ = ফ্যাশন, গুজব, জল্পনা, জনরব।
প্রসন্ন = সদয়, খুশি।
বে-আন্দাজি = হিসেবের বাইরে।
চরম = চূড়ান্ত, শেষ পর্যন্ত।
কুহকিনী = মায়াবিনী, জাদুকরী।
কুহকজাল = মায়াজাল, প্রতারণা, ছল।
মতদ্বৈধ = মতের অমিল।
অনাসক্ত = অনুরাগহীন, উদাসীন।
দৃষ্টিকটু = দেখতে খারাপ লাগা।
লোকারণ্য = লোকের ভিড়।
মৃদুকণ্ঠে = নরম গলায়, শান্তভাবে।

22.3.7 (7)

একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও দেখছিলাম সব।

প্রবীণেরা সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন এই ভেবে যে গিরীনঠাকুরদার হয়তো লুকানো টাকাকড়ি কিছু ছিল, সেই সংক্রান্ত কোনো লেখাপড়া।

চিঠিটাই হাঁ হাঁ করে কুড়িয়ে নিয়েছে লোকে, বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

মুখছেঁড়া খাম, পুরোনো চিঠি, বার করতেই যতগুলো সম্ভব মাথা তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু এ কী? এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা?

প্রবীণদের মুখভঙ্গি দেখে, যারা চিঠি পড়েনি তারা উদ্গ্রীব হয়ে তাকাল—ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী?

সকৌতূহলে = আগ্রহের সঙ্গে।
সংক্রান্ত = বিষয়ে।
বাক্যার্থ = বাক্যের মানে।
আঙরা = অঙ্গার-এর পরিবর্তিত রূপ, কয়লা।
উদ্গ্রীব = অতিশয় আগ্রহ।

সতীশ কুণ্ডু ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে, চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে বললেন—সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, বলে ফেলাই ভালো। সুভাষ বাবাজি আজ সাত মাস হলো গত হয়েছেন। বম্বে থেকে তাঁর এক বন্ধু যথা সময়েই জানিয়েছিলেন, তবে বউমা এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

ঘরের মধ্যে কি বাজ পড়ল!

মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখার সংবাদ এমন কিছু নতুন নয়। সময়ে অসময়ে অবস্থা বিবেচনা করে লোকে এমন করে থাকে কখনও কখনও। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গোপন করবে স্ত্রী? উদ্দেশ্যটা কী?

ভিড়ের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল।

প্রবীণরা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন, আর সুভাষ-কাকিমা ভাবলেশশূন্য মুখে শ্বশুরের অসুখের সময়ে ব্যবহৃত ওষুধের শিশি, কাচের গেলাস, পিকদানি, কাঁথাকানি, জামাকাপড় ইত্যাদি একত্রে জড়ো করতে লাগলেন। অতঃপর একজন মহিলা বললেন—হ্যাঁ সতীশ, বউমার করণীয় কাজ তাহলে কী হবে?

শব্দার্থ ও টীকা

ব্যঙ্গমিশ্রিত = উপহাস বা বিদ্রূপ মেশানো।
গত হয়েছেন = মারা গেছেন।
অস্ফুট = অনুচ্চ।
গুঞ্জন = গুনগুন শব্দ।
ভাবলেশশূন্য = উদাসীন, নির্বিকার।
প্রবীণা = বৃদ্ধা, বয়স্কা।
করণীয় = করা দরকার।

22.3.8 (8)

সতীশ কুণ্ডু বললেন—আপনারাই বলুন। আমার এই ষাট বছর বয়সে এমন ঘটনা তো দেখিনি সত্যদি, অজান্তে হয়—সে আলাদা। বলে অজান্তে সাপের বিষে দোষ লাগে না।

সত্যদি বললেন—ছাইপাঁশ শাখা সিঁদুরের ব্যবস্থা নয় আমি করে দিলাম, কিন্তু একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো? জেনে শুনে এমন অনাচার! ... হ্যাঁ গা বউমা, এ চিঠি চেপে রাখবার বুদ্ধি তোমায় কে দিলে বাছা?

সুভাষ-কাকিমা মুখ তুলে, কে জানে হয়তো বা একটু হেসেই বললেন— বুদ্ধি আর কে দেবে পিসিমা? বোধহয় আমার দুর্মতিই দিয়েছে।

—যাই হোক, বলি এর একটা মানে তো আছে? যদি উড়ো চিঠি বলে অবিশ্বাস এসে থাকে, পাড়ার পাঁচটা বিচক্ষণ লোককে দেখাতে হয় তো?

—অবিশ্বাস তো করিনি পিসিমা।

—তা হলে?

সুভাষ-কাকিমা এইবার হাতের কাজ থামালেন, স্থির ভাবে বললেন—ভেবেছিলাম বাবা বুড়োমানুষ, জীবনভোর অনেক শোকতাপ তো পেয়েছেন, মরণকালে না হয় আর নাই পেলেন।

—এইটাই কি আর একটা সহজ মানুষের মতন কাজ হল বাছা?—সত্যপিসি বললেন— যে যার কর্মফল নিয়ে এসেছে, ভোগ না করে উপায় কী? এই যে তুমি ছমাস ধরে জেনে শুনে তার ভিটেয় বসে বিধবা হয়ে সধবার আচরণ করলে, তাতেই কি তার ভালো করলে? এতে তার আত্মার অসদ্‌গতি হবে না? ... যাক এখন ভটচাজকে ডাকো, কী বলে সে দেখি। নারায়ণ নারায়ণ!

অজান্তে = অজ্ঞাতসারে, অজানা অবস্থায়।
প্রাচিত্তির = প্রায়শ্চিত্ত-এর গ্রাম্য রূপ। অর্থ, কোনো অন্যায় কাজ করার জন্য শাস্তি গ্রহণ।
অনাচার = শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ।
দুর্মতি = দুষ্ট বুদ্ধি, খারাপ ইচ্ছা।
বিচক্ষণ = অভিজ্ঞ, দূরদর্শী।
জীবনভর = সারা জীবন ধরে।
শোকতাপ = প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত কারণ বা দুঃখ।
কর্মফল = কাজ করার ফল বা পরিণতি; কৃতকর্মের ফল যা জন্মান্তরেও ভোগ্য বলে অনেকের বিশ্বাস।
ভিটেয় = (ভিত্তি > ভিটা/ভিটে) বাস্তু, যে জমি বা ভূমিতে বাসগৃহ নির্মিত হয়।
অসদ্‌গতি = স্বর্গলাভ বা মুক্তি না হওয়া।
নারায়ণ = এখানে 'নারায়ণ' শব্দটির দুবার করে করে পাপ কাটানো।

22.3.9 (9)

ভট্‌চাজ্‌ও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে এলেন। শুনে এসেছেন তো সব।

তিনি বিধান দিলেন, যেহেতু গিরীনঠাকুরদা শ্বশুর, সেই হেতু তাঁর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূর বৈধব্যসাজ গ্রহণ দৃষ্টিকটু। অতএব মৃতদেহ বার করার আগেই সুভাষ-কাকিমার শেষকৃত্য করে দেওয়া হোক।

সুভাষ-কাকিমা বললেন—আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা? না, আমি একা গেলে চলবে?

সত্যপিসি গম্ভীর বদনে বললেন—তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি, তবে আমার তো একটা কর্তব্য আছে? সেই আঠারো বছর বয়েস থেকে এই কাজে চুল পাকালাম। ... নাও চলো। ... থাক থাক গামছা কাপড় কিছু নেবার দরকার নেই। নাও দীনেশ, তোমরা ততক্ষণ ইদিক্‌কের গোছগাছ করো।

এত বড়ো একটা কাণ্ডে সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার কোনো সুযোগই দিলেন না দেখে বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসি।

এ সব হল সকালের কথা। রবিবার বলেই আমি ছিলাম।

এখন বাড়ির বিপরীত মুখে চলতে চলতে—কোনো আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে কে জানে— গেলাম গিরীনঠাকুরদারই বাড়িতে। রাত হয়ে গেছে। সে কথা আগে খেয়াল হয়নি, খেয়াল হল সুভাষ-কাকিমার দরজায় এসে।

ইতস্তত করে চলেই আসছিলাম, হঠাৎ দেখলাম পঞ্চা কলুর ছোটো মেয়েটা বেরিয়ে এসে বলল—দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে? কাকিমা শুধালো কিছু দরকার আছে?

বললাম — না, এমনি দেখতে এসেছিলাম। তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেল। বললে—''বুড়ো তো ম'ল, বামুনদিদি একা থাকবে? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে!''

—পাড়ার আর কেউ নেই?

—না তো!

শব্দার্থ ও টীকা

বিধান = ব্যবস্থা।
বৈধব্যসাজ = স্বামী মারা গেলে হিন্দু নারীকে সধবার বেশ পরিবর্তন করে সাদা থান ইত্যাদি পরতে হয়।
দৃষ্টিকটু = দেখতে খারাপ লাগে।
গম্ভীর = ধীর, অচঞ্চল, আভিজাত্যপূর্ণ।
বদন = মুখমণ্ডল।
কর্তব্য = অবশ্যকরণীয়।
ইদিক্‌কের = এইদিকের।
কাণ্ড = ঘটনা।
ইতস্তত = এদিক-ওদিক।
কলু = তেলের কারবারি।
শুধালো = জিজ্ঞাসা করল।
বামুনদিদি = 'ব্রাহ্মণ'এর কথ্য রূপ। ব্রাহ্মণের কন্যা, 'দিদি' সম্পর্কে ব্যবহার।
আত্তিরটুকু = রাতপর্যন্ত, 'রাত্তির' গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষ তারই বিকৃত উচ্চারণে এ শব্দ বলে। রাতের সময় ধরে।

22.3.10 (10)

কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকিমা বেরিয়ে এলেন। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় সাজসজ্জার পরিবর্তন বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না তাই রক্ষে।

সুভাষ-কাকিমা আমার চাইতে বয়সে বড়ো নয়, নিজের কাকিও নয়, তাই প্রণাম কখনও করিনি, অতএব ''ন যযৌ ন তস্থৌ'' ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম!

বললেন—মনোতোষ না? এমন সময় এদিকে?

—ভাবলাম আপনার একটা খবর—

—এসেছো ভালোই হয়েছে ভাই—বলেই থামলেন, সামান্য একটু হেসে বললেন— 'ভাই' বলেই বলছি কিছু মনে কোরো না, 'বাবা বাছা' করে বলতে পারি না। বলছি—গ্রামে আর কাউকে বলতে পারিনি, তোমায় বলছি—তোমার কাকার তো পারলৌকিক কাজের কিছুই হয়নি, এতদিন পরে কিছু হয় কিনা, কিংবা কী হয়,

জ্যোৎস্না = জোছনা, চন্দ্রালোক।
সাজসজ্জা = বেশভুষা।
'ন যযৌ ন তস্থৌ' = যেতেও না পারা, থাকতেও না পারা, একেবারে হতবুদ্ধি হওয়া।
বাবা বাছা = আদর করে কাজ করিয়ে নেবার জন্য সম্বোধন।
পারলৌকিক = পরলোক (মৃত্যুর পরে) সম্বন্ধীয়।

তোমাদের কলকাতার কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করতে পারো?

বললাম—আচ্ছা!

—আর শোনো, ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরেই বললাম—কেন? আপনার আবার প্রায়শ্চিত্ত কীসের?

—মস্ত একটা পাপ তো করলাম এতদিন ধরে? বিধবা হয়ে জেনে শুনে সে খবর চেপে রেখে সধবার আচরণ করা! হিন্দু ধর্ম কি এতটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?

আমি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলাম—'পাপ' বলে নিজে স্বীকার করেন আপনি?

—করেছি বইকি ভাই, হাজার হোক হিন্দুরই মেয়ে তো? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের লোভটাও মস্ত হয়ে উঠেছিল। ভাবলাম বুড়ো মানুষকে এই শেষ জীবনে আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিই কেন? ওঁকে পুত্রশোকের হাত থেকে রক্ষা করতে তো আমিই পারি? দেখি না ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে। তাই রাবণ রাজার মতো নিজের মৃত্যুবাণ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে রাখলাম।

রাগ করে বললাম—তা যথাসময়ে তো আবার নিজে হাতেই বার করে দিয়েছেন। এতদিনের যন্ত্রণার কথা থাক, আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

শব্দার্থ ও টীকা

পণ্ডিত = জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ।
ব্যবস্থা = বিধি, পালনীয় নিয়ম।
ক্রুদ্ধ স্বরে = রাগত কণ্ঠে, রেগে।
ভার = চাপ, ওজন।
স্বীকার = মেনে নেওয়া, কবুল।
পুণ্য = ভালো কাজের ফল।
মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা = এটি একটি প্রবাদ। লোকমুখের প্রচলিত কথা। অর্থ- আঘাতের ওপরে আরও আঘাত দেওয়া।
মৃত্যুবাণ = যে তিরে বিদ্ধ হলে মৃত্যু অনিবার্য, এখানে চরম শাস্তি।
লাঞ্ছনা = নির্যাতন।

22.3.11 (11)

সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—কী জানি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে একটা কিছু শাস্তিই হোক! খুব কঠিন শাস্তি! এতদিন ধরে হেসে গল্প করে সহজ হয়ে বেড়ানোর জন্যে ভয়ংকর কোনো শাস্তি! ... অজান্তে সাপের বিষ খেলে দোষ হয় না জানি, কিন্তু জেনে বুঝে সে বিষ হজম করলে? তার জন্য শক্ত বিধান শাস্ত্রে নেই?

উত্তর জোগাচ্ছিল না। হঠাৎ বারো বছরের 'নন্দী' চৈতন্য করিয়ে দিল—দাদাবাবু এবার ঘরে যাও। গাঁ ঘরের নোক তো ভালো নয়। কোথায় আনাচকানাচ দে' দেখবে আর কুচ্ছো রটাবে। 'আত' হয়েছে তো!

কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি!

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও এক কথায় উলটো মুখ ধরতে পারাও শক্ত। তাই বললাম — একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করব কাকিমা, গিরীনঠাকুরদা আপনার সঙ্গে যা ব্যবহার করতেন, সে তো কারুর অবিদিত নেই? অথচ তার জন্যে —

—এটা কী একটা কথা হল মনোতোষ—কাকিমা হেসে ফেললেন—উনি রাগের মাথায় যখন তখন আমার মাথা লক্ষ করে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন বলে আমি জেনে বুঝে ওর মাথায় লাঠি বসনোর ভারটা নেব?

— কিন্তু লোকে কি এর মর্ম বুঝল?

— লোকের বোঝাটাই তো শেষ কথা নয় ভাই!

ভয়ংকর = ভীষণ, মারাত্মক।
বিধান = বিধি, ব্যবস্থা, শাস্ত্রবিহিত নিয়ম।
শাস্ত্র = অনুশাসন, বিধিবিষয়ক গ্রন্থ। (বেদ, স্মৃতি, দর্শণ, পুরাণ ইত্যাদি)।
জোগাচ্ছিল = জোগান দিচ্ছিল, সরবরাহ করছিল।
চৈতন্য = চেতনা, এখানে মনে করিয়ে দেওয়া।
গাঁ = 'গ্রাম'-র কথ্য প্রয়োগ।
নোক = 'লোক'-এর গ্রাম্য উচ্চারণ।
আনাচ-কানাচ = এখানে-সেখানে, গলি-ঘুঁজি।
কুচ্ছো = কুৎসা, নিন্দা.
আত = 'রাত'-এর গ্রাম্য বিকৃত উচ্চারণ।
নিদারুণ = অত্যন্ত কঠিন।
অবিদিত = অজানা।
মর্ম = গূঢ় অর্থ।

— আচ্ছা আর একটি শেষ কথা—কিছুতেই এ সন্দেহকে দূর করতে পারছি না। ভাবছি কী করে পারলেন?

সুভাষ-কাকিমা এবারেও একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন—সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না মনোতোষ—কী করে পারলাম?

টীকা ঃ

'ন যযৌ ন তস্থৌ' = অংশটি মহকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে নেওয়া। উমা বা পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্যে কঠোর তপস্যা করেন। এমনকি অন্নজল ত্যাগ করে কেবলমাত্র যে গাছের তলায় তপস্যা করেন তার পাতার রসটুকু পর্যন্ত পান করা বন্ধ করলেন। তাই তাঁর নাম হল 'অপর্ণা'। নিজের চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে সারাদিন জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট শিব তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে এসে উমার সামনে শিবের নিন্দে করতে লাগলেন। সহ্য করতে না পেরে তিনি যখন চলে যেতে চাইলেন, তখন দেবাদিদেব স্বমূর্তিতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই মুহূর্তে উমা লজ্জায় কাঁপতে লাগলেন। এমন অবস্থা হল যে যেতেও পারছেন না, পেছনেও ফিরতে পারছেন না। এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই কবির এ কথার উল্লেখ।

22.4 বিষয়ের রূপরেখা

22.4.1 সুভাষ-কাকিমার নামে . . . . নইলে মরেই তো ছিলেন।

বক্তব্যসার:

গল্পটির কথক মনোতোষের মুখ থেকে জানা যাচ্ছে যে সুভাষ-কাকিমা (সুভাষ নামে কোনো ব্যক্তিকে 'কাকা' বলত বলে তার স্ত্রী কাকিমা, সেই হিসেবে ভদ্রমহিলাকে এ নামেই ডেকেছে মনোতোষ) নামে গ্রামের এক মহিলা সমাজের অনুমোদন নেই এমন কোনো কাজ করেছেন। সেটি এককথায় অনাচার। তাঁর সেই আচরণের জন্য নারী-পুরুষ সকলেই সমালোচনায় মুখর, চারদিকে ধিক্কার। ঘটনাটি প্রকাশিত হল তাঁর শ্বশুর এবং মনোতোষের ঠাকুরদা গিরীনের মড়া উঠোনে নিয়ে আসার পর। এমন কি মনোতোষের মা, কাকিমা ও পিসিমার প্রতিক্রিয়াও একইরকম। সকলেই সুভাষ-কাকিমার বিরুদ্ধে।

মন্তব্য:

গ্রামের সামাজিক পরিবেশ সাধারণত এমনই স্পর্শকাতর যে যে-কোনো পরিবারে ঘটে যাওয়া ছোটো একটা ঘটনার মধ্যে যদি কিছুমাত্র সমাজ-অনুমোদিত নয় এমন কাজের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে সমস্ত গ্রামেই সাড়া পড়ে যায়, তারা জেগে ওঠে এবং প্রতিরোধ (কথায় ও কাজে) গড়ে তোলে। এমন কি ঘটনার সত্যাসত্য বিচার না করেই তা করেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে নিন্দের ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 22.1

1. কার নামে ছিছিকার পড়ে গেল?
2. পিসিমার কথায় গিরীনখুড়োর হাড় ক'খানা কখন জুড়োল?
3. কথকের মা-কাকিমা মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে এসে স্নান না করে কী করেছেন?
4. শূন্যস্থান পূরণ করুন : (বন্ধনী থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে)

   (ক) কোনো মানুষের পক্ষেই কি ____________ ? (অসম্ভব/ সম্ভব)

   (খ) আহা, আজন্ম ____________। (সুখী/ দুঃখী)

   (গ) রোগে-শোকে ____________ দেহখানা টিকে ছিল (জরজর/ জ্বরজ্বর)

   (ঘ) পিসিমা একেবারে ____________ থেকে ডুব দিয়ে ফিরলেন। (নদী থেকে/ ঘাট থেকে)

22.4.2 আলনা থেকে শুকনো . . . . সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছল।

বক্তব্যসার:

গল্পের কথক মনোতোষের কথায় তার পিসিমা স্নানশেষে মটকার থান পরে যখন থানের আঁচল দিয়েই তাঁর ন্যাড়া মাথা মুছছিলেন, তার মা আবার সুভাষ-কাকিমার নিন্দেয় মুখর হয়ে উঠলেন — তিনি সারা জন্মেও একথা শোনেননি বলতে পিসিমা বললেন যে সারা পৃথিবীতেই একথা অভিনব। তার কাকিমা অবাক এই ভেবে যে এমন অবাক করা সংবাদটা সুভাষ-কাকিমা ছ-সাত মাস চেপে রাখল কীভাবে! তার মা বললেন যে পাষাণী বুক না হলে এমন সম্ভব নয়। এরপর পিসিমা সুভাষ-কাকিমার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করলেন, কুৎসিত ইঙ্গিতও করলেন।

মন্তব্য:

মৃত্যুবাড়ি থেকে ফিরে এসে সুভাষ-কাকিমার সমালোচনায় মেতে উঠলেন সকলে — কথকের মা, পিসিমা কাকিমা। এঁদের বক্তব্য, ছ-সাত মাস ধরে অমন একটা মারাত্মক খবর কী করে চেপে রাখলেন সুভাষ-কাকিমা, সেটাই অবাক করার বিষয়। অবশ্য সে-খবর এখনও প্রকাশিত হয়নি। সুভাষ-কাকা ও কাকিমার মধ্যে খুব কাছের সম্পর্ক থাকায় এঁরা ঈর্ষা কাতর। অথচ সুভাষ-কাকার উধাও হবার পেছনে দায়ী করছেন সুভাষ-কাকিমাকে। এঁদের অনুমান সুভাষ-কাকিমার চরিত্রের কোনো দোষের জন্যই কাকা চলে গেছেন। গ্রাম্য সমাজ এমনই!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.2

1. ''মানুষজন্ম হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি।'' —

   (ক) কে বলেছেন?

(খ) কাকে বলেছেন?

(গ) 'মানুষজন্ম' বলতে কী বলা হয়েছে?

(ঘ) 'সর্বনেশে কথা'টি কী বলতে পারেন?

2. ঠিক উত্তরটিতে (✓) টিক চিহ্ন দিন :

"ওগো কার ভেতরে কী থাকে, সে সুধু সময় এলেই ধরা পড়ে।" —

(i) কথাটি বলা হয়েছে পিসিমা সম্পর্কে — ☐

(ii) সুভাষ-কাকিমার সম্বন্ধে এ উক্তি — ☐

(iii) পিসিমাকে উদ্দেশ করে একথা বলা হয়েছে — ☐

(iv) উক্তিটি বক্তার মা'র সম্পর্কে বলা হয়েছে — ☐

3. বাঁদিকের মন্তব্যের বা বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক বক্তাটির/উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা শূন্যস্থানে লিখুন :

(ক) ন্যাড়া মাথাটা ঘসে ঘসে মুছতে লাগলেন ____________ কাকিমা।

(খ) তুমি তো সেদিনের মেয়ে বউ ____________ মা।

(গ) আমি শুধু ভাবছি — পারল কী করে? ____________ পিসিমা।

(ঘ) পাষাণ তার বুক ____________ পিসিমা।

22.4.3 জানি এ সমালোচনার আগুন . . . . বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম।

বক্তব্যসার:

গল্প কথকের কথায় জানা যাচ্ছে যে, যে সমালোচনা আর ধিক্কারের ঢেউ উঠেছে, কাজের তাগিদ ছাড়া কারুর সুভাষ-কাকিমার বাড়ি থেকে চলে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেদিন রবিবার। বক্তার কলকাতায় ফেরার কথা। কিন্তু সারাদিন ধরে সুভাষ-কাকিমার বিষয়ে যা শোনা যাচ্ছে তাতে গ্রামের সমাজপতিরা কোন্ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন সে ভাবছে। কী জাতীয় অপরাধ তিনি করেছেন অর্থাৎ কুলধর্ম নষ্ট করা বা অনাচার করা, বুঝে উঠতে পারছে না। এমনকি তার বাড়ি ফেরার পথে দীনেশ রায়ের বৈঠকখানাতেও একই আলোচনা। বেশ কয়েকটি নিবুনিবু হ্যারিকেনের আলোয় উপস্থিত লোকেদের শনাক্ত করা যাচ্ছে না। শুক্লপক্ষের রাত, আলাদা আলোর কোনো দরকার নেই। কিন্তু যেহেতু গ্রামে একটা মৃত্যু ঘটেছে, একটু আলোর ছোঁয়া থাকা ভালো, কেননা মৃত্যুর পর তার আত্মার ঘোরাফেরা, আগুন সামলে দেবে — এই সংস্কার। দীনেশ রায় ওই অন্ধকারের মধ্যে মনোতোষকে চিনে নাম ধরে ডাকতেই বক্তা দাঁড়িয়ে পড়ল।

মন্তব্য:

কথকের (মনোতোষের) সেদিন কলকাতায় ফেরার কথা থাকলেও সুভাষ-কাকিমা সম্বন্ধে নিন্দে শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গেল না। সে ভাবছে, সামান্য সমাজবিরুদ্ধ কাজেই চরম শাস্তির বিধান দেয় সমাজ। আর এই ঘোর অন্যায় কাজের জন্য সুভাষকাকিমাকে না জানি কি প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। কিন্তু অপরাধের আসল পরিচয় প্রকাশ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দেওয়া হয়নি। দীনেশ রায়ের বৈঠকখানায়

নিবুনিবু লণ্ঠনের আলোয় মনোতোষ দেখল গ্রামের মাথারাও জটলা করছেন। পূর্ণিমার আলোর দরকার না থাকলেও একটা মৃত্যু ঘটে যাবার জন্যে একটু আলোর ছোঁয়া দরকার। কেননা অন্ধ সংস্কার, মৃত আত্মা যে ঘুরে বেড়ায়!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.3

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

"জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না।" — এখানে 'নিভবে না' কথার অর্থ হল —

(ক) নির্বাপিত হবে না — ☐

(খ) বন্ধ হবে না — ☐

(গ) দাউ দাউ করে জ্বলবে — ☐

(ঘ) চলতে থাকবে না — ☐

2. ঠিক শব্দে শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ____________ কথা। (আসার/ ফেরার/ থাকার)।

(খ) আলোচনার বস্তু পেলে এরা ____________ তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়ে না। (আগাগোড়া/ পুরোপুরি/ আষ্টেপৃষ্ঠে)।

(গ) না কি ____________ নষ্ট করেছেন? (কুলধর্ম/ বংশের মর্যাদা/ স্বামীর সম্মান।)

(ঘ) গ্রামের লোকের অন্ধকারে চোখে ____________ জ্বলে। (আলো/ মানিক/ আগুন)

3. একটি করে বাক্যে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

"সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কখনও হয়নি।"

(ক) কার অপরাধ?

(খ) কারা আলোচনা করছিলেন?

(গ) প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তখনও আলোচনা হয়নি কেন?

22.4.4 দীনেশ রায় বললেন . . . . বিনীতভাবে বললাম — আজ্ঞে না।

বক্তব্যসার:

কথক (মনোতোষ) অমন দিনে লণ্ঠন নিয়ে না বেরোনোর জন্যে দীনেশ রায় অবাক এবং ওই গ্রামেরই সুরেনদা বলে জনৈকের সঙ্গে যাবার জন্যে বললে মনোতোষ দরকার নেই বলে। কিন্তু গ্রামের মাথা হিসেবে দীনেশ অমন প্রিয়জনকে আলোহীনভাবে ছাড়েন কী করে? দীনেশবাবুর আরও জিজ্ঞাসার উত্তরে ভালো না লাগার কথা বললে আগ বাড়িয়ে মনোতোষের মনোবেদনার কারণ হিসেবে সুভাষ-কাকিমার কীর্তিকলাপকে (যা এখনও প্রকাশিত হয়নি) দায়ী করলেন। কলকাতায়ও এমন ঘটনা দেখার সুযোগ মনোতোষের হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সে সবিনয়ে না দেখার কথাই বলল।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

কথক মনোতোষ কুসংস্কারমুক্ত। দীনেশ রায় অমন মৃত্যুর দিনে লণ্ঠন না নিয়ে বের হবার জন্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মনোতোষ মৃত্যুর পরে আত্মার থাকার বিষয়ে বিশ্বাস করে না। তবুও দীনেশ তাকে সুরেনদার সঙ্গে যেতে বলেন। মনোতোষের কলকাতায় না যাবার কারণ হিসেবে সুভাষ-কাকিমার অপকর্মকেই দায়ী করলেন দীনেশ রায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.4

1. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লিখুন :

''আজকের দিনে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?' — এখানে 'আজকের দিন' বলতে বোঝাচ্ছে —

(i) যে দিনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল

(ii) গিরীন খুড়োর মৃত্যুদিন

(iii) এক গভীর অন্ধকার রাত

(iv) গ্রামের মানুষের চোখে সুভাষ-কাকিমার অনাচার ধরা পড়ার দিন

2. একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে উত্তর লিখুন :

''দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন — হুঁ!''

(ক) দীনেশ রায় কে?

(খ) তিনি কাকে বললেন?

(গ) 'উচ্চাঙ্গের হাসি' কথাটিতে কী ভাব প্রকাশ পাচ্ছে?

(ঘ) দীনেশ রায়ের এ-হাসি কোন্ বিশেষ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে?

3. এক একটি বাক্য ভেঙে নীচের লাইনের দুপাশে এলোমেলো ভাবে রয়েছে। আলাদা আলাদা টুকরো জুড়ে বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন। বাঁদিকের বাক্সে ডানদিকের সঠিক সংখ্যাটি বসান। একটি নমুনা দেওয়া হল।

(ক) আজকের দিনে ☐	(i) তোমার দরকার নেই।
(খ) দীনেশ রায় উদার কণ্ঠে বলে উঠলেন ☐	(ii) একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?
(গ) দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন ☐	(iii) এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।
(ঘ) বললাম ☐	(iv) হুঁ: ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে?

22.4.5 সুরেন সরকার গলা ঝেড়ে বললেন . . . .জানে কী

বক্তব্যসার:

সুরেন সরকারের বক্তব্য, সুভাষ-কাকিমা শ্বশুরকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ জানালে তিনি মনে আঘাত পাবেন, এ অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। এরপর দীনেশ রায় সুভাষ-কাকিমাকে অসৎ বলে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, একথা প্রচার হলে সধবার বেশ পরা এবং মাছ খাওয়া শেষ হয়ে যেত। একথা শুনে মনোতোষ মাথায় যন্ত্রণা অনুভব করল এবং চলে যেতে চাইল। এতে দীনেশ রায় তাকে তার পৈতে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন এবং ব্যঙ্গ করে বললেন যেহেতু সে কলকাতায় থাকে ফ্যাশন করে হয়তো পৈতে নাও রাখতে পারে। সেদিনের রাতে ওটা খুবই জরুরি, কেননা গিরীন খুড়োর মৃত আত্মা তিনদিন তিনরাত নিজের জায়গায় ঘুরে বেড়াবে। পৈতে থাকলে নিরাপদ, বিশেষ গাছতলা দিয়ে যাবার সময়ে। এতে মনোতোষ অনুমান করছে গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও তাহলে ওইসব আলোচনা শুনে হয়তো পুত্রবধূর লাঞ্ছনায় খুশি অথবা এতদিন সধবা হিসেবে থাকার জন্যে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

মন্তব্য :

সুভাষ-কাকিমা যে বুড়ো শ্বশুরের মনে কষ্ট লাগবে বলে খবরটা (সুভাষ-কাকার মৃত্যুর পরে যা প্রকাশ পেয়েছে) চেপে রেখেছেন, তা দীনেশ রায় - সুরেন সরকাররা বিশ্বাস করেন না। সুভাষ-কাকিমাকে অসতী বলে ইঙ্গিত করলেন তাঁরা। আর, সধবার খাওয়া-পরার সুবিধে হারাবেন তিনি। খবরটা না দেবার এও একটা কারণ এটিও বললেন।

মনোতোষের পৈতে থাকা সম্বন্ধেও ব্যঙ্গ করলেন দীনেশ রায়। পৈতে থাকলে নাকি মৃত আত্মা ছুঁতে পারে না। আত্মা যদি সত্যিই থাকে তাহলে কি গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও আছে? তিনি হয় সুভাষ-কাকিমার নিন্দে-মন্দয় যোগ দিচ্ছেন অথবা তাঁর কাজের জন্য অভিশাপ দিচ্ছেন। মনোতোষের এই অভিমত এমন অন্ধ বিশ্বাসের কোনো ভিত্তিই নেই।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.5

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

"সাফাই শুনলে তো"

(i) কে বলেছেন?

(ii) কাকে উদ্দেশ করে?

(iii) এখানে 'সাফাই' শব্দের অর্থ কী?

(iv) যার সাফাইয়ের কথা বলা হয়েছে, সে সাফাইটি কী?

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

"মাছ খাওয়া, শাড়ি পরা ঘুচে যেত।" — কার কথা বলা হয়েছে?

(ক) কাকিমা — ☐

(খ) মা — ☐

(গ) সুভাষ-কাকিমা — ☐

(ঘ) পিসিমা — ☐

3. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসান :

(ক) বলি __________ গলায় আছে তো? (লণ্ঠন/রামনাম/পৈতে গাছটা)

(খ) মৃত আত্মা তিন দিন তিন রাত __________ ছেড়ে নড়তে চায় না, (বাড়ি/ জায়গা/ গাছ)

(গ) আবার বাড়ির __________ ঘুরলাম। (সামনের দিকে/ পেছনের দিকে/ বিপরীত দিকে)

(ঘ) গিরীন ঠাকুরদার আত্মাও নিশ্চয় __________ কোথাও ঘুরছে। (চারিদিকে/ কাছে-পিঠে/ সঙ্গে সঙ্গে)

(ঙ) বৃদ্ধদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে __________ দিতে চাইছে? (আশীর্বাদ/ গালাগলি/ অভিশাপ)

22.4.6 সুভাষ-কাকিমার প্রতি খুব বেশি স্নেহভার . . .তার ব্যবস্থাও দেবেন।

বক্তব্যসার:

সুভাষ-কাকিমার প্রতি তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের খুব যে স্নেহ ছিল তা কখনও দেখা দেয়নি বিশেষ করে সুভাষ সিনেমার হুজুগে বম্বে চলে যাবার পর। এর জন্য তাঁর পুত্রবধূকেই দায়ী করেন। তাঁকে কোনো দোষ দেওয়াও যায়না একারণে যে তাঁর ছ'টি সন্তানের শেষ জীবিত সন্তান হল সুভাষ। ফলে শ্বশুর আর পুত্রবধূর সংসারে বধূর ওপরে নির্যাতন হলেও দেখার কেউ নেই। সুভাষের চিঠি আর টাকা দুই-ই পাঠানো বন্ধ হল। পুত্রবধূ এমনকি নিজের অবশিষ্ট সামান্য সোনাদানা বিক্রি করেও সংসার চালাত, কিন্তু সমাজের নিন্দার শেষ নেই। কেননা ওই দৈন্যের মধ্যেও সুভাষ-কাকিমার সহজ স্বাভাবিক আচরণ আর হাসি ওদের কাছে অসহ্য। ঘটনা চরম অবস্থায় পৌঁছোল যখন গিরীন ঠাকুরদার মৃতদেহের সামনে হাজির অজস্র মানুষের মধ্যে গণ্যমান্য সমাজপতিদের সামনে খামের একটা চিঠি ফেলে দিলেন তিনি আর সেটি পড়ে তাঁর কর্তব্যের আদেশ প্রার্থনা করলেন। এমনকি প্রায়শ্চিত্তও করতে চাইলেন।

মন্তব্য:

সিনেমা-পাগল সুভাষকাকা বম্বে গেলেন। ছ-সাত মাস তাঁর কোনো খোঁজ নেই। শ্বশুর গিরীনঠাকুরদা সেই থেকে সুভাষ-কাকিমার ওপর শারীরিক এবং মানসিক দু-রকম অত্যাচারই করতেন। দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। সুভাষ যে ছ'জনের মধ্যে শেষ সন্তান! সুভাষের টাকা পাঠানো বন্ধ। খুব খারাপ অবস্থা। শেষ সম্বল দিয়ে এতদিন চালিয়েছেন সুভাষ-কাকিমা কোনোভাবে। মেয়েমানুষের এমন নিজের জোরে দাঁড়ানো সহ্য করে না গ্রামের মানুষ। গিরীনঠাকুরদার মৃতদেহ শোয়ানো। বাড়িতে গ্রামের লোকের ভিড়। এমন সময় সুভাষ-কাকিমা এতদিনের লুকোনো খবর প্রকাশ করলেন। একটা চিঠি গ্রামের মাথাদের সামনে ফেলে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ

চাইলেন। কী প্রচণ্ড মনের শক্তিতেই না এটা করলেন!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.6

1. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

"অবিশ্যি দোষ দেওয়াও যায় না।"

(ক) কার সম্বন্ধে এ কথাগুলি বলা হয়েছে?

(খ) কী কারণে তাঁর উপর দোষ দেওয়ার প্রশ্ন দেখা দিল?

(গ) তাঁকে দোষ না দিতে বলার কারণ কী?

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

". . . বাটিটা বে-আন্দাজি ছুঁড়ে মেরে বউ-এর কপাল ফাটান।" 'বে-আন্দাজি' কথার অর্থ হল—

(i) খেয়ালহীনভাবে — ☐

(ii) আন্দাজের সঙ্গে — ☐

(iii) লক্ষ্যহীন ভাবে — ☐

(iv) অনুমানের ওপর নির্ভর করে — ☐

3. বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক থেকে মিলিয়ে ঠিক বাক্সে ব্যক্তির চিহ্নটি দিন :

(ক) খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন —	☐	(i) সুভাষ-কাকিমা
(খ) কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন? —	☐	(ii) সুভাষ-কাকিমা
(গ) কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন —	☐	(iii) গিরীন ঠাকুরদা
(ঘ) এই নিন, এ চিঠি পড়ুন —	☐	(iv) গিরীন ঠাকুরদা

22.4.7 একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও . . . করণীয় কাজ তাহলে কী হবে?

বক্তব্যসার:

চিঠির রহস্য (গিরীন ঠাকুরদার লুকোনো টাকাকড়ি সম্বন্ধে) জানবার জন্যে প্রচণ্ড কৌতূহলী। সকলে ঝুঁকে পড়েছে চিঠির ওপর। অবশেষে চিঠির পাঠক সতীশ কুণ্ডু ঘোষণা করলেন যে সুভাষ ছ-সাত মাস আগেই মারা গেছে। সে সংবাদ পাওয়া গেল ওরই এক বন্ধুর পাঠানো এ চিঠিতেই। বউমা এতদিন যে এ সংবাদ গোপন রেখেছেন তার কারণ কেউই খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কি কোনো স্ত্রী লুকিয়ে রাখতে পারে? প্রবীণরা অবাক আর সুভাষ-কাকিমা অসুস্থ শ্বশুরের জমা ব্যবহৃত জিনিসপত্র এক জায়গায় করতে লাগলেন। একজন মহিলা বউমার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে সতীশকেই জিজ্ঞেস করলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

মন্তব্য:

সতীশ কুণ্ডু চিঠি পড়ে আসল খবর প্রকাশ করলেন — সুভাষ ছ-সাত মাস আগেই মারা গেছে। তার বন্ধু এ খবর দিয়েছে। আর বউমা অর্থাৎ সুভাষ-কাকিমা এমন সাঙ্ঘাতিক খবর এতদিন চেপে রেখেছে। এই খবরই সকলকে অবাক করল। সকলে সুভাষ-কাকিমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগল। গ্রামের সমাজ কুসংস্কারে অন্ধ। তিনি কেন একাজ করলেন তার বিচার করলেন না গ্রামের মাথারা। তিনি এতদিন সধবা ছিলেন এটিই তার প্রধান অপরাধ। হায়রে গ্রামের হিন্দু সমাজ!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.7

1. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :**

   "এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা?"

   (i) কোন চিঠি?
   (ii) চিঠিটি কে পড়লেন?
   (iii) চিঠির মূল বক্তব্য কী ছিল?
   (iv) 'জ্বলন্ত আঙরা' কথার অর্থ কী?

2. **"প্রবীণারা চোখ গোল করে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন," প্রবীণদের কী অবস্থা হল? ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

   (ক) অবাক হলেন — ☐
   (খ) কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না (হতবুদ্ধি হলেন) — ☐
   (গ) আশ্চর্য হলেন — ☐
   (ঘ) মজার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন — ☐

3. **বাঁদিকে ব্যক্তি এবং ডানদিকে ব্যক্তির আচরণের উল্লেখ রয়েছে এলোমেলো ভাবে। মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক সংখ্যাটি বাঁদিকের বাক্সে বসান :**

(ক) প্রবীণেরা — ☐	(i) এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।
(খ) লোকে — ☐	(ii) ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে . . .
(গ) সতীশ কুণ্ডু — ☐	(iii) সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন।
(ঘ) বউমা — ☐	(iv) বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

22.4.8 সতীশ কুণ্ডু বললেন . . . . নারায়ণ নারায়ণ।

বক্তব্যসার:

রহস্যের আবিষ্কার হল। বউমা (সুভাষ-কাকিমা) ছ-সাত মাস বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন।

সতীশ কুণ্ডু বউমার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সত্যদি বলে এক ভদ্রমহিলা বউমার শাঁখা ভাঙা, সিঁদুর মোছার দায়িত্ব নিলেও ওই অনাচারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের দরকার বললেন। শ্বশুরমশাই সারাজীবন বহু শোক পেয়েছেন স্ত্রী সন্তানদের হারিয়ে। শেষ সময়ে আর দুঃখ দিতে চাননি। একারণেই খবরটা বিশ্বাস করেও চেপে রেখেছিলেন। ক্ষুণ্ণ হয়ে সত্যপিসি বললেন যে বউমা শ্বশুরের ভালো দেখতে গিয়ে অনাচার আর তাঁর শ্বশুরের আত্মার অসদ্গতির ব্যবস্থাই করেছেন। কেননা শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করলে আত্মার মুক্তি নেই!

মন্তব্য:

এ ঘটনা নানা ভাবনা নিয়ে এল বউমার করণীয় সম্বন্ধে। বিধবার করণীয় ছাড়াও এতদিনের চেপে রাখা অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নও দেখা দিল। তাঁর এমন করার কারণ জানতে চাইল সকলে। সুভাষ-কাকিমা সারা জীবন ধরে শোক পাওয়া শ্বশুরকে মরণকালে আর শোক না দেবার জন্যেই এমন করেছেন বললেন। সমাজ এটা মেনে নিল না। তাদের ধারণা, এতে গিরীনঠাকুরদার আত্মার সদ্গতি হবে না। অন্ধ বিশ্বাস না হলে সুভাষ-কাকিমার এমন একটা কঠিন কাজকে অন্যায় কাজ ছাড়া কিছু বলতে পারেনা তারা। এইতো সমাজের আসল চেহারা!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.8

1. ঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

"একটা প্রাচিত্তিরের দরকার তো?" — কারণ —

(ক) গিরীনঠাকুরদা মারা গিয়েছেন — ☐

(খ) সুভাষ নিরুদ্দেশ হয়েছেন — ☐

(গ) সুভাষ-কাকিমা বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন — ☐

(ঘ) হিন্দুধর্মের রীতি লঙ্ঘন করেছেন সুভাষ-কাকা বম্বে উধাও হয়ে — ☐

2. "এতে তার আত্মার অসদ্গতি হবে না?"

(i) কে বলেছেন?

(ii) কার আত্মা?

(iii) বক্তা তার আত্মার অসদ্গতি হবার আশঙ্কা করেছেন কেন?

3. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসান :

(ক) এমন ____________ তো দেখিনি সত্যদি। (ঘটনা/ মেয়েমানুষ/ কাণ্ড)

(খ) বোধহয় আমার ____________ দিয়েছে। (সুমতি/ মন/ দুর্মতিই)

(গ) পাড়ার পাঁচটা ____________ লোককে দেখাতে হয়তো ? (গণ্যমান্য/ সম্ভ্রান্ত/ বিচক্ষণ)

(ঘ) যে যার ____________ নিয়ে এসেছে, (কর্মফল/ বুদ্ধি/ বিচার)

শব্দার্থ ও টীকা

22.4.9 ভট্‌চাজও 'নারায়ণ নারায়ণ' করতে করতে . . . . — না তো!

বক্তব্যসার:

বিধানদাতা পণ্ডিত ভট্‌চাজ বিধান দিলেন যে শ্বশুর মৃত গিরীনঠাকুরদার সৎকারের আগেই সুভাষ-কাকিমার বিধবা হিসেবে করণীয় কাজ শেষ করতে হবে। একাজে (সধবা থেকে বিধবার বেশ পরিবর্তনের সামাজিক রীতিগত কাজ) দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা সত্যপিসি চললেন তাঁকে নিয়ে। এক সকালের ঘটনা।

সন্ধের দিকে মনোতোষ অজ্ঞাত কোনো কিছুর টানে গিরীনঠাকুরদার বাড়ি পৌঁছেই যখন ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই পঞ্চা কলুর মেয়েকে দিয়ে সুভাষ-কাকিমা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন তার কোনো দরকার আছে কিনা। সেই ছোট্ট মেয়েটার কাছেই মনোতোষ জানতে পারল একলা বাড়িতে সঙ্গ দেবার জন্যে কেবলমাত্র ওই মেয়েটাই রয়েছে, পাড়ার অন্য কেউ নয়!

মন্তব্য:

গিরীনদার সৎকারের আগেই বিধবা হিসেবে সুভাষ-কাকিমার বিধবার কাজ শেষ করতে হবে। এ ব্রাহ্মণ ভট্‌চাজের বিধান। সুভাষ-কাকিমা কারুর সাহায্য না নিয়ে একাই সে কাজ করতে চললেন।

গ্রামের সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র মনোতোষই বুঝতে পারে সুভাষ-কাকিমার মনের অবস্থার কথা। সে যে শহরের আধুনিক যুবক! প্রতিবাদ করতে না পারলেও অন্যের আচরণ একেবারেই মানতে পারে না সে। কেন না জানি সে সুভাষ-কাকিমার দরজায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সহানুভূতি থাকলেও গ্রাম্য বাধবাধ ভাব তো রয়েছে!

পাঠগত প্রশ্ন : 22.9

1. **প্রশ্নের উত্তর লিখুন :**

   "তিনি বিধান দিলেন" —

   (i) তিনি কে?

   (ii) তিনি কী বলতে বলতে এলেন?

   (iii) তিনি কী বিধান দিলেন?

2. **বাঁদিকের উল্লিখিত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ডানদিকের ঠিক সংখ্যাটি বাক্সে লিখুন :**

(ক) সত্যপিসি বললেন — ☐	(i) দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে?
(খ) সুভাষ-কাকিমা বললেন — ☐	(ii) তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?
(গ) মনোতোষ বললেন — ☐	(iii) তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি।
(ঘ) পঞ্চাকলুর মেয়ে বলল— ☐	(iv) আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা?

3. "বোধহয় চটে গেলেন সত্যপিসি" — কেননা —
(ক) সুভাষ-কাকিমার বিধবা হবার খবর এত দেরিতে পেয়েছেন।
(খ) সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার সুযোগ দেননি।
(গ) সুভাষ-কাকিমা তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে উপস্থিত মহিলাদের কাছে আবেদন রেখেছেন।

22.4.10 কথার মাঝখানে সুভাষ-কাকিমা . . . . পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?

বক্তব্যসার :

ইতিমধ্যে সুভাষ-কাকিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পেছনের আবছা আলোয় তাঁর পরিবর্তিত বেশ চোখে পড়ল না মনোতোষের। তিনি বললেন, মনোতোষের কাকার কোনো পারলৌকিক কাজ করতে পারেন নি। মনোতোষ কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতের কাছ থেকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জেনে আসতে পারে কিনা জানতে চাইলেন। প্রায়শ্চিত্তের কথায় মনোতোষ তীব্র প্রতিবাদ করলে সুভাষ-কাকিমা বলেন হিন্দু বিধবা হয়ে সধবার আচরণ হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তবুও তিনি শ্বশুরকে পুত্রশোকের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে (একজনের জীবনরক্ষার মধ্য দিয়ে) কিছুটা পুণ্য করতে চেয়েছিলেন। মনোতোষের কথায়, যদি তাই হয়, তাহলে ওই দিনে সমস্ত মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাতেই তো প্রায়শ্চিত্তের সমাধা হয়েছে।

মন্তব্য :

সুভাষ-কাকিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সুভাষ-কাকার পারলৌকিক কাজ এবং তাঁর নিজের কাজের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা বললেন মনোতোষকে। সে যদি কালীঘাটের কোনো পণ্ডিতকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। মনোতোষ প্রায়শ্চিত্তের কথা মানতে পারে না। সে বিশ্বাস করে না একাজকে পাপ বলে। কিন্তু সুভাষ-কাকিমা হিন্দুর মেয়ে হয়ে এ কাজকে পাপ বলেই জানতেন। কিন্তু শ্বশুরের জীবনরক্ষার জন্য এ কাজ করেছেন তিনি। এতে পুণ্য সঞ্চয় করতে চাইছিলেন। মনোতোষের ভাবনাই ঠিক। এত মানুষের এত সমালোচনা, এত খারাপ কথা, মানসিক যন্ত্রণার থেকে বড়ো কোনো প্রায়শ্চিত্ত আর হতে পারে না। অন্য প্রায়শ্চিত্ত আর কী হতে পারে?

পাঠগত প্রশ্ন : 22.10

1. **"ন যযৌ ন তস্থৌ" — অংশটির আসল অর্থ হল — ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :**
(ক) যাব না থাকব না
(খ) গেল না এলও না
(গ) অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা
(ঘ) যেও না এসো না

2. **প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :**

"আজকের লাঞ্ছনাতেও কি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?" —
(i) কে বলেছে?

শব্দার্থ ও টীকা

(ii) কাকে উদ্দেশ করে বলেছে?
(iii) কোন্ দিনের কথা বলা হয়েছে?
(iv) উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কে বা কারা লাঞ্ছনা করেছে?

3. "শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান" — (ডানদিক থেকে)

(ক) কালীঘাটের কোনো ____________ জিজ্ঞেস করতে পার? (পাণ্ডাকে/ পণ্ডিতকে)

(খ) হিন্দুধর্ম কি এতটা ____________ ভার বইতে পারবে? (কুৎসার/ অনাচারের)

(গ) পুণ্যের লোভটাও ____________ হয়ে উঠেছিল। (বড়ো/ মস্ত)।

(ঘ) নিজের ____________ প্রাণপণ যত্নে লুকিয়ে তুলে রাখলাম। (প্রাণভোমরা/ মৃত্যুবাণ)

22.4.11 সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত . . . মনোতোষ— কী করে পারলাম।

বক্তব্যসার:

সুভাষ-কাকিমার সকলের লাঞ্ছনাতেও তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে মনোতোষ জানতে চাইলে তিনি শাস্তিই চাইছেন। এতদিন ধরে হেসেখেলে বেড়ানোর জন্য কঠিন শাস্তি। প্রকৃতপক্ষে সমাজের মানুষের কথা ছেড়ে দিলেও তিনি বিবেকের দংশন থেকেই এ দাবি করেছেন। এরপর পঞ্চাকলুর মেয়ে নন্দী একা কাকিমা আর মনোতোষের উপস্থিত দেখল, মানুষের কুৎসা রটনার ভয়ের কথা বলল সে। মনোতোষ যাবার আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করল শ্বশুরের শত লাঞ্ছনা সয়েও তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তিনি অমন কাজ করলেন কেন। লোকে তো আসল কথা বুঝল না। আর কী করেই বা তিনি এমন করতে পারলেন, এও তাঁর প্রশ্ন। সুভাষ-কাকিমা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

মন্তব্য:

যে ভাবেই হোক সুভাষ-কাকিমা একটা কঠিন শাস্তি চান। জেনে বা না-বুঝে এমন কাজ করলেও সমাজের নিয়মের বাইরে যেতে চান-না তিনি। এটা সত্যি। কিন্তু তার থেকেও সত্যি হল, তিনি মনের মধ্যেই এটাকে একটা অন্যায় কাজ বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু অদ্ভুত মনের মানুষ এই ভদ্রমহিলা। মনোতোষ বলল, গিরীনঠাকুরদার অত অত্যাচারের পরেও তিনি কীভাবে তাঁর জন্যে এমন অন্যায়ের ভার নিলেন তা সে বুঝতে পারছে না। এখানেই সুভাষ-কাকিমার আসল নারীসত্তা বেরিয়ে এল। তিনি শোকে কাতর শ্বশুরের লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিলেন। এখানেই তো তাঁর মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। লেখিকা তাঁর কাজ 'অনাচার' কিনা এ প্রশ্ন রাখলেও এটি সত্যিকারের মানবিকতার কাজই হয়েছে। পাঠকমাত্রেই একথা বুঝবেন, মানবেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 22.11

1. নীচে কয়েকটি বাক্য দেওয়া আছে। পাশের বন্ধনীতে ঠিক বা ভুল লিখুন —

(ক) সুভাষ-কাকিমা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন না। [ ]

(খ) মনে হচ্ছে একটা শাস্তিই হোক। [ ]

(গ) তার জন্যে শক্ত বিধান শাস্ত্রে আছে? [ ]

(ঘ) কথাটা বড়ো নিদারুণ সত্যি নয়! [ ]

(ঙ) সে তো কারুর অবিদিত নেই? [ ]

(চ) ভাবছি কী করে পারলেন? [ ]

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

"জেনে বুঝে ওর মাথায় লাঠি বসানোর ভারটা নেব?" — 'ওর মাথায় লাঠি বসানোর ভার' অংশটির আসল অর্থ হল —

(i) লাঠি দিয়ে মারা।

(ii) লাঠি বসিয়ে দেওয়া।

(iii) মানসিক আঘাত দেওয়া।

(iv) মাথা লক্ষ করে লাঠি ছোঁড়া।

3. একটি বাক্যে বা বাক্যাংশে উত্তর লিখুন :

"ভাবছি কী করে পারলেন?"

(ক) কে বলেছে?

(খ) কাকে লক্ষ করে বলা হয়েছে?

(গ) কী পারার কথা বলা হয়েছে?

(ঘ) উত্তরে তিনি কী বললেন?

22.5 আপনি যা শিখলেন

1. বাঙালি হিন্দু সমাজ এখনও কিছু কিছু কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সে বিষয়।

2. বাঙালি হিন্দু সমাজে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারীর ত্যাগমহিমা, সহনশীলতা, মানবিকতাকে মর্যাদা না দিয়ে তাকে কীভাবে অপমান করার কথা।

3. কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থান এবং যথাযথ পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন না হলে সেই আত্মার যে সদ্‌গতি হয় না, এমন অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন সমাজের কাছে প্রগতিমূলক চিন্তা ব্যাহত হবার কথা।

4. এরই মধ্যে মনোতোষ নামে যুবকের ভাবনায় সুভাষ-কাকিমার প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠার কথা।

5. গল্পটি সম্পূর্ণভাবে চলিত রীতিতে লেখার কথা।

22.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. "মানুষজন্ম হয়ে পর্যন্ত এমন সর্বনেশে কথা কখনও শুনিনি ঠাকুরঝি।"— কথাটি সর্বনেশে কেন?

2. "জানি এ সমালোচনার আগুন সহজে নিভবে না।"— সমালোচনাকে আগুন বলা হয়েছে কেন?

3. “ছেলে-ভোলানো আর বলে কাকে?”— ‘ছেলে-ভোলানো’ কথার বিশেষ অর্থ কী?
4. “মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা যন্ত্রণা বোধ করলাম”— এর থেকে বক্তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়?
5. “তিনি বিধান দিলেন।” — তিনি কী বিধান দিলেন?
6. “এ কি চিঠি, না জ্বলন্ত আঙরা”— চিঠিটিকে ‘জ্বলন্ত আঙরা’ বলার কারণ বুঝিয়ে বলুন।
7. “এতে আত্মার অসদ্‌গতি হবে না?”— এটি কি সত্যবিশ্বাস অথবা সংস্কার মাত্র?
8. “ওই সঙ্গে আমার কোনো প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যদি দেন।”— কী উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠেছে?
9. “হিন্দুধর্ম কি এতটা অনাচারের ভার সইতে পারবে?”— তিনি সত্যিই অনাচার করেছেন কিনা সে বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বোঝান।
10. “দেখিনা ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে।”— ‘ভগবানের ওপর কলম চালিয়ে’ বলতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?
11. এ ধরনের ঘটনা আপনার অভিজ্ঞতায় আছে কি? যদি থাকে ৭/৮টি বাক্যে লিখুন।

22.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

22.1

1. সুভাষ-কাকিমার নামে।
   তিনি এমন কাজ করেছিলেন যাতে প্রমাণিত হয়েছে তিনি কঠিন-প্রাণ।
2. গিরীনখুড়ো মারা যাবার পর তাঁর হাড় কখানা জুড়োল।
3. কথকের মা-কাকিমা মৃত্যুবাড়ি থেকে এসে স্নান না করে শুধু কাপড় ছেড়ে বসেছিলেন।
4. (ক) সম্ভব;
   (খ) দুঃখী;
   (গ) জরজর;
   (ঘ) ঘাট।

22.2

1. (ক) কথকের মা বলেছেন।
   (খ) কথকের পিসিমাকে বলেছেন।
   (গ) মানুষ হিসেবে জন্ম নেওয়া থেকে অর্থাৎ আশৈশব।
   (ঘ) ‘সর্বনেশে কথা’টি এখানে স্পষ্ট হয়নি (কোনোভাবেই এই অংশে প্রকাশ পায়নি)। তবে সুভাষ-কাকিমার কোনো গর্হিত কর্মের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্ভবত।

2. (ii) সুভাষ কাকিমার সম্পর্কে এ উক্তি।

3. (i) পিসিমা; (ii) পিসিমা; (iii) কাকিমা; (iv) মা।

22.3

1. (খ) বন্ধ হবে না।
2. (ক) ফেরার;

   (খ) আষ্টেপৃষ্ঠে;

   (গ) কুলধর্ম;

   (ঘ) মানিক।
3. (ক) সুভাষ-কাকিমার অপরাধ।

   (খ) দীনেশ রায়, সুরেন সরকার নামের গ্রামের মাথাওয়ালা লোকেরা।

   (গ) যে-ধরনের অপরাধ করা হয়েছে এ জাতীয় অপরাধ এর আগে ঘটেনি বলেই এখনও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয়নি।

22.4

1. (ii) গিরীনখুড়োর মৃত্যুদিন।
2. (ক) দীনেশ রায় মনোতোষ (গল্পের কথক)দের গ্রামের একজন মাথা।

   (খ) তিনি মনোতোষকে একথা বললেন।

   (গ) 'উচ্চাঙ্গের হাসি' কথাটির মধ্যে দীনেশ রায়ের সবজান্তা মুরুব্বিয়ানার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

   (ঘ) দীনেশ রায়ের এ-হাসি সুভাষ-কাকিমার কোনো অপরাধমূলক কাজের দিকে ইঙ্গিত করছে।
3. (ক) আজকের দিনে একটা লন্ঠন নিয়ে বেরোওনি কেন বাবাজি?

   (খ) দীনেশ রায় উদারকণ্ঠে বলে উঠলেন — 'তোমায় দরকার নেই',

   (গ) দীনেশ রায় একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললেন — হুঁঃ! ভালো আর লাগবে কোথা থেকে?

   (ঘ) বললাম — এমনি গেলাম না আজ, ভালো লাগল না।

22.5

1. (i) একথা সুরেন সরকার বলেছিলেন।

   (ii) মনোতোষকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন।

   (iii) এখানে 'সাফাই' শব্দের অর্থ হল অজুহাত বা নিজের অপরাধকে অস্বীকার করার বাহানা।

   (iv) সুভাষ-কাকিমা শ্বশুরের মনে যাতে আঘাত না লাগে, একথা বিবেচনা করেই অমন কাজ করেছিলেন।

2. (গ) সুভাষ-কাকিমা।

3. (ক) পৈতে গাছটা (খ) জায়গা; (গ) বিপরীতদিকে;
(ঘ) কাছে-পিঠে; (ঙ) অভিশাপ।

22.6

1. (ক) গিরীনঠাকুরদার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে।

(খ) তিনি খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন এবং পুত্রবধূর (সুভাষ-কাকিমা) ওপরও খাপ্পা হয়েছিলেন।

(গ) তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না একারণে যে গিরীনঠাকুরদার ছ-টি সন্তানের পাঁচটি আগেই মারা গেছে এবং অবশিষ্ট সন্তান সুভাষ সিনেমার হুজুগে বোম্বাই গিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। এতবড়ো শোক বহন করা সত্যিই কষ্টকর।

2. (iii) লক্ষ্যহীনভাবে।

3. (ক) খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন (iii) গিরীনঠাকুরদা

(খ) কী করে প্রসন্ন থাকতে পারেন? (iv) গিরীনঠাকুরদা

(গ) কুহকিনীর কুহকজালে আটকা পড়ে গেছেন (i) সুভাষ-কাকা

(ঘ) এই নিন, এই চিঠি পড়ুন (ii) সুভাষ-কাকিমা

22.7

1. (i) বম্বে থেকে সুভাষ-কাকার বন্ধুর পাঠানো চিঠি।

(ii) সতীশ কুণ্ডু চিঠিটা পড়লেন।

(iii) চিঠির মূল বক্তব্য ছিল যে সুভাষ-কাকা সাতমাস আগে মারা গেছেন।

(iv) জ্বলছে এমন কয়লা। এখানে বিশেষ অর্থে, সংবাদটা একদিকে খুবই মর্মান্তিক, অন্যদিকে এ সংবাদের পরিণতি অত্যন্ত নিন্দনীয়।

2. (খ)

3. (ক) প্রবীণেরা — (iii) — সকৌতূহলে চিঠি কুড়িয়ে নিলেন।

(খ) লোকে — (iv) — বাক্যার্থের দিকে কান দেয়নি।

(গ) সতীশ কুণ্ডু — (ii) —ক্ষোভ ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি মুখে ফুটিয়ে . .

(ঘ) বউমা — (i) — এযাবৎ সংবাদটি গোপন রেখেছিলেন।

22.8

1. (গ) সুভাষ-কাকিমা বিধবা হয়েও সধবার আচরণ করেছেন।

2. (i) সত্যপিসি একথা বলেছেন।

   (ii) গিরীনঠাকুরদার আত্মা।

   (iii) বক্তা তাঁর আত্মার অসদ্গতি হবার আশঙ্কা করছেন এ কারণেই যে গিরীনঠাকুরদার একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান সুভাষের মৃত্যুর সংবাদ চেপে রেখে সুভাষের পারলৌকিক কাজ করেননি সুভাষ-কাকিমা। উপরন্তু এই ছ-সাত মাস ধরে সধবার আচরণ করে যে অনাচার করেছেন তাতে শ্বশুরের আত্মার সদ্গতি হওয়া দুঃসাধ্য বলেই মন্তব্য করেছেন সত্যপিসি।

3. (ক) ঘটনা;

   (খ) দুর্মতিই;

   (গ) বিচক্ষণ;

   (ঘ) কর্মফল।

22.9

1. (i) ভটচাজ মহাশয় বিধান দিলেন/ ভটচাজ মহাশয়।

   (ii) তিনি 'নারায়ণ নারায়ণ' বলতে বলতে এলেন।

   (iii) তিনি বিধান দিলেন গিরীনখুড়োর শেষকৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ-কাকিমার বৈধব্যসাজ নেওয়া দৃষ্টিকটু হওয়ায় গিরীন খুড়োর মৃতদেহ বের করার আগেই সুভাষ-কাকিমার শেষকৃত্য করা উচিত।

2. (ক) সত্যপিসি বললেন — (iii) — তোমার অবিশ্যি কোনো সাহায্যের দরকার নেই দেখছি।

   (খ) সুভাষ-কাকিমা বললেন — (iv) — আমার সঙ্গে কি আপনারা কেউ যাবেন পিসিমা?

   (গ) মনোতোষ বলল — (ii) — তুই এখানে রাত্তিরে থাকবি বুঝি?

   (ঘ) পঞ্চুকলুর মেয়ে বলল — (i) দাদাবাবু এসে ফিরে যাচ্ছেন যে?

3. (খ) সুভাষ-কাকিমা তাঁকে কাঁদবার সুযোগ দেননি।

22.10

1. (খ) গেল না, এলও না।

2. (i) একথা মনোতোষ বলেছে।

   (ii) একথাগুলি বলা হয়েছে সুভাষ-কাকিমাকে উদ্দেশ করে।

   (iii) যেদিন সুভাষ-কাকার বন্ধুর চিঠিমারফত জানা গেল যে তিনি সাতমাস আগেই গত হয়েছেন অথচ সুভাষ-কাকিমা এতদিন সে সংবাদ গোপন রেখে সধবার আচরণ করেছেন সেই দিনের কথা।

   (iv) সুভাষ-কাকিমার গ্রামের নারী-পুরুষ সহ প্রায় সকলে, একমাত্র মনোতোষ বাদে।

3. (ক) পণ্ডিতকে;

(খ) অনাচারের;

(গ) মস্ত;

(ঘ) মৃত্যুবাণ।

22.11

1. (ক) ভুল;

   (খ) ঠিক;

   (গ) ভুল;

   (ঘ) ভুল;

   (ঙ) ঠিক;

   (চ) ঠিক।

2. (iii) মানসিক আঘাত দেওয়া।

3. (ক) মনোতোষ বলেছে।

   (খ) এটি বলা হয়েছে সুভাষ-কাকিমাকে লক্ষ করে।

   (গ) সুভাষ-কাকার মৃত্যু সংবাদ চেপে রেখে বিগত ছ-সাত মাস ধরে সধবার বেশে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার কথা।

   (ঘ) উত্তরে সুভাষ-কাকিমা বললেন যে তিনিও ভেবে পাচ্ছেন না তিনিই বা এমনটা করতে পারলেন কী করে!

লেখক পরিচিতি

আশাপূর্ণা দেবী : জন্ম - ৮ জানুয়ারি ১৯০৯, মৃত্যু - ১৩ জুলাই ১৯৯৫।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখিকা। উত্তর কলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবারে জন্ম। কোনো স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ হয়নি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে কালিদাস গুপ্তর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। দীর্ঘ জীবনে এক গৃহবধূ এবং মায়ের ভূমিকা পালন করতে করতেই তাঁর অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি। অসামান্য সূক্ষ্মদৃষ্টি, সংবেদনশীলতা এবং পরিচিত সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালি মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বাইরের কথা প্রত্যক্ষ করেছেন। আধুনিক মেয়েদের কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু আধুনিকতার বিলাসীদের কখনও প্রশ্রয় দেননি। ছোটোদের জন্যেও লিখেছেন। তাঁর লেখায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন নারী, পুরুষ, কিশোর থেকে বাঙালি পাঠকমাত্রেই।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই হল 'ছোটো ঠাকুরদার কাশীযাত্রা'। তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা' — এই তিনটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই তিনখণ্ডে তিন প্রজন্মের বাঙালি নারীর ঐতিহাসিক অবস্থান তাদের চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতার জগতের পরিবর্তনের এক আশ্চর্য ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাস সংখ্যা - ১৭৬, গল্প - ৩০টি, ৪৭টি ছোটোগল্প এবং অসংখ্য অন্যান্য রচনা।

শব্দার্থ ও টীকা

১৯৭৮ খ্রি. তিনি দেশের সর্বোচ্চ ‘জ্ঞানপীঠ’ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমি পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন।

সমধর্মী রচনা

এমন ধরনের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘দেনাপাওনা’, ‘স্ত্রীর পত্র’ ইত্যাদি গল্পে; আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা’ উপন্যাসে; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বামুনের মেয়ে ইত্যাদি গল্পে। সুযোগমতো এগুলি পড়লে বাঙালি হিন্দু সমাজে (পুরুষ-শাসিত) নারীর অবস্থান বুঝতে পারবেন। যুগের পরিবর্তন হলেও আজও বিয়ের পণ নিয়ে যে-নির্যাতন পাত্রী এবং তার পরিবারের ওপর হয়ে থাকে, তা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি গভীর উপলব্ধির বিষয়।

শব্দার্থ ও টীকা

23

টেরা ইনকগনিটা

সুদীপ্তা সেনগুপ্ত

23.1 প্রস্তাবনা

মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। সে সব কিছু দেখতে চায়, বুঝতে চায় ও জানতে চায়। আমাদের এই পৃথিবী নানা অজানা রহস্যে ভরা। বারে বারে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে- স্থলে, পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে ও মরু-মেরু অঞ্চলে অভিযান করেছে। পথের কষ্ট ও বিপদ কিংবা মৃত্যুভয় তাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। এই গ্রহের অজানা জীব-বৈচিত্র্য, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের আকর্ষণ মানুষকে যুগে যুগে ঘরছাড়া করেছে।

‘টেরা ইনকগনিটা’ শীর্ষক রচনাটিতে রয়েছে কুমেরু অভিযানের নানা অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা। ‘টেরা ইনকগনিটা’ হল একটি লাটিন শব্দ যার অর্থ অজ্ঞাত বা অনাবিষ্কৃত ভূখন্ড যা মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত বা নথিভুক্ত হয়নি। বর্তমানে বহু গবেষক যে-কোনো অনাবিষ্কৃত গবেষণা ক্ষেত্র বা বিষয় প্রসঙ্গে এই কথাটিকে ব্যবহার করে থাকেন।

দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী এই কুমেরু অঞ্চলের রহস্যে আকৃষ্ট হয়ে ওখানে গবেষণার জন্য যান। লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্তও ছিলেন একজন কুমেরু অভিযাত্রী। তিনি এই অভিযানের বর্ণনায় চমকপ্রদ নানা অভিজ্ঞতার কথা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ দিয়েছেন। লেখিকার দেওয়া জাহাজের সামুদ্রিক বরফ ভেঙে চলা, রাত বারোটার আকাশে ঝকঝকে সূর্য এবং কুমেরুর আকাশে সূর্যের নানা অজানা গতিবিধি ইত্যাদি আপনাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে।

23.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পড়ে আপনি :

- দুঃসাহসিক অভিযানে আগ্রহী হবেন।
- অভিযান করতে গিয়ে মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেন তাতে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- মানসিক উদারতা অর্জন করবেন।
- কুমেরু সম্বন্ধে আরও কৌতূহলী হবেন।
- দূষণ মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে আগ্রহী হবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

23.3 মূল পাঠ

23.3.1 (1)

আন্টার্কটিকা! আন্টার্কটিকা! স্কট-আমুন্ডসেন-শ্যাকলটনের আন্টর্কটিকা। বরফঢাকা পেঙ্গুইনদের দেশ আন্টার্কটিকা। বরফের ওপর হেঁটে বারবার অনুভব করতে লাগলাম সত্যিই আমরা পৌঁছে গেছি আন্টার্কটিকাতে। আজ সাতাশে ডিসেম্বর ১৯৮৩। সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখি কেবিনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুধসাদা বরফের রাজ্য। আমাদের জাহাজ স্থির ; সমুদ্রের বরফের ওপরেই নোঙর করা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে নামতে নামতেই অশোক আর লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। ওরাও চলেছে আন্টার্কটিকা মহাদেশে পা রাখার জন্য। স্থানীয় সময় ভোর আড়াইটেতে ফিনপোলারিস নোঙর করেছে সামুদ্রিক বরফে। কাল রাত প্রায় একটা পর্যন্ত আমরা জেগে বসেছিলাম। তারপর রাত্রে শুয়ে শুয়েও শুনেছি জাহাজের বরফ ভেঙে চলার প্রবল প্রচেষ্টা। ঘটাং ঘটাং করে জাহাজের বরফের ধাক্কা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল, অনেকটা খুব বড়ো বড়ো পাথর-ঢাকা রাস্তায় জিপে করে যেতে অবস্থা হয় সেরকম আর কি! এখানেই সামুদ্রিক বরফ তিন মিটার পুরু। ফিনপোলারিস তাই আর এগোতে না পেরে এখানে নোঙর করেছে। মূল বরফ-ভূমি বা হিমসোপান আরও তিন কিলোমিটার দূরে।

আন্টার্কটিকা = কুমেরু অঞ্চল। স্কট, আমুন্ডসেন, শ্যাকলটন--- এরা ছিলেন কুমেরু অভিযাত্রী।
ফিনপোলারিস = এই অভিযানের জাহাজের নাম।

হিমসোপান = বরফের স্তর।

23.3.2 (2)

নীচে তখন অনেকেই নেমে গেছে। চারিপাশে ঝকঝকে করছে সূর্যের আলোয়। তাপমাত্রা শূন্যের সামান্য ওপরে, হাওয়া নেই বললেই চলে। যেদিকে দু চোখ যায় কেবল সাদা বরফের বিস্তার। সামুদ্রিক বরফের লেভেল থেকে হিমসোপানের উচ্চতা প্রায় পাঁচ-ছ মিটার। জায়গায় জায়গায় হিমসোপানের কিছু অংশ সমুদ্রের বরফের ওপর ভেঙে পড়েছে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কৌতূহলী অ্যাভেলি পেঙ্গুইনের দল। কেউ বা গুটি গুটি হেঁটে আসছে টলমল পায়ে কালোকোট পরা ছোটো মোটাসোটা বাবুদের মতো। কেউ কেউ দল বেঁধে বসে নিরীক্ষণ করছে নবাগতদের। যখন হাঁটছে বেশির ভাগই লাইন করে। দেখে মনে হচ্ছিল এরা সবাই রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নাটকের ছক্কা পঞ্জা তিরি দুরি। আমাদের খুব কাছেই চলে আসছে কিন্তু আমরা ধরতে গেলেই পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফের উপর দিয়ে বুকে গ্লাইড করে। আমরা প্রত্যেকেই অভিভূত।

নিরীক্ষণ = মন দিয়ে দেখা।
নবাগত = নতুন এসেছে।
গ্লাইড = বরফের উপর চড়ার খেলা।
অভিভূত = মুগ্ধ।

অবশেষে আন্টার্কটিকা এসে পৌঁছোলাম। আর আমাদের সৌভাগ্য যে প্রথম দিনটাই এমন সুন্দর। ঊষা আর আলো-ঝলমলে। আমাদের কেউ বরফের ওপর গ্লাইড করবার চেষ্টা করছে, কেউ শুয়েই পড়েছে বরফের উপর, কেউ বরফের বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ছে। অনেকেই মনের আনন্দে গান ধরেছে নিজের নিজের ভাষায়। আমরা কজন ঠিক করলাম যে মূল বরফ ভূমিটি ছুঁয়ে আসব। কারণ এখনও তো আমরা সমুদ্রেই আছি, অন্তত হিমসোপান অবধি গেলে সত্যিই সত্যিই আন্টার্কটিকায় পৌঁছোনো হবে।

যেতে যেতে লক্ষ করেছিলাম বরফের ওপর দিয়ে সূক্ষ্ম দাগ চলে গেছে সরলরেখায় বহু দূরে। এগুলি ধীরে ধীরে ফাটল হয়ে যাবে, ক্রমে ক্রমে জমা সমুদ্র এই দাগ ধরেই ভেঙে যাবে। সামুদ্রিক বরফে লবণ বেশি থাকে বলে বেশি ভঙ্গুর হয় আর ভাঙবার সময় একেবারে সরলরেখায় ভাঙে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজাকৃতি টুকরোয়।

আন্টার্কটিকার আবহাওয়া এত বিশুদ্ধ আর বাতাস এত পরিষ্কার যে ওখানে সঠিক দূরত্ব আন্দাজ করা আমাদের মতো শহরবাসীদের পক্ষে অসম্ভব। তিন কিলোমিটার দূরের জিনিস মনে হচ্ছে যেন দুপা বাড়ালেই পৌঁছে যাব। পরেও দেখেছি দিনে বহু দূরের জিনিস এত স্পষ্ট দেখা যেত যে দূরত্ব সবসময়ই কম মনে হত। আমরা বেশ অনেক দূর হাঁটার পরও দেখছি যেন বরফের পাড় একই দূরত্বে রয়ে গেছে। আন্টার্কটিকার নিয়ম অনুযায়ী কখনও কোথাও একা যাওয়া বারণ, অদরকারে কোথাও যাওয়া যত সম্ভব কম করা এবং সবসময়

গন্তব্যস্থল জানিয়ে যাওয়া।

বিকালের ডিউটি শেষ হল রাত বারোটায়। তখনও আকাশে সূর্য ঝকঝক করছে। তবে দিনের বারোটার সূর্যের চেয়ে সামান্য একটু কম তার তেজ মনে হল। আন্টার্কটিকাতে সূর্য আমাদের এখানকার মতো পূর্ব থেকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায় না বা আকাশে মাথার ওপরও দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে সর্বদাই দিগন্তের ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘোরে এবং কখনোই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ওপর ওঠে না। মেরুপ্রদেশের সূর্যরশ্মি সেজন্য সর্বদাই তেরছা হয়ে পড়ে। একেবারে দক্ষিণ মেরু বা উত্তর মেরুতে ছয়মাস দিন, ছয়মাস রাত্রি। দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর অবস্থান হল ৭০° ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১২° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এখানে একুশে ডিসেম্বর সূর্য একেবারে এক উচ্চতায় দিগন্তে চক্রাকারে ঘোরে, দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না। তারপর থেকেই রাত বারোটায় ঠিক দক্ষিণ দিক বরাবর সূর্য একটু করে নামে। তারপর দিগন্ত ধরে পরিক্রমা করতে করতে দুপুর বারোটাতে ঠিক উত্তরে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছায়। অর্থাৎ সূর্য কিন্তু সবসময় আকাশে, তবে চক্রাকারে ঘোরবার সময় দুপুর বারোটা অবধি ধীরে ধীরে উঠতে থাকে এবং সে সময় উত্তর দিকে পৌঁছোনোর পর আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে ; রাত বারোটায় দক্ষিণ দিকে সর্বনিম্ন স্থানে নামার পর আবার ধীরে ধীরে উঠতে থাকে।

চব্বিশে জানুয়ারি সূর্য সর্বদাই আকাশে থাকবে এবং পঁচিশে জানুয়ারি এখানে প্রথম সূর্য অস্ত যাবে। যদিও সেদিন পুরোপুরি অস্ত যায় না। সূর্যদেব সেদিন ঠিক দক্ষিণ বরাবর একটুখানি ঢুকেই আবার উদয় হবেন। পঁচিশে জানুয়ারির পর থেকে আস্তে আস্তে একটু করে বেশি সময়ের জন্য অস্ত যাবে—মানে রাত্রির পরিধি রোজই একটু করে বাড়তে থাকবে। অবশ্য তখন রাত্রি না বলে গোধূলি বলাই ভালো। ধীরে ধীরে রাত্রির সময় বাড়তে বাড়তে বিশে মার্চ এই জায়গায় সমান দিন আর রাত হবে। তারপর থেকে দিনের চেয়ে রাতই বেশি বড়ো হবে এবং সূর্য ক্রমশ কম সময়ের জন্য আকাশে থাকবে। চব্বিশে মে সূর্যদেব উত্তর সীমান্তে একটু উঁকি দিয়েই অস্ত যাবেন বেশ কয়েক মাসের জন্য। পঁচিশে মে থেকে আঠারোই জুলাই পর্যন্ত চলবে একটানা দীর্ঘ রাত্রি। তখন আন্টার্কটিকায় ঘোর শীতকাল। শীতের শেষে উনিশে জুলাই সূর্য প্রথম উদয় হবে উত্তর আকাশে। দিগন্ত থেকে একটুখানির জন্য উঁকি দেওয়া তারপর থেকে দিনের পরিধি রোজই বাড়তে থাকবে একটু একটু করে। তেইশে সেপ্টেম্বর এখানে দিন আর রাত সমান হবে আর তারপর থেকেই রাতের চেয়ে দিনের সময় বেশি হতে থাকবে। এইভাবে দিন বাড়তে বাড়তে আঠারোই নভেম্বর সূর্য দক্ষিণাকাশে গিয়ে আর অস্ত যাবে না ; চব্বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত চক্রাকারে আকাশে ঘুরতে থাকবে সদাসর্বদা।

অনেকেরই আন্টার্কটিকাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় সর্বদা দিনের আলো থাকে বলে। আমার বিশেষ কিছু অসুবিধে হয়নি। ছুটির দিনে কলকাতাতে তো দিনে দুপুরে দিব্যি ঘুমাই, তখন তো কোনো অসুবিধা হয় না। আর যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ দিনের আলো, কেবিনে ঢুকে ব্লাইন্ড টেনে দিলে বা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে গেলে তো আলোর সমস্যা থাকে না। তখন ঘুমের বাধা কোথায়? তবুও কয়েকজনের "Big eye" বা অনিদ্রা রোগ হয়েছিল প্রথম কয়েকদিন। তবে কিছুদিন পরেই আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

23.3.3 (3)

উনত্রিশ তারিখ সকাল থেকেই আমি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলবার কাজে লেগে গেলাম। আমাদের দলের ডিউটি শুধু বেলা বারোটা থেকে, তাই সকালে বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায়। গত দুদিন ধরে রোজই ঘুমোতে ঘুমোতে তিনটে হয়ে যাচ্ছে। রাত বারোটায় ডিউটি শেষ হবার পর আমরা কজন বরফে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটাই স্কি করার চেষ্টায়। বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়েও কারও উৎসাহ কমে না। তাছাড়া সেই সময়টা আমরা দু-চারজন ছাড়া আর সবাই ঘুমোতে চলে যায় বলে নির্জনতাটা আরও উপভোগ করা যায়। আকাশে সূর্য

শব্দার্থ ও টীকা

গন্তব্য স্থল = যাবার জায়গা।

দিগন্ত = আকাশ ও পৃথিবী যেখানে মিলেছে।

গোধূলি = সূর্যাস্ত কাল।

পরিক্রমা = চারিদিকে ঘোরা।

সবসময় থাকলে এমনিতেই ভালো লাগে, তার ওপর সূর্যের অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যেন বরফ, সমুদ্র সব কিছুরই রং পালটে যেত। যে সমুদ্রকে দুপুর বেলা মনে হয় ঘোর নীল ; রাতে তাই যেন দেখায় হালকা প্যাস্টেল রঙে আঁকা নীল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের রংও যেন পালটায়, সাদার যে কত রকম শেড হয় তা বোঝা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

শেড = রঙের মাত্রা।

23.3.4 (4)

হেলিকপ্টার উড়ল আকাশে তারপর আবার নীচে নেমে এল আমাদের দিকে নেটের ওপর, ম্যাথুজ আর মন্ডল হুকের সঙ্গে মাল বেঁধে দিল। নেটে ছিল একটি তাঁবু, বেশ কয়েকটি গ্যালভানাইজড আয়রণ শিট—যা বাড়ির ভেতর বরফের মেঝের উপর পেতে দেওয়া হবে। এছাড়া ছিল দুটো বড়ো প্যাকিং বাক্স যাতে নানারকম যন্ত্রপাতি—যাকে বলে মেশিন টুলস তাই রয়েছে। আমি ছবি তুলবার জন্য আরও পিছিয়ে গেলাম। দূরে দেখছি চেতক ফিরে আসছে বেস ক্যাম্প থেকে মাল নামিয়ে, প্রতাপ উড়ে গেলেই ও এসে নামবে। আমি দুটি হেলিকপ্টারকে নিয়ে এক সঙ্গে ছবি তোলা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রতাপ আবার ওপরে উঠল এবারে নেটসুদ্ধ। দেখলাম মাল শুদ্ধ নেটটি ছোটো ডেক থেকে বড়ো ডেকের ওপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে চলল। ওপরে তাকিয়ে দেখি হেলিকপ্টার একদিকে কাত হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড কড় কড় শব্দ—হেলিকপ্টারের ওপরের পাখার সঙ্গে ওপাশের ক্রেনের দড়ির ঘর্ষণের শব্দ। ধাতুর দড়িটা ছিঁড়ে গেল আর প্রতাপ টাল খেয়ে জাহাজের ধার ঘেঁসে জলে গিয়ে পড়ে উলটে গেল ; পড়বার সময় তার পাখার ধাক্কায় ডেকের রেলিংও বেশ কিছুটা কেটে গেল। এতসব লিখতে যা সময় লাগল ঘটনাটা ঘটতে বোধ হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও লাগেনি। চোখের নিমেষে সবকিছু ঘটে গেল। আমরা ছুটে গিয়ে দেখলাম প্রতাপ উলটে আছে জলের ওপর আর পেটের দিকের একটি ছোটো জানলা ভেঙে বেরোবার চেষ্টা করছে কেউ কেউ।

ম্যাথুন, মণ্ডল = এঁরা এই অভিযানের অভিযাত্রী।
প্রতাপ, চেতক = হেলিকপ্টারের নাম।
নিমেষে = পলকে।
রেসকিউ বোট = উদ্ধারকারী নৌকা।
ঘোর নীল = গাঢ় নীল।

প্রথমে বেরিয়ে এল রায়, তারপর একে একে অন্যরা বেরোতে লাগল। ডক্টর ব্যানার্জি এবং আরও কজন রায়কে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেলেন হসপিটাল রুমে। অন্য ডাক্তার মেজর বিক্রম সিং, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার আমসি ও একজন নাবিক নৌকোয় করে গেলেন উদ্ধারের জন্য। চেতক গিয়ে দ্বিতীয় জনকে তুলে আনল। মাধোককে নিয়ে উড়ে আসবার সময় মাধোক প্রায় চল্লিশ ফিট উচ্চতা থেকে আবার পড়ে গেলেন জলে। ঠান্ডায় অসাড় হাতে হয়তো বেল্টটি ঠিকভাবে লাগাতে পারেননি। আমরা ডেক থেকে রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছি মাধোক জলে পড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টায় দু-একবার হাত পা নাড়লেন তার পরই সম্পূর্ণ দেহটি উলটে গেল ; জলের তাপমাত্রা তখন শূন্যের নীচে ১.৮$^{\circ}$ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ঠান্ডায় মানুষ পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি বাঁচে না। ওদিকে প্রতাপ তখন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে, অন্যরাও জলে। আমরা নিরুপায়ভাবে দেখছি আমাদের থেকে কতটুকুই বা দূরে অথচ কিছুই করতে পারছি না। রেসকিউ বোট যেতে মনে হচ্ছে যেন কত দেরি করছে। শেষ পর্যন্ত নৌকো গিয়ে পৌঁছোলো দুর্ঘটনা- স্থলে। একে একে ট্যান্ডন, যাদব গুপ্ত এবং মাধোককে জল থেকে তোলা হল। মাধোকের আর তখন জ্ঞান নেই এবং নাড়িও প্রায় নেই বললেই চলে। ডাক্তার বিক্রম সিং মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে ওর শ্বাস ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

23.3.5 (5)

ওরা ঘুরে বরফের পাড়ে এসে পৌঁছাল। আমরা কজন যত পারি কম্বল নিয়ে নীচে দৌড়োলাম। ট্যান্ডন আর গুপ্তা যদিও শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছেন তবে নিজে নিজে হেঁটে যেতে পারলেন, যাদবের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর মাধোকের তো জ্ঞানই নেই। এদের দুজনকেই স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল। জাহাজের সিঁড়িটি এত সংকীর্ণ যে মাধোককে তুলতেই বেশ সময় লেগে গেল তার ওপর ওকে অক্সিজেন দিতে দিতে

নেওয়া হচ্ছিল। এরপর যাদবকে তুলতে হিমসিম খেয়ে গেলুম আমরা। যাদবের স্ট্রেচার বহন করেছিলাম আমি, অজিতকুমার, মন্ডল আর ম্যাথুজ। যাদব বেশ ভারী চেহারার মানুষ, জাহাজে ওঠার সরু সিঁড়ি দিয়ে ওকে টেনে তুলতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল ; সিঁড়িতে দুজন পাশাপাশি দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। আবার শুধু দুজনে মিলে স্ট্রেচার কিছুতেই তোলা যাচ্ছিল না। আমি আর অজিত নীচে থেকে ঠেলছিলাম স্ট্রেচার উপরের দিকে আর উপর থেকে একজন চেষ্টা করছিল টেনে তোলার। এমন সময় .... ওপর থেকে চেঁচিয়ে আমাদের সরে যেতে বলল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানকার বরফের পাড় ভেঙে পড়ছে। ভাগ্যিস ও সাবধান করে দিয়েছিল, তা না হলে আমরাও পড়তাম ঠান্ডা জলে ভাঙা বরফের সঙ্গে সঙ্গে। এমন সময় কারও একজনের মাথায় এল যে সিঁড়িটাকেই পুরো উপরে নেওয়া। এতক্ষণে যে কেন কারও মাথায় এটা আসেনি সেটাই আশ্চর্যের।

শব্দার্থ ও টীকা

ওদের পাঁচজনকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল রুমে চিকিৎসা করা হল। রায়ের বিশেষ কিছুই হয়নি, শুধু জানলা ভেঙে বেরোবার সময় মুখে ও হাতে আঘাত লেগেছে। ট্যান্ডন, যাদব আর গুপ্তকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুমোতে দেওয়া হল। শুধু মাধোকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। হাইপোথারমিয়া ওর ভালোরকমই হয়েছে। ঘণ্টা তিনেক বাদে ডাক্তার জানাল যে প্রাণের আশঙ্কা নেই তবে গুরুতর চোট পেয়েছে মেরুদণ্ডতে, সেটাতে কী হবে বলা যাচ্ছে না।

এত বড়ো দুর্ঘটনাতে কিন্তু মনোবল কারও ভাঙেনি। মাধোকের প্রাণের আশঙ্কা কেটে যাওয়াতে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং ঘণ্টা তিনেক পর থেকেই আবার রুটিনমতো কাজ শুরু করে দেওয়া হল—কাজ বন্ধ করে দিলেই বরঞ্চ মনোবল কমে যেত। আমাদের ভাগ্য অবশ্য খুবই ভালো যে বেশি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেনি। হেলিকপ্টারটি যদি জলে না পড়ে অন্য পাশের বরফের পাড়ে ভেঙে পড়ত তবে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জনেরই নিঃসন্দেহে জীবন শেষ হত।

মাধোক ছাড়া প্রত্যেকের অবস্থা পরের দিন থেকেই ভালো। মাধোকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে ধীরে ধীরে। ওর মেরুদণ্ডের চোটের গুরুত্ব এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তাররা ওকে কোনোরকম নড়াচড়া করতে দিচ্ছেন না এবং তিনজন ডাক্তার সমানে পালা করে ওর সঙ্গে আছেন। ডাক্তাররা আমাদের পরদিন থেকেই বলেছেন ওর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে। সেটা ওর পক্ষে ভালোই হবে। আমি পরদিন দুপুরের খাবার এবং কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে গেলাম হসপিটাল কেবিনে। মাধোককে দেখে খুব ভালো লাগল—সেদিন অজ্ঞান অবস্থায় ওর নীল হয়ে যাওয়া মুখ দেখে সত্যিই ভয় লেগে গিয়েছিল। এখনও বেশ ক্লান্ত চেহারা তবে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ওঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ভঙ্গিতে কথা বলতে। আমি খাবার সাজিয়ে এবং ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে যাওয়াতে খুব খুশি। বললেন যে যদিও জীবনে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন কোনোবারই বিশ্বাস করতে পারেননি যে সত্যিই মরবেন এবং প্রত্যেকবারই বেঁচে গেছেন বলতে গেলে অলৌকিক ভাবেই। এবারেই যখন হেলিকপ্টারের ব্লেড ক্রেনের দড়িতে লেগে গোত্তা খেয়ে পড়ল হিমশীতল জলে, কো-পাইলট টান্ডনকে তখন শেষ বিদায় জানিয়ে বলেছিলেন— This is the end। আবার চেতকের দড়ি থেকে পড়ে যাবার সময়তো দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কোলেই ফিরে গিয়েছিলেন অথচ তার পরেও চোখ মেলে আলো দেখলেন, জীবনে ফিরে এলেন।

ম্যাগাজিন = মাসিক পত্রিকা

স্বভাবসিদ্ধ = স্বাভাবিক।

অলৌকিক = দৈব।

কো-পাইলট = সহকারী বিমান চালক

23.3.6 (6)

একত্রিশে ডিসেম্বর আমরা ঠিক করলাম যে বেশ ঘটা করে নতুন বছর উদযাপন করা হবে। এর প্রধান কারণ ডাক্তাররা মনে করেছেন যে মাধোকের মেরুদণ্ডের আঘাত খুব গুরুতর নয়। সামান্য অসুবিধা থাকলেও

ঘটা = আড়ম্বর, জাঁকজমক।
উদ্‌যাপন = পালন।

শব্দার্থ ও টীকা

ফিনিশ = ফিনল্যান্ডের অধিবাসী।

মনমরাভাব = নিরুৎসাহ।

উদ্দীপনা = প্রেরণা, উৎসাহ।

বেসক্যাম্প = যেখান থেকে অভিযান এগিয়ে যায়।

ভূমিষ্ঠ = জন্মগ্রহণ।

বিকীর্ণ = বিচ্ছুরিত, ছড়ানো।

অভেদ্য = ভেদ করা যায় না।

দৃশ্যমানতা = দেখা যাওয়া।

ব্লিজার্ড = তুষার ঝঞ্ঝা যা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে।

তাণ্ডব = তোলপাড়।

হাঁটা-চলার বা অন্যান্য কোনরকম ক্ষতি দেখা যাবে না। সবাই এই খবরে খুশি। এই দুর্ঘটনার পর ভারতীয়দের তো বটেই, ফিনিশদের মধ্যেও একটু মনমরাভাব এসেছিল। মাধোকের আরোগ্যের খবরে সবাই উৎফুল্ল। কাজের রুটিন কোনো ব্যাহত না করেই সেদিন নতুন বছর উদযাপন করলাম আমরা। কুকরা সেদিন বেশ ভালো ভালো রান্না করল, কে বলবে রোজকার ওই একঘেয়ে রান্না এরাই করে। কাওকো বেশ কিছু ভালো স্ন্যাক্স তৈরি করল। ডক্টর গুপ্তা দু ক্রেট বিয়ার উপহার দিলেন, জাহাজের ক্যাপটেন উপহার দিলেন শ্যাম্পেন। মাধোকের হসপিটাল কেবিনে সবাই গিয়ে ওকে শুভ নববর্ষ জানাতে লাগল। সব মিলিয়ে বেশ নতুন উদ্দীপনায় নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হল। বেস ক্যাম্পে ওরাও বরফের মধ্যে ঝকঝকে আলোয় নববর্ষ উদ্যাপন করল—ওদের উৎসব পালনের আরও একটি কারণ আছে। মেজর নায়ারের বাড়ি থেকে খবর এসেছে তাঁর কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবার।

তেসরা জানুয়ারি প্রথম বরফের ঝড় হল। তুষার ঝড়ের বাসভূমি আন্টার্কটিকাতে সেই আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। সেদিন সকালে বেলা ন-টায় বেস ক্যাম্পে একপ্রস্থ মালপত্র নামিয়ে এসে নটরাজন বলল যে বেস ক্যাম্প হোয়াইট আউট হয়ে গিয়েছে প্রায়—ওর নামতে খুবই অসুবিধে হয়েছিল। হোয়াইট আউট হচ্ছে ব্ল্যাক আউটের ঠিক উলটোটা। মেঘলা দিনে সূর্যের রশ্মি এমনভাবে বিকীর্ণ হতে থাকে যার ফলে কোনো ছায়া পড়ে না, আবার দিগন্ত ও বরফের তফাত বোঝা যায় না। ছায়া নেই বলে সাদা বরফে উচ্চতারও কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। চার দিকই উজ্জ্বল অভেদ্য সাদা। পাইলটদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক এই অবস্থা। এখন আমাদের একটিই বড়ো প্রতাপ। হেলিকপ্টার রয়েছে এবং নটরাজন ও অমিতকুমারকে সবকটা ফ্লাইটেই চালাতে হচ্ছে, মাধোক ও ট্যান্ডনের অনুপস্থিতিতে। অভিযানের মালপত্র বহনের প্রধান বাহন হচ্ছে প্রতাপ-হেলিকপ্টার। সুতরাং বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নটরাজন ফেরার পর হেলিকপ্টারটি বেঁধে ঢাকা দিয়ে রাখা হল।

ধীরে ধীরে বেড়ে চলল ঝোড়ো হাওয়া। সঙ্গে উড়ছে বরফের কণা যার ফলে দৃশ্যমানতা খুবই কমে আসছে। কুমেরুতে ব্লিজার্ডের সময় তুষারপাত কমই হয়। ওখানকার তাপমাত্রা এত কম যে সেই বাতাস জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না বলে খুবই শুষ্ক—কেবল তীরবর্তী অঞ্চলেই কিছু তুষারপাত হয়। ঝড়ের সময় হাওয়ার ঝাপটায় বরফের ওপরের আস্তরণের তুষার কণা উড়তে থাকে—যাকে বলে ড্রিফট স্নো। হাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে তুষার কণা ওড়ে এবং গতির মুখে বাধা পেলে তার গায়ে গিয়ে জমা হয়।

সেদিন সারাদিনই চলল ঝড়ের তান্ডব। কাজকর্ম সবই বন্ধ। বেস ক্যাম্পে খবর নেওয়া হচ্ছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ওরা সবাই তাঁবু-বন্দি, কাজকর্ম সবই বন্ধ। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে ওদের ভিত খোঁড়ার কাজ সব শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এমন ঝড়ের তান্ডবে সব খোঁড়া জায়গা আবার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ফলে নতুন করে আবার খুঁড়তে হবে, লেভেলিং করতে হবে, মানে আরও একটি বাড়তি দিন নষ্ট।

(সংক্ষেপিত)

23.4 বিষয়ের রূপরেখা

23.4.1 আন্টার্কটিকা! .... দূরে।

বক্তব্যসার:

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত আন্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশে পৌঁছলেন। ভোরে ঘুম ভেঙে জানলা দিয়ে সেই ধবধবে সাদা বরফের মহাদেশ দেখলেন। রাতে শুয়ে শুয়ে লেখিকা শুনেছেন তাঁদের জাহাজটির বরফ ভেঙে চলার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ। তাঁদের জাহাজ ফিনপোলারিস বরফের ওপরই নোঙর করেছে। সেখান থেকে হিমসোপান বা মূল বরফভূমি আরও তিন কিলোমিটার দূরে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কুমেরু বা আন্টার্কটিকা আবিষ্কারের দুঃসাহসিক অভিযান চলছে। সাফল্যের জন্য বহু অভিযাত্রী মরণপণ লড়াই করেছেন এবং অনেকেই এই কুমেরু মহাদেশে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। এই মহাদেশে প্রথম পা রাখেন ও নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করেন ওই দেশের প্রখ্যাত অভিযাত্রী রোনাল্ড আমুন্ডসেন। রবার্ট ফালকন স্কট এই মহাদেশে সফল অভিযান করলেও দ্বিতীয়বারে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা প্রচন্ড শীত, ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে ওইখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্যাকলটনও এই মহাদেশে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৮২ সাল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কুমেরু অভিযানে সফল হয়ে বারে বারে নানা গবেষণাকর্মে ওই মহাদেশে যাচ্ছেন।

তাঁদেরই পথ ধরে বাঙালি মহিলা অভিযাত্রী সুদীপ্তা সেনগুপ্ত কুমেরু অভিযানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা সজীব ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবন্ধ করেছেন। পাঠ্যাংশটি তাঁর অভিজ্ঞতারই বাণীরূপ।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রাঞ্জল = সহজবোধ্য।
বাণীরূপ = বর্ণনা।

মন্তব্য:

বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লেখিকা এক অপরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন। কত মানুষ এই কুমেরু মহাদেশ অভিযানে ব্রতী ছিলেন! কত অভিযাত্রী তুষার ঝড়ে, প্রবল ঠান্ডায়, ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে এখানেই প্রয়াত হয়েছেন। এখানকার বরফের ওপর দাঁড়িয়ে লেখিকার হৃদয় স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে ; দেহেমনে সেই বীরেদের উপস্থিতি অনুভব করছেন। তাই আন্টার্কটিকা শব্দটি লেখিকা একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন। লেখিকা স্কট-আমুন্ডসেন- শ্যাকলটনের স্মৃতি বিজড়িত এই আন্টার্কটিকায় পৌঁছে শিহরণ অনুভব করছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.1

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) আন্টার্কটিকার অপর নাম—

(অ) সুমেরু (আ) কুমেরু (ই) ওয়েডেল সাগর

(খ) কোন অভিযাত্রী প্রথম আন্টার্কটিকায় পৌঁছান?

(অ) স্কট (আ) শ্যাকলটন (ই) আমুন্ডসেন

(গ) আন্টার্কটিকা কিসে ঢাকা?

(অ) বরফে (আ) কুয়াশায় (ই) সবুজে

2. ঠিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান ঃ

(ক) আন্টার্কটিকায় মানুষের বসবাস ____________।

(অ) অস্থায়ী (আ) স্থায়ী

(খ) আন্টার্কটিকার তাপমাত্রা কদাচিৎ ____________ ডিগ্রির নীচে নামে।

(অ) ১° (আ) ০° (ই) – ১°

(গ) আন্টার্কটিকায় কী ধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়?

(অ) সব ধরণের (আ) প্রবল ঠান্ডা সহ্য করতে পারে এমন

3. 'আন্টার্কটিকা' শব্দটি লেখিকা একাধিকবার উচ্চারণ করেছেন কেন?

23.4.2 নীচে তখন .... গন্তব্য স্থল জানিয়ে যাওয়া।

বক্তব্যসার:

হিমসোপান থেকে তিন কি.মি. দূরে জাহাজ নোঙর করল। সবাই জাহাজ থেকে নেমে পড়ল ঝকঝকে সূর্যের আলোয়। তাপমাত্রা 0^{o}-র সামান্য ওপরে ; বাতাস নেই। চারিদিকে বরফ, আর বরফ। সামুদ্রিক বরফস্তর থেকে হিমসোপান প্রায় ৫/৬ মিঃ উঁচু। মাঝে মাঝে হিমসোপানের কিছু অংশের বরফ সামুদ্রিক বরফের ওপর ভেঙে পড়েছে। ওখানে ছড়িয়ে থাকা অ্যাডেলি পেঙ্গুইনের দল নবাগতদের দিকে কৌতূহলে চেয়ে থাকছে। সাদা-কালো রঙের পেঙ্গুইনগুলো টলতে টলতে গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে। লেখিকাদের কাছে এলেও এদের ধরা যায় না ; হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যায়। বরফের ওপর বুক রেখে মসৃণভাবে চলে যায়।

লেখিকা তাঁর সহযাত্রীসহ এসে পৌঁছলেন আসল আন্টার্কটিকায়। আলো-ঝলমলে সকাল। মনের আনন্দে কেউ বরফের বল বানিয়ে একে অপরের দিকে ছুঁড়ছে, কেউ বরফের ওপর শুয়ে পড়েছে। কেউ বা মনের আনন্দে গান ধরেছে।

চলার পথে বরফের ওপর দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত সরু দাগ দেখা গেল। ধীরে ধীরে দাগগুলো ফাটল হয়ে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ আকার নিয়ে ভেঙে পড়ে।

কুমেরুতে আবহাওয়া সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত। তাই কোনো শহরবাসীর পক্ষে এখানকার দূরত্ব অনুমান করা অসম্ভব। দূরের সব জিনিস খুব কাছে বলে অনুমিত হয়। এখানকার নিয়ম হল কোথাও একা যাওয়া চলবে না আর গেলেও গন্তব্যস্থল জানিয়ে যেতে হবে।

মন্তব্য:

সাদা কোটপরা পেঙ্গুইনদের টলমল পায়ে গুটি গুটি চলা দেখে লেখিকার রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের কথা মনে হয়েছে। তাসের দেশের তিরি দুরিরা কল্পলোকের মানুষ। এই মাটির পৃথিবীতে তারা যেন ঠিক খাপ খায় না। কুমেরুর পেঙ্গুইনদেরও ঠিক কল্পলোকের জীব বলে মনে হয়। আমাদের চোখে তাদের উপস্থিতিটা খুবই মজাদার।

আমরা শহরবাসী। দূষণের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দূষণমুক্ত এলাকায় সঠিক কাজ করতে পারে না। তাই কুমেরুর দূষণ মুক্ত পরিবেশে আমাদের চোখ সঠিক দূরত্বের অনুমান করতে না পেরে ঠকে যায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) জাহাজ যেখানে নোঙর করল সেখান থেকে হিমসোপানের দূরত্ব কত?

(অ) ১ কিমি. (আ) ৩ কি.মি. (ই) ৫ কি.মি.

(খ) সামুদ্রিক বরফ-লেভেল থেকে কার উচ্চতা পাঁচ-ছ মিটার?

(অ) জাহাজের (আ) হিমসোপানের

(গ) পেঙ্গুইনগুলো কাদের নিরীক্ষণ করছিল?
(অ) সীলদের (আ) নবাগতদের

2. আন্টার্কটিকা পৌঁছানোর সুন্দর দিনটা সকলে কেমনভাবে উপভোগ করছিল তার দুটি উদাহরণ দিন।

3. শহরবাসীরা কেন কুমেরুতে ঠিক দূরত্ব অনুমান করতে পারে না তা দু-তিনটি বাক্যে লিখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

23.4.3 বিকেলের ডিউটি শেষ হল .... ঘুরতে থাকবে সদাসর্বদা

বক্তব্যসার:

বিকেলের ডিউটি যখন শেষ হল তখন রাত বারোটা। অথচ আকাশে তখন ঝকঝকে সূর্য। রাত বারোটার সূর্যের তেজ অবশ্য বেলা ১২টার সূর্য থেকে একটু কম। এখানে সূর্যের গতিবিধি লেখিকার দেশের মত নয়। গ্রীষ্মকালে এখানে দিগন্তের ওপর দিয়ে সূর্য চক্রাকারে ঘোরে এবং ৪৫^{o} ডিগ্রির ওপরে ওঠে না। ফলে মেরুপ্রদেশে সূর্যের রশ্মি বাঁকাভাবে পড়ে। দুই মেরুতেই বছরে ছয় মাস দিন ; ছয় মাস রাত্রি। এখানে একুশে ডিসেম্বর সূর্য এক উচ্চতায় দিগন্তে চক্রাকারে ঘোরে ; দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর হেরফের হয় না। এখানে সূর্য সবসময় আকাশে। চক্রাকারে ঘোরার সময় দুপুর বারোটা অবধি একটু একটু করে ওঠে এবং সেসময় উত্তর দিকে পৌঁছানোর পর আবার ধীরে ধীরে নামে। রাত বারোটায় দক্ষিণদিকে সর্বনিম্ন স্থানে নামার পর আবার তার ওঠার পর্ব শুরু হয়।

২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত সূর্য এখানে সবসময় আকাশে এবং ২৫শে জানুয়ারি এখানে প্রথম সূর্য অস্ত যাবে। তবে একেবারে অস্ত যায় না। ২৫শে জানুয়ারির পর রাতের ব্যাপ্তি রোজই একটু একটু করে বাড়ে। অবশ্য এ সময়ের রাতকে গোধূলি বলাই ভালো। ২০শে মার্চ এখানে দিন ও রাত সমান। এরপর থেকে রাত বাড়বে এবং সূর্য কম সময়ের জন্য আকাশে থাকবে। ২৪শে মে সূর্য একবার উঁকি দিয়েই বেশ কয়েক মাস ধরে আর উঠবে না। ২৫শে মে থেকে ১৮ই জুলাই পর্যন্ত চলবে একটানা রাত। তখন আন্টার্কটিকায় ঘোর শীতকাল। শীতের শেষে ১৯শে জুলাই সূর্য প্রথম দেখা দেবে উত্তরের আকাশে। দিগন্ত থেকে একটুখানির জন্য উঁকি দেবে। তারপর থেকে বাড়তে থাকবে দিনের পরিধি। ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাত সমান হবে। আর তারপর থেকেই রাতের চেয়ে দিনের সময় বেশি হতে থাকবে। এইভাবে দিন বাড়তে বাড়তে ১৮ই নভেম্বর সূর্য দক্ষিণাকাশে গিয়ে আর অস্ত যাবে না। ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত চক্রাকারে আকাশে ঘুরতে থাকবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.3

1. হ্যাঁ বা না লিখে উত্তর দিন ঃ

(ক) কুমেরুতে রাত বারোটার আকাশে সূর্য থাকে কি?

(খ) ২১শে ডিসেম্বর দিনে বা রাতে সূর্যের আলোর কি হেরফের হয়?

(গ) ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাতের পরিধি কি সমান হয়?

(ঘ) ২৫শে জানুয়ারির পর রাতের ব্যাপ্তি কি একটু একটু করে কমে?

2. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কবে থেকে রাতের পরিধি একটু একটু করে বাড়ে?

(অ) ২৫শে মে (আ) ২৫শে জানুয়ারি (ই) ১৯শে জুলাই।

(খ) প্রথম সূর্য অস্ত যায় কবে?

(অ) ২৫শে জানুয়ারি (আ) ২৪শে মে (ই) ২৪শে জানুয়ারি

(গ) কোন্ দিনের পর রাত্রিকে গোধূলি বলাই ভালো?

(অ) ২৪শে মের পর থেকে

(আ) ২৫শে জানুয়ারির পর থেকে

(ই) ২৫শে মের পর থেকে।

23.4.4 অনেকেরই আন্টার্কটিকাতে .... শেড হয় তা বোঝা যায়।

বক্তব্যসার:

কুমেরুতে সারাদিন দিনের আলো। তাতে অনভ্যস্তদের কাছে ঘুমের কিছু অসুবিধে হয়। তবে লেখিকার কলকাতাতে দুপুরে ঘুমের অভ্যাস আছে বলে অসুবিধে হয়নি। কেবিনে পর্দা টেনে দিলে কিংবা স্লিপিং ব্যাগে একেবারে ঢুকে গেলে আলোর অসুবিধা থাকে না। তবে কয়েকজনের অনিদ্রা রোগ হয়েছিল। অবশ্য দু-একদিনেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

লেখিকার দলের বেলা ১২টা থেকে ডিউটি শুরু বলে সকালে তাঁরা সময় পেতেন ক্যামেরায় ছবি তোলার। রাত বারোটায় ডিউটি শেষে লেখিকাদের দল বরফে স্কি করার চেষ্টা করতেন ; বরফে পড়েও যেতেন। অন্যেরা ঘুমোতে যেত বলে লেখিকার দলটি ওখানকার নির্জনতা উপভোগ করতেন। আকাশে সূর্যের অবস্থিতির জন্য বরফ ও সমুদ্রের রঙ্ পালটে যেত। দুপুরে সমুদ্র ঘোর নীল আর রাতে হালকা প্যাস্টেল রঙে আঁকা নীল। সাদা বরফেও নানা শেড দেখা যেত।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.4

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বেছে নিন।

(ক) কুমেরুতে ঘুমের অসুবিধা হবার কারণ হল—

(অ) খালি পেটে থাকা

(আ) অনিদ্রা রোগ হওয়ার জন্য

(ই) সারাদিন দিনের আলো থাকা।

(খ) লেখিকাদের দল কখন স্কি করতেন?

(অ) দিন ১২টার পর

(আ) রাত ১২টার পর

(ই) সকালবেলা।

(গ) বরফ ও সমুদ্রের রঙ্ পরিবর্তনের কারণ—

(অ) আকাশে সূর্যের স্থিতি

(আ) রঙিন আলো নিক্ষেপ

(ই) তুষারপাত।

2. (ক) অন্যদের কুমেরুতে ঘুমের অসুবিধা হলেও লেখিকার কেন অসুবিধা হয়নি তা দুটি বাক্যে উত্তর দিন।

(খ) লেখিকার দল সকালে কেন ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় পেতেন তা একটি বাক্যে লিখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

23.4.5 হেলিকপ্টার উড়ল .... লাগলেন।

বক্তব্যসার:

দুটি হেলিকপ্টারে করে মাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লেখিকা হেলিকপ্টার দুটির ছবি তুলছিলেন। এমন সময় প্রতাপ হেলিকপ্টারটি কড় কড় করে জলের উপর উলটে পড়ল। পেটের দিকে ছোটো জানলা ভেঙে সহযাত্রী ডঃ ব্যানার্জিসহ কয়েকজন বেরিয়ে এসে আহত রায়কে স্ট্রেচারে করে হসপিটাল রুমে নিয়ে গেলেন। নৌকা করে উদ্ধারের জন্য আরও কয়েকজন এলেন। মাধোককে নিয়ে উড়ে আসার সময় ৪০ ফিট উঁচু থেকে তিনি জলে পড়ে গেলেন। সম্ভবত ঠান্ডায় বেল্টটি ঠিকমত লাগানো হয়নি। জলের তাপমাত্রা তখন শূন্যের নীচে ১.৮^{o} ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতাপ জলে ডুবেছে ; অন্যেরাও জলে। শেষ পর্যন্ত রেসকিউ বোট পৌঁছল। আহত মাধোক, ট্যান্ডন ও যাদব গুপ্তকে জল থেকে তোলা হল। মাধোক অজ্ঞান ; নাড়িও তার প্রায় নেই! ডঃ বিক্রম সিং মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মন্তব্য:

দুর্গম কুমেরু অভিযানে প্রতি পদে বিপদ থাকে ও দুর্ঘটনা ঘটে, লেখিকা এরকম এক দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে কুমেরু অভিযানের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে আপনাদের ওয়াকিবহাল করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.5

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) বেসক্যাম্প থেকে মাল নামিয়ে কোন্ হেলিকপ্টার ফিরে আসছিল?

(অ) প্রতাপ (আ) চেতক

(খ) কোথা থেকে প্রতাপের যাত্রীরা নেমে এল?

(অ) দরজা থেকে (আ) ছাদের ওপর থেকে (ই) পেটের কাছের জানলা দিয়ে

ওয়াকিবহাল = অবগত।

2. দু-এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(ক) কত উঁচু থেকে মাধোক পড়ে গিয়েছিলেন?

(খ) যে জলে মাধোক পড়েছিলেন তার তাপমাত্রা কত ছিল?

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) কে মাধোকের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চালাবার চেষ্টা করেছিলেন?

3. ডঃ বিক্রম সিং কীভাবে মাধোককে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন তা একটি বাক্যে উত্তর দিন।

23.4.6 ওরা ঘুরে .... জীবনে ফিরে এলেন।

বক্তব্যসার:

ট্যান্ডন ও গুপ্তা শীতে কাঁপলেও হেঁটে আসতে পারছেন কিন্তু যাদবের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই আর মাধোকের জ্ঞান নেই। যাদবকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে লেখিকাসহ কয়েকজন হিমসিম খেতে লাগলেন। এমন সময় সহযাত্রীদের একজনের মাথায় এল সিঁড়িটাকেই পুরো উপরে তুলে নেওয়ার কথা।

ওদের পাঁচজনকে হসপিটালে নেওয়া হল। তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হল। কিন্তু মাধোকের অবস্থা ভালো নয়। ঠান্ডায় তার দেহের তাপমাত্রা শরীরের প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক নীচে নেমে গেছে। তাছাড়া তার মেরুদন্ডে আঘাত আছে। তবে ডাক্তারের মতে প্রাণ যাওয়ার ভয় নেই।

এত বড়ো ভয়ংকর দুর্ঘটনার পর কারও মনের শক্তি কমেনি। ঘণ্টা তিনেক পরে রুটিনমতো কাজকর্ম শুরু হল। সকলে মনে করেছিলেন যে হেলিকপ্টারটি যদি জলে না পড়ে বরফের ওপর পড়ত তাহলে সকলেই মারা যেতেন।

পরের দিন প্রত্যেকের অবস্থা ভালো। মাধোকের অবস্থারও উন্নতি হয়েছিল তবে তাঁর নড়াচড়া বন্ধ। ডাক্তারের নির্দেশে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা চলল। দুপুরের খাবার ও ম্যাগাজিন নিয়ে লেখিকা হাসপাতালে মাধোককে দেখতে গেলেন। অজ্ঞান মাধোক চোখ মেলে আলো দেখলেন ; জীবনে ফিরলেন।

মন্তব্য:

কুমেরুর মত দুর্গম মহাদেশে অভিযানে প্রতি পদে পদে বিপদ। আর এই বিপদে হতবুদ্ধি হওয়া নয় ও হতাশ হওয়া নয়, বেঁচে থাকার লড়াই করাই একমাত্র পথ। এই রকম অভিযানে মানুষ সব সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দুর্গত ও বিপন্নদের পাশে দাঁড়ায়। এই অভিযানে আপনারা সেই উদার মানবিকতার ছবি দেখলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.6

1. দু-একটি শব্দ দিয়ে উত্তর করুন।

(ক) আহত কারা শীতে ঠকঠক করে কাঁপলেও হেঁটে যাচ্ছিলেন?

(খ) ঘণ্টা তিনেকের পর রুটিনমতো কী শুরু করে দেওয়া হল?

2. (অ) যাদব ও মাধোককে কেন স্ট্রেচারে বহন করা হয়েছিল তা দুটি বাক্যে লিখুন।

(আ) মাধোকে দেখে লেখিকার ভয় হয়েছিল কেন তা একটি বাক্যে উত্তর দিন।

হতবুদ্ধি = কী করবে ঠিক করতে না পারা।
বিপন্ন = বিপদগ্রস্ত।

23.4.7 একত্রিশে ডিসেম্বর আমরা .... একটি বাড়তি দিন নষ্ট।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

৩১শে ডিসেম্বর ঘটা করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হল ডাক্তারের মতে মাধোকের মেরুদণ্ডের চোট তেমন মারাত্মক নয়। তাঁর হাঁটা-চলার অসুবিধা হবে না। সীমিত পরিস্থিতি অনুযায়ী আয়োজন করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা হল। মাধোকের হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে সকলে নববর্ষের শুভকামনা জানালেন। বেস ক্যাম্পের অভিযাত্রীরাও নববর্ষের আনন্দে অংশ নিলেন ঝকঝকে আলোয়। উৎসব-অনুষ্ঠানের মাত্রা বেড়ে গেল যখন সবাই জানলেন মেজর নায়ার সদ্যোজাত এক কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন।

আন্টার্কটিকা তুষার ঝড়ের বাসভূমি। ৩রা জানুয়ারি অভিযাত্রীরা সেই ভয়ংকর ঝড়ের আসল রূপ দেখলেন। খবর এল বেস ক্যাম্প পুরোটাই বরফে ঢেকে হোয়াইট আউট হয়ে গেছে। মেঘলা দিনে সূর্যের কিরণ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ছায়া পড়ে না। দিগন্ত ও বরফের ফারাক বোঝা যায় না। পাইলটরা একে খুবই বিপজ্জনক বলে মনে করেন। ঝড়ের ঝাপটায় বরফের ওপর চাদরের তুষার কণা উড়তে থাকে—একেই বলে ড্রিফট স্নো। ঝড়ের তান্ডব চলল। কাজকর্ম সব বন্ধ বেস ক্যাম্পে। সেখানে যে ভিত খোঁড়া হয়েছিল তাও তুষার কণায় ভর্তি হয়ে গেছে। ফলে দিনটি নষ্ট হয়ে গেল।

পাঠগত প্রশ্ন : 23.7

1. দু-একটি শব্দ প্রয়োগে উত্তর করুন।

(ক) নববর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হয়েছিল?

(খ) নববর্ষ পালনের সিদ্ধান্তের যেকোনো একটি কারণ উল্লেখ করুন।

(গ) আন্টার্কটিকাকে কীসের বাসভূমি বলা হয়?

(ঘ) হোয়াইট আউট কীসের উলটো?

2. (ক) হেলিকপ্টার নামাতে অসুবিধা হচ্ছিল কেন?

(খ) বেস ক্যাম্পে কাজকর্ম বন্ধ কেন?

23.5 আপনি যা শিখলেন

1. দূর ও অজানাকে জানতে।
2. যৌথ জীবনযাপন করতে।
3. মেরু অভিযানের নানা ঘটনা।

23.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. আন্টার্কটিকাতে পৌঁছে লেখিকার চোখে সেখানকার যে রূপ ধরা পড়েছিল তা নিজের কথায় ১০টি বাক্যে লিখুন।
2. আন্টার্কটিকার দূষণমুক্ত আবহাওয়ায় দূরত্ব অনুমানে যে সমস্যা হয় তা ৩/৪টি বাক্যে লিখুন।
3. হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার ও চিকিৎসার জন্য সহযাত্রীদের মধ্যে যে সহযোগিতার চিত্র আছে তা ৮/১০টি বাক্যে লিখুন।
4. ঘটা করে নববর্ষ উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত কী কী কারণে নেওয়া হল সেগুলি ৫টি বাক্যে উল্লেখ করুন।
5. কুমেরুতে লেখিকা যে তুষার ঝড় প্রত্যক্ষ করেছিলেন ৮/১০টি বাক্যে তার বর্ণনা দিন।

23.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

23.1

1. ক — আ
খ — ই
গ — অ

2. ক — আ
খ — আ
গ — আ

3. দুঃসাহসী কুমেরু অভিযাত্রীদের স্মৃতি বিজড়িত মহাদেশে পৌঁছে লেখিকার অপূর্ব অনুভূতি।

23.2

1. ক — আ
খ — আ
গ — আ

2. গান গাওয়া ও বরফের ওপর শুয়ে পড়া।

3. দূষণমুক্ত পরিবেশে দূরের বস্তুকে কাছে লাগে।

23.3

1. ক — হাঁ
খ — না
গ — হাঁ
ঘ — হাঁ

শব্দার্থ ও টীকা

2. ক — আ
খ — অ
গ — আ

23.4

1. ক — ই
খ — আ
গ — আ

2. (ক) কলকাতায় ছুটির দিনে ঘুমোনোর অভ্যাস।

(খ) বেলা ১২টা থেকে ডিউটি শুরু বলে।

23.5

1. ক — আ
খ — ই

2. (ক) ৫০ ফুট
(খ) শূন্যের নীচে ১.৮ ডিগ্রি
(গ) ডঃ বিক্রম সিং।

23.6

1. (ক) ট্যান্ডন ও গুপ্তা
(খ) কাজকর্ম

2. (অ) যাদব হাঁটতে অক্ষম ও মাধোক অজ্ঞান
(আ) মাধোকের নীল চোখ ও অজ্ঞান হওয়ার জন্য।

23.7

1. (ক) ৩১শে ডিসেম্বর
(খ) ডাক্তাররা মনে করেছেন যে মাধোকের মেরুদন্ডের আঘাত গুরুতর নয়—এটাই নববর্ষ পালনের প্রধান কারণ।
(গ) তুষার ঝড়ের বাসভূমি।
(ঘ) মাধোকের হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

2. (ক) মেঘলা দিনে বিকীর্ণ সূর্যের রশ্মি। দিগন্ত ও বরফের তফাত বুঝতে অসুবিধা।
(খ) ঝড়ের তাণ্ডবের জন্য।

লেখক পরিচিতি

লেখিকা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ১৯৪৬ সালের ৮ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। স্ট্রাকচারাল জিওলজিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১৯৮৩ সালে বিজ্ঞানী হিসাবে গবেষণার জন্য কুমেরু অভিযানে যান। তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 'টেরা ইন্‌কগ্‌নিটা' রচনায় অত্যন্ত সাবলীল ও সজীব ভাষায় লিপিবন্ধ করেন।

সমধর্মী রচনা

এই গল্পটির একটি সমধর্মী রচনা হল ঃ **দেবতাত্মা হিমালয়**, লেখক—**প্রবোধচন্দ্র সান্যাল**।

শব্দার্থ ও টীকা

24

নীলকণ্ঠ (নাটিকা)

উৎপল দত্ত

চরিত্র

মহারাজ, শিউনন্দন, চিদানন্দ, অলক, ছেলেরা, সুরেন, অবিনাশ, পোর্টফোলিও, সুদর্শন, নিতাই, সমীর, আরও অনেকে

24.1 প্রস্তাবনা

এই পাঠটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন। এর বক্তব্য নাটকের আকারে উপস্থিত করা হয়েছে। সাধারণ নাটকের মতো এটির অভিনয়ের জন্য কোনো মঞ্চ লাগে না, রঙিন আলোর দরকার নেই, পোশাক সাজসজ্জা লাগে না। এমনকি এখানে কোনো পর্দা নামারও দরকার নেই। পথের উপরই অভিনয় হতে পারে যে কোনো সময়, জাঁকজমক ছাড়াই। নাটকটির চরিত্ররা একেবারে সাধারণ লোক। দর্শকের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। এ-ধরনের নাটককে বলা হয় পথনাটক।

নাটকের বিষয়েও বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে যারা নাটকের মূল চরিত্র তাঁরা দুজনেই সমাজের নীচুতলার লোক। জীবিকায় তাঁরা সাফাইকর্মী।

মেথর ধাঙড় নামে পরিচিত এই সাফাই কর্মীরা সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের কাছে অস্পৃশ্য। এই সমস্যাটাই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। শিউনন্দন এবং মহারাজ, এই দুই সাফাইকর্মী এসেছে গলির ম্যানহোলের ভেতর থেকে ময়লা তুলতে। অল্পবয়সি মহারাজ ম্যানহোলে নেমেই সেখানকার বিষাক্ত গ্যাসে ছটফট করতে থাকে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে নানা পেশার লোকের রীতিমতো ভিড়। সবাই নানা কথায় মেতে ওঠে। হকাররা এই ভিড়ে তাদের জিনিস বিক্রি করে যায়। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না ম্যানহোল থেকে মহারাজকে উদ্ধার করতে। তার কাতর চিৎকারে কেউ বিচলিত নয়। এই সব মানুষের নির্বিকার মনোভাব পাঠককে বিচলিত করবে। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এত রকম মানুষের সমাবেশ করে নাট্যকার গোটা সমাজের চেহারাটাই যেন তুলে ধরেছেন। নীচুতলার প্রতি তথাকথিত উচ্চশ্রেণির উপেক্ষা ও অবহেলার বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একটি নীরব প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে নানা ঘটনায়। এখানেই ‘নীলকণ্ঠ’ নাটকের সার্থকতা। রচনার গুণে নাটকটি পাঠককে টেনে নিয়ে যায় ঘটনার পর ঘটনার দিকে।

শব্দার্থ ও টীকা

24.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনি পারবেন—

- সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কথা জানাতে;
- সাফাইকর্মীদের প্রতি অন্যস্তরের মানুষের অবহেলা ও অস্পৃশ্যতার দৃষ্টান্ত দিতে;
- বিপন্ন মানুষের প্রতি কর্তব্যের অবহেলার দৃষ্টান্ত দিতে;
- তথাকথিত উচ্চস্তরের মানুষের ভেতরের কুশ্রী ছবিটি বর্ণনা করতে;
- অস্পৃশ্যতাবিরোধী, শ্রমিকদের প্রতি উপেক্ষার বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তোলার ভাব জাগিয়ে তুলতে।

24.3 মূল পাঠ

নীলকণ্ঠ

উৎপল দত্ত

24.3.1 (1)

(বিকেল বেলা চারটে নাগাদ মেঘ করে আসায় গলিটা কেমন অন্ধকার অন্ধকার ঠেকছে। এমন সময়ে শুধু মাত্র নেংটি পরনে, হাতে দড়ি আর বালতি নিয়ে কৃষ্ণকায় শিউনন্দন আর মহারাজ এসে শাবলের চাড় দিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনাটি খুলে ফেলল। মহারাজ বালক মাত্র; তাই কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী সাফ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ওদিকে শিউনন্দন বিড়ি ধরিয়েছে, গুন গুন করে গানও ধরেছে। মহারাজ ম্যানহোলের মুখে দাঁড়িয়ে পূতিগন্ধময় গহ্বরটাকে একবার দেখে নেয়। এদের ভাষা কাব্যময় ব্রজবুলি; সুবিধের জন্য এদের দিয়ে বাংলাই বলানো যাক।)

চাড় = জোর দিয়ে তোলা।
ভূগর্ভ = মাটির নীচে।
পূতিগন্ধ = দুর্গন্ধ।
গহ্বর = গভীর গর্ত।
ব্রজবুলি = একটি মিশ্রভাষা।

শিউনন্দন। নামবি তো, না চেয়েই থাকবি?

মহারাজ। নামছি, তাড়া কী?

শিউনন্দন। কাজ শেষ করে ঘরকে যাই। মন ভালো নেই।

মহারাজ। কী ব্যাপার?

শিউনন্দন। আর বলিস কেন; সকালে মোড়ের বাড়িটায় এক কাণ্ড হয়ে গেল।

মহারাজ। কী?

শিউনন্দন। জল ঢালতে বললাম, গিন্নির আর আসার সময় হয় না। কল ছুঁয়ে ফেলেছিলাম।

মহারাজ। তারপর?

শিউনন্দন। বাড়ির দুই পালোয়ান ছেলে জুতো নিয়ে মারতে এল, হাওয়া হয়ে গেলাম।

মহারাজ। হাতের ঝাঁটাটা দিয়ে মুখে এক-ঘা কষে দিতে পারলে না?

শিউনন্দন। হ্যাঁ, আর পৈতৃক প্রাণটা যাক আর কি? নাম, নাম।

(মহারাজের নামার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে কুলপি কিনতে গেল। মহারাজ কুলপি খেতে খেতে ফিরে এল ম্যানহোলের কাছে।)

শিউনন্দন। তুই বেশ আছিস।

মহারাজ। কী?

শিউনন্দন। ছোটোখাটো শরীর, মাটির তলায় কাজ। আমার এই গতর নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। রাজ্যের পায়খানা ঝেঁটিয়ে গালি খাও। নাম না রে বাবা!

মহারাজ। এই নামছি।

(মহারাজের সমবয়সি পাড়ার ছেলেরা ইস্কুল থেকে ফিরল। বইখাতা ঝপাঝপ রোয়াকে নামিয়ে রেখেই তারা গলিটাকে ক্রিকেট-পিচ-এ পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তাদের দেখে মহারাজ আধখানা কুলপি ফেলে ম্যানহোল দিয়ে নামতে শুরু করল।)

শিউনন্দন। কী হল?

মহারাজ। ওই ছেলেগুলো ভারী পাজি! সেদিন বস্তির মুখে ওদের দুটোকে ধরে আমরা ঠেঙিয়েছিলাম। ঘুড়ি কেড়ে নেবে।

(সে নেমে যায় অন্ধকূপে। শিউনন্দন বালতিতে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেয় ভেতরে। তারপর সে-ও কুলপি কেনে। খাচ্ছিল আয়েস করে। এমন সময় ম্যানহোল থেকে জেগে ওঠে একটা চিৎকার। ছেলেরা খেলা বন্ধ করে। শিউ-এর হাত থেকে কুলপি পড়ে যায়। সে ছুটে যায় ম্যানহোলের মুখে; মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে কেশে ফেলে কাঠ-চেরা শব্দ করে— তাই সে পিছিয়ে যায়। নাকে গামছা বেঁধে সে আবার ঝোঁকে।)

শিউনন্দন। এই মহারাজ! মহারাজ! কী? গ্যাস?

(নীচ থেকে মহারাজ কী বলে আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু শিউনন্দন শুনতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে।)

এক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাক; তোকে এখুনি তুলে নিচ্ছি।. . .

(মহারাজ আরও কিছু বলছে, ওর অস্ফুট কথা একটা গোঙানির মতন শোনাচ্ছে। গলির বাসিন্দারা এখনও ব্যাপারটা সম্যক বুঝতে পারেননি, তাই তাঁরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন।)

আরে বাবা, এখুনি আসছি, লোক ডাকতে হবে তো, নাকি?

(ছেলেদের বাবারা এগিয়ে এসেছেন সদলবলে ব্যাপারটার রহস্যভেদ করতে।)

অবিনাশ। অমন মটকা মেরে পড়ে আছে কেন?

সুদর্শন। থেকে থেকে কাশছে।

অলক। মরে যাবে নাতো?

সুরেন। কী ঝামেলা! পাড়ার মধ্যে ঢুকে এভাবে—

(পোর্টফোলিও হাতে এক ভদ্রলোক পথ বেয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন, এ দৃশ্য দেখে ব্যবসা ভুলে তিনি দেখতে শুরু করলেন।)

শব্দার্থ ও টীকা

আয়েস করে = আরাম করে।
ম্যানহোল = নর্দমার মধ্যে নামার জন্য বড়ো গর্ত।

মটকা মেরে = অনড় হয়ে।

পোর্টফোলিও। কখন আটকাল?

নিতাই। এই তো।

সমীর। কিন্তু ব্যাপারটা কী? পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে?

অলক। পা স্লিপ করে—

সুদর্শন। না, না, গ্যাস, কাদায় বালতি মারতেই—

চিদানন্দ। কী গ্যাস?

শিউনন্দন। কয়লাখনিতেও থাকে— কী যেন নাম?

পোর্টফোলিও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকমটা হয়। সালফারের সঙ্গে জল মিশে হাইড্রোক্লোরিন গ্যাসের— মানে এরকমটা হয়।

24.3.2 (2)

(আটের দুইয়ের ডি বাড়ি থেকে বেরুলেন অতিবৃদ্ধ শ্যামসুন্দরবাবু, নাতির হাত ধরে ঠুকঠুক করে এগিয়ে এলেন ম্যানহোলের ধারে,

(অলকের সাহায্যে ম্যানহোলের ধারে পৌঁছে দাদু ঠাওর করেন, কিন্তু হতাশ হন।)

শ্যামসুন্দর। কাদায়, কালো রং-এ মাখামাখি, কিছু বোঝার উপায় নেই।

(কিন্তু নাতির নবীন চোখে মহারাজের দেহ শুধু দৃশ্যমান নয়, একগাদা প্রশ্নও।)

নাতি। দাদু, ও শুয়ে আছে কেন?

শ্যামসুন্দর। কিছু না, আবার উঠে আসবে।

নাতি। ওর গায়ে জামা নেই কেন?

শ্যামসুন্দর। ওরা গরিব, তাই জামা নেই।

নাতি। গরিব কেন?

শ্যামসুন্দর। মেথরের ছেলে তাই গরিব।

নাতি। ও ইস্কুলে যায় না কেন?

শ্যামসুন্দর। গরিব কিনা, তাই যায় না।

নাতি। গরিব কেন?

(প্রশ্নগুলো ক্রমশ বেয়াড়া রকমের হয়ে উঠছে দেখে শ্যামসুন্দর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।)

শ্যামসুন্দর। ওকে তোলা হচ্ছে না কেন?

অবিনাশ। সঙ্গে আরেকটা মেথর ছিল। সে লোক ডাকতে গেছে।

শ্যামসুন্দর। মরে যাবে যে! আমরাই একটু কষ্ট করে—

শব্দার্থ ও টীকা

নিতাই। ব্যাপারটা বিপজ্জনক। নীচে হাইড্রোক্লোরাইড গ্যাস— মানে ইনি বলবেন—

(বলে তিনি পোর্টফোলিওকে দেখিয়ে দেন।)

পোর্টফোলিও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রেসকিউ-এর কাজে নানাধরণের যন্ত্রপাতি— মানে গ্যাসমাস্ক আর অক্সিজেন— অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেন্টস লাগে।

24.3.3 (3)

(শিউনন্দন একজন কনস্টেবল জোগাড় করে এনেছে। অতি শীর্ণ কনস্টেবল। বিরাট লাল পাগড়িটা রোগা দেহে অত্যন্ত বেমানান।)

কনস্টেবল। হঠ যাও, হঠ যাও, দেখতে হলে লাইন লাগাও। এসব ধাক্কাধাক্কি চলবে না।

শিউ। এই গর্তে—

(কনস্টেবল অন্ধকারে দৃষ্টি চালিত করে।)

কনস্টেবল। এই ছোকরা, উঠে আয় না! ওখানে পড়ে থেকে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস?

শিউ। তোমার যেমন কথা পুলিসসাহেব! উঠতে পারলে ও শখ করে ওখানে পড়ে আছে? আপনি মদত না দিলে কী করে তুলব হুজুর?

কনস্টেবল। আমি কী করে মদত দেব? আমি কি হরিজন উদ্ধার সমিতি খুলেছি, না আমার বাপের দড়ির কারখানা আছে? অ্যাঁঃ, কী বোঁটকা গন্ধ।

হরিজন = অস্পৃশ্যদের গান্ধিজি বলেছেন হরিজন।

শিউ। বাবুসাহেবরা, আপনারা একটু সাথ দিলে আমিই ওকে তুলে আনতে পারি, ওইটুকু তো শরীর।

এক যুবক। এই ন্যাড়া, চল, চল, রিলে-র সময় হয়ে গেল।

শিউ। বাবুজি একটু মদত দিন, হালকা বাচ্চা, বাবুজি—

মদত = সাহায্য।

অবিনাশ। হ্যাঁ ওখানে সেঁধিয়ে পৈতৃক প্রাণটা ওখানেই রেখে আসি—

সেঁধিয়ে = ভেতরে ঢুকে।

শিউ। পায়ে ধরছি, বাবুজি।

অবিনাশ। এই ছুঁবিনে বলছি। মেথর!

24.3.4 (4)

(ভেতর থেকে আবার তীক্ষ্ণ চিৎকার ফেটে পড়ে, শিউনন্দন অধীর হয়ে ওঠে।)

শিউ। কাছে টেলিফোন কোথায় আছে হুজুর—

(সকলে সমস্বরে বোঝাতে প্রয়াস পান, ফলে কিছুই বোঝা যায় না।)

সমস্বরে = একসাথে বলা।

পোর্টফোলিও। (ধমকে) আস্তে!— এগিয়ে বাঁ-হাতে গেটওয়ালা বাড়ি।

(শিউনন্দন ছুটে চলে গেল। যাঁরা গর্তের মধ্যে দৃষ্টিপাত করছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল।)

শব্দার্থ ও টীকা

— নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে! নড়ছে!

(মহিলারা বারান্দা থেকে ম্যানহোলের অভ্যন্তর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁরা এবার দলে দলে পথে বেরিয়েছেন, ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল, তাঁরা এসে দেখে যাচ্ছেন।)

— ওই দ্যাখ নীরা, তালগোল পাকিয়ে গেছে—

— পাড়ার মধ্যে এসব!

— ওখানে পড়ে থাকলে কী হবে?

— এ মা, কী গন্ধ!

অবিনাশ। আমার মনে হয় ও-বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে রাখা ভালো।

— রুমালে নাকটা ঢেকে নে, রমা!

— মা গো, মরার আর জায়গা পায় না এরা?

24.3.5 (5)

(অলক ডাক্তারবাবুকে পথ দেখিয়ে আনে।)

চিদানন্দ। এই যে, এসে গেছেন, দেখুন তো দিকি।

(ডাক্তার ঝুঁকে এক ঝলক দেখে নিলেন।)

ডাক্তার। দেখলাম।

পোর্টফোলিও। ও কী? চলে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান। এক্ষুণি তোলা হবে। ফার্স্টএড দিতে হবে।

ফার্স্ট এড = প্রাথমিক চিকিৎসা।
ক্যালাস (Callous) = নিষ্ঠুর উদাসীনতা।
হিপোক্র্যাটিক ওথ (hypocratic oath) = শপথ করা ভণ্ডামি।
ইনহেল = নাকে টানা।

ডাক্তার। এ কেসে ফার্স্ট-সেকেন্ড কিস্যু নেই। প্রচুর টাকা লাগবে। আপনারা দেবেন?

পোর্টফোলিও। আ-হা-হা-হা, আপনারা এত ক্যালাস হলে চলে কী করে? আর্তদের সেবা করার একটা শপথ নিতে হয় না ডাক্তারদের? হিপোক্র্যাটিক ওথ?

ডাক্তার। সেবা করতে তো রাজি আছি। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস বাড়াতে হবে, যাতে গ্যাসটা বেরিয়ে যেতে পারে। অক্সিজেন মিক্সচার ইনহেল করাতে হবে। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দয়া করে টাকা কটা ফেলে দিলেই তো হয়।

(সকলে ভিড়ে অস্বস্তিতে ঘামতে থাকেন)

কী হল? দয়া মায়া আর্তসেবা শেখাচ্ছিলেন না? আপনি দেবেন? আপনি? কই, কোনো উচ্চবাচ্য নেই যে বড়ো? আমার ফি'টা তো না হয় ছেড়েই দিলাম।

শিউ। আর বাচ্চাটার যে জান নিয়ে টানাটানি হুজুর।

ডাক্তার। কেন হয় অমন অ্যাকসিডেন্ট? অমন দামি দুর্ঘটনা ধাঙড়-মেথরের হওয়া উচিত নয়।

পাদস্পর্শ = পা ছোঁয়া।

(শিউনন্দন বিশ্বময় সকল হুজুরের পাদস্পর্শে বিশেষ তৎপর। সে চকিতে ডাক্তারবাবুর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

শিউ। হুজুর, দয়া করুন হুজুর—

ডাক্তার। একি? ব্ল্যাকমেল নাকি? ছাড়, পা ছাড়।

(বলে ডাক্তার হন হন করে খানিক এগিয়ে গেলেন, সেখান থেকে বললেন)

তার চেয়ে ওলাইচণ্ডীর পুজো দে, সস্তায় হবে।

(ডাক্তার চলে গেলেন)

শব্দার্থ ও টীকা

ব্ল্যাকমেল (blackmail) = গোপন তথ্য ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়।
ওলাইচণ্ডী = এক দেবী।

24.3.6 (6)

এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন একদল প্রেস রিপোর্টার, তৎসহ কয়েকজন ফটোগ্রাফার। 'কই কই' শব্দে তাঁরা দৌড়োতে দৌড়োতে ম্যানহোলের কাছে পৌঁছোলেন। এবং পরমুহূর্তে খটাখট শব্দে ফ্ল্যাশ বালব্ জ্বলতে শুরু করে। লিকলিকে একজন রিপোর্টার প্রথম প্রশ্নবান জ্যা-মুক্ত করতে শুরু করেন।

আবির্ভূত হলেন = এলেন।
রিপোর্টার = সংবাদদাতা।
জ্যামুক্ত = তির ছোঁড়া।

লিকলিকে। পড়ল ঠিক কখন?

শিউ। এই চারটে হবে।

জবাবগুলো খর খর শব্দে চোদ্দোখানা নোটবই-এ একযোগে লেখা হতে থাকে।)

লিকলিকে। কেমন করে পড়ল?

শিউ। হুজুর, গ্যাস খেয়ে।

লিকলিকে। নীচে নেমে গ্যাস খেয়ে পড়ল, না গ্যাস খেয়ে নীচে পড়ে গেল?

শিউ। জী, হ্যাঁ।

লিকলিকে। ঠিক করে বলো।

শিউ। হুজুর . . . গ্যাস খেল আর পড়ল।

লিকলিকে। পড়ার সময়ে কী বলল?

শিউ। জী?

লিকলিকে। কী বলল?

শিউ। হুজুর, বলবে কী?

লিকলিকে। মানে একটা কিছু বলল তো। ধরো, গ্যাস খেয়েছি, বা—

শিউ। হাঁ, মানে, না তা বলেনি।

লিকলিকে। তবে কী বলল?

শিউ। জানি না হুজুর।

লিকলিকে। দুর কিস্যু মনে রাখতে পারে না।

আরেকজন। বলল না— বাঁচাও, আমায় বাঁচাও?

শিউ। না, হুজুর—

লিকলিকে। (ধমকে) ভালো করে ভাব।

শিউ। হ্যাঁ, হুজুর।

লিকলিকে। গুড! (লিখতে লিখতে) বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

(একজন অত্যন্ত রাশভারি সাংবাদিক, ফটোগ্রাফারসহ ভিড় ঠেলে এসে পড়েন। তাঁকে দেখে অন্যান্য রিপোর্টাররা সংকুচিত হয়ে পড়েন)

লিকলিকে। দাদা স্বয়ং!

রাশভারি। ঘাবড়াও মাৎ, বেশি কিছু লিখব না। এই যে 'ওরিয়েন্ট', রিপোর্টার কই?

ওরিয়েন্টের ফটোগ্রাফার। আজ্ঞে আমাদের কাগজকে তো চেনেন। ছবি ছাড়া আর কিছুই ছাপবে না।

রাশভারি। আর 'কালান্তর'? দেখছিলাম তোমাদের কাণ্ডকারখানা। একটা স্টোরির প্রাণ হচ্ছে একটা হিউম্যান অ্যাঙ্গল, যার থাকবে সর্বজনীন আবেদন, যা পড়ে লোকের চোখের পাতাটা একটু ভিজে উঠবে।

লিকলিকে। কী আপনি বলছেন দাদা, বুঝতে পারছি না। আমি যে অ্যাঙ্গল নিয়েছি, মানে গ্যাস খেয়ে ছেলেটা বললে— বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।

রাশভারি। আরে ছোঃ!

(দাদার গলা নেমে এসেছে; সাংবাদিকরা ভিড় করে শুনছেন।)

আমার কাছে একখানা ছবি ছিল হে। চিনাকুড়ি খনি-দুর্ঘটনার। ছেলে মরে গেছে খবর পেয়ে নির্বাক শোকাহতা মায়ের ছবি। সেইটে সুপারইম্পোজ করব এই ম্যানহোলের ভিড়ের ছবির উপর। নিচে ছোট্ট একটি লাইন— মণিহারা! ওই নির্বাক মাতাই হবে আমার গল্পের নায়িকা।

(এই বলে দাদা তাঁর ফটোগ্রাফারকে নানা নির্দেশ দিতে থাকলেন। শিউনন্দনের হাতখানাকে কপালে চেপে ধরতে বলে ছবির বাস্তবটাকে আরও নিশ্চিত করে তুললেন। অন্যান্য সাংবাদিকরা সপ্রশংস ও স-ঈর্ষা দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকলেন।

দাদা হাঁকলেন— ক্যামেরা!

(ফ্ল্যাশ বাল্ব বিদ্যুৎ হানল। এমনি সময়ে ম্যানহোল থেকে একটা কাতরোক্তি উত্থিত হতে সবাই থেমে গেলেন এবং ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন ছড়াতে লাগল—।)

— গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে, গোঙাচ্ছে—

(দমকলের ঘন্টাও শোনা গেল। সেই সঙ্গে দমকলের কর্মীরা যখন কর্দমাক্ত বীভৎস শীর্ণ ছোটো দেহখানা তুলে আনল, তখন মহারাজ মরে গেছে। চোখদুটো খোলা, সাদা আর মুখখানা হাঁ করা। নিঃশ্বাস নিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল মহারাজ, কারণ মানুষ মরতে চায় না।)

শব্দার্থ ও টীকা

রাশভারি = গম্ভীর।

হিউম্যান অ্যাঙ্গল (Human angle) = মানবিক দৃষ্টি।

সুপারইম্পোজ (Super impose) = একটা ছবির উপর আর একটা ছবি চাপিয়ে দেওয়া।

মণিহারা = মণি বা শ্রেষ্ঠধন পুত্র হারিয়েছে।

গোঙাচ্ছে = গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে, কাতরাচ্ছে।

কর্দমাক্ত = কাদা মাখা।

শব্দার্থ ও টীকা

24.4 বিষয়ের রূপরেখা

এই পাঠটির বিশেষ দিক:

নাট্যকার হতদরিদ্র এক সাফাইকর্মীর নাম রেখেছেন মহারাজ, আর অন্যজনের নাম রেখেছেন শিউনন্দন মানে শিবের পুত্র। নিতান্তই ব্যবসায়ী একজনকে বলেছেন পোর্টফোলিও। ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্রই তার পোর্টফোলিও ব্যাগে থাকে। এভাবে নামকরণ করে নাট্যকার চরিত্রগুলোর নাম আর পরিচয়ের তফাত চমৎকার করে দেখিয়েছেন।

24.4.1 বিকেল বেলা . . . মানে ওরকমটা হয়।

বক্তব্যসার:

সাফাইকর্মী শিউনন্দন আর মহারাজ এসেছে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে নীচে নেমে ময়লা তুলতে। এটা যে বেশ বিপজ্জনক সেটা জেনেও তাকে আসতে হয়েছে, কারণ এটাই তার জীবিকা। শিউনন্দন সকালে কল ছুঁয়ে দেবার অপরাধে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। এসব সয়েও এই কাজ তাদের করে যেতে হয় পেটের তাগিদে। মহারাজ ভেতরে নেমে গিয়েই কাদা আর বিষাক্ত গ্যাসের শিকার হয়। আর এখান থেকে ঘটনার সূত্রপাত। অবিনাশ, সুদর্শন, চিদানন্দ, আরও অনেকে এসে জুটে যায়। ম্যানহোলের ভেতরটায় মহারাজের অবস্থা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ প্রকাশ করে। শিউনন্দন ওকে তুলে আনার আশ্বাস দিলেও সে কারো কোনো সাহায্য পাচ্ছে না।

মন্তব্য:

এটি নাটকের সূচনা অংশ। সমাজের নানা অংশের লোক এবং তাদের আচরণ সম্বন্ধে নানা কথা জানা যাচ্ছে। পরিবেশ পরিষ্কার রাখার গুরুদায়িত্ব পালন করে বলে সাফাইকর্মীরা প্রশংসার যোগ্য। এই অংশে তাঁদের যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি তাদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব যাঁদের, সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মনোভাবও তাঁদের আলোচনায় প্রকাশ পাচ্ছে। নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরবর্তী ঘটনা জানার জন্য কৌতূহল জাগানো। এরপর মহারাজের কী হল তা জানার জন্য পরের অংশে যেতে ইচ্ছে করবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.1

1. **যেটি ঠিক সেটিতে (✓) দিন—**

   1.1 সাফাই কর্মীদের কাজ (বেশ সোজা/ খুব মজার/ অত্যন্ত বিপজ্জনক/ কেবল ঝাঁট দেওয়া)

   1.2 ঘটনাটি বলা হয়েছে (গল্পের মতো করে/ ভ্রমণ কাহিনির আকারে/ কবিতার ছন্দে/ নাটকের আকারে)

   1.3 ম্যানহোলের ভেতর থেকে মহারাজের চিৎকার শুনে বোঝা যায় (সে খুশি হয়েছে/ বিপদে পড়েছে/ খেলায় মেতেছে/ সাপ দেখেছে)

   1.4 উপস্থিত অনেকে (ওকে উদ্ধারের উদ্যোগ নিল/ পড়ার কারণ নিয়ে মশগুল হল/ মহারাজের

বিপদ বুঝে বিচলিত হল/ এই ঘটনায় বিরক্ত হল)

2. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসান—

2.1 নাটকটি লিখেছেন ....

2.2 ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখন সময় ....

2.3 কল ছুঁয়ে দেওয়ার অপরাধে শিউনন্দনকে ....

2.4 ম্যানহোল থেকে চিৎকার শুনে ছুটে গেল ....

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দিন—

3.1 ‘মোড়ের বাড়িটায় এক কাণ্ড হয়ে গেল।’— কাণ্ডটি শুনে মহারাজ রেগে গিয়েছিল কেন?

3.2 এমন সময়ে ম্যানহোলের ভেতর থেকে চিৎকার শুনে শিউনন্দনের হাত থেকে কুলপি পড়ে গেল কেন?

3.3 ‘মহারাজ’— বালকটির এই নামের সঙ্গে তার আসল পরিচয়ের পার্থক্য কী?

24.4.2 আটের দুই এর ডি বাড়ি . . . খনির অফিসার।

বক্তব্যসার :

ম্যানহোলের ভিতরের দৃশ্য দেখার কৌতূহলে কিছুক্ষণের মধ্যে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। মহারাজের বিপদ নিয়ে কাউকে বিচলিত হতে দেখা যায় না। শ্যামসুন্দরবাবু কাদায় মাখা মহারাজকে তুলে আনার অনুরোধ জানাতেই নিতাই প্রবল আপত্তি জানায়। কারণ ব্যাপারটা এতই বিপদের যে এক পাও এগোনো অনুচিত। এসব বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে একজনের মরণ-বাঁচন সমস্যা অন্যদের কাছে যেন নিতান্তই কৌতূহলের বিষয়, তার বেশি কিছু নয়।

মন্তব্য :

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নটি করে বসে বালকটি, শ্যামসুন্দর বাবুর নাতি। ‘ওরা স্কুলে যেতে পারে না কেন?’ দাদুর উত্তর, ‘মেথর বলে, গরিব বলে’। কিন্তু ‘গরিব কেন’ এই প্রশ্নের মূলে যে সামাজিক বিভেদ, অবহেলা, বঞ্চনা, তার কোনো সদুত্তর কিন্তু কেউ দিতে পারে না। বস্তুত অস্পৃশ্যতা ও দারিদ্র্য যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত! নাট্যকার খুব প্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রশ্নটি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.2

1. কোনটা ঠিক, (✓) দাগ দিয়ে দেখান—

1.1 ম্যানহোলের কাছে ভিড় জমে গিয়েছিল—

(ক) মহারাজকে উদ্ধারের জন্য

(খ) কী হয়েছে দেখার জন্য

(গ) কেন ভিড় সেটা বোঝার জন্য

(ঘ) বাস ধরার জন্য

1.2 শ্যামসুন্দর বাবুর মতে মহারাজের গরিব হবার কারণ—

(ক) সে কোনো রোজগার করে না

(খ) সে কোনো সঞ্চয় করে না

(গ) সে মেথরের ছেলে

(ঘ) তাদের পরিবারে অনেক লোক

1.3 শ্যামসুন্দর ছেলেটাকে তুলে আনার প্রস্তাবে—

(ক) সবাই রাজি হল

(খ) দু-একজন এগিয়ে এল

(গ) কেউ রাজি হল না

(ঘ) সবাই একটু অপেক্ষা করার কথা বলল।

2. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

2.1 'আষাঢ়ে মেঘের মতন'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

2.2 দাদু তাঁর নাতির প্রশ্নগুলোকে বেয়াড়া রকমের মনে করেছিলেন কেন?

24.4.3 শিউনন্দন একজন কনস্টেবল . . . নফর কুণ্ডু হবার শখ নেই।

বক্তব্যসার :

কনস্টেবল মনে করে তার কড়া আদেশ শুনেই মহারাজ উঠে আসবে, যেন সে ওখানে শখ করে পড়ে আছে। তার হুকুমে সবাই মিলে ওকে উঠিয়ে আনবে— এটাই তার বিশ্বাস। শিউনন্দন একাজে তাকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানালেও সে রাজি হয় না। পুলিশ প্রশাসনেরও মহারাজদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাবার কথা জানা গেল।

মন্তব্য :

এই অংশে তিনজনের সংলাপে মেথরের প্রতি আসল মনোভাব ফুটে ওঠে। হরিজন প্রসঙ্গে কনস্টেবলের বিরূপ মনোভাব বোঝা গেল। অবিনাশ সরাসরি তাকে না ছোঁবার জন্য বলল। এমনকি ওই পোর্টফোলিও (ব্যবসায়ী) জানিয়ে দেয় সে ভদ্রলোকের ছেলে, যা 'ছোটোলোকের কাজ' তা সে করবে না। নাট্যকার এভাবেই সকলের অমানবিক চরিত্র প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্যেরা যখন নানা ছুতোয় দায়িত্ব এড়াতে চাইছে, শ্যামসুন্দর বাবু মহারাজকে উদ্ধারের প্রস্তাব করে তবু মানবিকতা দেখিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.3

1. নীচের কথাগুলোতে বক্তার কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? বন্ধনীতে ঠিক উত্তরের সংখ্যাটি লিখুন:

ক)	এ্যাঃ কী বোঁটকা গন্ধ— কনস্টেবল ( )	১) অনুরোধ
খ)	বাবুজি একটু মদত দিন— শিউনন্দন ( )	২) অনিচ্ছা
গ)	ওখানে সেঁধিয়ে প্রাণটা ওখানেই রেখে আসি অবিনাশ ( )	৩) সাহায্য প্রার্থনা
ঘ)	তা দেখান না আপনার উদারতা— চিদানন্দ ( )	৪) নিজের আভিজাত্যের বালাই
ঙ)	ভদ্রলোকের ছেলে, নফর কুণ্ডু হবার শখ নেই— পোর্টফোলিও ( )	৫) সাফাই কর্মীর প্রতি অবজ্ঞা

2. নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টি ঠিক? টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান—

ক.১) মহারাজকে তুলে আনা কনস্টেবলেরও একটা দায়িত্ব।
ক.২) ভিড় সামলানো ছাড়া এ ব্যাপারে কনস্টেবলের আর কোনো দায়িত্বই নেই।

খ.১) বাবুরা একটু মদত দিলেই ছেলেটাকে তুলে আনা যায়।
খ.২) বাবুরা মদত দিলেও ওকে তুলে আনা অসম্ভব।

গ.১) মেথরে ছুঁলেই অবিনাশের জাত যাবে।
গ.২) কারো ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত যাবার কথাটা কুসংস্কার মাত্র।

ঘ.১) মেথরের ছোঁয়া অবাঞ্ছিত— এই ধারণা পুরোনো বলে বিশ্বাস করে পোর্টফোলিও।
ঘ.২) পোর্টফোলিও নিজেই এই কুসংস্কারকে বিশ্বাস করে।

24.4.4 অলক। আমি নামব . . . মরার আর জায়গা পায় না এরা।

বক্তব্যসার:

ম্যানহোলের ভেতর থেকে চিৎকার শুনেই শিউনন্দন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে টেলিফোনে কর্তৃপক্ষকে সব জানাবার জন্য ছুটে যায়। এবার দেখা গেল মেয়েরা এসেছে। তাদের কেউ দেখল গর্তে তালগোল পাকানো শরীর, কেউ বিশ্রী গন্ধে অসুস্থ হবার আশঙ্কা করল।

মন্তব্য:

সবাই জানে নারী মমতাময়ী। এক্ষেত্রে দেখা গেল এই নারীদের যেন স্নেহ মমতা কিছুই নেই। বরং আচরণে ফুটে উঠল বিরক্তি। এমনকি গলির এই দুর্ঘটনাকে উৎপাত ভাবল কেউ। সবাই চায় পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকুক। কিন্তু এর জন্য যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে তাদের প্রতি এদের চূড়ান্ত অবজ্ঞা। এই অংশে সংলাপে ও চরিত্রদের আচরণে সে-কথাই জানা গেল। বলা বাহুল্য, এই মনোভাব যে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 24.4

1. যেটি ঠিক সেটিতে (✓) দাগ দিন—

1.1 মহিলারা এসেছেন (উদ্ধার কাজে সাহস যোগাতে/ নিতান্ত কৌতূহল মেটাতে)।

1.2 তাঁরা ম্যানহোলের মধ্যে (জীবিত একটি ছেলেকে দেখলেন/ দেখতে পেলেন তালগোল পাকানো একটি দেহ)।

1.3 ম্যানহোলের দুর্গন্ধকে তাঁরা (গ্রাহ্য করলেন না/ দুর্গন্ধে তাঁরা বিরক্ত হলেন)।

1.4 তাঁদের গলিতে এই মৃত্যুর ঘটনায় তাঁরা (কান্নায় ভেঙে পড়লেন/ তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন)।

2. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

2.1 ‘একটা গুঞ্জন রাস্তাময় ছড়িয়ে পড়ল’— এই গুঞ্জন ওঠার কারণ কী?

2.2 মহিলাদের আচরণে তাঁদের কী মনোভাব প্রকাশ পেল?

24.4.5 অলক ডাক্তারবাবুকে পথ. . . ছা পোষা, অতটাকা পাবো কোত্থেকে?

বক্তব্যসার:

ডাক্তার এলেন। তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্তকে তুলে আনার কথা কিছুই বললেন না। বলে গেলেন মুমূর্ষুর চিকিৎসার জটিলতার কথা আর খরচের কথা। সবাই ডাক্তারকে আর্তের সেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ফি না নিতে রাজি হলেন। কিন্তু ওষুধপত্রের খরচ সবাই মিলে দেবার প্রস্তাব দিতেই সবাই পিছিয়ে এল।

মন্তব্য:

ডাক্তারের উক্তি বড়োই বেদনাদায়ক। তিনি বললেন শিউনন্দনের উচিত মহারাজের ডাক্তারি চিকিৎসার বদলে ওলাইচণ্ডীর পুজো দেওয়া। উক্তি দুটোতে স্পষ্টত নীচুতলার মানুষের প্রতি বিদ্রুপ করা হয়েছে। মেথরদের কাজই তো ঝুঁকির কাজ। পদে পদে তাদের বিপদ আর অসুখ। চিকিৎসার পয়সা নেই বলেই তো বিনা চিকিৎসায় তারা মরে। ডাক্তারের কোনো সাহায্যই কি তারা পায়? ডাক্তার জানেন ওলাইচণ্ডীর পুজোতে রোগ সারে না। তবু এই কুসংস্কারের পথে যেতে তিনি বললেন কেন? সাফাইকর্মীর দারিদ্র্যের প্রতি এ যে পরিহাস মাত্র। এই ধরণের সংলাপে যে বক্রোক্তি তাতে নাটক বাস্তবসম্মত হয়েছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 24.5

1. নীচের কোন্ বাক্য নাটকের ঘটনা অনুযায়ী ঠিক? (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান—

1.1 ডাক্তার ম্যানহোল দেখে নিয়ে বুঝেছেন মহারাজ বেঁচে আছে।

1.2 ডাক্তার বুঝতেই পারেননি মহারাজ জীবিত কি মৃত।

1.3 ডাক্তার ওষুধপত্রও বিনামূল্যে দেবেন বলেছিলেন।

1.4 ডাক্তার তাঁর ফি নেবেন না বলেছিলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

1.5 উপস্থিত সবাই আর্তের সেবায় সবকিছু করতে প্রস্তুত।

1.6 দরকারি ওষুধপত্রের দাম দিতে রাজি হল পোর্টফোলিও।

2. কারণগুলি বেছে নিন—

2.1 ম্যানহোলে পড়ে যাওয়াকে দামি দুর্ঘটনা বলা হয়েছে কারণ—

(ক) এই দুর্ঘটনাগ্রস্তের চিকিৎসার ব্যয় অনেক।

(খ) ম্যানহোলটা খুব দামি।

2.2 ওলাইচণ্ডীর পুজো দিতে বলা হয়েছে কারণ—

(ক) তাতে মহারাজ তাড়াতাড়ি সারবে।

(খ) তাতে খরচ কম।

2.3 শিউনন্দন ডাক্তারবাবুর পায়ে পড়ল কারণ—

(ক) সে মহারাজকে বাঁচাতে চায়।

(খ) ডাক্তারের কাছে কিছু পয়সা চায়।

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

3.1 ডাক্তারি জীবন শুরু করার সময় ডাক্তারদের রোগীর সেবার একটা শপথ নিতে হয়। পোর্টফোলিও এই ডাক্তারবাবুর শপথকে অসত্য বলে বিদ্রূপ করলেন কেন?

24.4.6 এমনি সময়ে . . . মানুষ মরতে চায় না।

বক্তব্যসার:

অবশেষে সংবাদপত্রের রিপোর্টাররাও এসে গেল। ম্যানহোলে পড়ে-যাওয়া নিয়ে শিউনন্দনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শিউনন্দনের দিশেহারা অবস্থা। তাদের রিপোর্টকে আকর্ষণীয় করে লেখার জন্য নিজের সুবিধামতো কথা শিউনন্দনের মুখে বসিয়ে দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত দমকল কর্মীরা এসে মহারাজের দেহ তুলে আনলে দেখা গেল সে কর্দমাক্ত, মৃত। আমরা বুঝতে পারলাম কিছু সাংবাদিক আছে যারা রিপোর্টকে আকর্ষণীয় করবার জন্য মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে পারে।

মন্তব্য:

উপস্থিত যুবকেরা উদ্যোগী হলে হয়তো-বা মহারাজকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা যেত। তাদের স্বার্থপরতা এবং অস্পৃশ্যতার জন্যই মহারাজকে মরতে হল। মহারাজ কিন্তু সবার স্বার্থরক্ষার জন্যই ম্যানহোলের ময়লা তুলতে গিয়েছিল। নাটকে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, গরিবের প্রতি তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতেই নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 24.6

1. কোন্‌টি ঠিক দেখান—

1.1 মহারাজ ম্যানহোলে
- ক) পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল
- খ) গ্যাস খেয়ে পড়ে গিয়েছিল
- গ) নিজেই নেমেছিল
- ঘ) আচমকা পড়ে গিয়েছিল

1.2 পড়ার সময় মহারাজ
- ক) চিৎকার করেছিল
- খ) কিছুই বলেনি
- গ) 'বাঁচাও বাঁচাও' বলেছিল
- ঘ) 'বাবা গো!' বলেছিল

2. ঠিক অংশটিতে (✓) দিন—

2.1 মৃত শ্রমিক মহারাজের মুখখানা ছিল হাঁ-করা।
নাট্যকারের মতে এতে বোঝা যায়—

2.1.1 মহারাজের মুখ সর্বদা হাঁ-করা অবস্থায় থাকে।

2.1.2 মহারাজ কিছু খেতে চেয়েছিল।

2.1.3 মহারাজ বাঁচতে চেষ্টা করেছিল।

2.1.4 মহারাজ শিউনন্দনকে ডাকছিল।

3. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন—

3.1 সাংবাদিকদের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল?

3.2 রাশভারী সাংবাদিকটি কী করতে চেয়েছিল?

3.3 মহারাজের মুখ ছিল হাঁ-করা— এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

24.5 আপনি যা শিখলেন

1. ঘটনাকে নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে আবেদন বেশি কার্যকর হয়;
2. সমাজে নানা অংশের মানুষের নানারকম জীবিকার বিষয়;
3. অস্পৃশ্য ভেবে নীচু তলার মানুষের প্রতি ওপর তলার মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাব অনুচিত;
4. সমাজে কারা জীবন বাজি রেখে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করে আর কারা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে তাদের চিনে রাখা দরকার;
5. সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষায় নিয়োজিত থেকেও মেথর-ধাঙড়দের প্রতি অবহেলার কারণে তাদের করুণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

24.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. একটি বাক্যে উত্তর লিখুন—
   - 1.1 শিউনন্দন ও মহারাজের জীবিকা কী?
   - 1.2 অন্ধকূপ কাকে বলা হয়েছে?
   - 1.3 ম্যানহোলে মহারাজের কী অবস্থা হয়েছিল?
   - 1.4 'নীলকণ্ঠ' ছাড়া নাটকটির আর কী কী নাম দেওয়া যেতে পারে?

2. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - 2.1 কীভাবে বোঝা যাচ্ছে যে নাটকের ঘটনাটি এক শহরেই ঘটেছিল?
   - 2.2 মহারাজের সম্বন্ধে নাট্যকার কী কী বলেছেন?
   - 2.3 ডাক্তারের কোন্ কথায় কেউ উচ্চবাচ্য করছিল না?
   - 2.4 প্রত্যেকের পরিচয় সংক্ষেপে লিখুন—
     - ক) পোর্টফোলিও
     - খ) শ্যামসুন্দর

3. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - 3.1 নাটকটির নাম 'নীলকণ্ঠ'। এই নাম নাট্যকার দিয়েছেন কেন বুঝিয়ে দিন।
   - 3.2 নাটকে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ লিখুন।
   - 3.3 উপস্থিত দর্শকদের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বুঝিয়ে দিন।
   - 3.4 বিপদগ্রস্ত মহারাজকে কীভাবে বাঁচানো যেত বলে আপনার মনে হয়? বুঝিয়ে দিন।

24.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

24.1

1. 1.1 অত্যন্ত বিপজ্জনক
- 1.2 নাটকের আকারে
- 1.3 বিপদে পড়েছে
- 1.4 পড়ার কারণ নিয়ে মশগুল হল

2. 2.1 উৎপল দত্ত
- 2.2 বিকেল প্রায় ৪টা
- 2.3 দুই পালোয়ান ছেলে জুতো নিয়ে মারতে এসেছিল

2.4 শিউনন্দন

3. 3.1 শিউনন্দন কল ছুঁয়ে দেওয়ায় সে বাড়ির দুটো ছেলে তাকে জুতো দিয়ে মারতে এসেছিল বলে মহারাজ রেগে গিয়েছিল।

3.2 কারণ শিউনন্দন বুঝেছিল মহারাজ ঘোর বিপদে পড়েছে।

3.3 'মহারাজ' বলতে কোনো রাজ্যের অধীশ্বরকে বোঝায় আর এ মহারাজ দরিদ্র ধাঙড় এক বালক।

24.2

1. 1.1 (খ)

1.2 (গ)

1.3 (গ)

24.3

1. ক) ৫

খ) ৩

গ) ২

ঘ) ১

ঙ) ৪

24.4

1. 1.1 নিতান্ত কৌতূহল মেটাতে

1.2 দেখতে পেলেন তালগোল পাকানো একটি দেহ

1.3 দুর্গন্ধে তাঁরা বিরক্ত হলেন

1.4 তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন

24.5

1. 1.1

1.4

2. 2.1 ক

2.2 খ

2.3 ক

24.6

1. 1.1 গ)

1.2 খ)

2. 2.1 2.1.3

কবি পরিচিতি

নাট্যকার উৎপল দত্তের জন্ম অধুনা বাংলাদেশে ১৯২৯ সালে। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় থেকে তাঁর নাটকের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখা যায়। শেকসপীয়রের নাটক অভিনয় দিয়ে শুরু হয় তাঁর নাট্যচর্চা। উৎপল দত্ত প্রথমে 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নামে নাট্যদল গঠন করেন। পরে তৈরি করেন 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার' (পি এল টি)। দীর্ঘ ৬৪ বছর ধরে তিনি অসংখ্য নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন, তাতে অভিনয় করেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর রচিত 'অঙ্গার', 'ফেরারি ফৌজ', 'কল্লোল', 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'দিন বদলের পালা', 'ব্যারিকেড' প্রভৃতি পথনাটকের সাফল্য অবিস্মরণীয়। 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'সাদা পোশাক' প্রভৃতি যাত্রার পালাও তিনি রচনা করেছেন, সেগুলো পরিচালনা করেছেন।

উৎপল দত্ত রচিত নাটকের সংখ্যা ছোটো বড়ো মিলিয়ে শতাধিক। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন সমস্যাা তাঁর নাটকের বিষয়। সহজে অনাড়ম্বর ভাবে, যে কোনো খোলা জায়গায় অভিনয় করা যেতে পারে এমন কতগুলো ছোটো ছোটো নাটক তিনি লিখেছেন যেগুলো পথ নাটক বলে পরিচিত। 'নীলকণ্ঠ' উৎপল দত্ত রচিত 'পথনাটক সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত।

নীলকণ্ঠ প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় ১৯৬১-র দেশ পত্রিকায়।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১) রথের রশি নাটক। (২) 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য।

নির্মিতি

25. ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক পত্র
26. সংক্ষিপ্তসার
27. প্রতিবেদন রচনা
28. অফিসের ফাইলে নোট নেওয়া
29. রেখাচিত্র ও তালিকা তৈরি
30. বোধ পরীক্ষণ
31. বক্তব্যের নোট নেওয়া ও দেওয়া

25

ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক পত্ররচনা

25.1 প্রস্তাবনা

পত্ররচনা বা চিঠি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল কোনো একজনের পক্ষ থেকে আর এক জনের কাছে মনের কথা জানানো। শুধু দূরের মানুষের উদ্দেশ্যেই নয়, কাছের বা অন্তরঙ্গ জনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কাজেও চিঠির কার্যকারিতা অপরিসীম। সাম্প্রতিক কালে যদিও অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ার (টেলিফোন বা দূরভাষ, মোবাইল, এস এম এস, ই-মেল ইত্যাদি) সাহায্যে অনেকক্ষেত্রে যোগাযোগের কাজ সারা হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও পত্ররচনার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। হাতের লেখার স্পর্শে ব্যক্তিগত চিঠিতে হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনিত হয়। আবার নথিভুক্ত করার কারণে প্রশাসনিক পত্রেরও প্রয়োজন আছে।

পত্ররচনাকে দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি ব্যক্তিগত, আর একটি বৈষয়িক। বৈষয়িক পত্র আনুষ্ঠানিক বা রীতিসম্মত। ব্যক্তিগত পত্র আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত বা রীতিবহির্ভূত। ব্যক্তিগত পত্র বলতে বোঝায় সেই ধরণের চিঠি যার আদানপ্রদান হয় আপন বা ঘনিষ্ঠ মানুষজনের মধ্যে। (আপনারা নির্ধারিত পাঠক্রমের গদ্যপাঠের মধ্যে 'শিলাইদহ থেকে' শীর্ষক পাঠটিতে ব্যক্তিগত পত্রের একটি চমৎকার নিদর্শন পাবেন।) বৈষয়িক পত্রের মধ্যে পড়ে প্রশাসনিক বা সরকারিপত্র, ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক পত্র, আবেদন-নিবেদনমূলক পত্র এবং সামাজিকতা-সংশ্লিষ্ট পত্র। বৈষয়িক পত্ররচনার ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট রীতিনিয়ম মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠি সে-রকম কিছু থাকে না। বৈষয়িক পত্রে কখনো কখনো দরকার মতো 'সংলগ্ন পত্র' জুড়ে দিতে হয় যেখানে মূল পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য থাকে।

দু-রকম পত্রের বিভাগ নীচে একটি চার্টের সাহায্যে বোঝানো হল:

- পত্র
  - ব্যক্তিগত পত্র (প্রেরক ও প্রাপক আপন বা ঘনিষ্ঠ জন— আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত)
  - বৈষয়িক পত্র (রচনা পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক বা রীতিসম্মত)
    - প্রশাসনিক বা সরকারি পত্র
    - ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক পত্র
    - আবেদন-নিবেদন মূলক পত্র
    - সামাজিকতা-সংশ্লিষ্ট পত্র

শব্দার্থ ও টীকা

পত্ররচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে-কোনো ভালো চিঠির গুণ হল তার বক্তব্যবিষয় সহজভাবে সরল ভাষায় যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে গুছিয়ে পরিবেশন করা। তা হলেই পত্রলেখকের কথা পত্রপ্রাপক যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবেন।

25.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়বার পরে আপনি:

- চিঠি লেখার প্রয়োজন সম্পর্কে বুঝতে পারবেন;
- পত্ররচনার দুটি প্রধান শ্রেণির বিষয়ে জানতে পারবেন;
- ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হবেন;
- ভালো চিঠির বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারবেন;
- আপনার নিজের পক্ষে যথাযথভাবে ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক পত্র রচনা করে ঠিকমতো বক্তব্য পরিবেশনের কাজে সমর্থ হবেন।

25.3 বিষয়ের রূপরেখা

25.3.1 চিঠির সাধারণ কাঠামো

মনে রাখা চাই, পত্ররচনা বা চিঠি লেখার ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলবার দরকার পড়ে। যে-কোনো চিঠিরই একটা সাধারণ কাঠামো আছে। এবার সেই কাঠামোর বিষয়টি বিবৃত করা হচ্ছে—

চিঠির ভিতরে এইসব অংশ থাকতে হবে:

(ক) পত্রপ্রেরক অর্থাৎ পত্ররচয়িতার ***পুরো ঠিকানা***। এটা লিখতে হয় চিঠির কাগজের মাথার ডানদিকে।

(খ) চিঠি লেখার বা চিঠি পাঠাবার ***তারিখ***। এটা সাধারণত ঠিকানার ঠিক নীচে লেখা হয়। তারিখটা সাধারণত খ্রিস্টিয় ক্যালেণ্ডার অনুসারে দেওয়া হয়ে থাকে। ওটাই স্বীকৃত। তবে এই রাজ্যে প্রচলিত বঙ্গাব্দের তারিখ থাকাটাও বাঞ্ছনীয়। চিঠি তারিখহীন হলে চিঠির অঙ্গহানি হয়।

(গ) চিঠি যাকে লেখা হচ্ছে তাকে উদ্দেশ করে ***সম্বোধন বা সম্ভাষণসূচক পাঠ*** লিখতে হয় চিঠির মূল বয়ান শুরু করার আগে। সম্বোধন বা সম্ভাষণসূচক পাঠের পর কমা দেওয়া চাই।

(ঘ) এরপর শুরু হবে চিঠির মূল ***বয়ান***। এটিই হল কোনো চিঠির প্রধান অঙ্গ। এখানেই পত্ররচয়িতার বক্তব্যটি ঠিকভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে। চিঠির বিষয়বস্তু এক বা একাধিক অনুচ্ছেদে সাজিয়ে দিতে হবে। বক্তব্য শেষ হলে দাঁড়ি দিয়ে তারপর 'ইতি' লেখা যেতে পারে। ইতি মানে সমাপ্ত বা শেষ।

(ঙ) চিঠির মূল বয়ান শেষ হলে তার তলায় ডানদিকে ***বিনয়বাচক পাঠ*** লিখতে হয়।

(চ) বিনয়বচনের ঠিক নীচে থাকবে চিঠির প্রাপক বা ***প্রেরকের স্বাক্ষর***। পরিচিত জন পত্ররচয়িতার হাতের লেখা আর সই সহজেই চিনে নিতে পারবেন, কিন্তু অপরিচিত জনের কাছে চিঠি লিখলে স্বাক্ষরটি স্পষ্ট হওয়া চাই এবং প্রয়োজনবোধে স্বাক্ষরের তলায় বন্ধনীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে পুরো নাম লিখে দিতে হবে।

(ছ) চিঠির মূল বয়ান শেষ হবার পর বিনয়বচন লিখে স্বাক্ষর করার পরেও যদি বিশেষ কিছু লেখার

দরকার হয় তাহলে পুনশ্চ শীর্ষকে কয়েকটি বাক্য লেখা যেতে পারে।

(জ) এছাড়া, চিঠির মোড়ক বা ***খামের উপর প্রাপকের পুরো নাম আর ঠিকানা*** লিখে দেওয়া চাই। পোস্টকার্ড বা ইনল্যান্ড লেটারে এজন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। খামে ডানপাশে ওপরের দিকে ডাকটিকিট লাগাতে হবে। আর খামের মাঝামাঝি জায়গায় একটু ডানদিক ঘেঁসে বেশ স্পষ্ট করে লিখতে হবে প্রাপকের পুরো নাম-ঠিকানা। পিনকোড বা সূচক সংখ্যা অবশ্যই দেওয়া চাই এবং এর নম্বরগুলি লিখতে হবে ইংরেজিতে। খামের বাঁপাশে নীচের দিকে কোণ বরাবর পত্রলেখক বা প্রেরকের নাম-ঠিকানা লিখতে হবে।

পত্রলিখনের একটি ছক নীচে দেওয়া হল—

চিঠির ভিতরের অংশ

পত্রলেখকের পুরো ঠিকানা

....

....

....

তারিখ ....

সম্বোধন বা সম্ভাষণ,

....

....

....

....

....

....

....

....

....

বিনয়বচন

পত্রলেখকের স্বাক্ষর

পুনশ্চ (যদি প্রয়োজন হয়)

....

....

শব্দার্থ ও টীকা

পুনশ্চ = পুনরায়, আরও।

চিঠির বাইরের অংশ

ডাকটিকিট

প্রাপকের নাম ও ঠিকানা

....

....

....

ডাকঘর ....

পিনকোড ....

প্রেরক:

....

....

....

ডাকঘর ....

পিনকোড ....

ব্যক্তিগত পত্রে কীভাবে সম্ভাষণ আর বিনয়বচন লিখতে হবে তার কয়েকটি নীচের ছকে দেওয়া হল:

সম্বন্ধ	সম্ভাষণ	বিনয়বচন
বয়সে বড়ো (পুরুষ)	শ্রীচরণেষু পূজনীয়েষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, মাননীয়েষু, সম্মানভাজন, পাকজনাবেষু, মোবারক জনাবেষু	প্রণত, স্নেহার্থী, স্নেহধন্য, বিনীত, নিবেদক, খাকসার, খাদেন (লেখক মহিলা হলে লিঙ্গান্তরিত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।)

সম্বন্ধ	সম্ভাষণ	বিনয়বচন
বয়সে বড়ো (মহিলা)	শ্রীচরণেষু, পূজনীয়াসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু, মাননীয়াসু, সম্মানীয়া, মোয়াল্লেমা, . . .	ওই
বয়সে ছোট	কল্যাণীয়েষু/কল্যাণীয়াসু কল্যাণীয়/ কল্যাণীয়া স্নেহাস্পদেষু/ স্নেহাস্পদাসু স্নেহভাজন/ স্নেহের আজিজে কদর,	শুভার্থী, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী আশীর্বাদক, খায়েব, তালেম . . . (লেখক মহিলা হলে লিঙ্গান্তরিত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।)
বন্ধু বা প্রীতিভাজন (পুরুষ)	প্রিয়, বন্ধুবরেষু, সুহৃদবরেষু প্রীতিভাজন, দোস্তবরেষু, মেহেরবানেষু . . .	শুভেচ্ছু প্রীতিমুগ্ধ/ প্রীতিমুগ্ধা
বন্ধু বা প্রীতিভাজন (মহিলা)	প্রিয়, সুচরিতাসু, সুহৃদাসু, প্রীতিনিলয়াসু, মেহেরবান সাহেবা, . . .	প্রীতিধন্য/ প্রীতিধন্যা

বৈষয়িক পত্রে সম্ভাষণ বা সম্বোধন হিসাবে সাধারণত লেখা হয়: সবিনয় নিবেদন, মাননীয়/ মাননীয়া, মহাশয়/ মহাশয়া ইত্যাদি।

বৈষয়িক পত্রের বিনয়বাচক পদ এরকম হয়ে থাকে: ভবদীয়, বিনীত, বিনয়াবনত ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 25.1

1. যে-কোনো চিঠির সাধারণ কাঠামোয় কী কী বিষয় থাকা চাই?
2. ব্যক্তিগত পত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা ও পুরুষকে কী ধরণের সম্ভাষণ করা উচিত?
3. ব্যক্তিগত পত্রে বন্ধুস্থানীয় বা প্রীতিভাজনকে কী রকম বিনয়বচন জানানো যায়?
4. বৈষয়িক পত্রে সম্ভাষণ হিসাবে কী লেখা হয়?
5. বৈষয়িক পত্রের বিনয়বচন কেমন হয়?
6. চিঠির খামে বা মোড়কের উপর কী কী লিখতে হয়?

শব্দার্থ ও টীকা

25.3.2 ব্যক্তিগত চিঠির নমুনা

এবার আমরা কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রের নমুনা পেশ করছি—

1. বাবার কাছে ছেলের পত্র
(দুঃস্থ আত্মীয়কে সাহায্যের কথা জানিয়ে)

৯এ/২, নর্দার্ন অ্যাভিনিউ
পাইকপাড়া
কলকাতা ৭০০ ০৩৭
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০

শ্রীচরণেষু বাবা,

গতকাল রাত্রেই টেলিফোনে তোমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। আমাদের সব কুশল সংবাদ শুনেছ। আর আমরাও তোমার কাজের চাপ ও নানা জায়গা পরিদর্শন সম্বন্ধে জেনেছি। এই বয়সে চাকরির খাতিরে তোমাকে একা দূরে থেকে এতটা পরিশ্রম করতে হচ্ছে বলে আমাদের খুব উদ্‌বেগের মধ্যে থাকতে হয়। মা-ও এখন এখানকার সংসার ছেড়ে তোমার ওখানে যেতে পারছে না। দাদা সবে চাকরি পেয়েছে, পোস্টিং যদিও কলকাতার কাছেই, তবে কবে যে বদলির আদেশ এসে যাবে জানি না। আগামী বছরের গোড়ায় আমার শেষ সেমিস্টারের পরীক্ষা।

যাই হোক, যে-কথাটা জানাবার জন্য তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি সেটা বলছি। একটু আগে পিসিমণি ফোনে জানাল যে ছোড়দার ডিউডোনাল আলসার ধরা পড়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে তার তলপেটে খুব ব্যথা হচ্ছিল। দু-এক দিন মলদ্বার দিয়ে রক্ত বার হয়। কতকগুলো ডাক্তারি পরীক্ষার পর আসল রোগ নির্ণয় করা গেছে। ছোড়দা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওদের পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শে সাউথ ক্যালকাটা নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে। অন্তত পনেরো দিন থাকতে হবে। ওখানে দু-বেলার জন্য দু-জন নার্স রাখতে হবে। এই ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসার ভার একা পিসেমশায়ের পক্ষে সামলানো খুব কষ্টকর। কিছুকাল আগে পিসেমশায়ের নিজের চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাই ওঁদের সংসারে বেশ টানাটানি চলছে।

এইসব শুনে মা ঠিক করেছে, তোমার আর মা-র নামে এখানকার ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকার যে ফিক্সড ডিপোজিট আছে সেটা ভাঙিয়ে পিসিমণিকে সাহায্য করবে। এ ব্যাপারে তোমার সম্মতি মিলবে তা আমরা ধরেই নিয়েছি। তুমি এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ওই টাকা তুলে ওদের দেওয়া হবে।

অসহায় বা দুঃস্থ আত্মীয়দের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা আমরা তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। তাই মায়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্তে আমাদের পুরো সায় আছে।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম।

প্রণত
অমলকুমার নাগ

শ্রী অজয়কুমার নাগ
মালঞ্চনগর
কুঞ্জবন
আগরতলা
ত্রিপুরা
PIN 799 006

2. বন্ধুর কাছে চিঠি (পরিবেশ চেতনা নিয়ে)

সুমন্ত মিত্র
২৩ পিপুলপাতি রোড
চুঁচুড়া, হুগলি জেলা
৭ জুলাই ২০০৯

প্রিয় নীলাঞ্জন,

তোমার চিঠি দিন কয়েক আগে পেয়েছি। কিন্তু নানা কারণে উত্তর লিখতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল।

পিম্পরি-তে তোমার চাকরিটা যে ভালো লেগেছে জেনে খুব খুশি হয়েছি। পুণেতে দিদি-জামাইবাবুর কাছে থাকার ফলে পারিবারিক সুখ পাচ্ছ এবং এখানকার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে যাওয়ার অভাবটা তত দুঃখ দিচ্ছে না বলে জানিয়েছ। এটা ভালো লক্ষণ, কেননা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা মানুষের একটা বড়ো গুণ।

তবে একটা বিষয়ে তোমাকে সচেতন করতে চাই। অবশ্য এ-বিষয়ে আমি বলার আগেই তুমি নিজে থেকে অবহিত আছ বলেই মনে করি। ব্যাপারটা হল, মহারাষ্ট্রের এই পুণে-পিম্পরি অঞ্চলটা বিবিধ শিল্প-কারখানায় জমজমাট। আমাদের রাজ্যে যেমন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। আর ওইসব কারখানা থেকে নিরন্তর বিষাক্ত গ্যাস উদ্‌গিরণ হতে থাকার দরুন পরিবেশ সর্বক্ষণ দূষিত হয়ে থাকে। নির্মল বাতাস কিংবা পানীয় জল মেলা ভার হয়ে ওঠে। এ কথা ঠিক, শিল্প-কারখানাগুলি আধুনিক নানা প্রণালী ব্যবহার করে দূষণের মাত্রা যথাসম্ভব কমাবার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ওখানকার আশপাশ এলাকা অনেকটাই দূষণযুক্ত। ওখানে ধুলো-ধোঁয়া এ সবের দাপটে যে-কেউ সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। শ্বাসকষ্টের রোগ, স্নায়ুর রোগ, এমনকি ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ওই দূষিত পরিবেশের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়াটা খুবই জরুরি। শরীরে ধুলো-ধোঁয়া যাতে ঢুকতে না-পারে সেজন্য নাক-কান-চোখ-মুখ ঢেকে রাখার সরঞ্জাম ব্যবহার করা দরকার। জল বা কোনো পানীয় গ্রহণের সময় সাবধান থাকতে হবে। রাস্তার ধারের কোনো খাবার, বিশেষ করে কাটা-ফল, খাওয়া চলবে না। কাজের জায়গা থেকে বাড়ি ফিরে সাবান আর ডিসইনফেকট্যান্ট বা জীবানুনাশক দিয়ে খুব ভালো ভাবে নাক-চোখ-কান-মুখ তো বটেই গোটা শরীরটাই ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পুষ্টিকর আহারের দিকে নজর দিতে হবে। রাতের ঘুমটা যেন ভালো হয়।

উদ্‌গিরণ = বেরিয়ে আসা।

দুরারোগ্য = সহজে সারে না।
সমূহ = প্রবল।

আরও একটা কথা, কাজের জায়গায় অনেক সময় নানা কারণে টেনশন বা মানসিক চাপ তৈরি হয়ে থাকে। এর পরিণতিতে শরীর ও মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়ে জটিল রোগ পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। তাই এই টেনশন্ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এটা পুরোপুরি নিজের হাতে। যে-কোনো

দায়িত্বই আসুক, যে কোনো অসুবিধা বা বিপত্তি ঘটুক তাতে একটুও বিচলিত না-হয়ে ঠান্ডা মাথায় তার মোকাবিলা করা চাই। তাহলেই দেখবে তোমার আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠবে এবং তুমি সকল সমস্যাই সহজে কাটিয়ে উঠতে পারবে।

আমার এই উপদেশভরা লম্বা চিঠি তোমার বিরক্তির কারণ হবে না বলেই মনে করি। একজন শুভানুধ্যায়ী অন্তরঙ্গ সুহৃদ হিসেবে তোমাকে এসব কথা জানানো— যা হয়তো অনেকটাই তোমার জানা আছে— আমার কর্তব্য বলে মনে হয়েছে।

তোমার ও দিদি-জামাইবাবুর কুশল কামনা করি।

ভালোবাসা জেনো,

তোমার সুমন্ত

শ্রী নীলাঞ্জন চৌধুরী
৫, পুষ্পাঞ্জলি
রামবাগ কলোনি
পুণে, মহারাষ্ট্র
PIN 799 006

শব্দার্থ ও টীকা

আত্মপ্রত্যয় = নিজের উপর বিশ্বাস।

3. বোনকে লেখা একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

বিশ্ববন্ধু দাশ
Banerghatta Main Road
Bengaluru 560 076
৭ জুলাই ২০০৯

স্নেহের বোন ব্রততী,

আমরা চার বন্ধু মিলে ট্রেনে সারা রাস্তা খুব মজা করতে করতে বেঙ্গালুরু স্টেশনে পৌঁছোনোর পর প্রদীপের দাদা তাঁর গাড়িতে করে তাঁদের ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন। এটা এগারো তলার উপর। অনেক দূর অবধি দেখা যায়। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ঢালু জমি। খুব মনোরম দৃশ্য। আর আবহাওয়াটা বসন্তকালের মতো। এখানে এসে বেশ আরাম করে স্নানটান সেরে শরীরটা চাঙ্গা করে পোশাক পালটে নেওয়া গেল। তারপর প্রদীপের বউদির পরিবেশনায় পর্যাপ্ত ব্রেকফাস্ট সারা হল। এই সাউথ সিটিটা একটু ঘুরে নেবার জন্য আমরা তখনই বেড়িয়ে পড়লুম। পিচ-বাঁধানো রাস্তা খুব পরিচ্ছন্ন। প্রচুর গাছপালা, খোলা মাঠ কিংবা পার্ক সবুজ ঘাসে ঢাকা। তারই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলি ২০ তলার বহুতল বাড়ি। কিন্তু একটুও ঘিঞ্জি লাগে না। এখানকার জমি উঁচুনিচু। চড়াই-উতরাই বেয়ে চলতে হয়।

বিকেলে প্রদীপের দাদা অফিস থেকে ফিরে আমাদের সঙ্গে নিয়ে শহরের কয়েকটি জায়গা ঘুরিয়ে দেখালেন। বেশ বড়ো শহর। প্রচুর দোকানবাজার। লোক থইথই করছে। জে.পি. নগরে একটি রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার সেরে নেওয়া হল। সেখানে আশপাশের টেবিল থেকে বাংলায় কথাবার্তা কানে আসছিল। আমরা যেচে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করলুম। এখানে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বহু বাঙালি ছেলেমেয়ে বেশ উঁচু পদে আছে। তাছাড়া মলিকিউলার বায়োলজি পড়তে এবং চিকিৎসাগবেষণার কাজে অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে

শব্দার্থ ও টীকা

রত আছে। বেশ কিছু বাঙালি বেঙ্গালুরুতে ফ্ল্যাট কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

পরের দিন, আমরা লালবাগে উদ্ভিদ উদ্যান, বিশ্বেশ্বরাইয়া বিজ্ঞান মিউজিয়াম, টিপু সুলতান-হায়দার আলির প্রাসাদ, বিধানসৌধ এসব দেখে কাটালুম।

তার পরের দিন আমাদের তিরুপতি যাওয়া। চার বন্ধু ভাড়ার গাড়িতে সকালে রওনা হলুম। ওখানে পৌঁছে লাইনে দাঁড়ানো। তবে ব্যবস্থা খুব সুশৃঙ্খল। দেবদর্শন হলে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার ফেরার পথ। এই যাত্রাটা খুবই আনন্দের হয়েছিল।

আর দুটো দিন এখানে কাটিয়ে আমরা কলকাতার ট্রেন ধরব। প্রদীপের দাদা-বউদি আমাদের জন্য যা করেছেন তা বলে বোঝানো যাবে না। আমরা বাড়ির বাইরে এসেছি বলে বুঝতেই পারছি না।

এ চিঠি আমার আগে পৌঁছাবে, নাকি আমি চিঠির আগে পৌঁছোব তা জানি না।

রোজই টেলিফোনে তোদের খবর পাই। তাই আশ্বস্ত আছি। মা-বাবা, দাদা-বউদিকে আমার প্রণাম জানাস, তুই ভালোবাসা জানবি।

দাদা

ব্রততী দাশ
প্রযত্নে: শ্রী বিষ্ণুপদ দাশ
৭, জীবনকৃষ্ণ চ্যাটার্জী লেন
ডাক: সোদপুর
জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা
PIN 700 110

পাঠগত প্রশ্ন : 25.2

1. আপনার পরীক্ষার ফল জানিয়ে দিদিকে চিঠি লিখুন।
2. পুজোর ছুটিতে মামার বাড়িতে কাটানোর বিবরণ দিয়ে বন্ধুকে চিঠি লিখুন।
3. দূরে কর্মরত বন্ধুকে রোগ সম্বন্ধে সচেতন করে চিঠি লিখুন।

25.3.3 বৈষয়িক চিঠির নমুনা

1. সরকারি অফিসে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের আবেদন

শব্দার্থ ও টীকা

২১ সেন্ট্রাল রোড
যাদবপুর, কলকাতা ৭০০ ০৩২
০৮.০২.২০১০

নিবন্ধক
অর্থবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়/মহাশয়া,

আমি গত রাত্রি থেকে ভাইরাসঘটিত অসুখে আক্রান্ত হয়েছি। আমার চিকিৎসক আমাকে পাঁচদিনের জন্য পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। সে-কারণে আমাকে আজ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত পাঁচদিনের অর্জিত ছুটি (আগের শনি-রবিবার ৬ ও ৭ তারিখ এবং পরের শনি-রবিবার ১৩ ও ১৪ তারিখ ছুটির দিনের মধ্যে গণনা না-করে) অনুমোদন করতে অনুরোধ জানাই। আমি কাজে যোগ দেবার সময় চিকিৎসকের শংসাপত্র জমা দেব।

আশা করি, আমার এই আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ছুটি মঞ্জুর করে আমাকে অনুগৃহীত করবেন।

নমস্কারান্তে,

ভবদীয় = আপনার।

ভবদীয়
প্রদ্যোতকুমার সেন
উচ্চবর্গীয় করণিক

2. সরকারি অফিসে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন

বি সি ৩৬/৩, সেক্টর ১
সল্টলেক
কলকাতা ৭০০ ০৬৪
১ ডিসেম্বর, ২০০৯

সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ

মহাশয়,

আগামী ৩ ডিসেম্বর ২০০৯ আমার ভগিনীর বিবাহ। সেই উপলক্ষ্যে বাড়িতে বিধি কর্তব্যের জন্য আমার পক্ষে ২ থেকে ৪ ডিসেম্বর '০৯ অফিসের কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই আমাকে উক্ত তিন দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে আবেদন জানাই।

আমার এই আবেদন অনুমোদন করে আমাকে অনুগৃহীত করবেন বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

নমস্কার
ভবদীয়
অলোক সমাদ্দার
সহ অধিকর্তা (সংস্কৃতি)

3. চাকরির দরখাস্ত

১৯ শিববাটী লেন
কোন্‌নগর
হুগলি জেলা
PIN 712 235
১৮.০১.২০১০

পোস্ট বক্স নং XYZM
আনন্দবাজার পত্রিকা

বিজ্ঞাপনদাতা সমীপে
মহাশয়/মহাশয়া

গত ১৬.০১.২০১০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় আপনার সংস্থার তরফে করণিকের পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। সেই সূত্রে আমি একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন জানাচ্ছি। আমার জীবনপঞ্জি এইসঙ্গে সংলগ্ন করে দেওয়া হল।

একান্তভাবে আশা করি যে আমার আবেদনপত্রটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে আমাকে সাক্ষাৎকারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে আনুকূল্য করে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দিয়ে অনুগৃহীত করবেন।

নমস্কারান্তে—

স্বাক্ষর
(অনসূয়া মুখোপাধ্যায়)

সংলগ্নপত্র : জীবনপঞ্জি

জীবনপঞ্জি

নাম	:	শ্রীমতী অনসূয়া মুখোপাধ্যায়
পিতা/স্বামীর নাম	:	প্রয়াত অনিল মুখোপাধ্যায়
ঠিকানা	:	১৯ শিববাটী লেন, কোন্‌নগর হুগলি জেলা

বিবাহিত/অবিবাহিত : অবিবাহিত

জন্মতারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি.এ. (ইংরেজি অনার্স)

শিক্ষাসংক্রান্ত পরিচয়

পরীক্ষা	বৎসর	পরীক্ষা গ্রহণ কর্তৃপক্ষ	বিষয়	বিভাগ ও মার্কস
মাধ্যমিক	২০০৪	প. ব. মধ্যশিক্ষা পর্ষদ	বাংলা, ইংরেজি গণিত ইতিহাস ভৌতবিজ্ঞান জীবনবিজ্ঞান ভূগোল ঐচ্ছিক গণিত	প্রথম ৭৭%
উচ্চ মাধ্যমিক (কলা)	২০০৬	উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ	বাংলা, ইংরেজি ইতিহাস পৌরবিজ্ঞান পরিবেশবিদ্যা	প্রথম ৭২%
বি.এ. (ইংরেজি অনার্স)	২০০৯	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজি, বাংলা ইতিহাস পৌরবিজ্ঞান	দ্বিতীয় ৫৭%

অন্যান্য যোগ্যতা

ইংরেজি টাইপিং : স্পিড - ৪৫ শব্দ/মিনিট

বাংলা টাইপিং : স্পিড - ৪০ শব্দ/মিনিট

ইংরেজি স্টেনোগ্রাফির শিক্ষানবিশি চলছে

চাকরির অভিজ্ঞতা : নেই

স্বাক্ষর

(অনসূয়া মুখোপাধ্যায়)

4. পর্যটন সংস্থাকে পত্র

সারদামাতা বালিকা বিদ্যালয়
পাঁচলা, হাওড়া জেলা

২ এপ্রিল, ২০০৮

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
৩/২, বিবাদী বাগ (পূর্ব)
কলকাতা ৭০০ ০০১

বিষয় : শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্যাকেজ

মহাশয়/মহাশয়া,

সংবাদপত্রে আপনাদের সংস্থার বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবগে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণার্থীদের নিয়ে যাওয়ার সুব্যবস্থা আপনাদের আছে। বিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রছাত্ররা একযোগে শিক্ষামূলক ভ্রমণে গেলে তাদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ আছে।

আমাদের বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ২৫ জন ছাত্রীকে নিয়ে আমরা আগামী জুন মাসের ৫ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত বীরভূম ও সন্নিহিত অঞ্চলে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যেতে চাই। প্রথমে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন, তারকেশ্বর বক্রেশ্বর হয়ে কেন্দুলি ও কাটোয়ার নানা ঐতিহাসিক ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো হবে। শিক্ষিকা সহ মোট ৩০ জনের এই দলের লাক্সারি বাসে ভ্রমণকালে যাতায়াত সহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য মোট কত টাকা লাগবে তার হিসাব যথাসত্বর পাঠাতে অনুরোধ জানাই। কোথায় কীভাবে থাকা হবে আর দুবেলার জলখাবার ও দু-বেলা আহারের মোটামুটি খাদ্যতালিকা পেশ করতে পারলে ভালো হয়। সেই সঙ্গে ভ্রমণকালে এতগুলি মেয়ের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচ্য।

পত্রোত্তরে বিশদে সব কিছু জানালে আমাদের পক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

নমস্কারান্তে
ভবদীয়

(প্রধান শিক্ষিকা)

5. মাল সরবরাহের অর্ডার

ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি
১৪৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২
দূরভাষ ২২৪১ ৫৮৫৮

দিনাঙ্ক ১৯.০৩.২০০৮

পত্রাঙ্ক : ইবিএস/২১ জি ০৮
মেসার্স ক্যালকাটা ড্রেস মেকার্স লিমিটেড
৪৫ বাগমারি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

প্রসঙ্গ : উর্দি (ইউনিফর্ম) সরবরাহ

মহাশয়,

একটি সুবৃহৎ বেসরকারি সংস্থার বেয়ারা ও আর্দালিদের জন্য দু-মাসের মধ্যে প্রচুর পোশাক বা উর্দির অর্ডার আমাদের হাতে আছে। তবে আমাদের স্টকে যা মজুত আছে তাতে কিছু পরিমাণ উর্দি কম পড়ছে। আপনারা দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে পোশাক বানানোর কাজে যুক্ত আছেন। আপনাদের সঙ্গে যদি আমাদের দর-দামে পোষায় তাহলে আপনাদের সংস্থাকে বেশ কিছু উর্দির ফরমাশ দিতে পারব।

পোশাক সংক্রান্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

১.	ফুলহাতা খাকি বুশশার্ট	২০ ইঞ্চি - ৩০ ইঞ্চি
২.	হাফহাতা খাকি বুশশার্ট	৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি
৩.	খাকি ড্রিল ট্রাউজার্স (কোমরের মাপ)	৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি

যথাসত্বর আপনাদের চলতি দরপত্র হাতে পাওয়ার পর সেটি বাজার-দরের সঙ্গে যাচাই করে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার জানিয়ে দেব। মাল সরবরাহের আগে ২০ শতাংশ অর্থ অগ্রিম দেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সব মাল সরবরাহ করা হয়ে গেলে পনেরো দিনের মধ্যে বাকি টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

নমস্কারান্তে
ভবদীয়

স্বাক্ষর
ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটির পক্ষে

শব্দার্থ ও টীকা

6. অর্ডার সরবরাহের ব্যাপারে দরপত্র দাখিল

ক্যালকাটা ড্রেস মেকার্স লিমিটেড

৬৫ বাগমারি রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ ২৫২৪ ১৮৭৮

তাং ২২ মার্চ ২০০৮

মেসার্স ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটি
১৪৮ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২

প্রসঙ্গ : উর্দি সরবরাহের ব্যাপারে চলতি দরপত্র দাখিল

মহাশয়,

আপনাদের প্রেরিত ১৯.০৩.২০০৮ তারিখের ইবিএস/২১জি ০৮ সংখ্যক পত্রের জন্য ধন্যবান। আপনারা ওই পত্রে উর্দি সরবরাহের যে ফরমাশের কথা বলেছেন সেই ব্যাপারে আমাদের চলতি দরপত্র নীচে প্রদত্ত হল:

	মালের নাম	প্রতি ডজন
১.	ফুলহাতা খাকি বুশশার্ট (২০ ইঞ্চি - ৩০ ইঞ্চি)	১২০০ টাকা
২.	হাফ হাতা খাকি বুশশার্ট (৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি)	১০০০ টাকা
৩.	খাকি ড্রিল ট্রাউজার্স (কোমর ৩০ ইঞ্চি - ৪৫ ইঞ্চি)	১৭৫০ টাকা

আপনাদের অর্ডার পাওয়ার পর দু'সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হবে। মালের ফরমাশের সঙ্গে আপনাদের প্রস্তাবমতো মোট দামের ২০ শতাংশ টাকার ব্যাংক ড্রাফট পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানাই। আরও জানানো হচ্ছে মাল ডেলিভারির ৭ দিনের মধ্যে নগদে পুরো পাওনার টাকা মিটিয়ে দেওয়া হলে আমাদের তরফে ৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

পোশাক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের কারিগরি দক্ষতা ও সততা সুবিদিত। আমরা নিশ্চিত যে আপনাদের পুরোপুরি সন্তুষ্টিবিধান করতে পারব। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ সংস্থার অর্ডার অতিশয় যতনসহকারে ও দ্রুততার সঙ্গে মানসম্মতভাবে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা সমর্থ।

ধন্যবাদান্তে
ভবদীয়

(এস. কে. সেন)
ক্যালকাটা ড্রেস মেকার্স লি:-এর পক্ষে

7. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্ডার সরবরাহ করতে পারার অসুবিধা জানিয়ে পত্র

গুডলাক ইলেকট্রিকাল প্রোডাক্টস

২২, রাধাবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১

দিনাঙ্ক ১৯.০৩.২০০৮

মেসার্স চ্যাটার্জি ইলেকট্রনিক্স
জি.টি. রোড, (পশ্চিম)
আসানসোল - ৪

বিষয় : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল সরবরাহে অপারগতা

মহাশয়,

আপনাদের প্রেরিত ১৭.০৪.০৮ তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। ওই পত্রে আপনারা ২০০৮-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিম্নলিখিত মাল সরবরাহের ফরমাশ জানিয়েছেন—

১.	খৈতান সিলিং ফ্যান ৪৮ ইঞ্চি	১০০ খানি
২.	পোলার সিলিং ফ্যান ৪৮ ইঞ্চি	১০০ খানি
৩.	ওরিয়েন্ট টেবিল ফ্যান ১৪ ইঞ্চি	৫০ খানি

গ্রীষ্মের মরশুম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে পাখার চাহিদা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের স্টক দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদক কোম্পানি মালের ঠিকমতো জোগান দিতে পারছে না। তাই এত কম সময়ের মধ্যে আপনাদের ফরমাশ মতো মাল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। আপনাদের যদি মে (২০০৮) মাসের শেষ বরাবর ওইসব মাল পেলে চলে তবে অনুগ্রহ করে তা জানালে আপনাদের ফরমাশ অনুযায়ী সব পাখা সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। সত্বর আপনাদের অভিমত জানালে আমরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারব।

আপনাদের সন্তুষ্টিবিধানে আমরা সদা তৎপর আছি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরমাশ মতো মাল সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে না বলে আপনাদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে আপনারা চাইলে আমরা ৩১ মে ২০০৮-এর মধ্যেই পুরো মাল সরবরাহের আশ্বাস দিতে পারি।

আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

ধন্যবাদান্তে

ভবদীয়

স্বাক্ষর
গুডলাক ইলেকট্রিকাল প্রোডাক্টস-এর পক্ষে

৪. ব্যাংকে ওভারড্রাফট্ সুবিধার জন্য অনুরোধ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২২৪১ ৯৪৩১, ২২৪১ ৬৪২০

জুন ২৭, ২০০৯

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
কলেজ স্ট্রিট শাখা

প্রসঙ্গ : ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধার জন্য আবেদন

মহাশয়,

আমরা কলকাতার অন্যতম প্রাচীন প্রকাশক ও বিক্রেতা। দীর্ঘ তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে আপনাদের শাখায় আমাদের কয়েকটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টে (নম্বর যথাক্রমে এস বি ২৪৭০, এস বি ৯৮৩৫, সি এ ১৫৬০৭) লেনদেনের কাজ হয়ে থাকে। আমাদের বইয়ের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে একসঙ্গে বেশ কিছু বই ছাপার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাগজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর অনেকটাই নগদে কিনতে হয়। সে কারণে আমাদের তহবিলে মাঝেমাঝেই ঘাটতি দেখা দেয়।

এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমাদের পরিচালন পর্ষদ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের গুদামে মজুত মাল বন্ধকের বিনিময়ে প্রয়োজন অনুসারে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা টাকার অতিরিক্ত অর্থ ধার নেবার সুবিধার জন ব্যবস্থা করতে। আপনাদের ব্যাংকের প্রচলিত শর্তসাপেক্ষে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ওভারড্রাফট গ্রহণের সুবিধা দেবার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের এই প্রস্তাব যথাসত্বর অনুমোদন করে এ ব্যাপারে আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরম ও অন্যান্য দরকারি কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে বিশেষভাবে অনুগৃহীত বোধ করব।

নমস্কারান্তে

ভবদীয়

(এস. এন. রায়)
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
লিমিটেডের পক্ষে

9. সামাজিক পত্র (কোনো অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : (০৩৩) ২৩৫০ ৩৭৪৩

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৮ শ্রাবণ ১৪১৬ (২৫ জুলাই ২০০৯) শনিবার বিকেল পাঁচটায় পরিষৎ-সভাঘরে পরিষদের ১১৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাদিবসের ভাষণ প্রদান করবেন অধ্যাপক সুবিমল সেন।

বিষয় : বিজ্ঞান ও সাহিত্য।

সংগীত পরিবেশন করবেন দেবজিত্ ও ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পরিষৎ-সভাপতি অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কার।

স্বপন বসু

কলকাতা
১৫.০৭.২০০৯

সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পাঠগত প্রশ্ন : 25.3

1. আপনার অসুস্থতার জন্য অফিসে ৩ দিনের ছুটির আবেদন করুন।

2. চাকরির দরখাস্তে কী কী বিষয় থাকা উচিত?

25.4 আপনি যা শিখলেন

1. পত্ররচনার আবশ্যকতা;
2. পত্রের প্রধান দুটি শ্রেণি— ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক;
3. বৈষয়িক পত্রের বিবিধ বিভাগ;
4. চিঠির কাঠামো কেমন হওয়া উচিত;
5. ভালো চিঠির বৈশিষ্ট্য;
6. যথাযথভাবে পত্ররচনার রীতি এবং যে-কোনো চিঠি লেখার বেলায় তা ঠিকমতো প্রয়োগ।

শব্দার্থ ও টীকা

25.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ব্যক্তিগত পত্র আর বৈষয়িক পত্র রচনার ক্ষেত্রে মিল এবং পার্থক্যের বিষয়টি আলোচনা করুন।
2. হস্টেল থেকে মা-কে চিঠি লিখে লেখাপড়ার অগ্রগতির কথা জানান।
3. বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে বন্ধুকে চিঠি লিখুন।
4. ধূমপানের অপকারিতার কথা জানিয়ে ভাইকে চিঠি লিখুন।
5. মফস্‌ল থেকে কলকাতার পুস্তকবিক্রেতাকে কতকগুলি বই ভি.পি.পি.-তে পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখুন।
6. অসুস্থ নিকট আত্মীয়কে চিকিৎসার জন্য মুম্বাই নিয়ে যেতে হবে বলে অফিসে দু-সপ্তাহের ছুটির জন্য আবেদন করে চিঠি লিখুন।

25.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

25.1

25.3.1-এ দেওয়া চিঠিগুলি পড়ে উত্তর লিখুন।

25.2

25.3.2-এ দেওয়া চিঠিগুলি পড়ে উত্তর লিখুন।

25.3

25.3.3-এ দেওয়া চিঠিগুলি পড়ে উত্তর লিখুন।

26

সংক্ষিপ্তসার

26.1 প্রস্তাবনা

গদ্যের এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ কিংবা কবিতার এক বা একাধিক স্তবকের বক্তব্য-বিষয়কে সংক্ষেপে ও সহজভাবে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার কাজটাই হল সংক্ষিপ্তসার রচনা। সংক্ষিপ্তসারকে ইংরেজিতে বলে প্রেসি (précis)।

সংক্ষিপ্তসার এবং সারাংশ (Precis আর Substance) কিন্তু এক নয়। সারাংশ বা ভাবার্থে প্রদত্ত পাঠের কেন্দ্রীয় ভাবকে তুলে এনে তাকে সহজ ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হয়। সারাংশে কোনো শিরোনাম দিতে হয় না।

সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি প্রস্তুত করার ব্যাপারে যেসব সাধারণ সূত্র মনে রাখা দরকার সেগুলি হল —

(ক) প্রদত্ত পাঠটি বারকয়েক মন দিয়ে পড়ে নিয়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবটি ঠিকমতো বুঝে নিতে হবে।

(খ) প্রদত্ত পাঠটি গদ্যে বা পদ্যে কিংবা সাধু বা চলিত যাতেই লেখা হোক-না কেন সংক্ষিপ্তসারটি লিখতে হবে মান্য চলিত গদ্যে নিজের ভাষায়। প্রকাশভঙ্গি সরল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। মূল পাঠের বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। তাই রচনাটি হবে বাহুল্যবর্জিত।

(গ) প্রদত্ত পাঠটি উত্তমপুরুষ বা মধ্যমপুরুষের বয়ানে বর্ণিত হয়ে থাকলে সেটিকে প্রথম পুরুষে লিখতে হবে। পাঠে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলে শুধু তার মর্মটুকু পরোক্ষ উক্তিতে বলতে হবে। অলংকার থাকলে তা বর্জন করে সেখানকার আসল ভাবটুকু সহজ করে লিখতে হবে।

(ঘ) সংক্ষিপ্তসারটির আয়তন মূল পাঠের এক-তৃতীয়াংশের বেশি না-হওয়াই উচিত।

(ঙ) প্রদত্ত পাঠের মূল বক্তব্যটি যে-অংশে আছে সেটি বুঝে নিয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে এবং সংক্ষিপ্তসারের শিরোনামও হবে সেই অনুযায়ী।

26.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়বার পরে আপনি:

- সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি বলতে কী বোঝায় তা জানতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- সংক্ষিপ্তসার লেখার রীতিনীতি জানতে পারবেন;
- সংক্ষিপ্তসারের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার দক্ষতা অর্জন করবেন;
- মূল পাঠের আসল বক্তব্য যেখানে আছে তা খুঁজে নিয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে পারবেন;
- সংক্ষিপ্তসারের উপযুক্ত শিরোনাম দিতে পারবেন।

26.3 বিষয়ের রূপরেখা

একটি রচনাংশের সংক্ষিপ্তসার লেখার সূত্রাবলি:

26.3.1 প্রথম সূত্র :

রচনাংশের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করা। দৃষ্টান্ত:

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোশে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

এই অংশের মূল বক্তব্য বলা হয়েছে শেষ লাইনে— মাতৃভাষা মণিমাণিক্যপূর্ণ একটি খনির মতো।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.1

1. **নীচের উদ্ধৃতাংশের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করুন।**

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে

নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনিতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।

26.3.1 দ্বিতীয় সূত্র :

(১) সংক্ষিপ্তসার উত্তম বা মধ্যম পুরুষ নয়, লিখতে হবে প্রথম পুরুষে।

(২) সবরকম অলংকার ও বাহুল্যবর্জিত হতে হবে। দৃষ্টান্ত:

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

এখানে চিহ্নিত অংশগুলো অলংকার। এগুলো বর্জন করে সহজ ভাষায় লেখার নমুনা—

কঠোর জীবন সংগ্রামের কথা কবিতার কোমল ভাষায় বলা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন কঠোর গদ্যভাষা।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.2

1. **নীচের উদ্ধৃতাংশের মূল বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখুন। সব রকম অলংকার বর্জন করবেন।**

"হে ভারত ভুলিয়ো না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বলো— আমি ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, অজ্ঞান ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিনরাত, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্বলতা, আমার কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।"

26.3.1 তৃতীয় সূত্র :

সংক্ষিপ্তসার হবে মূল অংশের মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ। দৃষ্টান্ত:

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও
তার মতো সুখ কোথাও কী আছে,
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর।
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

এই অংশে মোট ৫৫টির মতো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্তসার লিখতে হবে অনধিক ২০টি শব্দে।

উদ্ধৃতাংশের সংক্ষিপ্তসার:

কেবল ব্যক্তিগত সুখলাভই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। এতে প্রকৃত সুখ নেই। পরের দুঃখ দূর করার মধ্যেই আছে জীবনের সার্থকতা।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.3

1. **নীচের উদ্ধৃতাংশের বিষয় এক তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন।**

অনুবীক্ষণ নামে এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখায়। বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে থাকিলেও ওই উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত্র বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড়ো বলিয়া পরিচিত, এইখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

26.3.1 চতুর্থ সূত্র :

প্রত্যেক সংক্ষিপ্তসারের একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিতে হয়। নীচে শিরোনাম সহ একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্তসারের নমুনা দেখুন—

বিশ্বে একটি বাহিরের দিক আছে, সেইদিকে সে মস্ত একটা বল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মে এদিক ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়, কুঁড়েমি করে, বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি, নিজেকে ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে। বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে। সকল জায়গায় সকলের আগে সে পৌঁছাতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তার পাতে। আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায়, তারা গিয়ে দেখে যে তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তটাই ফাঁকি। (অংশটি ১০০টি শব্দে লিখিত)

উদ্ধৃতাংশের সংক্ষিপ্তসার: এতে আছে (১) শিরোনাম, (২) অলংকার ও বাহুল্যবর্জিত, (৩) প্রধান বক্তব্যের প্রাধান্য, (৪) মূল অংশের এক তৃতীয়াংশ শব্দ।

বস্তুবিশ্ব নিয়মের অধীন

এই বিশ্বজগৎ নিয়মশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোথাও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বস্তুবিশ্বের নিয়মকে মেনে চললে তবেই কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। তাকে অগ্রাহ্য করলে ব্যর্থতা অবধারিত। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই প্রকৃতির বাধাকে লঙ্ঘন করা সম্ভব। এই নিয়ম যে মানে না সে দুরবস্থায় পড়ে।

পাঠগত প্রশ্ন : 26.4

1. **নীচের অংশটির একটি পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্তসার লিখুন।**

রামায়ণে যদি কোনো চরিত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে; কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, 'কোনো কোনো জলজন্তু যেমন স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।' কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোনো খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্যপাত করিতেছে। কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী।

26.4 আপনি যা শিখলেন

1. সংক্ষিপ্তসার বা প্রেসি বলতে কী বোঝায়;
2. সংক্ষিপ্তসার লিখিত হয় মান্য চলিত গদ্যে এবং প্রথম পুরুষের বয়ানে;
3. মূল পাঠে অলংকার বা বাগ্‌বিস্তার থাকলে তা পরিহার করে কেবল সার বক্তব্যটুকু উদ্ধার করা চাই;
4. মূল অংশের আসল বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে হয়, মূল অংশের এক তৃতীয়াংশ শব্দে সংক্ষিপ্তসার লিখতে হয়;
5. সংক্ষিপ্তসারের ঠিকমতো শিরোনাম দেওয়া চাই।

26.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচে প্রদত্ত অংশগুলির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করুন—

1. চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

2. কেন নিবে গেল বাতি
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসর রাতি
তাই নিবে গেল বাতি।
কেন ঝরে গেল ফুল
আমি বক্ষে জাগিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল
তাই ঝরে গেল ফুল।
কেন মরে গেল নদী
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি চারিধারে
চাহি তারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী।
কেন ছিঁড়ে গেল তার
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

3. আমরা সিঁড়ি
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে।

শব্দার্থ ও টীকা

তোমাদের পদধূলি ধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।
তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত—
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে
আর, চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত অত্যাচারী পদধ্বনি।
তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত,
আর, সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন।

4. আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙালিদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময় যে-সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাংলায় একঘরে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে-সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমনকি দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাংলা পুস্তক প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিতস্বভাবসুলভ দাম্ভিকতা সহকারে বিষয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন।

5. বঙ্গবাসী মাত্রই সজ্জন, বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শোনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বণিক; তাহারা আপনার সন্তানকে ভালো কাপড়, ভালো জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনার পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা। যাহাদের প্রতিবাসী নাই তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদের নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগল পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে অলংকার দেখাইবে, তারপরই ঋষিকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দরখাস্ত করিতে হইবে।

6. সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই— এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। . . . সংসারে সৌন্দর্যসম্পদে ভরা বসন্ত জানি আনে সঙ্গে করে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মালিকা-মালতী জাতি-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন। কিন্তু যে আবেষ্টনের

ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না, সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি— শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমি করিনি।

26.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

26.1

1. শ্রমশক্তির দ্বারাই সভ্যতার অগ্রগতি হয়।

26.2

1. প্রকৃত ভারতবাসীর কাছে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র সমাজের সব অংশের মানুষই এক। কাপুরুষতা দুর্বলতা মুক্ত হোক ভারতবাসী।

26.3

1. বিদ্যাসাগরের উন্নত জীবনের কাছে অন্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের ম্লান দেখায়। তাঁর মতো উচ্চতায় পৌঁছানো বুঝি সম্ভব নয়। সমাজের চারদিকে ক্ষুদ্রতার ক্ষধ্যে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব অতুলনীয়।

26.4

1. রামায়ণের আদর্শ চরিত্র ভরত

ভরতই রামায়ণের আদর্শ চরিত্র। রামের বালি বধ, লক্ষ্মণের রূঢ় বাক্য, লক্ষ্মণের প্রতি সীতার কটূক্তি, কৌশল্যাকে দশরথের ভর্ৎসনা প্রভৃতি ত্রুটি দেখা যায়। কিন্তু ভরত আগাগোড়া নিষ্কলঙ্ক। তাই রামায়ণ মহাকাব্যে ভরতের চরিত্রই শ্রেষ্ঠ।

27

প্রতিবেদন রচনা

27.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি আপনারা পড়লেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখাও জানতে পারলেন। বাংলা ভাষার শব্দ পরিচয় ও বাক্যগঠন পদ্ধতি আপনারা জেনেছেন। বাংলা লেখার সাধু ও চলিত রীতির পরিচয়ও আপনারা পেয়েছেন। সাহিত্যিক গদ্যের পাশাপাশি কাজের গদ্যের নমুনাও এবার আপনারা দেখবেন। বিভিন্ন সময়ে নানা ঘটনা, পরিস্থিতি ও সমস্যা ইত্যাদি জানা ও সাধারণকে জানানোর জন্য প্রতিবেদন রচনার প্রয়োজন হয়। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

27.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি:

- প্রতিবেদন কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন।
- প্রতিবেদন লেখার প্রয়োজনীয়তা জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিবেদন লিখতে শিখবেন ও প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারবেন।

27.3 বিষয়ের রূপরেখা

27.3.1 প্রতিবেদন কাকে বলে

দেশে বিদেশে বা এলাকায় প্রতিনিয়ত নানা ঘটনা ঘটে চলেছে, নানা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সব বিষয় জানবার জন্য মানুষ উৎসুক থাকে। তা জানাবার জন্য লিখতে হয় রিপোর্ট বা প্রতিবেদন। প্রতিবেদন নানা প্রকারের হতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যেমন প্রতিবেদন রচনা করা হয় তেমনি শ্রাব্য মাধ্যম বা রেডিও-তে শোনার জন্য প্রতিবেদন রচনা করা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে শুনেই যাতে বোঝা যায় এমনভাবে তা রচিত হয়। আবার দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম বা টেলিভিশনে শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা বা পরিস্থিতির জীবন্ত চিত্র ফুটে ওঠে। ফলে সে প্রতিবেদনে পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 27.1

1. প্রতিবেদন কেন লেখা হয়— একটি বাক্যে লিখুন।

2. কোন্ কোন্ মাধ্যমের জন্য প্রতিবেদন রচনা করা হয়?

27.3.2 প্রতিবেদনের উপযোগিতা

বর্তমানে প্রতিবেদনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। তা সমাজ ও জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে। প্রতিবেদক একটি সমিতিই হোক কিংবা জনৈক ব্যক্তিই হোন তাঁরা বিষয়টির জানা-অজানা সকল তথ্যই খুঁজে বের করেন। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে ঘটনা বা সমস্যার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটিত করেন। এই সকল তথ্য, সাক্ষাৎকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে ঘটনা বা পরিস্থিতি বা সমস্যার উৎস, মূল কারণ ইত্যাদিতে উপনীত হন। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষের ভুলত্রুটি নির্দেশ করেন। এই সব বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রস্তাব বা সুপারিশ তাঁরা পেশ করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা থেকে তাঁদের কর্তব্যের দিক্ নির্দেশ লাভ করেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 27.2

1. সঠিক উত্তরে টিক দিন—

(ক) প্রতিবেদন রচনার বিশেষ গুরুত্ব নেই। (হ্যাঁ / না)

(খ) প্রতিবেদন রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। (হ্যাঁ / না)

(গ) প্রতিবেদন রচনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজন নেই। (হ্যাঁ / না)

(ঘ) প্রতিবেদনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করা হয়। (হ্যাঁ / না)

2. প্রতিবেদন কাকে বলে?

3. প্রতিবেদন রচনা করে কে?

27.3.3 প্রতিবেদনের প্রধান প্রধান দিক

(ক) কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা, জ্বলন্ত সমস্যা, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, বিতর্কিত বিষয়, নিয়মনীতি বহির্ভূত কাজই হচ্ছে প্রতিবেদনের বিষয়।

(খ) ঘটনা বা পরিস্থিতির যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখা, এবং তার উৎস খুঁজে বের করার জন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তি বা একটি সমিতিকে প্রতিবেদন রচনার ভার দেওয়া হয়।

(গ) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাবতীয় খোঁজখবরের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনে সমস্যার গভীরে যাওয়া ও তার জটিল গ্রন্থি মোচন করা সম্ভব হয়।

(ঘ) প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য দলিলে পরিণত করার জন্য সকল সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ঙ) ধীর স্থির পক্ষপাতহীন বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদকরা যে সব সিদ্ধান্তে আসেন, তা তাঁদের প্রস্তাব বা সুপারিশের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

(চ) কোনো কোনো সময় সাময়িক বিষয়ের উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা না করতে পারলে তার প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হয়।

27.3.4 প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি

প্রতিবেদন রচনার জন্য বিষয় অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করে তা ধাপে ধাপে কার্যকর করতে হবে।

(ক) প্রতিবেদন রচনায় প্রথম যে কথা মনে রাখতে হবে তা হল, বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সময় সর্বদা মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

(খ) উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মপ্রক্রিয়ার একটি রূপরেখা আগেই তৈরি করে নেওয়া।

(গ) প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি, ম্যাপ, রেখাচিত্র, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে নেওয়া।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সব মানুষকে আহ্বান করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের বক্তব্য জানা, বিভিন্ন পক্ষের মতামত গ্রহণ করা।

(ঙ) এইভাবে যে সব তথ্য, প্রমাণ, পরিসংখ্যান মিলবে সেগুলি বিশ্লেষণ করে সারণি প্রস্তুত করা।

(চ) সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণের পর যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে এবং যে সব প্রস্তাব বা সুপারিশ করা হবে তার একটি খসড়া প্রস্তুত করা।

(ছ) সব শেষে যে প্রতিবেদন তৈরি হবে তার সঙ্গে যাবতীয় সাক্ষ্য, ইত্যাদির কাগজপত্র, ছবি, পরিসংখ্যান, তথ্য যুক্ত করে সকল সদস্যের স্বাক্ষর সহ পেশ করা।

পাঠগত প্রশ্ন : 27.3

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন—

(১) প্রতিবেদনে সমস্যার __________ পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।

(২) প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য দলিলে পরিণত করতে প্রয়োজন সাক্ষ্য এবং __________।

(৩) প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য __________ মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৪) প্রতিবেদনের ভাষা __________ ও __________ হওয়া চাই।

(৫) প্রতিবেদনে যে সব সুপারিশ বা প্রস্তাব দেওয়া হবে চূড়ান্ত করার আগে তার একটি __________ করা চাই।

27.3.4 প্রতিবেদনের নমুনা

আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন

সম্প্রতি বীরভদ্র জেলার নক্সিপুর মহকুমার অঞ্জনগড় পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত হয়ে শতাধিক পুরুষ, মহিলা ও শিশুর মৃত্যু ঘটায় রাজ্য সরকার ১৪/১২/০৮ তারিখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন

শব্দার্থ ও টীকা

করেন। ছয় সদস্য বিশিষ্ট এই তদন্ত কমিটিতে জনস্বাস্থ্য দপ্তর, নগরোন্নয়ন দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার দুজন করে প্রতিনিধি ছিলেন। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই কমিটির সদস্য-সচিব হন। ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। কমিটির বিচার্য বিষয় —

১) কী কী কারণে এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং এত মানুষের মৃত্যু ঘটল তা খতিয়ে দেখা।

২) কোনো কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি গাফিলতি ঘটেছে কি না তা নির্দেশ করা।

৩) ভবিষ্যতে যাতে এমন মহামারির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার সুপারিশ করা।

গত ১৪/০২/০৯ তারিখে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

পেশ করা প্রতিবেদন :

তদন্ত কমিটি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে, বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে জনশুনানি গ্রহণ করে, মৃত ব্যক্তিসমূহের পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ও কথা বলে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন।

আক্রান্ত অঞ্চল —

৫ নং ওয়ার্ডের ৩টি কাঁচা বস্তি।

১৪ নং ওয়ার্ডের ময়লা খালের সংলগ্ন ৬৫টি ঝুপড়ি।

১৭ নং ওয়ার্ডের রেললাইনের পার্শ্ববর্তী কলোনি

(এ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্য, মৃতদের নাম ধাম ইত্যাদি পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।)

এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা :

এলাকাগুলিতে অত্যন্ত দরিদ্র মানুষের বাস। পুরুষদের একাংশ ছোটো ছোটো কারখানায় সামান্য মজুরিতে অনিয়মিতভাবে কাজ করেন। যা রোজগার করেন তাতে পরিবারের ৫ থেকে ৭ জনের দুবেলা ভাত বা রুটির সংস্থান হয় না। এলাকার অধিকাংশ অসংগঠিত শ্রমিক। তাঁরা রিক্সা বা ঠেলা চালান, মোট বহন করেন কিংবা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন।

মহিলাদের অনেকে সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজ করে কিছু রোজগার করেন। বৃদ্ধ ও শিশুদের একাংশ আবর্জনাকুণ্ড থেকে কাগজ, প্লাস্টিক ইত্যাদি সংগ্রহ করে সামান্য কিছু উপার্জন করেন।

বাসস্থান ও পরিবেশগত সমস্যা :

এদের বাসস্থানগুলি পরস্পর সংলগ্ন, মেঝে ও দেওয়াল মাটির, মাথায় খাপরা বা টালির চাল। খোলা জায়গা বলতে বিশেষ কিছু নেই, ঘরে আলো-বাতাস বিশেষ প্রবেশ করে না। এক একটি অপ্রশস্ত ঘরে পুরো পরিবার বাস করে। এক চিলতে জায়গায় কাঠকুটো, পোড়া কয়লা জ্বালিয়ে রান্না হয়। কোনো কোনো বারান্দায় ছাগল মুরগিও পোষা হয়।

১৫/২০টি পরিবার পিছু এক একটি সাধারণ শৌচাগার। শিশুরা নালা-নর্দমাতে মলত্যাগ করে। পয়প্রণালী অধিকাংশ কাঁচা, পাকাগুলিও খোলা। সেখানে সারা বছরই ময়লা জল জমে থাকে, মশা মাছি ভনভন করে। সাধারণ স্নানাগারে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, স্নান সবই হয়। পরিশ্রুত পানীয় জল অপ্রতুল। আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ অপসারণের নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। ফলে তা জমে থাকে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অবস্থা :

এলাকার অধিকাংশ শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত। রোগে ডাক্তার দেখানো ও ঔষধ কেনার সামর্থ্য অনেকেরই নেই। উদ্যোগ ও সচেতনতার অভাবও রয়েছে। গুরুতর ব্যাধিতে লোকে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়। কিন্তু সেখানে রোগীর তুলনায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা খুব কম। স্বাস্থ্যকর্মীদের গৃহে গৃহে পরিদর্শনও অনিয়মিত। স্বাস্থ্যবিধি পালনের সময় ও সামর্থ্যেরও অভাব রয়েছে।

রোগ বিস্তার ও মৃত্যুর কারণসমূহ :

উপরে বর্ণিত অবস্থাই আন্ত্রিক মহামারির মূল কারণ। প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি না মানার ফলে রোগ বিস্তার লাভ করেছে। অপুষ্টির জন্য একের পর এক শিশু দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মৃত্যু ঘটেছে। মৃতদের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষ এলাকাকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য আবর্জনা সরানো, বদ্ধ জল অপসারণ, ড্রেন পরিষ্কার বা ব্লিচিং ছড়ানো ইত্যাদি কাজকে আপৎকালীন ভিত্তিতে গ্রহণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

প্রস্তাব বা সুপারিশ সমূহ :

সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে কমিটি মনে করে যে —

(1) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে অবিলম্বে আরও শক্তিশালী করার জন্য পরিকাঠামো উন্নত করা, স্থায়ী অস্থায়ী শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা, ডাক্তার নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক।

(2) স্বাস্থ্য সেবিকারা যাতে সপ্তাহে অন্তত একবার করে সমস্ত পরিবার পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ রোগ প্রতিরোধমূলক ঔষধ বিতরণ, রোগ দেখা দেওয়ার শুরুতে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কাজে তৎপর হন সেদিকে নজর দেওয়া হোক।

(3) জনস্বাস্থ্য আধিকারিক যাতে প্রতিনিয়ত সমস্ত অঞ্চলের রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন সেদিকে নজরদারির ব্যবস্থা হোক।

(4) ৩/৪টি পরিবারপিছু একটি করে স্যানিটারি পায়খানা সরকারি ব্যয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হোক।

(5) নলকূপের সংখ্যা দ্বিগুণ করা, পাকা ও ঢাকা নর্দমা নির্মাণ করা, নিয়মিত বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার জন্য পৌরসভা উদ্যোগী হোন।

(6) শিশুদের ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করা হোক।

(7) অবিলম্বে বাসস্থানের সংলগ্ন অঞ্চলে শূকর, ছাগল, মুরগি পোষা নিষিদ্ধ করা হোক।

(8) বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে বহুতল পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা হোক।

(9) বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক-উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যেমন —

(ক) রিক্সা, সেলাই কল, ছোটোখাটো মেশিন বিনামূলে বিতরণ

(খ) বিনা সুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং অনুদানের ব্যবস্থা

(গ) সমবায় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা।

পরিশিষ্ট :

(1) বিভিন্ন তথ্যাবলি, চিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা

(2) বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপিসমূহ।

(3) বিভিন্ন ব্যক্তির জবানবন্দি।

(4) এলাকার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(1) সদস্য সচিব	(2) সদস্য	(3) সদস্য
____________	____________	____________
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
(4) সদস্য	(5) সদস্য	(6) সদস্য
____________	____________	____________
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

এতক্ষণ আপনারা যে প্রতিবেদনটি পড়লেন সেটি একটি সমিতি কর্তৃক রচিত। এর থেকে আপনারা প্রতিবেদনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, তা রচনার পদ্ধতি অনুধাবন করতে পারলেন। এবার জনৈক ব্যক্তির দ্বারা রচিত একটি প্রতিবেদনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

মহামায়া কলোনিতে অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ জানুয়ারি পূর্বরেলের বিদ্যানগর স্টেশনের পার্শ্ববর্তী মহামায়া কলোনি নামক বস্তিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪৫০টি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একজন জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন। আশ্রয় হারিয়েছেন অন্তত দু'হাজার মানুষ। তাদের জামাকাপড়, বিছানাপত্র, বাসনকোসন, সংসারের যাবতীয় আসবাব তৈজসপত্র, যৎসামান্য গহনাগাটি, টাকাপয়সা ইত্যাদি সর্বস্ব সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই।

ঘটনার পরপরই ওই অঞ্চলে গিয়ে দেখা গেল কয়েক সহস্র মানুষ চারনম্বর রেললাইনের উপর অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কোনো মহিলা অবিরাম কান্নাকাটি করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় — দুপুরে যখন বাড়িতে বাড়িতে রান্না চলছিল তখন একটি বাড়িতে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তারপর একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগে। পৌষমাসের শুকনো উত্তুরে হাওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে একের পর এক গ্যাসের সিলিণ্ডার ফাটতে থাকায় আগুন ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। দাহ্য পদার্থ— বাঁশ, কাঠ, প্লাস্টিক ইত্যাদি— দ্রুত জ্বলে ওঠে।

দমকলের তিনটি ইঞ্জিন কিছুক্ষণের মধ্যে এসে অগ্নিনির্বাপণের কাজ শুরু করে। কিন্তু কিছু দুষ্কৃতী দেরিতে আসার অজুহাত তুলে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে তাদের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। আগুনকে আয়ত্তে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা দমকল করতে থাকে। কিন্তু একদিকের আগুন নিভতে না নিভতে অন্যদিকে জ্বলে ওঠে। অবশেষে শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আরও ২১টি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। কিন্তু কলোনি ও সংলগ্ন বাজারটি পুরো ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে সংলগ্ন অঞ্চলের কয়েকশত বাড়ি ও হরিশচন্দ্র মার্কেটটি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আগুন লাগার কারণ এখনও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। কেউ কেউ মনে করে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য পুলিশ ও দমকল বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি রাজ্যসরকার গঠন করেছেন। সাত দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ভস্মস্তূপ থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন।

সর্বস্বহারা গৃহহীন পরিবারগুলিকে আপাতত অস্থায়ীভাবে ডাক ও তার বিভাগের আবাসনের সামনের মাঠে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকার ও পুরসংস্থার তরফ থেকে তাদের পলিথিনের তাঁবু, রান্না করা খাবার, শীতবস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে, ছাত্রছাত্রীদের বই খাতাপত্র পুড়ে গিয়েছে। ছাত্র সংগঠন নতুন বই খাতা কিনে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

পুড়ে যাওয়া জায়গায় নতুন করে বাড়ি তৈরি করে দেবার জন্য রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন বিভাগ উদ্যোগী হয়েছে।

বিশ্লেষণ :

এতক্ষণ আপনারা প্রতিবেদনের দুটি দৃষ্টান্ত পাঠ করলেন। দৃষ্টান্তদুটি ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন —

প্রথমটি প্রণয়ন করেছে একটি সমিতি। এই সমিতির ছয়জন সদস্য। একজন সদস্য-সচিব, আর পাঁচজন সাধারণ সদস্য। এঁরা সকলে মিলে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন, সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, বিভিন্নভাবে মতামত গ্রহণ করেছেন। সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন। প্রতিবেদনের সঙ্গে সমস্ত তথ্য, বিবরণ, মূল দলিল ইত্যাদি যুক্ত করেছেন। প্রতিবেদনে সকল সদস্য স্বাক্ষর করেছেন।

দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন এক ব্যক্তি। এটি একটি অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবেদন। প্রতিবেদক ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন। আগুনের বিস্তৃতি ও ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা তুলে ধরেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন, অগ্নিনির্বাপণ ও তার সমস্যার কথা বলেছেন। পরবর্তী অবস্থা ও ব্যবস্থার কথাও জানিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রতিবেদন দুটিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা সাহিত্যিক ভাষা নয়, এটি কাজের ভাষা।

27.4 আপনি যা শিখলেন

- আপনি শিখলেন, প্রতিবেদন কত রকমের হতে পারে
- প্রতিবেদন রচনার জন্য কী কী প্রস্তুতি নিতে হবে
- প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য কী কী করা প্রয়োজন
- প্রতিবেদনে প্রস্তাব বা সুপারিশ কী ভাবে লিখতে হয়
- সরকার নিয়োজিত সমিতির প্রতিবেদনে কাদের স্বাক্ষর থাকে

27.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?
2. সমিতির প্রতিবেদন ও ব্যক্তিগত প্রতিবেদনের পার্থক্য কী?
3. প্রতিবেদন রচনার জন্য ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন কী?

4. প্রতিবেদন রচনার জন্য কী কী সাক্ষ্য প্রমাণ প্রয়োজন?

5. কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড বর্ষণ হল, জল সরল না, এলাকা জলমগ্ন রইল। কারণ প্লাস্টিক জমা হয়ে নালা নর্দমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

6. এই মরশুমে যেমন গরম তেমনি শীত প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হল। এদিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কোপেনহেগেনে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন হয়ে গেল। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

27.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

27.1

1. ঘটনা, পরিস্থিতি, সমস্যার কথা জানানোর জন্য

2. সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন

27.2

1. (ক) না

(খ) হ্যাঁ

(গ) না

(ঘ) হ্যাঁ

2. ঘটনা ইত্যাদির বিবরণ

3. সমিতি বা ব্যক্তি

27.3

(১) উৎসে

(২) তথ্য

(৩) সব পক্ষের

(৪) স্পষ্ট, সরল

(৫) খসড়া

28

অফিসের ফাইলে নোট দেওয়া

28.1 প্রস্তাবনা

অফিসে যেসব কাজকর্ম হয় এবং নানা বিষয়ে যেসব চিঠিপত্র আসে সে-সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও ওইসব চিঠির উত্তর সবই নথিভুক্ত করে রাখতে হয়। এভাবেই দপ্তরে কোন্ সময়ে কী সব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল কিংবা নানা মহল থেকে প্রাপ্ত আবেদন বা অনুরোধ বা অভিযোগ সম্পর্কে কী ধরনের বিবেচনা ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সে-সমস্তই নথিতে রেকর্ড হয়ে থাকে। এর থেকে যেমন আগেকার কাজের ধারা বুঝতে পারা যায় তেমনি পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধেও দিশা মেলে।

এছাড়া, দপ্তরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও—বিশেষ করে কর্মী নিয়োগ, বিভিন্ন পদের বেতনকাঠামো, পদোন্নতি, বদলি, ছুটির হিসাব ইত্যাদি— নথি তৈরি করার দরকার হয়।

অনেক সময় এক দপ্তরের সঙ্গে অন্য দপ্তরের যোগাযোগ করা ও মতামত নেওয়ার জন্যও ফাইল চালাচালি করতে হয়।

এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ফাইল খোলা চাই। সেই সেই ফাইলে শুধু সেই সেই সংক্রান্ত কাগজপত্রই রাখতে হবে। প্রতিটি ফাইল একটি পুরু কভারে ফ্ল্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা থাকে। ফাইলের দুটি ভাগ—নোটশিট বা মন্তব্যপত্র আর প্রাপ্ত ও প্রেরিত চিঠিপত্র।

28.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পরে আপনারা:

- অফিসে কী জন্য ফাইল তৈরি করতে হয় তা জানতে পারবেন;
- কী কী কারণে ফাইল খোলা হয় তা জানতে পারবেন;
- ফাইলের দু-টি ভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন;
- নিজেদের অফিসে ফাইল খুলতে পারার ব্যাপারে সামর্থ্য অর্জন করতে পারবেন;
- ফাইলে নোট দেওয়ার কৌশল শিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

28.3 বিষয়ের রূপরেখা

28.3.1 ফাইলের গঠন

ফাইল বা নথি প্রস্তুত করার ব্যাপারে কতকগুলি রীতি মেনে চলার দরকার হয়।

বিশেষত সরকারি দপ্তরে ফাইলের কভারে উপরের ডানদিকে নথিসংখ্যা ও বৎসরের উল্লেখ থাকবে। তারপর মাঝ বরাবর রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট বিভাগ আর সেই বিভাগের শাখার নাম লেখা হয়। তার নীচে থাকবে নথির বিষয় বা subject-এর উল্লেখ। এই বিষয়টি ঠিকমতো স্পষ্টভাবে রচিত হওয়াটা বিশেষ জরুরি।

ফাইলের দু-টি ভাগ থাকে।

(ক) সাধারণত যে-চিঠি কিংবা নোটের ভিত্তিতে নথিটি খোলা হয় সেই চিঠি (বা নোট) এবং তার উত্তর ও পরবর্তী নানা চিঠিচাপাটি ফাইলের তৃতীয় কভারের সঙ্গে একটি ট্যাপ দিয়ে গেঁথে রাখা হয়। নীচের দিক থেকে প্রতিটি কাগজে ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বসানো হয়।

(খ) নথির অপর অংশটি হল নোটশিট বা মন্তব্যপত্র। কোনো দপ্তর বা তার শাখার নাম মুদ্রিত-করা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের একটি নোটশিট দিয়ে ফাইল লেখা শুরু হয়। নোটশিটের বাঁ-দিকের মার্জিন বরাবর একটি খাড়া লাইন টানা থাকে। ওই নোটশিটের দুই পৃষ্ঠা ভরতি হয়ে গেলে আদালা একটি কাগজ নেওয়া হয়, তবে তার মাথায় দপ্তর বা তার শাখার নাম ছাপা থাকার দরকার নেই যদিও মার্জিন কাটা থাকতে হবে। মন্তব্যপত্রে ফাইলের চিঠি বা নোট সংক্রান্ত বক্তব্য লিখে সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। নোটশিট বা মন্তব্যপত্র হল ফাইলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সাধারণত, কোনো অবরবর্গীয় (নিম্নপদস্থ) সহায়ক এই বক্তব্য লিখে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। অনুমোদিত হলে তখন পত্রোত্তরের একটি খসড়া বা ড্রাফট পেশ করেন ওই অবরবর্গীয় সহায়ক। খসড়ায় ঊর্ধ্বতন আধিকারিক সই (initial) করলে সেটি যথাযথ লেটারহেড কাগজে টাইপ করে আবার সেই আধিকারিকের স্বাক্ষরের (signature) জন্য পাঠানো হয়। স্বাক্ষরসহ চিঠিখানিতে দপ্তরের পত্রাঙ্ক ও দিনাঙ্ক বসিয়ে প্রাপকের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ফাইলের কাজ চলে।

ফাইলে নোট দেওয়ার সময় এইসব বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে—

- বিবেচনাধীন পত্রটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ও পরিষ্কারভাবে বিবৃত করতে হবে।
- একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ বর্জনীয়।
- বক্তব্য বিষয় অনুসারে মন্তব্যের অনুচ্ছেদ ভাগ করা চাই।
- বিবেচ্য পত্রটির অনুরোধ বা আবেদন বিবেচনা করে বিভাগীয় বা প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক যেসমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব তা যথাযথভাবে, প্রয়োজন হলে নজির সহ, উল্লেখ করতে হবে।
- নোটের ভাষা হবে সহজ ও স্পষ্ট। দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া চাই অপক্ষপাতমূলক। উত্তম পুরুষে লেখা চলবে না।
- নোটের শেষে অবশ্যই তারিখসহ নিজের সই (initial) দিতে হবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 28.1

1. ফাইল গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
2. ফাইলে নোট দেওয়ার সময় কী নিয়ম মেনে চলা দরকার?

28.3.1 বিষয়ের উদাহরণ

ফাইলে কীভাবে নোট দিতে হয় তার কতকগুলি নমুনা এবার দেখুন—

১. দপ্তরের একজন অবরবর্গীয় সহায়কের সান্ধ্য কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য অনুমতির আবেদন বিবেচনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি শাখা

নথিতে এই শাখার হিসাব সেকশানের অবরবর্গীয় সহায়ক শ্রীচঞ্চলকুমার রায়ের ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে উপসচিবকে লেখা পত্রটি দেখা যেতে পারে।

ওই পত্রে শ্রীরায় তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর অভিপ্রায়ে আগামী শিক্ষাবর্ষে গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সে সান্ধ্যকালীন ক্লাসে অ্যাকাউন্টেসি অনার্সসহ বি.কম পড়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন। তিনি উচ্চ মাধ্যমিকে বাণিজ্য শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি। এবার তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, যেহেতু অফিসের কাজের শেষে ছুটির পর তিনি ক্লাস করতে যাবেন তাতে তাঁর টেবিলের কাজ ঠিকমতো সম্পাদন করায় কোনো বিঘ্ন ঘটবে না। তিনি এতদিন যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে ও যথাসম্ভব দ্রুততায় তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করে এসেছেন এর পরেও ঠিক সেভাবেই সব কাজ করে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শ্রীরায়ের আবেদনটি বিবেচনা করে তিনি সান্ধ্য কলেজে ভরতি হওয়ার দরুন অফিসের কাজে কোনোরকম ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটবে না এই শর্ত মেনে চলা সাপেক্ষে তাঁকে অফিস ছুটির পর ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হল।
নী. সেন
সহায়ক
৭.২.০৭

শ্রীচঞ্চলকুমার রায়, অবরবগরীয় সহায়ক, হিসাব সেকশান, সংস্কৃতি শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, সান্ধ্য কলেজে বি.কম অনার্স পড়ার ব্যাপারে যে-অনুমতি চেয়েছেন তা নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করা যেতে পারে—

১. তিনি সান্ধ্য কলেজে ক্লাস করার ফলে অফিসে তাঁর কাজের কোনোরকম অসুবিধা বা ক্ষতি হবে না।

২. বিভিন্ন পার্টের শুধু পরীক্ষার দিনগুলির জন্য তিনি অর্জিত ছুটি নিতে পারবেন। তবে সেই সময় যদি অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকে তা হলে পরীক্ষা শেষে কয়েক দিন অতিরিক্ত সময় অফিসে থেকে সেই কাজ তুলে দিতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করে শ্রীরায়কে অনুমতিপত্র দেওয়া যেতে পারে।

উপসচিবের অনুমোদনের পর খসড়া পেশ করা হোক।

আ. সমাদ্দার
অ্যাকাউন্টস অফিসার
০৮.০২.২০০৭
ক. মজুমদার
সহসচিব
৮.২.০৭
পী. বন্দ্যোপাধ্যায়
উপসচিব
৯.২.০৭

উপরের আদেশ। খসড়া পেশ করা হল।
নী. সেন
সহায়ক
১০.২.০৭

খসড়া

পত্রাঙ্ক.......... দিনাঙ্ক............

শ্রীচঞ্চলকুমার রায়
অবরবর্গীয় সহায়ক
হিসাব সেকশান, সংস্কৃতি শাখা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

মহাশয়,

আপনার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখের পত্রে আগামী শিক্ষাবর্ষে বি.কম অনার্স পড়ার জন্য গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্সে সান্ধ্যকালীন ক্লাসে ভরতি হওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন।

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এই অনুমতি দেওয়া সম্ভব :

১. আবেদনকারী দিনের শেষে অফিসের ছুটির পর কোনো ক্লাসে যোগ দেওয়ার ফলে অফিসে তাঁর কাজের কোনোরকম ক্ষতি বা অসুবিধা যেন না ঘটে; এবং

২. শুধু বিভিন্ন পার্টের পরীক্ষার দিনগুলিতে অনুপস্থিতির জন্য আবেদনকারীকে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে, তবে ওই সময় যদি অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকে তাহলে তাঁকে পরীক্ষা শেষে যে-কদিন লাগে অতিরিক্ত সময় অফিসে থেকে সেই কাজ তুলে দিতে হবে।

আপনি লিখিতভাবে উপরোক্ত শর্তে স্বীকৃতি জানালে তবেই আপনাকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য সান্ধ্য

কলেজে ভরতি হওয়ার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

ভবদীয়
পী. বন্দ্যোপাধ্যায়
উপসচিব (সংস্কৃতি)
তাং..........

২. একটি জেলা মেলায় সরকারি স্টল দেওয়ার জন্য আবেদন বিবেচনা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কৃষি বিভাগ
কৃষি আধিকার

নথিতে রক্ষিত বিবেচ্যপত্রখানি দেখা যেতে পারে। এটি প্রেরিত হয়েছে 'জলপাইগুড়ি মেলা' কর্তৃপক্ষের তরফে। ১০ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে জলপাইগুড়ি মেলার আহ্বায়ক কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অধিকর্তার কাছে লিখিত এই পত্রে আগামী ১৪-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ অনুষ্ঠেয় দশ দিনের ওই মেলায় রাজ্যের কৃষি বিভাগের একটি স্টল স্থাপনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এটি মেলার দ্বাদশ বৎসর। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও সেখানকার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে মেলাটি বসবে। এটি একটি অবাণিজ্যিক উদ্যোগ। এখানে প্রতিদিন বিবিধ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানারকম শিক্ষামূলক আলোচনা (যথা : সাক্ষরতা, পরিবেশ ভাবনা, রোগ প্রতিরোধ, কুসংস্কার মোচন প্রভৃতি) আয়োজিত হবে, সেই সঙ্গে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও থাকবে। প্রতি বছরের মেলাতেই আমাদের কৃষি বিভাগ ছাড়াও রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তরও যোগ দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি মন্ত্রক থেকেও স্টল দেওয়া হয়। কিছু বেসরকারি উদ্যোগ এবং স্থানীয় অনেক সংস্থার স্টলও থাকে। কলকাতার ও স্থানীয় পুস্তকব্যবসায়ীরাও স্টল খোলেন। দশ দিনের মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয় এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্টলে উৎসাহী দর্শক ভিড় করেন বলে দাবি করা হয়েছে।

কৃষি বিভাগ থেকে আগের আগের বারের মতো গত বৎসরও জলপাইগুড়ি জেলায় স্টল স্থাপন করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট নথিখানি এই সঙ্গে নীচে রাখা হল। ৫০০ স্কোয়ার ফুট জায়গার উপর এই স্টল নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন খরচ ধরে অর্থবিভাগ থেকে নির্ধারিত খাতে মোট ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত বছর সাকুল্যে ১,২৩,৮৩৫ টাকা খরচ হয়েছিল এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয়সাধনপূর্বক উদ্‌বৃত্ত ১,১৬৫ টাকা অর্থবিভাগে ২৫ জুন ২০০৯ তারিখে জমা দেওয়া হয়।

গত কয়েক বৎসরের মতো এই বছরেও আমাদের বিভাগ 'জলপাইগুড়ি মেলা'-য় যোগ দিতে পারে। এবারের খরচ কিছুটা বাড়বে অনুমান করে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মঞ্জুরের জন্য অর্থ বিভাগে নথি পাঠানো যেতে পারে।

খরচের দফাওয়ারি আনুমানিক হিসাব নীচে রাখা হল।

কৃষি অধিকর্তার বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হল।

ম. ঘোষ

শব্দার্থ ও টীকা

সহায়ক
১৬.১১.০৯

শ্যা. সাহা
সহ অধিকর্তা
১৭.১১.০৯
আ. রসিদ
উপ-অধিকর্তা
১৯.১১.০৯

৩. স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারে সদস্য মনোনীত করে আদেশ জারি

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের ফাইল)

পূর্বপৃষ্ঠার নোটে 'ক' চিহ্নিত অংশটি দেখা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী নদিয়া জেলার এল.এল.এ. (লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি)-তে এই বিভাগের ৮/২(৯ক) এবং ৮/২(৫) ধারা মোতাবেক মনোনীত প্রার্থীদের নাম অনুগ্রহপূর্বক অনুমোদন করেছেন।

এখন সেই অনুযায়ী নদিয়া জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার (লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি)-এ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে সদস্য মনোনীত করে সরকারি আদেশ জারি করা হোক।

ধারা	নাম ও ঠিকানা
৮/২(৯ক)	১. শ্রীবিভাস বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, নদিয়া জেলা প্রাথমিক সংসদ
	২. শ্রী এস.এম. সাদী ধর্মতলা লেন, মালোপাড়া ডাক : কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া
	৩. শ্রী মেঘলাল শেখ কানাই কুণ্ডু ভবন, ডাক : স্বরূপগঞ্জ জেলা - নদিয়া
	৪. শ্রীগৌর ঘোষ, রাধানগর ডাক : কৃষ্ণনগর, জেলা-নদিয়া
৮/২(৫)	১. শ্রীরাধাকান্ত বিশ্বাস দালালপাড়া লেন, রবীন্দ্রপল্লি, সূত্রাগড় ডাক : শান্তিপুর, জেলা-নদিয়া
	২. ড. বিমল বানি বি-২/১৫৫, ডাক : কল্যাণী, জেলা-নদিয়া

স্বা:
(বিভাগীয় প্রতিমন্ত্রী)
২২/১৯/০৯

মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী মহোদয়ের আদেশ দেখা যেতে পারে।

নীচে একটি খসড়া অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।

দে. সেন
সহায়ক
৬.১২.০৫

বি. সামন্ত
সহসচিব
৬.১২.০৫

যথা প্রস্তাবিত। খসড়া স্বাক্ষরিত হল।

আ. শ. গুপ্ত

উপসচিব

০৭/১২/০৫

৪. কলেজে দু-টি অশিক্ষক শূন্যপদ পূরণের আবেদন বিবেচনা

(প.ব. সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নথি)

পৃ. ৪১

পূর্বপৃষ্ঠায় শিক্ষা অধিকর্তার মন্তব্য দেখা যেতে পারে। রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া থেকে ১৮.১০.২০০০ তারিখে প্রেরিত পত্রে (পত্রখানি নথিমধ্যে রাখা আছে) উক্ত কলেজের দুটি অশিক্ষক পদ—প্রধান করণিক ও গাণনিক—কিছুকাল ধরে শূন্য পড়ে থাকায় সেগুলি পূরণের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে। শিক্ষা অধিকর্তা মহাশয় শিক্ষা বিভাগকে যথাসত্বর ওই শূন্যপদ দুটি পূরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। পদবিন্যাস সংক্রান্ত সংশোধিত বিধিতে ওই পদ দুটি পূরণে কোনো বাধা নেই বলেও শিক্ষা অধিকর্তা উল্লেখ করেছেন।

রামানন্দ কলেজ, বিষ্ণুপুর থেকে প্রাপ্ত পত্রে দেখা যাচ্ছে যে নিম্নোক্ত দু-টি শূন্য পদ পূরণের অনুমতি চাওয়া হয়েছে—

১. শ্রীঅদ্বৈত দাশগুপ্তের অবসর গ্রহণের ফলে ১.৪.৯৯ থেকে শূন্য হয়ে থাকা প্রধান করণিকের পদটি; এবং

২. শ্রীবিশ্বনাথ ব্যানার্জির অবসর গ্রহণের ফলে ১.৫.৯৮ থেকে শূন্য হয়ে থাকা গাণনিকের পদটি।

এই দুটি শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারে শিক্ষা অধিকর্তা মহাশয় সুপারিশও করেছেন। পদবিন্যাসের সংশোধিত বিধি অনুসারে উভয় পদই কলেজটির প্রাপ্য। পদ দুটি বেশ কিছু দিন শূন্য পড়ে রয়েছে।

কাজেই, শূন্যপদ দুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সেগুলির পূরণ বিধিসম্মত বিধায় বিষ্ণুপুরের রামানন্দ কলেজের প্রধান করণিক ও গাণনিকের পদ দুটি পূরণের প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

র.চ.

সহায়ক

২৭.১১.২০০০

শব্দার্থ ও টীকা

বি. ভট্টাচার্য
যুগ্মসচিব
২৮.১১.২০০০
দী. মুখোপাধ্যায়
সচিব
২৯.১১

উপরের নির্দেশমতো একটি খসড়া অনুমোদনের জন্য নীচে পেশ করা হল।

র.চ.
সহায়ক
৩.১২.২০০০

৫. ক্রমতালিকা (Gradation List) অনুসারে সরকারি কর্মীদের উচ্চতর পদে অন্য বিভাগে যোগদানের নির্দেশ দিয়ে আদেশনামা জারি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বরাষ্ট্র (কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগ

Home (Per) Deptt.

কমন ক্যাডার শাখা

আগামী ১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মীদের অবসরগ্রহণ জনিত ২২টি আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পদ আপাতত শূন্য হচ্ছে।

বিভিন্ন দপ্তর ও শূন্যপদের হিসাব নিম্নরূপ :

অর্থ (অডিট)	৩
অর্থ (গণন)	২
বিধানসভা সচিবের অফিস	২
রাজভবন সচিবের অফিস	১
উচ্চ শিক্ষা	২
বিদ্যালয় শিক্ষা	২
তথ্য ও সংস্কৃতি	২
শিল্প	৩
নগরোন্নয়ন	২
কৃষি	৩
	২২

এই বিভাগে রক্ষিত গ্রেডেশন লিস্ট বা ক্রমতালিকা অনুযায়ী এখন এই বাইশ জন অবরবর্গীয় সহায়ক পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় সহায়কের পদে উন্নীত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে রয়েছেন। এইসব কর্মীর ক্রমিক নাম এবং তাঁরা এখন যে যে দপ্তরে কর্মরত তার বিবরণ এরকম—

১. শ্রীপ্রিয়তোষ গঙ্গোপাধ্যায়	অর্থ (অডিট)
২. শ্রীঅনিন্দ্য রায়	অর্থ (অডিট)
৩. শ্রীমতী মিলি সেনগুপ্ত	অর্থ (গণন)
৪. শ্রীশুভ হালদার	স্বাস্থ্য
৫. শ্রীপরেশ বাসকে	অর্থ (গণন)
৬. শ্রীমিলন মণ্ডল	ক্ষুদ্র শিল্প
৭. শ্রীতাপস মাইতি	জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি
৮. শ্রীমতী ঈশিতা মৈত্র	রাজভবন সচিবালয়
৯. শ্রীমতী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়	উচ্চ শিক্ষা
১০. শ্রীসহাবুদ্দিন আলি	গ্রন্থাগার পরিষেবা
১১. শ্রীজয়ন্ত মাহাত	বিদ্যালয় শিক্ষা
১২. শ্রীঅয়ন সিংহ	বিদ্যালয় শিক্ষা
১৩. শ্রীমতী সীমা কুণ্ডু	তথ্য ও সংস্কৃতি
১৪. শ্রীদেবব্রত দত্ত	তথ্য ও সংস্কৃতি
১৫. শ্রীনুরুল ইসলাম	জলসম্পদ
১৬. শ্রীপার্থসারথি ভুঁইয়া	শিল্প
১৭. শ্রীমানবেন্দ্র মজুমদার	শিল্প
১৮. শ্রীগৌতম দাশগুপ্ত	নগরোন্নয়ন
১৯. শ্রীমতী ব্রততী বসাক	বিদ্যালয় শিক্ষা
২০. শ্রীঅক্ষয় কয়াল	উচ্চ শিক্ষা
২১. শ্রীতাপস ভদ্র	কৃষি
২২. শ্রীমতী অনুরাধা চক্রবর্তী	কৃষি

এইসব অবরবর্গীয় সহায়ককে উচ্চবর্গীয় সহায়ক পদে উন্নীত করে ওই বাইশটি শূন্যপদে যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করা যেতে পারে।

অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।

প্র. কর

সহায়ক

১৫.১১.০৭

নথিতে বর্ণিত ক্রমতালিকা অনুসারে সহায়কগণকে অবরবর্গীয় থেকে উচ্চবর্গীয় পদে উন্নীত করে এভাবে বিভিন্ন বিভাগে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে—

ক্রম ১ থেকে ৩	অর্থ (অডিট)
ক্রম ৪ — ৫	অর্থ (গণন)
ক্রম ৬—৭	বিধানসভা সচিবের অফিস
ক্রম ৮	রাজভবন সচিবের অফিস
ক্রম ৯—১০	উচ্চশিক্ষা
ক্রম ১১—১২	বিদ্যালয় শিক্ষা
ক্রম ১৩—১৪	তথ্য ও সংস্কৃতি

ক্রম ১৫—১৭	শিল্প
ক্রম ১৮—১৯	নগরোন্নয়ন
ক্রম ২০—২২	কৃষি

জ. গুপ্ত
সহসচিব
১৮.১১.০৭

মা. লাহা
উপসচিব
১৯.১১.০৭

মী. বালসুব্রামানিয়ম
সচিব
২০.১১.০৭

সচিব মহোদয়ের ২০.১১.০৭ তারিখের আদেশ দেখা যেতে পারে।

আগামী ৩১.১২.২০০৭ তারিখে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে-বাইশজন উচ্চবর্গীয় সহায়ক অবসর গ্রহণ করছেন তাঁদের শূন্যপদে ক্রমতালিকার ভিত্তিতে ২২ জনকে যোগ দেওয়ার আদেশ দিয়ে একটি আদেশনামার খসড়া নীচে পেশ করা হল।

অনুমোদনের জন্য।

প্র. কর
সহায়ক
২৫.১১.০৭

৬. বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে জনস্বার্থে চিকিৎসক বদলির আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্বাস্থ্য বিভাগ
স্বাস্থ্য অধিকার
চক্ষু রোগ শাখা

এই শাখার আটজন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের ৩১ মার্চ ২০০৮ তারিখে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় চার বছরের কার্যকাল পূর্ণ হবে। এ সম্পর্কে বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

চিকিৎসকের নাম	যে হাসপাতালে কর্মরত	এখানে যোগদানের তারিখ
ড. জ্যোতির্ময় চৌধুরী	কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল	০৩.০৪.২০০৪
ডা. শ্রীমতী স্মৃতিকণা রায়	বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল	০২.০৫.২০০৪
ডা. মহেশ্বর টুডু	বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল	১৫.০৫.২০০৪
ডা. অলোক সেন	শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল	০১.০৬.২০০৪

শব্দার্থ ও টীকা

ডা. শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্য	হাওড়া জেলা হাসপাতাল	০১.০৬.২০০৪
ডা. সুদীপ হাজরা	শান্তিপুর মহকুমা হাসপাতাল	১৭.০৬.২০০৪
ডা. মনোজ জোয়ারদার	বারাসত মহকুমা হাসপাতাল	০১.০৮.২০০৪
ডা. অভয় সরকার	ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল	১৬.০৮.২০০৪

একই স্টেশনে তিন বছরের অধিককাল অতিবাহনের পর স্বভাবতই অন্যত্র বদলির বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে। উপরোক্ত আটজনের সকলেই ইতিমধ্যে বদলি চেয়ে চিঠিও দিয়েছেন (চিঠিগুলি নথিতে রাখা আছে— পতাকা ১-৮ দ্রষ্টব্য)।

এইসব চিকিৎসককে এবার জনস্বার্থে বদলির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য উপস্থাপিত হল।

চ. ধর
সহায়ক
০২.০৩.০৮

যে-আটজন চক্ষু চিকিৎসকের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মকাল তিন বৎসরের অধিককাল হয়ে গিয়েছে তাঁদের ১ এপ্রিল ২০০৮ থেকে নিম্নোক্তরূপে বদলি করা যেতে পারে —

চিকিৎসকের নাম	বর্তমান কর্মরত	পরবর্তী কর্মক্ষেত্র
ড. জ্যোতির্ময় চৌধুরী	কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল	হাওড়া জেলা হাসপাতাল
ডা. শ্রীমতী স্মৃতিকণা রায়	বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল	বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল
ডা. মহেশ্বর টুডু	বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল	বাঁকুড়া জেলা হাসপাতাল
ডা. অলোক সেন	শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল	বারাসত মহকুমা হাসপাতাল
ডা. শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্য	হাওড়া জেলা হাসপাতাল	কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল
ডা. সুদীপ হাজরা	শান্তিপুর মহকুমা হাসপাতাল	শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল
ডা. মনোজ জোয়ারদার	বারাসত মহকুমা হাসপাতাল	ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল
ডা. অভয় সরকার	ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতাল	শান্তিপুর মহকুমা হাসপাতাল

স্বাস্থ্য অধিকর্তা মহোদয়ের অনুমোদনের পর জনস্বার্থে বদলির আদেশনামা জারি করা যেতে পারে।

জ. ঘোষাল
সহঅধিকর্তা
০৫.০৩.০৮

শরাফৎ আলি
উপ-অধিকর্তা
০৬.০৩.০৮

জ্যোৎস্না মল্লিক
স্বাস্থ্য অধিকর্তা
০৮.০৩.০৮

স্বাস্থ্য অধিকর্তার আদেশ।

বদলি সংক্রান্ত আদেশনামার খসড়া পেশ করা হোক। সত্বর।

জ. ঘোষাল
সহঅধিকর্তা
১০.০৩.০৮

28.4 আপনি যা শিখলেন

1. অফিসে ফাইল খোলার প্রয়োজনীয়তা
2. কোন্ কোন্ কারণে ফাইল খুলতে হয়
3. কেমনভাবে ফাইল গঠিত হয়
4. ফাইলের দু-টি ভাগ কী কী
5. ফাইলে নোট লেখার এবং খসড়া প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া
6. ফাইলে নোট লেখার ব্যাপারে সাধারণ রীতি
7. যথাযথভাবে ফাইল খোলা ও তাতে নোট দেওয়া আর খসড়া তৈরি করার ক্ষেত্রে সামর্থ্যের প্রয়োগ

28.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. অফিসের কোনো সহায়কের পূর্বানুমতি না নিয়ে মাঝে মাঝে অনুপস্থিতি এবং নিয়মানুযায়ী ছুটির দরখাস্ত জমা না-দেওয়ার দরুন তাকে 'শো-কজ' করা বা কারণ দর্শানোর জন্য একটি নোট তৎসহ খসড়া প্রস্তুত করুন
2. কলকাতা পুস্তক মেলায় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের স্টল স্থাপনের ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের জন্য একটি নোট প্রস্তুত করুন
3. মিলনমেলা প্রাঙ্গণে 'শিল্প মেলা' উদ্‌বোধনের জন্য শিল্পমন্ত্রী কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রীর সমীপে অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্রের খসড়া তৈরি করুন
4. রায়গঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুটি নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য অর্থবরাদ্দের আবেদন জানিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে প্রেরিত পত্রখানি বিবেচনার্থে দপ্তরে ফাইল খুলে তাতে নোট লিখুন
5. কৃষি দপ্তরের জেলা কৃষি আধিকারিদের বদলির ব্যাপারে ফাইলে নোট প্রস্তুত করুন।

28.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

1. অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) দেখুন।
2. 28.3.1 দেখুন।

29

রেখাচিত্র ও তালিকা তৈরি

29.1 প্রস্তাবনা

মানুষের ভাববিনিময়ের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। ভাষার সাহায্যে মানুষ তার নিজের মনের ভাব অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। কিন্তু এই ভাষারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এই ভাষাও মানুষের গহন মনের গভীর বেদনার কথা কখনও কখনও প্রকাশ করতে পারে না, তাই মানুষ কথায় দেয় সুর, গায় গান। সেইভাবেই প্রয়োজনের তাগিদে সহজ থেকে সহজতর ভাবে কোনো কিছু বোঝাতে মানুষ ব্যবহার করে নানা সাংকেতিক চিহ্ন, ছবি আঁকে, রেখাচিত্র তৈরি করে। বিশেষ বিশেষ জটিল বিষয়ে তথ্যলিপি লিখে, সারণি প্রস্তুত করে, প্রবাহচিত্র, স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করে মানুষ তার প্রয়োজন মেটায়। কাজেই, শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব সাংকেতিক রেখাচিত্র, সারণির গুরুত্ব অপরিসীম।

29.1 উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করলে আপনারা —

- তালিকা, সারণি, রেখাচিত্র, স্তম্ভচিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- নিজেরাও প্রয়োজনে এইসব রেখাচিত্র, প্রবাহচিত্র, স্তম্ভচিত্র আঁকতে পারবেন;
- কর্মক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার করতে পারবেন।

29.3 বিষয়ের রূপরেখা

বিভিন্ন প্রকার রেখাচিত্র তৈরি ও তার ব্যবহার :

29.3.1

তালিকা বা ফর্দ — আমরা যখন বাজার করতে যাই, তখন একটা তালিকা বা ফর্দ তৈরি করে হাতে করে নিয়ে যাই। এতে সুবিধা, বিশেষ ঘোরাঘুরি করতে হয় না। বিশেষ বিশেষ জিনিসের দোকানে গিয়ে শুধুমাত্র সেই জিনিসটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। এতে সময় বাঁচে। আবার কোন্ জিনিস কতটুকু পরিমাণ লাগবে, তা তালিকায়

লেখা থাকলে জিনিসের অপচয় রোধ করা যায় এবং অর্থেরও অপব্যবহার কমে। বিশেষভাবে আমাদের ঘরে কোনো উৎসব আয়োজন অথবা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়- স্বজনের আগমন ঘটলে তো কথাই নেই। তখন তালিকা তৈরি করে জিনিস সংগ্রহ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বড়ো বড়ো উৎসবে পালা-পার্বণে ফর্দের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে চিত্র এঁকে সাধারণ বাজারের এক তালিকা তৈরি করে দেখান হল।

তালিকা বা ফর্দ - 1 : একটি প্রাত্যহিক বাজারের তালিকা। লোকটিকে প্রতিদিন বাজারে চাল, ডাল, সবজি, মাছ, তরিতরকারি, আলু, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, চিনি, চা, পাঁউরুটি কিনতে হয়। সে নীচে লেখা তালিকার মতো একটি তালিকা তৈরি করে বাজারে নিয়ে যাবে। এতে তার সময় এবং অর্থ উভয়েরই সংকুলান হবে।

জিনিস	পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য
চাল	২.৫ কেজি	৫০ টাকা
ডাল	৫০০ গ্রাম	৩০ টাকা
মাছ	১ কেজি	১৪০ টাকা
সবজি	৫০০ গ্রাম	১০ টাকা
আলু	১ কেজি	১০ টাকা
পেঁয়াজ	২৫০ গ্রাম	৫ টাকা
চিনি	৫০০ গ্রাম	২০ টাকা

তালিকা বা ফর্দ - 2 : এবারে আমরা বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, পরিশ্রমী ব্যক্তি এবং সামান্য কাজ করে এমন সব ব্যক্তিদের শরীরে প্রতিদিন শাক-সব্জি, ফল-মূল, দুধ, চিনি, প্রভৃতি কতটুকু তার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিচ্ছি। এই ধরনের তালিকা সামনে থাকলে স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ে, খাদ্যাভ্যাস নিয়মিত এবং পরিমিত হয়। কাজেই এই ধরনের খাদ্য-তালিকা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আবশ্যিক।

ভোজ্য সামগ্রী (গ্রাম প্রতি)	বয়স্ক পুরুষ			বয়স্ক স্ত্রী			শিশু		ছেলে	মেয়ে
	কার্যক্ষমতা			কার্যক্ষমতা						
	কম কাজ	সামান্য কাজ	বেশি কাজ	কম কাজ	সামান্য কাজ	বেশি কাজ	১ - ৩ বছর	৪ - ৬ বছর	১০ ১২ বছর	১০ ১২ বছর
১ বৎসর										
তরি-তরকারি	460	520	670	410	440	575	175	270	420	380
ডাল	40	50	60	40	45	50	35	35	45	45
তাজা টাটকা শাক-সবজি	40	40	40	100	100	50	40	50	50	50
অন্যান্য সবজি	60	70	80	40	40	100	20	30	50	50
মাটির নিচের কন্দ জাতীয় সবজি	50	60	80	50	50	60	10	20	30	30
দুধ	150	200	250	100	150	200	300	250	250	250
তেল-ঘি	40	45	65	20	25	40	15	25	40	35
শর্করা/চিনি	30	35	55	20	20	40	30	40	45	45

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 29.1

নীচের প্রশ্নগুলি পড়ে ঠিক উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দিন :—

1. তালিকা, রেখাচিত্র, প্রবাহচিত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় —
   (ক) যাতে একই জিনিস বারবার বোঝাতে না হয়,
   (খ) অতি সহজে জিনিসটি বুঝতে পারা যায়
   (গ) বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায়।

2. ঘরে একটি ক্যালেন্ডার রয়েছে, ক্যালেন্ডারটিকে বলা যায় —
   (ক) তথ্যচিত্র
   (খ) বর্ষতালিকা
   (গ) বর্ষপঞ্জি

3. বিভিন্ন বয়সের জন্য খাদ্যতালিকাটি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখুন, এবারে একজন বেশি কার্যক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের যে খাদ্যতালিকা এখানে দেওয়া হল, সেটি সঠিক কি না উত্তরে হ্যাঁ বা না লিখুন।

   বেশি কার্যক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ

ডাল	—	৬০ গ্রাম	হ্যাঁ / না
সবজি	—	৭০ গ্রাম	
দুধ	—	২৫০ গ্রাম	
তেল/ঘি	—	৫০ গ্রাম	
চিনি	—	৫০ গ্রাম	

29.3.2

চক্র চিত্র (Pie Chart) : এবারে আমরা অন্য একটি চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করব। এই প্রক্রিয়াটি পড়াশোনার ব্যাপারে বিশেষ কাজে লাগে। ধরুন একটি বিদ্যালয়ে 1000 জন ছাত্র পড়ে। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে 600 জন, বাণিজ্য বিভাগে 200 এবং কলা বিভাগে 200 জন পড়ে। অঙ্কের সাহায্যে অতি সহজে এর শতকরা হিসাব বের করা যায়। যেমন,

$$\text{কলা বিভাগে শতকরা } \frac{200}{1000} \times 100 = 20\%$$

গণিত শাস্ত্রে একে 'পাই ফরমূলা' বলে। 'পাই' (pie) একটি ইংরেজি শব্দ। বাংলায় এর অর্থ 'অংশ'। যে চিত্রের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়টি সমগ্র বিষয়ের কত অংশ জুড়ে আছে তার পরিচয় দেওয়া হয় তাকে বলে পাই চার্ট (Pie Chart)। এই চিত্র দেখতে চাকার মতো বলে বাংলায় একে বলা হয় চক্রচিত্র।

চিত্রের সাহায্যে উপরের শতকরা বা শতাংশের হিসাবটি অতি সুন্দর এবং সহজে প্রকাশ করা যায়। নীচের চিত্রটি বিশেষভাবে লক্ষ করুন।

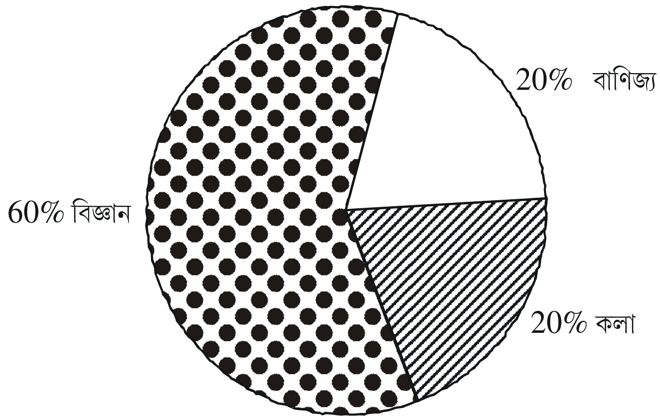

বংশলতিকা:

এই প্রক্রিয়াটিকে সাধারণ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়। একটি বৃক্ষ যেমন শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি করে একটি বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়, তেমনি একজন ব্যক্তিও একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা করে কালক্রমে সেই বৃহৎ পরিবারের আদি পুরুষ হিসাবে পরিচিত হন। প্রাচীনকালে এইসব পরিবারে পারিবারিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে কুলপঞ্জি বা বংশলতিকা ব্যবহার করা হত। প্রসঙ্গত জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যা প্রমুখ এক বিরাট পরিবার। বর্তমানে এই পঞ্জি শুধুই জীবনক্ষেত্রেই নয়, অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। নীচে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সম্পর্কে একটা বংশলতিকা তৈরি করে দেওয়া হল, লক্ষ করুন।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা — সংস্কৃত
(খ্রিষ্ট পূর্ব ১৫০০ - ৬০০)

⇓

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা
(খ্রিষ্ট পূর্ব ৬০০ - ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ)

⇓

পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ

⇓

পৈশাচী প্রাকৃত | শৌরসেনী প্রাকৃত | মাগধী প্রাকৃত

মাগধী প্রাকৃত

⇓

মাগধী অপভ্রংশ

⇓

বাংলা-অসমীয়া | ওড়িয়া

বাংলা-অসমীয়া

⇓

বাংলা

পাঠগত প্রশ্ন : 29.2

নীচের প্রশ্নগুলি পড়ে উত্তর দিন :

1. এবছর 2009-এ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরীক্ষায় ধরা হল, বিজ্ঞান বিভাগে 94%, কমার্স বিভাগে 82% এবং কলা বিভাগে 68% পাশ করেছে। একটি পাইচিত্র অঙ্কন করে বিষয়টি পরিস্ফুট করুন।

2. এক শেখর রায়ের এক ছেলে বড়ো, পরপর দুটি মেয়ে, পরে আরও একটি ছেলে জন্মায়। বড়ো ছেলে বিবাহিত, তার এক ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো মেয়ে অবিবাহিত, মেজ মেয়ে বিবাহিত, তার এক ছেলে, এক মেয়ে, ছোটো ছেলে দশ বছর বয়সে অকালমৃত। শেখর রায়ের পরিবারের একটি বংশলতিকা তৈরি করুন।

প্রবাহ চিত্র (Flow Chart):

এবারে প্রবাহ চিত্র বা Flow Chart সম্পর্কে কিছু জানতে পারবেন। আপনারা প্রত্যহ বাজার থেকে আপেল, আঙুর, কমলালেবু কিনে খান। কখনও কখনও এই ফলগুলির জুস (juice)ও কিনতে পাওয়া যায়। এখন, কমলালেবু কিনে তার খোসা ছাড়িয়ে তার জুস তৈরির ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সময় এবং প্রচুর ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু সেই কাজই সহজে করা যায় একটা প্রবাহচিত্রের সাহায্যে। নীচের চিত্রটির প্রতি লক্ষ করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

স্তম্ভচিত্র (Bar Chart):

এতক্ষণ বিভিন্ন প্রকার তালিকা, পাই চার্ট, প্রবাহ চার্ট প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এবার আমরা বলব বারচিত্র বা স্তম্ভচিত্রের কথা। অত্যন্ত জটিল এবং সমস্যাবহুল একটি বিরাট তালিকা বারচিত্রের সাহায্যে অতি সরলভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। নীচে দেওয়া বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা (2001) লক্ষ করুন।

উত্তরপ্রদেশ	—	14,27,18,015
মধ্যপ্রদেশ	—	10,89,14,265
মহারাষ্ট্র	—	17,58,15,814
কর্নাটক	—	9,78,27,763
পশ্চিমবঙ্গ	—	8,02,21,171
বিহার	—	8,29,98,509
রাজস্থান	—	5,65,07,188
গুজরাট	—	5,06,71,017

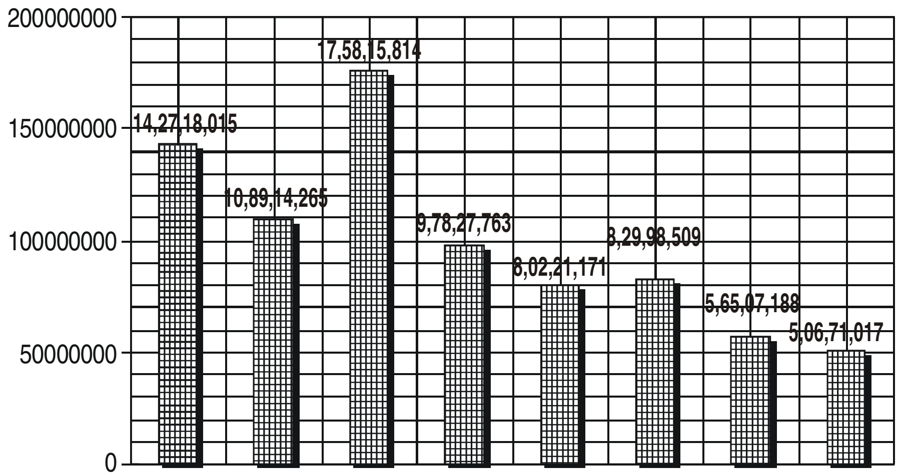

বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা (2001)

দলগত স্তম্ভচিত্র (Group Bar Chart):

আগের চিত্রে সরল স্তম্ভচিত্র (Bar Chart)-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে। কখনও কখনও এমন কিছু সমস্যা দেখা দেয়, যার সমাধান সরল স্তম্ভচিত্র দ্বারা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে দলগত স্তম্ভচিত্র ব্যবহার করতে হয়। ভারতের বর্তমান সাক্ষরতার হার জানতে গিয়ে পুরুষ ও নারীর প্রশ্ন ওঠে, এবং এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এখানে দলগত স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে পুরুষ ও নারীর পৃথক পৃথক হার দেখানো হল। চিত্রটি লক্ষ করুন।

ভারতে সাক্ষরতার হার

সাল	পুরুষ	নারী
1961	40.4	15.3
1971	46.0	22.0

1981	56.4	29.8
1991	63.9	39.4
2001	75.85	54.16

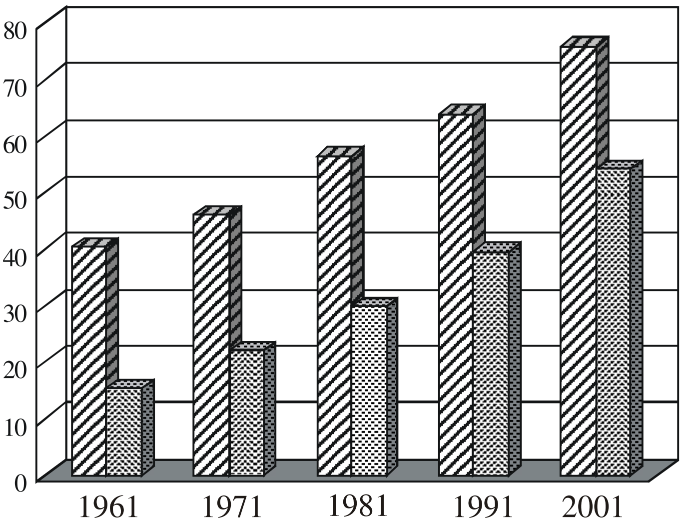

29.5 আপনি যা শিখলেন

1. এতদিন পর্যন্ত বইপত্র পড়াশোনা করে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করে শিক্ষালাভ করেছেন। এখন তারও অতিরিক্ত কিছু যেমন, তালিকা প্রস্তুতকরণ, রেখাচিত্র, প্রবাহচিত্র, স্তম্ভচিত্র অঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে অতিরিক্ত কিছু সামর্থ্য লাভ করলেন।
2. এই সমস্ত শিক্ষণ সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করতে গিয়ে কিছু দক্ষতা অর্জন করলেন এবং নূতন নূতন ভাবনা-চিন্তা শুরু হল।
3. এই সকল কাজ করতে গিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেই সমস্যা নিজেই চিন্তা করে উদ্ভাবন করেছেন এবং সফল হয়েছেন, নতুন শিক্ষা অর্জন করেছেন।
4. অঙ্কের একটা জটিল পদ্ধতি কীভাবে শতকরা হার নির্ণয় করা হয়, শিখেছেন।
5. জটিল সমস্যা প্রস্তুতিতে গ্রাফচিত্র, বারচিত্রের সাহায্যে সমাধান করা যায়, শিখেছেন।

29.4 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. বিভিন্ন রাজ্যে শিশু শ্রমিকের শতকরা হার দেওয়া হল। চক্রচিত্রের সাহায্যে অঙ্কন করে দেখান।

মহারাষ্ট্র	—	9.5%
কর্নাটক	—	8.7%
মধ্যপ্রদেশ	—	12.0%
উত্তরপ্রদেশ	—	12.5%

শব্দার্থ ও টীকা

অন্ধ্রপ্রদেশ	—	14.5%
অন্যান্য	—	42.6%

[শ্রম মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার।
বার্ষিক রিপোর্ট - 2002-2003]

2. বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতে শতকরা কতজন মহিলা নিযুক্ত আছেন তার বিবরণ দেওয়া হল। একটি স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দিন।

রাজ্য	পঞ্চায়েতে মহিলাদের স্থান (%)
ত্রিপুরা	42.00
অন্ধ্রপ্রদেশ	27.00
মহারাষ্ট্র	21.30
কেরেলা	20.00
বিহার	20.00
পাঞ্জাব	14.48

3. একটি পারিবারিক বংশলতিকা নির্ণয় করুন।

29.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

29.1

1. খ
2. গ
3. হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না, না।

29.2

দুটি প্রশ্নের উত্তর চক্রচিত্র ও বংশলতিকা তৈরি করার পদ্ধতি অনুসারে এঁকে দেখাতে হবে।

30

বোধ পরীক্ষণ

30.1 প্রস্তাবনা

লেখাপড়ার বিষয়ে 'আমরা স্বনির্ভর'— এ-কথা যত সহজে বলা যায় ব্যাপারটা তত সহজ নয়। স্বনির্ভরতার নানা মাত্রা বা স্তর আছে। আংশিক স্বনির্ভরতার থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা থাকা চাই। সাধারণত দেখা যায়, গৃহশিক্ষকের উপর শিক্ষার্থীরা খুব নির্ভরশীল। শিক্ষক লিখিয়ে দেন, ছাত্রছাত্রীরা অনেকে মুখস্থ করে। তাদের আশা মুখস্থ বিদ্যার জোরে পরীক্ষায় উতরে যাবে। তার ফলে পরীক্ষার খাতায় অনেক হাস্যকর ভুলও দেখা যায়। তাতে বোঝা যায়, পাঠ্যবিষয় ঠিকমতো বোধগম্য হয়নি। 'বোধ পরীক্ষণ' পাঠটি আমাদের এগোতে সাহায্য করবে। আমরা নিজেরাই বিচার করতে পারব, আমরা যতটা বুঝতে পারছি তা ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছি কিনা।

30.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা—

- বোধ পরীক্ষণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন;
- উদ্ধৃত বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

30.3 বিষয়ের রূপরেখা

30.3.1 বোধ পরীক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

রোজই আমাদের কিছু-না-কিছু পড়তে হয়। খবরের কাগজ, রাস্তার ধারের বিজ্ঞাপন, আবার বইপত্রও। এই পড়া তো শুধু পড়া নয়, পড়ে বোঝা। আবার শুধু বুঝলেই হবে না, কী বোঝা গেল তা প্রকাশ করে অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই। বোধ পরীক্ষণের প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করতে হবে চলিত ভাষা, প্রত্যক্ষ উক্তি পরিণত হবে পরোক্ষ উক্তিতে। প্রশ্নের উত্তরে বাড়তি কথা লেখা চলবে না, যতটুকু উত্তর চাওয়া হয়েছে ততটুকুই শুধু লিখতে হবে। এভাবে প্রকাশ করতে গেলে নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, পঠিত বিষয়টি কতখানি বোধের মধ্যে এসেছে। ঘরে-বাইরে আমরা অনেক কিছু পড়ি— ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান রাজনীতির বিষয়, খেলার খবর, আরও কত-কী। বোধ পরীক্ষণের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে পাঠ্য বহির্ভূত যে-কোনো প্রশ্নের

উত্তর বা বক্তব্যের প্রকাশ সহজে করা যায়। তবে লিখতে গেলে ভাষার উপর দখল থাকা চাই। ভাবনা ও অনুভূতি আমরা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করি। মাধ্যমটিকে আয়ত্ত করতে না-পারলে ভাষা অশুদ্ধ হবে, লেখা আটকে যাবে। সব সময় মনে রাখতে হবে সহজ ভাষায় লেখা অনুশীলন সাপেক্ষ।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 30.1

1. বোধ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লেখা উচিত? (অনধিক চারটি বাক্যে উত্তর দিন)
2. ভাষা-মাধ্যমকে আয়ত্ত করা খুব দরকার কেন?

30.3.1 বোধ পরীক্ষণ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত

(1)

কত্তাবাবা (রবীন্দ্রনাথ) মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোয় অভিনয়ের আয়োজনে মাতিয়ে তুলতেন সবাইকে। শান্তিনিকেতনের দল যখন তৈরি হয়নি তখন যা-কিছু করত কলকাতার দল। কলকাতায় এসে কত্তাবাবাকে দল সংগ্রহ করতে হত। দাদামশায়দের (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের) টানতেন, অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুরা এসে যোগ দিতেন, শান্তিনিকেতনেরও কেউ কেউ আসতেন। এইভাবে দল গড়ে উঠত। জোড়াসাঁকো হত জমজমাট। বাড়ির রূপই বদলে যেত। লেখাপড়া প্রায় হতই না আমাদের। খেলাও বন্ধ হয়ে আসত।

রিহার্সাল আরম্ভ হলে আমরা লক্ষ করতুম যে আমাদের ছোটোদের মধ্যে থেকে একমাত্র খুকিমাসি (অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা) ছাড়া আর কারুর কত্তাবাবার দলে ঢোকবার ডাক আসত না। খুকিমাসি 'ডাকঘর'-এ মালিনীর পার্ট করে খুব নাম করেছিল। সেই থেকে তার কদর। বাকিদের করবার মতো পার্ট তাঁর নাট্যে থাকত না। কিংবা এমনও হতে পারে যে আমাদের কাউকে তিনি উপযুক্তই মনে করতেন না। এর ফলে আমরা দর্শকের কোঠায় পড়ে থাকতুম। অবশ্য দিনের পর দিন প্রতি সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেখে ভারী আমোদ পেতুম— পার্ট সব মুখস্থ হয়ে যেত— কত্তাবাবার শেখানো ঢংগুলো পর্যন্ত। তার ফলে যতদিন তালিম শুনতুম ততদিন অভিনয় করতে না-পারার কোনো দুঃখ আমাদের মনকে স্পর্শ করত না। কিন্তু অভিনয় সাঙ্গ হয়ে গেলে দল ভেঙে যে-যাঁর পথে চলে গেলে, কত্তাবাবা শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলে আমাদেরও থিয়েটার করবার শখ জাগত মনে।

(মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়: দক্ষিণের বারান্দা)

প্রশ্ন :

১) উদ্ধৃত অংশে অভিনয়ের কোন্ দুটি দলের কথা বলা হয়েছে?

২) রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের দল গড়ে উঠত কীভাবে?

৩) ক) অভিনয় করার জন্যে ছোটোদের মধ্যে কার ডাক পড়ত?

খ) কেন তার ডাক পড়ত?

৪) কারা কেন দর্শক হয়েই থাকত?

৫) অভিনয় না-করার দুঃখ কেন ছোটোরা ভুলে যেত?

৬) কখন ছোটোদের মধ্যে অভিনয় করার শখ জাগত?

৭) অবনীন্দ্রনাথ লেখকের দাদামশায়, তাহলে লেখক অবীনন্দ্রনাথের কে?

উত্তর :

১) কলকাতার দল ও শান্তিনিকেতনের দলের কথা বলা হয়েছে।

২) কলকাতায় এলে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের দল গড়ে তুলতেন। দলের মধ্যে নিয়ে আসতেন অবনীন্দ্রনাথদের, আত্মীয় ও বন্ধুদের ডাক দিতেন, আর থাকতেন শান্তিনিকেতনের কয়েকজন। এই ভাবে গড়ে উঠত কলকাতার দল।

৩) ক) অবনীন্দ্রনাথের কন্যা সুরূপা বা 'খুকুমাসি'র ডাক পড়ত।

খ) 'মালিনী' নাটকে ভালো অভিনয় করেছিল খুকুমাসি, তাই অভিনেত্রী হিসেবে তার খুব সমাদর ছিল। এই পরীক্ষিত অভিনয়-প্রতিভার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাকে দলের মধ্যে নিতেন।

৪) অবনীন্দ্রনাথ এবং অন্য ছোটো ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের যোগ্য কোনো ভূমিকা নাটকে থাকত না। অথবা রবীন্দ্রনাথ হয়তো অন্য কোনো ছোটোকে অভিনয়ের উপযুক্ত মনে করেন নি। কাজেই ছোটোরা দর্শক হয়েই থাকত।

৫) প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাটকের মহলা হত। সে ছিল ভারী আনন্দের অভিজ্ঞতা। দেখতে দেখতে সকলের পার্ট স্মৃতিতে গেঁথে যেত। রবীন্দ্রনাথ অভিনেতাদের যে-ভঙ্গি শেখাতেন সে-সব তারা আয়ত্ত করে ফেলত। ফলে মহলা চলতে থাকলে অভিনয় না-করতে পারার দুঃখ মন থেকে মুছে যেত।

৬) একসময় অভিনয় সাঙ্গ হত, নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যেত। অভিনেতারা বিদায় নিতেন। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতেন। আনন্দের দিন শেষ হত ছোটোদেরও। এই সময় তাদের মধ্যে জেগে উঠত নাটক করার আগ্রহ।

৭) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

(2)

দরজার সম্মুখে বসিবার উপায় নাই, জলে ভিজিয়া গিয়াছে। নীল ডোরাকাটা ইজারটি দিয়া জল মুছিয়া লইলাম। ইজার ময়লা হইলেও আর ক্ষতি নাই। কাল তো আর ওটি পরিতে হইবে না। নয় বৎসর আগে ভূমিকম্পের সময় মেঝেতে এই স্থানে গর্ত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রহিয়া পি.ডব্‌লু.ডি'র কর্মনিষ্ঠার সাক্ষ্য দিতেছে। এক নম্বর সেলে যে থাকে তাহার আবার এত বাছ-বিচার! ফাঁসির মঞ্চ হইতে যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তাহারই দাবি এই ঘরের উপর সবচেয়ে বেশি। সেলের সাড়ে চার হাজার বাসিন্দার মধ্যে এই ঘরের উপর আমারই দাবি সর্বোচ্চ। পি.ডব্‌লু.ডি.-র লোকেরা ঠিকই ভাবিয়াছে— ভিজা মেঝের উপর বসিয়া বাতগ্রস্ত হইতে যতদিন সময়ের দরকার, এ-বাসিন্দাকে ততদিন বাঁচিতে হইবে না। আজিকার দিনেও কিন্তু

শব্দার্থ ও টীকা

মনে হইতেছে, এই ভিজার উপরে বসিয়া অসুখ করিতে পারে। একটা গল্প পড়িয়াছিলাম,— একজন লোক আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। বিষের শিশি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার বন্ধু বাহির হইতে ইহা দেখিয়া, পিস্তলটি তাহার দিকে নিশানা করিয়া বলিল, 'ফেলে দে বলছি গেলাসটা, না হলে এখুনি গুলি করলাম।' হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া গেল। কে বুঝিতে পারে মনের এই গতি! . . . হয়তো দরজার সম্মুখের এই গর্তটি ভূমিকম্পের পর মেরামতের সময় নজরে পড়ে নাই। কী কাণ্ড সেবার ভূমিকম্পের সময়! ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বলিতেছি। পাটনা ক্যাম্প জেল হইতে উত্তর বিহারের সকল রাজবন্দীকে গভর্নমেন্ট ছাড়িয়া দিল— ভূমিকম্পপীড়িত জনগণের সেবার জন্য।

(সতীনাথ ভাদুড়ী: জাগরী)

প্রশ্ন :

1. ঠিক উত্তরে টিক(✓) দিন—

বক্তা কোথায় বসেছিলেন?

(ক) একটি গর্তের উপর।

(খ) ঘরের বাইরে বারান্দায়।

(গ) জেলখানার একটি ঘরে।

(ঘ) নিজের বাড়ির একটি ঘরে।

2. দরজার সামনে বসবার উপায় ছিল না কেন?

3. ইজার ময়লা হলেও ক্ষতি নেই কেন?

4. দরজার সামনে কেন গর্ত হয়েছিল?

5. গর্তটি থাকার জন্য বক্তার কী অসুবিধে হচ্ছিল?

6. পি.ডব্‌লু.ডি.-র কর্মনিষ্ঠার কথা কেন উঠল?

7. নির্দিষ্ট ঘরটির উপর কার দাবি কেন সর্বোচ্চ?

8. পি.ডব্‌লু.ডি.-র লোকেরা ঠিকই ভেবেছে কোন্ কথা?

9. বক্তার একটি গল্প মনে পড়ল, কী সেই গল্প?

10. কেন ওই গল্পটিই বক্তার মনে এল?

11. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

ক) কত সালের ভূমিকম্পের কথা বক্তা বলেছেন?

খ) ভূমিকম্পের পর গভর্নমেন্ট কী পদক্ষেপ নিয়েছিল?

গ) কেন ওই বিশেষ পদক্ষেপের কথা বক্তার মনে পড়ল?

12. বক্তার জীবনের যে-ঘটনার কথা এখানে বলা হয়েছে তা কত খ্রিস্টাব্দের?

উত্তর :

1. গ

2. দরজার সামনেটা জলে ভেজা, তাই বসার উপায় নেই।

3. পরের দিন ইজারটি আর পরতে হবে না। তাই সেটা ময়লা হলেও ক্ষতি নেই।

4. ভূমিকম্পের কারণে দরজার সামনে গর্ত তৈরি হয়েছিল।

5. গর্তে জল জমে, দরজার সামনেটা ভিজে যায়। তাই সেখানে বসার অসুবিধে।

6. গর্ত সারানোর দায়িত্ব পি.ডব্‌লু.ডি.-র। গর্তটা ন-বছর ওখানে রয়ে গেছে, তবু তারা সারায়নি। তাতে পি.ডব্‌লু.ডি.-র কর্মনিষ্ঠার অভাবই প্রমাণিত হয়। কিন্তু বক্তা উলটো কথা বলেছেন— গর্তটা কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছে। স্বভাবতই মন্তব্যটি ব্যঙ্গাত্মক।

7. বক্তা ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন, তাঁর দাবি সর্বোচ্চ। ফাঁসির মঞ্চ থেকে সবচেয়ে কাছে যে-ঘর, সেই ঘরে বক্তাকে রাখা হয়েছে। যাঁর ফাঁসির দিন সবচেয়ে কাছে চলে এসেছে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট থাকে এই ঘর। বক্তার ফাঁসির সময় ঘনিয়ে আসছে, তাই তাঁর অবস্থান ওই ঘরে।

8. ওই বিশেষ ঘরের বাসিন্দাকে ভিজে মেঝের ওপর থাকতে হবে। তাতে বাতব্যাধিতে মরবে। কিন্তু সে ব্যাধি ধরতে যে-সময় লাগার কথা তার আগেই বাসিন্দার ফাঁসি হয়ে যাবে। সুতরাং গর্ত বোঝানো নিরর্থক— এই কথাই ভেবেছে পি.ডব্‌লু.ডি।

9. গল্পটি আত্মহত্যায় উদ্যত একজন মানুষের। তিনি আত্মহত্যার জন্য মুখের কাছে বিষের শিশি নিয়ে এসেছেন। এমন সময় তাঁর বন্ধু বাইরে থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল তাক করে শিশিটা ফেলে দিতে হুকুম করলেন, না-ফেললে সেই মুহূর্তেই তিনি গুলি করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা-করতে-যাওয়া মানুষটির হাত থেকে বিষের শিশি খসে পড়ল।

10. বক্তার ফাঁসির সময় ঘনিয়ে আসছে। অথচ তিনি ভাবছেন— ভিজে মেঝেতে বসলে তাঁর অসুখ করবে। তাঁর মনের অবস্থার সঙ্গে মিল আছে গল্পে কথিত মানুষটির। তাই এই সময় গল্পটি তাঁর মনে পড়ল।

11. (ক) ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পের কথা বক্তা বলেছেন

(খ) ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত মানুষদের সাহায্য করবেন তাই পাটনা ক্যাম্প জেল থেকে উত্তর বিহারের সব রাজবন্দিকে সরকার মুক্তি দিয়েছিল।

(গ) পাটনা জেল থেকে আকস্মিকভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন রাজবন্দিরা। কত আকস্মিক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে। এমন কোনো ঘটনা মৃত্যুপথযাত্রী বক্তার জীবনেও ঘটতে পারে— এই রকম কোনো ভাবনা লুকিয়ে ছিল বক্তার মনের গহনে। একটু আগেই তিনি মন্তব্য করেছেন— মানুষের মনের গতি কী বিচিত্র। সেই বিচিত্র গতিরই নিদর্শন মিলল বক্তার ভাবনায়।

12. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের কথা এখানে বলা হয়েছে।

(3)

অদ্ভুত সেই হরিণ দেখে সীতা খুশি হয়ে রামকে ডেকে বললেন, প্রভু, তুমি শিগ্‌গির লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে এসো। রাম সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মণের সঙ্গে সেখানে আসতেই হরিণটাকে দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণের মনে সন্দেহ হল। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে মারীচই এই হরিণের রূপ ধরেছে। রাজারা বনে মৃগয়া করতে এলে দুষ্ট মারীচ হরিণ সেজে তাদের মৃত্যু ঘটায়। এই রকম রত্নময় হরিণ থাকা অসম্ভব। এ নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া। সীতা কিন্তু ছলনায় মুগ্ধ হয়ে আছেন। লক্ষ্মণের কথা শুনে রামকে বললেন, তুমি ওই হরিণ আমায় এনে দাও। আমি

শব্দার্থ ও টীকা

ওকে নিয়ে খেলা করব। তুমি যদি ওকে জীবন্ত ধরে আনতে পারো, তাহলে বনবাস শেষ হলে আবার যখন রাজ্যে ফিরে যাব, তখন এই হরিণ আমাদের শোভার সামগ্রী হয়ে থাকবে। ভরত, শাশুড়িরা আর আমি অবাক হয়ে দেখব। আর যদি মারাও যায়, ওর ওই সুন্দর চামড়া আমরা ব্যবহার করতে পারব। ঘাসের উপর সোনার চামড়া বিছিয়ে আমরা বসতে পারব। রাম সীতার কথা শুনে এবং সোনার বরন হরিণ দেখে উল্লাসের সঙ্গে লক্ষ্মণকে বললেন, আজ এই হরিণ তার অসামান্য রূপের জন্য আমার হাতে বিনষ্ট হবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, স্বর্গের বাগানেও এমন জিনিস আর নেই। এর মুখমণ্ডল ইন্দ্রনীলময় (নীলকান্তমণিময়) পানপাত্রের মতো সুন্দর, উদর শঙ্খ ও মুক্তার মতো মনোহর। এমন মনোহরণ স্বর্ণমৃগকে দেখলে কার-না লোভ হয়। রাজারা মাংসের জন্য হোক বা ক্রীড়ার জন্য হোক, বনে গিয়ে হরিণ বধ করেন। তুমি সীতার পাহারায় থাকো, এ যদি মারীচ হয় তাহলে তাকে হত্যা করব, আর যদি সত্যিই মৃগ হয় তাহলে ধরে আনব।

(জ্যোতিভূষণ চাকী: গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ)

প্রশ্ন :

1. হরিণটিকে দেখে লক্ষ্মণ কী বললেন?
2. হরিণ নিয়ে সীতা কী করতে চান?
3. সীতা লক্ষ্মণের কথা শুনেও শুনলেন না কেন?
4. হরিণটি দেখে রামচন্দ্রের লোভ হল কেন?
5. রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ধাওয়া করে কী করবেন?
6. উদ্ধৃত অংশে সীতার চরিত্রের কী পরিচয় আমরা পাই?
7. রাম ও লক্ষ্মণ— এই দুই চরিত্রের মধ্যে কী পার্থক্য আমরা লক্ষ করি?
8. উদ্ধৃত অংশ থেকে শব্দ নিয়ে একপদে পরিণত করুন।
   ক) যা রত্ন দিয়ে আচ্ছন্ন
   খ) যার জীবন আছে
   গ) পান করার জন্য পাত্র
   ঘ) যা মন কাড়ে।

উত্তর :

1. হরিণ দেখে লক্ষ্মণ তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করে বলেছেন, মারীচ হরিণের চেহারা নিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হয়েছেন। রাজারা যখন অরণ্যে শিকার করতে আসেন তখন দুষ্ট মারীচ হরিণের রূপ ধরে তাঁদের ভোলায়। হত্যা করে। লক্ষ্মণ নিশ্চিত, এমন রত্নদেহী হরিণ অবাস্তব, সুতরাং এ হল রাক্ষসের ছলনা।
2. রাম যদি হরিণকে জীবন্ত ধরে আনতে পারেন, তাহলে সীতা তার সঙ্গে খেলা করবেন। তারপর বনবাসপর্ব শেষ হলে হরিণটি নিয়ে ফিরবেন নিজেদের রাজ্যে, সেখানে হরিণ হবে এক দর্শনীয় জিনিস। ভরত ও শাশুড়িদের সঙ্গে সীতা তাকে অবাক দৃষ্টি মেলে দেখবেন। আর রামচন্দ্র যদি তাকে মৃত অবস্থায় আনেন, তাহলেও হরিণের সুদৃশ্য চামড়া হবে তাদের ব্যবহারের সামগ্রী, ঘাসের উপর স্বর্ণময় চামড়া পেতে তাঁরা বসতে পারবেন।

3. মারীচের ছলনায় সীতা মুগ্ধ হয়েছিলেন, হরিণের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ জন্মেছিল, তাই লক্ষ্মণের বক্তব্য তিনি উপেক্ষা করেছেন।

4. এমন হরিণ সম্পূর্ণ দুর্লভ। তার মুখমণ্ডল নীলকান্তমণিখচিত পানপাত্রের মতো অপূর্ব, তার উদর শাঁখ ও মুক্তার মতো মনোহারী। এই দুর্লভ সৌন্দর্য রামচন্দ্রের মনে লোভের জন্ম দিয়েছিল।

5. হরিণটি যদি ছদ্মবেশী মারীচ হয় তাহলে রামচন্দ্রের হাতে সে নিহত হবে, আর ওটি যদি সত্যিই হরিণ হয় তাহলে তাকে ধরে নিজেদের কুটিরে নিয়ে আসবেন।

6. সীতা রত্নময় হরিণ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সেই মুগ্ধতা এতই গভীর যে লক্ষ্মণের যুক্তি তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তিনি নিশ্চিত যে ওটা হরিণই। কোনো সন্দেহ বা আশঙ্কার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি। তিনি ভাবছেন, সুন্দর হরিণটির সঙ্গে বনবাসজীবনে তিনি খেলা করবেন, জীবনযাপনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনবেন। ভরত ও শাশুড়িদের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ আছে তাঁর কথার মধ্যে— সকলে মিলে তাঁরা উপভোগ করবেন হরিণের সৌন্দর্য। আমরা আরও দেখতে পাই, সোনার চামড়া তাঁরা ব্যবহার করবেন, সেটি পেতে বসবেন— এসব ভাবতেও সীতার ভালো লাগছে। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সুরুচিসম্পন্ন জীবনের প্রতি সীতার আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।

7. স্বর্ণমৃগ রামচন্দ্রকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করেছে। লক্ষ্মণের কথায় মোহ ও লোভের কোনো পরিচয় নেই।
লক্ষ্মণ বুঝেছেন, এমন বিচিত্র হরিণের অস্তিত্ব অসম্ভব। এমন বোধের পরিচয় রামচন্দ্রের কথায় আমরা পাই না।
লক্ষ্মণ হরিণের মধ্যে দেখেছেন মারীচকে। রামচন্দ্রের এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি নেই।
রামচন্দ্র হরিণের পিছনে ধাওয়া করতে চেয়েছেন। লক্ষ্মণ এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।
লক্ষ্মণ যুক্তির দ্বারা চালিত, রামচন্দ্র প্রধানত আবেগ-তাড়িত

8. (ক) রত্নময়
(খ) জীবন্ত
(গ) পানপাত্র
(ঘ) মনোহর বা মনোহরণ

30.4 আপনি যা শিখলেন

1. বোধ পরীক্ষণের জন্য প্রদত্ত বিষয় পড়ে বুঝতে;
2. সাধুভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করতে;
3. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করতে;
4. নিজের ভাষায় উত্তর দিতে।

পাঠান্ত প্রশ্ন : 30.5

নীচে অংশ পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিন—

1. হস্তলিপি একটা শিল্প। যাঁরা ডিটেকটিভ হতে চান তাঁদের এই শিল্পের সঙ্গে ভালো পরিচয় থাকা

দরকার। হস্তলিপির ব্যাখ্যা শিখতে হয়, কারণ হাতের লেখায় মনের ভাব ধরা পড়ে। সরল মনে লিখলে তার চেহারা একরকম হয়, অপরাধের চেতনা নিয়ে লিখলে আর-এক রকম। অপরাধ-চেতনা হাতের পেশিতে কাজ করে। হাতের লেখার সময় আঙুল বেশি ব্যবহৃত হয়, না হাত বেশি ব্যবহৃত হয় তা নিয়ে মতভেদ আছে। আমার মনে অক্ষরের উর্ধ্বমুখী আর নিম্নমুখী টানগুলি দিতে আঙুল ব্যবহৃত হয়, আর লেখাগুলি বাঁ ধার থেকে ডানধারে চালাতে হাত ব্যবহৃত হয়। কাজেই স্বাভাবিক লেখাতে দুইয়েরই ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বাভাবিক লেখায় হাত সহজভাবে চলে, সমানভাবে চলে, কোথাও হঠাৎ বেশি চাপ পড়ে না। নকল লেখায় হাতের ঝাঁকুনি লাগে, দেখলেই বোঝা যায় অক্ষরগুলো লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল না। লেখার সময় নিব যখন উপরের দিকে চলে তখন নিব কাগজে বিঁধে যায়। নকল লেখায় অক্ষরের উলটোদিকে চাপ পড়ে বেশি। তাতেও অনেক সময় নকল ধরা যায়। বেনামি চিঠিতেই এরকম থাকে বেশি। স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর যখন প্রতারণার জন্য নকল করা হয় তখন হাতের পেশির কাজই হয় বেশি। তখন আঙুল স্বাধীন ইচ্ছায় সহজ লিখন লিখতে পারে না। মনোযোগটা নকল করার দিকে বেশি চলে যায়।

(পরিমল গোস্বামী: ইংরাজ ডিটেকটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা)

প্রশ্ন :

1. ডিটেকটিভদের ভালো পরিচয় থাকা দরকার কীসের সঙ্গে?
2. স্বাভাবিক লেখায় হাতের চাপ হঠাৎ বেশি পড়ে না কেন?
3. স্বাভাবিক লেখায় আঙুল ও হাতের ব্যবহার কীভাবে হয়?
4. বেনামি চিঠিতে কোন্ বৈশিষ্ট্য বেশি কাজ করে?
5. কীভাবে বোঝা যবে অক্ষর লেখকের নিয়ন্ত্রণের অধীনে নেই?
6. আঙুলের চেয়ে হাতের পেশি বেশি কাজ করে কখন?
7. নকল করার সময় হাতের লেখা অস্বাভাবিক হয়ে যায় কেন?

2. মহাভারতের কর্ণ আমার সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র। মহাভারতের নায়ক যদিও যুধিষ্ঠির, কিন্তু সর্বাংশে উজ্জ্বল পুরুষ অর্জুন। কিন্তু অর্জুন যেন স্রষ্টার আদুরে ছেলে। তিনি সব পান। তিনি সব প্রতিযোগিতায় জেতেন। অর্জুন বীর, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর জয় এমনই অবধারিত যে রোমাঞ্চ হয় না। অর্জুন যে কোনো সংকটের সম্মুখীন হলেই আমরা জানি তিনি ঠিক অপরাভূত হয়ে বেরিয়ে আসবেন।

কিন্তু কর্ণ প্রথম থেকেই হারছেন। জয়ী হবার মতন সমস্ত গুণ এবং সম্ভাবনাই ছিল তাঁর মধ্যে, তবু তিনি জেতেননি একবারও। অর্জুন পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর আশীর্বাদ, কর্ণ পেলেন তাঁর গুরুর অভিশাপ, বিনা দোষে। অস্ত্র পরীক্ষার সময় কিংবা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাঁর অপমান আমাদেরও গায়ে বাজে। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী যখন কর্ণের বীরত্ব প্রমাণ করার আগেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন তখন কর্ণ হেসেছিলেন। কী মর্মান্তিক সেই হাসি। বঞ্চিত অপমানিত মানুষের এরকম হাসি আমরা সহসা দেখি না। তাঁর দানের অহংকার ছিল প্রবল। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র যখন তাঁর কবচকুণ্ডল চান, কর্ণ তা দিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। তখনও কর্ণ হেসেছিলেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে যখন তিনি চিনে ফেলেছিলেন, তখন দানের সময় তাঁর ওষ্ঠে তাচ্ছিল্যের হাস্য ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক মনে হয়। অনেক সময় জয়ের গৌরবের চেয়েও এই হাসির তাৎপর্য অনেক মহান হয়ে ওঠে।

কর্ণের চরিত্রে দোষ অনেক। যদি আমরা ধরে নিই যে গোটা মহাভারত একা বেদব্যাসের রচনা

নয়, পরবর্তী অনেক কবিই এই মহাগ্রন্থের ওপর কলম চালিয়েছেন, তাহলে অনায়াসে একথাও বলা যায় যে, ওই সব প্রক্ষিপ্ত রচনাকাররা অনেকেই কর্ণবিদ্বেষী ছিলেন। কেউ বলেছেন, কর্ণ মহাবীর, আবার অনেকেই বলেছেন, তিনি কাপুরুষ। কেউ বলেছেন, কর্ণ অতিশয় উদার, আবার অনেকে বলেছেন, তিনি কুৎসিতভাষী ও নীচ। তবু এতসব হস্তাবলেপেও কর্ণ যেন আলাদাভাবে এক মহান ট্রাজেডির নায়ক।

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য এবং সাহিত্য)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:
   (ক) মহাভারতের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র কোন্‌টি?
   (খ) গুরুর কাছ থেকে অর্জুন ও কর্ণ কী কী পেয়েছিলেন?
   (গ) দ্রৌপদী কোথায় কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন?
2. অর্জুনকে স্রষ্টার আদুরে ছেলে বলা হয়েছে কেন?
3. অর্জুনের বীরত্ব লেখককে রোমাঞ্চিত করে না কেন?
4. কর্ণ প্রথমবার কখন হেসেছিলেন?
5. কর্ণ দ্বিতীয়বার কখন হাসলেন?
6. কর্ণের দুটি হাসির বৈশিষ্ট্য কী?
7. মহাভারতের রচনাকার কে বা কারা?
8. কর্ণের চরিত্রে নানা দোষ ও গুণের যে একত্র সমাবেশ ঘটেছিল, তার কারণ কী?

4. ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভাস্কো ডা গামা সসৈন্যে ভারত যাত্রা করিলেন। এবার বৈরনির্যাতনের প্রবল উত্তেজনায় পর্তুগিজ সেনাপতির ধর্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গামা কালিকট আক্রমণ করিয়া নগর-প্রাচীরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বন্দরের মুসলমান বণিকবর্গের বাণিজ্যতরণী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। কালিকটরাজের নৌসেনা গামার নিকট বন্দিবেশে আনীত হইল। গামা ৮০০ বন্দির নাসা কর্ণ ও হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তাহা উপঢৌকন স্বরূপ কালিকট রাজাকে প্রেরণ করিলেন। ভারতবর্ষের লোক এরূপ নিষ্ঠুরতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এখন ভাস্কো ডা গামার নাম ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছে। তাঁর চরিত্রদোষ বিস্মৃত হইয়া ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার চরিত্রগুণেরই উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু সেকালের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গামা বীর হইলেও দস্যু, ধর্মোন্মত্ত হইলেও রাক্ষসের ন্যায় নিষ্ঠুর! গামার সহিত মালাবার-প্রবাসী যে সকল মুসলমান বণিকের কলহ ঘটিয়াছিল, তাঁহারা রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন না। গামা তাহাকে এশিয়া ও ইউরোপের— কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের— জাতিগত কলহ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

মিশরের সুলতানের নিরীহ প্রজাবর্গ মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া একখানি অর্ণবপোতে (জাহাজে) আরোহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আফ্রিকার পূর্বোপকূলের নিকটে আসিয়া গামার অর্ণবপোতের সহিত তীর্থযাত্রীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যাহার নিকট যাহা ছিল, হাজিগণ সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া কেবল প্রাণভিক্ষা চাহিল। কিন্তু তাহারা যে সকলেই মুসলমান! গামা মুসলমান তীথযাত্রীদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদের অর্ণবপোত লক্ষ করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একজন লিখিয়া গিয়াছেন, ''মুসলমান তীর্থযাত্রীবর্গের অর্ণবপোতে যে সকল রমণী ছিলেন তাঁহারা

শব্দার্থ ও টীকা

শিশুসন্তানগণকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বালকবালিকার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। গামা অবিচলিত চিত্তে স্ত্রীহত্যায় শিশুহত্যায় নিবিষ্ট রহিলেন।

(অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: ফিরিঙ্গি বণিক)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) ভাস্কো ডা গামা কোন্ দেশের অধিবাসী?
   - খ) গামা কত খ্রিস্টাব্দে কাদের সঙ্গে পুনরায় ভারত-যাত্রা করেন?
   - গ) মক্কাতীর্থ-ফিরত মুসলমানরা কোন্ দেশের মানুষ?
   - ঘ) গামা কালিকটে কোথায় গোলাবর্ষণ করেন?
2. নীচের শব্দগুচ্ছের বদলে উদ্ধৃত অংশ থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে বসান—
   - ক) যা ভস্ম হয়ে গেছে।
   - খ) যে-মানুষের রং কালো।
   - গ) নিজের ধর্ম নিয়ে যিনি উন্মাদ।
   - ঘ) রাজার বা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।
3. ইতিহাস-লেখকরা ভাস্কো ডা গামাকে কীভাবে দেখাচ্ছেন?
4. সেকালের কাগজপত্র গামা সম্পর্কে কী সাক্ষ্য দেয়?
5. ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি গামার নিষ্ঠুরতার দুটি দৃষ্টান্ত দিন।
6. গামা মালাবারের মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন?
7. হাজিরা প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু গামা কী করলেন?
8. গামা কেন প্রাণভিক্ষার আবেদনে সাড়া দেননি?
9. মুসলমান তীর্থযাত্রীদের ওপর ভাস্কো ডা গামার অত্যাচার সম্পর্কে একজন লেখক কী বলেছেন?

5. গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং এবং গিবন— প্রাণীজগতে আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। এই চারটি প্রাণীকে নর-বানর নাম দেওয়া হয়েছে। তবে গরিলারা অন্যদের থেকে অনেকটা আলাদা। জঙ্গলের মধ্যে একটি গরিলাদলের সঙ্গে আর-একটি দলের দেখা হলে বিবাদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। সম্পর্কটি থাকে শান্তিপূর্ণ, যেহেতু নিজেদের এলাকা বলে কর্তৃত্ব জাহির করার ঝোঁক ওদের নেই। এ-ব্যাপারটা অন্য নর-বানরদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। গরিলাদের দু-টো দল কাছাকাছি এলে একদলের কোনো সদস্য ইচ্ছে করলে স্থায়ীভাবে অন্যদলেও যোগ দিতে পারে। গরিলাদের দলগুলোর মধ্যে স্থিতিশীলতাই অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার। দলপতি যদি হঠাৎ দল ছেড়ে বেরিয়ে যায় বা মারা পড়ে, তাহলেই ঘটে বিপত্তি। দলের অন্য সদস্যরা তখন দিশাহারা হয়ে পড়ে। ঘুরতে ঘুরতে অন্য কোনো দলের সদস্যভুক্ত হবার পর নতুন দলপতির অধীনে তারা মানসিক শান্তি ফিরে পায়। দলবদ্ধ জীবনযাপনের এই সুশৃঙ্খল প্রবণতা অন্য তিনটি নর-বানরের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

   অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে কথা বলার ক্ষমতা গরিলাদের নেই। কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় বাগ্‌যন্ত্র ওদের আছে। নেই শুধু মগজের মধ্যে কথাবলার সেই বিশেষ এলাকাটি, চিন্তাভাবনাকে যা বাঙ্ময় রূপ দেবে। একমাত্র খাদ্য-সংগ্রহ করা ছাড়া গরিলাদের জীবনে আর-কোনো সমস্যা নেই। গরিলাদের

মগজের আয়তন মাত্র ৬০০ থেকে ৬৫০ ঘন সেন্টিমিটার, মানুষের হল ১৬০০। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে.বি.এস. হলডেন বলেছিলেন, ‘‘একদল শিম্পাঞ্জিকে একটি জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দাও, যেখানে ওদের প্রচুর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দেখবে, ওদের জীবনে কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। কিন্তু দুটো মানুষকে একটি ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখো, দেখবে আধঘন্টার মধ্যেই অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।” মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব হল সমস্যা সৃষ্টি করা।

(শংকর চক্রবর্তী: বিবর্তনের পথে মানুষ)

প্রশ্ন :

1. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) কোন্ কোন্ প্রাণীকে নর-বানর বলা হয়?
   - খ) কোন্ নর-বানর অন্য সমজাতীয় প্রাণীর চেয়ে আলাদা?
   - গ) গরিলাদের দুটো দলের মধ্যে দেখা হলে এমন কোন্ ঘটনা ঘটে যা অন্য নর-বানরদের চেয়ে পৃথক?
   - ঘ) গরিলাদের জীবনের একমাত্র সমস্যা কী?
2. পাঠে উদ্ধৃত অংশ থেকে শব্দ বেছে নিয়ে একশব্দে পরিরত করুন—
   - ক) ভাষা বা বাক্যে রূপান্তরিত
   - খ) স্থায়ী অবস্থা
   - গ) দিক হারিয়েছে যে
3. গরিলাদের দলে স্থিতিশীলতায় কখন বিঘ্ন ঘটে?
4. স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটলে গরিলারা কীভাবে তা ফিরে পায়?
5. গরিলাদের দুটি দলের মধ্যে বিবাদ ঘটে না কেন?
6. মগজের আয়তনের দিক থেকে গরিলা ও মানুষের তফাত কী?
7. গরিলাদের কথা বলার ক্ষমতা নেই কেন?
8. মানুষের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব কী?
9. শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে হলডেন কী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন?

6. একসময় বাউলগান সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ জেগেছিল। বারবার ছুটে গেছি কেঁদুলির মেলায়, শীতের মধ্যে সারা রাত জেগে বসে থেকেছি অজয় নদীর ধারে ছোটো ছোটো আখড়ায়। খুবই দুঃখের কথা, কয়েক বছরের মধ্যেই আমি বাউলগান সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ি। মন দিয়ে বারবার শুনলে বাউলগানেও একঘেয়েমি এসে যায়। তিন-চার রকমের বেশি সুরবৈচিত্র্য নেই। গানের মাঝে মাঝে ‘ও ভোলামন’ বলে একটি দমফাটানো তান আসলে শ্রোতাদের চমকে দেবার একটা কায়দা মাত্র। একসঙ্গে তিন চারটের বেশি বাউল-গান শোনা যায় না, তখন হাই ওঠে, কিংবা ফ্যাসানের বশবর্তী হয়ে কৃত্রিম বাহবা দিতে হয়। আসলে বাউলগানের কাছে আমাদের খুব বেশি প্রত্যাশা করাটাই ভুল। বাউলগান বাউলগানেরই মতন। আমরা তার থেকে আংশিক আনন্দ পেতে পারি মাত্র। সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতাই নগরকেন্দ্রিক। আমরা আর ইচ্ছে করলেই গ্রামীণ হয়ে যেতে পারি না। স্বতঃস্ফূর্ত গানের প্রতি আমাদের অন্তরীণ (অন্তর্নিহিত) বাসনা আছে বলেই আমরা বাউলগান বা লোকসঙ্গীতের কাছে গেছি বারবার। কিন্তু মন্দিরের সিঁড়িতে-বসা একান্ত বাউলগান বা ভেসে-যাওয়া নৌকোয় মাঝির গান শোনবার সৌভাগ্য

আমাদের দু-একবারই হয়। বারবার পেতে গেলে সবকিছুর মধ্যেই একটা সাজানো ব্যাপার এসে পড়ে। মঞ্চে ওঠবার আগে বাউল প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে পরে নেয় গেরুয়া পোশাক, শ্রোতাদের দাবিতে মজার গান হিসেবে পরিবেশন করে এইরকম গান: 'এঁড়ে গোরু বেড়া ভেঙে খেজুর গাছে চড়েছে'। অতি উৎসাহে বাউল বা লোকসংগীত শিল্পীকে আমরা সরিয়ে আনি তার জীবনচর্যা থেকে। তার ফলে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমশ সেও আমাদের কৃত্রিম দ্রব্য সরবরাহ করতে থাকে।

(সুধীর চক্রবর্তী: বাউল ফকির কথা)

প্রশ্ন :

1. একসঙ্গে প্রকাশ করুন—
   - ক) নগরকে কেন্দ্র করে যা গড়ে ওঠে।
   - খ) যা আপনা থেকেই বিকশিত হয়।
   - গ) জীবনব্যাপী পালনীয় রীতি।
   - ঘ) বৈরাগীদের আশ্রম।
2. একটি বাক্যে উত্তর দিন—
   - ক) বাউলরা মাঝে মাঝে 'ও ভোলামন' গেয়ে ওঠে কী উদ্দেশ্যে?
   - খ) লেখক অজয় নদীর ধারে কোথায় বসে থেকেছেন?
   - গ) গান শুনতে শুনতে কখন হাই ওঠে?
3. বাউলগান শোনার আগ্রহে লেখক কী করেছেন?
4. গান শুনতে শুনতে একঘেয়েমি এসে যায় কেন?
5. মঞ্চে ওঠার আগে বাউল কী করে?
6. মঞ্চে শ্রোতাদের দাবি বাউলরা কীভাবে মেটায়?
7. বাউলগানের কাছে খুব বেশি প্রত্যাশা করা উচিত নয় কেন?
8. উদ্ধৃতাংশে কৃত্রিম দ্রব্য বলতে কী বোঝান হয়েছে বুঝিয়ে দিন।

30.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

30.1

1. মুখস্থ নয়, নিজের ভাষায়— সাধুভাষা থেকে চলিতে রূপান্তর— প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন— উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত;
2. লেখা এলোমেলো হবে— লেখা আটকে যাবে।

শব্দার্থ ও টীকা

31

বক্তব্যের নোট নেওয়া ও দেওয়া

31.1 প্রস্তাবনা

নোট করা একটি অতি প্রয়োজনীয় দক্ষতা। এই দক্ষতা আমাদের খুবই সাহায্য করে। সব কিছু আমরা মনে রাখতে পারি না। শব্দ ধরে ধরে কোনো পঠিত অংশকে স্মৃতিতে ধরে রাখা অসম্ভব। নোট আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সংগ্রহ করে তাকেও স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

31.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনারা—

- নোট কেন করব তা জানতে পারবেন;
- উক্ত বিষয়-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন;
- নোট করার কৌশল অর্জন করতে পারবেন।

31.3 বিষয়ের রূপরেখা

নোট করা কী?

বিষয় একক ধরে ধরে মূল ও তার সহায়কভাবকে সংক্ষেপ করাই হল নোট। মনে রাখতে হবে নোট যেন সহজ হয়। নোট করার কয়েক মাস পরে যদি তা পড়ে কিছুই না বোঝা যায় তাহলে সেগুলিকে আদর্শ নোট বলে না।

কেমন করে নোট করতে হয়?

- কেন্দ্রীয় ভাবটি বুঝতে গোটা অনুচ্ছেদটি পড়ুন।
- মূলভাব বা ভাবগুলিকে সুনির্দিষ্ট করতে একাধিকবার পড়ুন।
- মূলভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয় এককগুলি বাছুন।

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে।

- পাঠ্য বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে।
- নোট ছোটো হবে।
- বিষয় ধরে ধরে নোট করতে হবে। পুরো বাক্যে নোট করা চলবে না।
- জানা শব্দসংক্ষেপ ও প্রতীক দরকারে ব্যবহার করুন।
- পরপর যুক্তি বসিয়ে বিষয়টি সাজান।
- অলংকার ও বিশেষ অর্থসূচক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করবেন না।
- উদাহরণ ও উদ্ধৃতি প্রয়োগ করবেন না।

31.4 নোট করার দুটি নমুনা

১ম নমুনা:

ভুল এমনই একটা চিরন্তন ব্যাপার, যে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা মুনি-ঋষিরাও এর হাত থেকে রেহাই পাননি। সত্যি ভুল একটা মানবীয় ধর্ম। সুতরাং ধর্মই যদি হল, তাহলে 'ভুল কী করে হয়' এ ধরনের প্রশ্নে নিজেকে বা অপরকে বিব্রত করা বিলাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবনে এই ভুল মাঝে মাঝে এতো দুঃখ, কষ্ট, অশান্তির কারণ হয়, ভুলের মাশুল এত বেশি ভার বোঝা এমনকি মারাত্মক হয়ে পড়ে যে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে কেবল উদগ্রীব নয়, রীতিমতো উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারে না। ভুলটা কী করে হল, কেমন করে এর পুনরাবৃত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, সেটা সে জানতে চায়, বুঝতে চায়।

ভুল অনেক রকমের হয়— সীমিত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা বিচারবুদ্ধির ত্রুটির জন্যে আমরা ভুল করে বসি। সতর্কতা বা চেষ্টা থাকলে সেই সব ভুল হয়তো এড়ানো খুব কঠিন নয় ; আবার চেষ্টা করলেই যে সব সময় ভুল এড়ানো যায় তা তো নয়, 'পেটে আসছে মুখে আসছে না' অবস্থা আমাদের আরও বিপাকে ফেলে। অথবা এক ভুল শোধরাতে গিয়ে আর-এক ভুল করে বসি।

আলোচনা :

আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ভুল করা যে মানুষের ধর্ম সে সম্পর্কেই এই অনুচ্ছেদ দুটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অনুচ্ছেদটি আমরা আরও একবার পড়ে এই অংশের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য চিহ্নিত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদটির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল :

ভুল মানুষের ধর্ম—এবার দেখা যাক্ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মূলভাবটি কী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রধান ভাবটি হল : ভুল হয় অনেক রকমের। যেমন—

(ক) সীমিত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য মানুষের ভুল হয়।

(খ) বিচারবিবেচনায় ত্রুটি থাকার জন্যও ভুল হয়।

(গ) চেষ্টা করলে এসব ভুল মানুষ এড়াতেও পারে।

(ঘ) আবার অনেক সময় চেষ্টা করেও এ ভুল এড়ানো সম্ভব হয় না।

শব্দার্থ ও টীকা

অনুচ্ছেদ দুটির নোট

1. নামকরণ : ভুল করাই মানুষের ধর্ম।
2. ভুলের কারণ : সীমিত জ্ঞান বা বিচারবিবেচনায় ত্রুটি।
3. ভুলের মাশুল : চরম ভুলে জীবন বিপন্ন।
4. ভুল দূরীকরণের চেষ্টা : একশ ভাগ ভুল সংশোধন অসম্ভব। সব সময় সফল হয় না।

২য় নমুনা :

কোনো স্থান সম্পর্কেই সাধারণ কাকেদের কোনো বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও শহরের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি দেখা গেছে। ঝোপ-জঙ্গল বা সভ্য মানুষের বসতি বর্জিত অঞ্চলগুলিতে তাদের সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। সুদূর পল্লি অঞ্চল এবং কৃষিপ্রধান স্থানগুলিতেও তারা মানুষের খুব সান্নিধ্যে থাকে। এখানে প্রধানত মাঠে-খেতে তাদের দেখা যায়। তারা দল বেঁধে প্রত্যহ আহারের সন্ধানে বের হয় এবং দিনের শেষে সদলবলে নিজেদের বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু নগর এলাকায় এরা যেন এক স্বতন্ত্র জীব—তখন এরা দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মপ্রত্যয়ে অটল। মানুষকে তাদের বিন্দুমাত্র ভয় নেই—মানুষের সঙ্গে চাতুরি করতেও তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। মফস্‌সল অঞ্চলে থাকতে দলবদ্ধ হয়ে থাকার যে অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে, এখানে তারা তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। কারণ শহরে তারা নিজেদের বেশি নিরাপদ বলে মনে করে। শহরাঞ্চলে এরা মূলত আবর্জনা থেকেই খাদ্য আহরণ করে জীবনধারণ করে এবং সেইদিক থেকে এদের উপকারিতার তুলনা হয় না। তরি-তরকারি এবং মাছ-মাংসের ফেলে দেওয়া অংশ থেকে শুরু করে ডিমের খোসা, অন্যান্য পাখির ছানা এবং রান্নাঘরের জঞ্জাল সবকিছু থেকেই এরা খাদ্যবস্তু আহরণ করে থাকে।

আলোচনা :

অনুচ্ছেদটি পাঠ করে আপনারা বুঝেছেন যে সাধারণ কাকদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সে চরিত্র পল্লি অঞ্চলে একরকম, শহরাঞ্চলে ভিন্ন।

অনুচ্ছেদটি আমরা আরও একবার পড়ে এর মূল বক্তব্য বা বক্তব্যসমূহ চিহ্নিত করব।

অনুচ্ছেদটির প্রধান বক্তব্য হল :

ক। কাকেদের নির্দিষ্ট কোনও স্থানের প্রতি কোনও বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও শহরের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

খ। পল্লি অঞ্চল এবং কৃষিপ্রধান স্থানগুলিতে মানুষের কাছাকাছি তারা থাকে।

গ। পল্লি অঞ্চলে দল বেঁধে তারা খাদ্যের সন্ধানে যায় এবং সদলবলেই ফিরে আসে।

ঘ। শহরে তাদের চরিত্র ভিন্ন—মানুষকে ভয় পায় না। মানুষের সঙ্গে চাতুরি করে।

ঙ। শহরে প্রধানত আবর্জনা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে মানুষের উপকার করে।

অনুচ্ছেদটির নোট

নামকরণ : **কাক-চরিত**

1. কাকেদের পল্লি অঞ্চল থেকে শহর অধিকতর পছন্দ।
2. পল্লি অঞ্চলে : (ক) এদের দলবদ্ধ গতিবিধি। (খ) মাঠে-খেতেই এদের চলাফেরা বেশি।
3. শহরাঞ্চলে : (ক) মানুষ থেকে ভয় নেই। (খ) দাম্ভিক (গ) আত্মকেন্দ্রিক (ঘ) আত্মপ্রত্যয়ে অটল।

4. কিছু ক্ষেত্রে মানুষের উপকারী।
5. এরা খায় : (ক) তরি-তরকারির খোসা। (খ) মাছ-মাংসের নোংরা। (গ) ডিমের খোসা। (ঘ) অন্যান্য পাখির ছানা।

পাঠগত প্রশ্ন : 31.1

1. নোট করার দক্ষতা জানা কেন দরকার তা তিনটি বাক্যে লিখুন।
2. নোট করা সম্বন্ধে অনধিক দুটি বাক্যে লিখুন।
3. কেমন করে নোট করতে হয় তা তিনটি বাক্যে লিখুন।

31.5 আপনি যা শিখলেন

- বিষয় এককগুলি বার করতে।
- সহায়ক ভাবকে চিহ্নিত করতে।
- মূল ভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয়-এককগুলি বুঝতে।

31.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে নোট তৈরি করুন :

দর্শন হল এমন এক শাস্ত্র যা সমগ্র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করে। দর্শনের সঙ্গে জীবনের এক নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান। দর্শন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করেই দর্শনের উদ্ভব হয়েছে। যে-কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোনো-না-কোনো ধারণা আছে। মানবজীবনের সমস্যা থেকে মুক্ত কোনো দার্শনিক মতের যথার্থ কোনো মূল্য নেই। আজকাল অনেকে বলেন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দর্শনের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এরূপ বক্তব্য যথার্থ নয়। দার্শনিক অনুসন্ধান আমাদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটায় না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে দর্শনকে চিন্তার এক বিলাসিতা মাত্র বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। দার্শনিক সত্যানুসন্ধানের এক স্বতঃমূল্য আছে। দর্শন শাস্ত্রের পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে মানুষ উচ্চ মননশক্তির অধিকারী হয়। ফলে যে-কোনো জটিল বিতর্কমূলক বিষয় সে সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং সে-সম্পর্কে তার বিচারসম্মত অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। দর্শন জীবনের গভীরতম প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। দার্শনিক চিন্তা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সুস্থ ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনযাপন সম্ভব নয়। জ্ঞানপিপাসা মানুষের চিরন্তন স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং যতদিন তার এই জ্ঞানপিপাসা থাকবে ততদিন দর্শনের মূল্য থাকবে। সুতরাং, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এই বিচারে দর্শন আমাদের জীবনের দিগ্‌দর্শন।

31.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

31.1

1. বিষয় সংগ্রহ ও স্মৃতিতে ধরে রাখা।
2. মূল ও সহায়ক ভাবকে সহজে ও সংক্ষেপে লেখা।
3. অনুচ্ছেদটি একাধিকবার পড়া, চিহ্নিত করা ও মূল ভাবের সঙ্গে যুক্ত বিষয়-এককগুলি বাছা।

উপন্যাস

32. আরণ্যক

32

আরণ্যক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

32.1 প্রস্তাবনা

শহরের হৈচৈ ও আধুনিক জীবনধারায় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দম আটকে আসছিল। শ্রান্ত, ক্লান্ত-মনকে একটু চাঙ্গা করতে তিনি আন্তরিকভাবে তাঁর জীবিকার বদল চাচ্ছিলেন।

লেখক এখানে সত্যচরণের ভূমিকায়। এক জমিদারির এস্টেটের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন-পাহাড়ে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন সত্যচরণ। এখন তিনি লবটুলিয়া-বইহার-আজমাবাদের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সেখানকার জ্যোৎস্না, অন্ধকারময় শান্ত স্তব্ধ রাত, রাতের গভীরে জন্তু জানোয়ারের পথ চলার আওয়াজ, সরস্বতী কুণ্ডীর জলে বুনো মহিষের জলপান, পাহাড়-পর্বতে ছেয়ে থাকা জানা-অজানা রঙীন ফুলের বন ইত্যাদি থেকে সব রস শুষে নিয়ে তাজা হয়ে উঠলেন। এখানে মানুষ নয়, প্রকৃতিই প্রধান।

সত্যচরণ পাহাড়-বনে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছেন ; খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতির হাতে গড়ে-ওঠা নর-নারীদের, বনের পশুপাখিদের। অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন তাদের। একটি উপন্যাসের কাঠামোর ফ্রেমে সেই পাহাড়-পর্বত বনজঙ্গল নদী ঝরনা যেমন ধরেছেন তেমনি ধরেছেন গনোরী, যুগলপ্রসাদ, কুন্তা, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে আর ভানুমতীকে।

লেখকের মনকে আজকের গর্বান্ধ আধুনিক সভ্যতা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এদেশের আসল মালিক এই আদিবাসীদের কাছে। ফিরে দেখার নানা স্মৃতিচারণা করেছেন লেখকের হয়ে সত্যচরণ।

‘আরণ্যক’ মূল উপন্যাসটিকে এখানে সংক্ষেপিত করা হয়েছে। মূল আলোচ্য ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

এই পাঠে লেখকের ব্যবহৃত বানানরীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে অন্যত্র প:ব: বাংলা একাডেমি নির্দেশিত বানান রাখা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

32.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনারা :

- আমাদের দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বহুত্ব সম্বন্ধে পরিচিত হতে পারবেন;
- পূর্ণিয়া জেলার (বর্তমানে বিহার) জঙ্গলমহলের ও সেখানকার আদিবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন;
- শহুরে সভ্যতার ও আদিবাসীদের সনাতন জীবনধারার তুলনামূলক পরিচয় পাবেন;
- দূষিত ও দূষণমুক্ত পরিবেশকে চিনতে পারবেন;
- গোটা দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন;
- বনজঙ্গল ও সেখানকার জীবজন্তুদের পরিচয় পাবেন।

32.3 মূল পাঠ

অনুবিভাগ - 32.3.1

পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরি মিলিল না।

তাগাদা = কোনো কাজ করার জন্য বারংবার অনুরোধ।
ধুমধাম = জমকাল, আড়ম্বরপূর্ণ।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধূমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই। হিন্দু হোস্টেলে জলসার পর অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?

প্রবঞ্চনা = ছলনা।
অযাচিতভাবে = না চাইতেই আপনা থেকে।

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি! যে চাকুরির খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরির প্রস্তাব আপনা হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

উদাসীন = নিরপেক্ষ, অনাসক্ত।

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মত বলিলাম—ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ তো?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে

আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারীর ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজী হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

শব্দার্থ ও টীকা

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার = নিয়োগ পত্র।

অনুবিভাগ - 32.3.2

কি করিয়া চাকুরি পাইলাম তাহা বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—অবিনাশের বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিসপত্র লইয়া বি এন্ ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে নামিলাম।

স্বতন্ত্র = আলাদা, ভিন্ন।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-ক্ষেত, শীতল সান্ধ্য-বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে-জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদার প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।

সান্ধ্য = সন্ধ্যাকালীন।

গরুর গাড়ীতে প্রায় পনের-যোল ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলকাতা হইতে আনীত কম্বল র‍্যাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এ-সব অঞ্চলে ভয়ানক শীত! সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম, জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্তি পরিগ্রহন করিয়াছে—ক্ষেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোটোবড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

ক্রোশ = দু মাইলের কিছু অধিক দীর্ঘপথ-পরিমাণ।

লোকালয় = জনবসতি।
আবাদ = চাষ।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনের বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরী—ঘরে শুক্‌নো ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন তৈরী, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাটকা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরণা থাকায় এখানে জলের কষ্ট নাই।

অনুবিভাগ - 32.3.3

জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, লাইব্রেরী, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এসব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনোদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরে

রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারীর বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতের-আঠার বছর। বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ী। বলিলাম বসুন গোষ্ঠবাবু—

গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকার কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ—

—বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভাল, এমন নয় গোষ্ঠবাবু—

—সে আর আমার জানতে বাকী নেই, ম্যানেজারবাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত— আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশী থাকতে পারি নে।

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় নাকি?

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজারবাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ুউড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।

—কি দেখব?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে— কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোন্‌কালে কোলকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি!

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভাল নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।

কৌতূহলের সহিত বলিলাম, বলেন কি! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?

—বেশী না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তা ছাড়া, এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে দিলে দেখবেই বা কে?

শব্দার্থ ও টীকা

পুরাইব = কাটাইব।
মুহুরী = কেরাণী।
হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি = স্বস্তি পাই।
তাড়না = অত্যাচার।
উড়ুউড়ু = পালাই পালাই।

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হাকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরি করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এ-সব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

শব্দার্থ ও টীকা

অনুবিভাগ - 32.3.4

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোট পাথরের টিলা, তার উপর প্রাচীন ও সুবৃহৎ একটা বটগাছ। এই বটগাছের নাম গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ। কেন এই নাম হইল, তখন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

অনতিদূরে = অতিরিক্ত দূরে নয়, অল্প দূরে।
অনুসন্ধান = খোঁজ
নিস্তব্ধ = নিঝুম, নিস্পন্দ।
অপরাহ্নে = দিনের শেষ ভাগে, বিকেলে।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূর পর্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদীঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা—প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস্ মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু-হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরির খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এই সব মূর্খ, বর্বর মানুষ,—এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না—এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তাই সঙ্কল্প করিলাম, এ মাসের আর সামান্য দিনই বাকী, সামনের মাসটা কোনরূপে চোখ বুঁজিয়া কাটাইব, তার পর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

বিরামহীন = বিরতি বা শেষ নেই এমন।

সাহচর্যে = সঙ্গে বা সাথে।
উদাস = আনমনা।
দিগন্তব্যাপী = অনন্তবিস্তারী।
দূরবিসর্পী = দূরবিস্তৃত।

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছি, সিপাহী মুনেশ্বর সিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম—কি মুনেশ্বর?

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দী কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল—হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরী বাবুকে।

—কি হবে লোহার কড়া?

মুনেশ্বরের মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত সুরে বলিল—একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে

করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোকে রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরনের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরীব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ-আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়? শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

পরদিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর সিং নউগচ্ছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেঝেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

—হো গৈল, হুজুরকী কৃপা-সে—কড়াইয়া হো গৈল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই একমাসের মধ্যে সর্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো! বড় কষ্ট তো এদের!

শব্দার্থ ও টীকা

চিরকুট = ছোটো টুকরো।
হর্ষোৎফুল্ল = আনন্দে আত্মহারা।
হো গেল, হুজুরকী কৃপা-সে = (হিন্দি শব্দ) হয়ে গেল, হুজুরের দয়ায়।

অনুবিভাগ - 32.3.5

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে সেদিন দোল-পূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্যন্ত হেড আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে-জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা-নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

নিশীথিনী = রাত্রি।
অবর্ণনীয় = যার বর্ণনা দেওয়া যায় না।

হয়তো যতদিন আসিয়াছি, শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনো বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ- প্রমোদের পরে ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথরাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটোখাটো বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চক্‌চকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি— মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এই সব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়, আমি অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

অর্ধশুষ্ক = অর্ধেকটা শুকনো।
অপার্থিব = অলৌকিক, নৈসর্গিক।
নিশীথ রাত্রে = গভীর রাতে।
অনধিকার = অধিকার ছাড়া, অধিকার ব্যতীত।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রি কতবার দেখিয়াছি—ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধ্‌লি ফুল

ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙীন ফুলের গালিচা বিছাইয়া দেয়, তখন কত জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধ্‌লি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হতে পারে, মনে এমন ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহা তো কোনদিন ভাবিও নাই! ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্‌দিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া ওঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত ; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

শব্দার্থ ও টীকা

গালিচা = কার্পেট।
অপরূপ = অতুলনীয়।
দিগ্‌দিগন্ত = একদিক থেকে আরেক দিক।
বিসর্পিত = বিস্তৃত।

অনুবিভাগ - 32.3.6

সাদা কথায় গ্রীষ্ম বা জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝানো যাইবে না। উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর—পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গল-মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল—সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না—যদিবা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, ছোট এক বালতি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে একমাত্র কুশী নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে। আমাদের জমিদারী ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বহিয়া আসিতেছে—কিন্তু বর্তমানে শুধু শুষ্ক বালুময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুঁড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায়, তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসী লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ-কলসীটাক ঘোলা জল লইয়া বাড়ী ফিরে।

বিভীষিকাময় = ভয়ানক ভীতিপূর্ণ।

কুণ্ডী = বড়ো জলাশয়।

চরণচিহ্ন = পায়ের ছাপ।

কিন্তু পাহাড়ী নদী—স্থানীয় নাম মিছি নদী—আমাদের কোনও কাজে আসে না—কারণ আমাদের মহাল হইতে বহু দূরে। কাছারিতেও কোন বড় ইঁদারা নাই—ছোট যে বালির পাতকুয়াটি আছে, তাহা হইতে পানীয় জলের সংস্থান হওয়াই বিষম সমস্যার কথা দাঁড়াইল। তিন বাল্‌তি জল সংগ্রহ করিতে দুপুর ঘুরিয়া যায়।

ইঁদারা = কুয়ো।
সংস্থান = ব্যবস্থা, যোগাড়, সংগ্রহ।

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারিধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কার মত তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া বহিতেছে—সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের ও ভয়ানকরুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়—এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস পশ্চিমে বাতাসের সময়—কাছারি হইতে এক-শ’ গজ দূরের জিনিস ঘন বালি ও ধূলিরাশির আড়ালে ঢাকিয়া যায়।

তাম্রাভ = তামার ন্যায় আভা।
অগ্নিবর্ষী = আগুন বর্ষণকারী, ভীষণ গরম।

অর্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায়—কুঁয়ামে পানি নেই ছে, হুজুর। কোন-কোন দিন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বাল্‌তি তরল কর্দম স্নানের জন্য আমার সামনে আনিয়া ধরে। সে ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য।

পানি = জল।
ছানিয়া ছানিয়া = ছেঁকে ছেঁকে।

শব্দার্থ ও টীকা

ভীম-ভৈরব = বিশাল রুদ্রমূর্তি।
হাইড্রোজেন = মৌলিক গ্যাস বিশেষ।
নিকেল/কোবাল্ট = বিভিন্ন ধাতু।
ফার্নেস = অগ্নিকুণ্ড।

একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলায় স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারিধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি তো নাই-ই, এ জায়গা হইতে চলিয়া গেলে আর কোথাও দেখিবও না। আজন্ম বাংলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি— জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ রুদ্রমূর্তি তাহার নাই। এ ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড— ক্যাল্‌সিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধূ-ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারেব স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া, প্রতি তৃণপত্রের শিরা উপশিরার সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ঝল্‌সাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব-লীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্বত্র কম্পমান তাপ-তরঙ্গ ও তাহার ওধারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখির দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের!

কুণ্ডী = জলাশয়, হ্রদ।

কাছারি হইতে তিন মাইল দূরে একটি বনে-ঘেরা ক্ষুদ্র কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল ছিল, কুণ্ডীটাতে গত বর্ষার জলে খুব মাছ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম—খুব গভীর বলিয়া এই অনাবৃষ্টিতেও তাহার জল একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কিন্তু সে জলে কাহারও কোন কাজ হয় না—প্রথমত, তার কাছাকাছি অনেক দূর লইয়া কোন মানুষের বসতি নাই—দ্বিতীয়ত, জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে, কোমর পর্যন্ত বসিয়া যায়—কলসীতে জল পুরিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হইবার আশা বড়ই কম। আর একটি কারণ এই যে, জলটা খুব ভাল নয়— স্নান বা পানের আদৌ উপযুক্ত নয়, জলের সঙ্গে কি জিনিস মিশানো আছে জানি না— কিন্তু কেমন একটা অপ্রীতিকর ধাতব গন্ধ।

অপ্রীতিকর = খারাপ

একদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমে বাতাস ও উত্তাপ কম পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় বাহির হইয়া ঐ কুণ্ডীটার পাশের উঁচু বালিয়াড়ি ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের পথে উপস্থিত হইয়াছি। পিছনে গ্র্যাণ্ট সাহেবের সেই বড় বটগাছের আড়ালে সূর্য অস্ত যাইতেছিল। কাছারির খানিকটা জল বাঁচাইবার জন্য ভাবিলাম, এখানে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়াইয়া লই। যত কাদা হোক, ঘোড়া ঠিক উঠিতে পারিবে। জঙ্গল পার হইয়া কুণ্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুণ্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটা প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণত দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল, এ ধরনের মহিষ আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং, গায়ে লম্বা লম্বা লোম—বিপুল শরীর। কাছেও কোনও লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই—তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেহ লুকাইয়া হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি, মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল—আরে সর্বনাশ! বলেন কি হুজুর! হনুমানজী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ! ও পোষা ভঁইস্ নয়, ও হ'ল আড়ন, বুনো ভঁইস্ হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গল থেকে

ভঁইস = মোষ।

শব্দার্থ ও টীকা

এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই তো। জলকষ্টে পড়ে এসেছে।

কাছারিতে কথাটা তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই এক বাক্যে বলিল—উঃ, হুজুর খুব বেঁচে গিয়েছেন। বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যেবেলা ঐ নির্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত, ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না হুজুর।

খবর আসিতে লাগিল সেই জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীতে লোকে বাঘকে জল খাইতে দেখিয়াছে, বন-মহিষকে জল খাইতে দেখিয়াছে, হরিণের পালকে জল খাইতে দেখিয়াছে, নীল গাই ও বুনো শূয়োর তো আছেই—কারণ শেষের দুইপ্রকার জানোয়ার এ জঙ্গলে অত্যন্ত বেশী। আমি নিজে আর একদিন জ্যোৎস্না-রাতে ঘোড়ায় করিয়া কুণ্ডীতে যাই শিকারের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে তিন-চারজন সিপাহী ছিল—দু-তিনটি বন্দুকও ছিল। সে যা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম সে রাত্রে, জীবনে ভুলিবার নয়। তাহা বুঝিতে হইলে কল্পনায় দৃষ্টি আঁকিয়া লইতে হইবে এক জনহীন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ও বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের। আরও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে সারা বনভূমি ব্যাপিয়া এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার, অভিজ্ঞতা না থাকিলে যদিও সে নিস্তব্ধতা কল্পনা করা অসম্ভব।

উষ্ণ বাতাস অর্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। লোকালয় হইতে বহুদূরে আসিয়াছি, দিগ্-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কুণ্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে একদিকে দুটি নীল গাই, অন্য দিকে দুটি হায়েনা, নীল গাই দুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীল গাই দুটির দিকে চাহিতেছে—আর দু-দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের এক ছোটো নীল গাইয়ের বাচ্চা। অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি নাই—দেখিয়া পিপাসার্ত বন জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও একফোঁটা জল নাই। আরো এক বিপদ দেখা দিল। এই সুবিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের মাঝে মাঝে লোকে দিক হারাইয়া আগেও পথ ভুলিয়া যাইত—এখন এই সব পথাহারা পথিকদের জলাভাবে প্রাণ হারাইবার সমূহ আশঙ্কা দাঁড়াইল, কারণ ফুলকিয়া বইহার হইতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ পর্যন্ত বিশাল তৃণভূমির মধ্যে কোথাও একবিন্দু জল নাই। এক-আধটা শুষ্কপ্রায় কুণ্ডী যেখানে আছে, অনভিজ্ঞ দিগ্ভ্রান্ত পথিকদের পক্ষে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়।

অনুবিভাগ - 32.3.7

একদিনের ঘটনা বলি।

সেদিন বেলা চারটার সময় অত্যন্ত গরমে কাজে মন বসাইতে না পারিয়া একখানা কি বই পড়িতেছি, এমন সময় রামবিরিজ সিং আসিয়া এত্তেলা করিল, কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপর একজন কে অদ্ভুত ধরনের পাগলা লোক দেখা যাইতেছে—সে হাত-পা নাড়িয়া দূর হইতে কি যেন বলিতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম সত্যই দূরের ডাঙাটার উপরে কে একজন দাঁড়াইয়া— মনে হইল মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছে। কাছারিসুদ্ধ লোক জড় হইয়া সেদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি দুজন সিপাহী

এত্তেলা = সংবাদ, খবর।

শব্দার্থ ও টীকা

চাকলাদার = কয়েকটি পরগণার শাসক।

কথঞ্চিৎ = কিছুটা।
প্রবৃত্তি = ইচ্ছা।

অনুসন্ধান = খোঁজ।
দিগ্‌ভ্রান্ত = দিক স্থির করতে ব্যর্থ।

জিনপরী = অপদেবতা।

নৈঋত কোণ = দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

পাঠাইয়া দিলাম লোকটাকে এখানে আনিতে।

লোকটাকে যখন আনা হইল, দেখিলাম তাহার গায়ে কোন জামা নাই—পরনে মাত্র একখানা ফর্সা ধুতি, চেহারা ভাল, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখদুটি জবাফুলের মত লাল, চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। আমার ঘরের দাওয়ায় একটা বালতিতে জল ছিল—তাই দেখিয়া সে পাগলের মত ছুটিয়া বালতির দিকে গেল। মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদার ব্যাপারটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বালতি সরাইয়া লইল। তাহার পর তাহাকে বসাইয়া হাঁ করাইয়া দেখা গেল জিভ ফুলিয়া বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে। অতি কষ্টে জিভটা মুখের এক পাশে সরাইয়া একটু একটু করিয়া তার মুখে জল দিতে দিতে আধ ঘণ্টা পরে লোকটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাছারিতে লেবু ছিল, লেবুর রস ও গরম জল এক গ্লাস তাহাকে খাইতে দিলাম। ক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শুনিলাম তার বাড়ী পাটনা। গালার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে সে এ-অঞ্চলে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পূর্ণিয়া হইতে রওনা হইয়াছে আজ দুই দিন পূর্বে। তার পর দুপুরের সময় আমাদের মহালে ঢুকিয়াছে, এবং একটু পরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এ রকম একঘেয়ে একই ধরনের গাছে-ভরা জঙ্গলে দিক্ ভুল করা খুব সোজা, বিশেষত বিদেশী লোকের পক্ষে। ভয়ে দিশাহারা হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে আজ সারা দুপুর, তাহার উপর খুব চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছে—কোথায় লোক? ফুলকিয়া বইহারের কুলের জঙ্গল যেদিকে, সেদিক হইতে লবটুলিয়া পর্যন্ত দশ-বারো বর্গমাইল-ব্যাপী বনপ্রান্তর সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাহার চীৎকার কেহ শোনে নাই। আরও তাহার আতঙ্ক হইবার কারণ, সে ভাবিয়াছিল তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে জিনপরীতে পাইয়াছে—মারিয়া না ফেলিয়া ছাড়িবে না। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, কিন্তু আজ অসহ্য পিপাসায় দুপুরের পরে এমন গা-জ্বলুনি শুরু হইয়াছিল যে জামাটা খুলিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় দৈবক্রমে আমাদের কাছারির হনুমানের ধ্বজার লাল নিশানাটা দূর হইতে তাহার চোখে না পড়িলে লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।

একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুর বেলা সংবাদ পাইলাম, নৈঋত কোণে মাইল-খানেক দূরের জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে আপাতত তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল!

ভাবিবার সময় নাই। কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারী দলিল, ম্যাপ, সর্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার তো আছেই। এ সব তো যায়। সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর! বলিলাম—সব জিনিস বার কর। সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

জনকতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় কাটিয়া পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যে বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিমা বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর

বিপন্ন।

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোস দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল —ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পালাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটাকতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে.... আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন? গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু, রাখ্! এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার?

শব্দার্থ ও টীকা

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনের জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নেই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এইমাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিসপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিস যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে! মুহুরীবাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন, আর দলিলের বাক্সটা।

বিভীষণ = অতি-ভয়ঙ্কর।

জিম্মা = হেপাজত, সংরক্ষণের দায়িত্ব।

কাছারির উঠান ও পরিষ্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্বমুখে ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এযাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহুদূরে পূর্বাকাশে লাল করিয়া লোলজিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারারাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় গিয়া পৌঁছিল।

অনুবিভাগ - 32.3.8

প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, কিন্তু তাহাতে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মতো সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরও নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

সেলামী = মালিককে সম্মান জানাবার জন্য টাকা দেওয়া।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল, সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরীব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি স্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় দিতে পারি কিনা?

বখরা = ভাগ।

এক ধরণের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশি কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে, সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ অনেক আশা করিয়া

ধরমপুর পরগণা হইতে এতদূর আসিয়াছে জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশাভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, একরকম বিনামূল্যেই। বলিয়া দিলাম, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথমে দু বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজনা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই কি অদ্ভুত ধরণের মানুষকে জমিদারীতে বসাইলাম!

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতের শেষে হঠাৎ একদিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর লোকটা একবারও কাছারিমুখো হল না, এর মানে কি? বলিলাম— কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে-ছুড়ে চলে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ করনি?

দেখিলাম, ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমতা আমতা করিয়া বলিল— হ্যাঁ হুজুর, চাষ কিছু— এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম— দেড় বছর তোমার চুলের টিকি তো দেখা যায়নি। দিব্যি স্টেট্‌কে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ— কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল— ফসল হুজুর? কিন্তু সে তো ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠেনি— সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিলাম— চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন মকাই করনি?

না হুজুর, বড্ড গজার জঙ্গল। একা মানুষ, ভরসা করে উঠতে পারিনি। পনের কাঠা জমি অতিকষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

রাজুর পিছনে পিছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূরে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরি ছোট নীচু দুখানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় তার ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নীচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম— রাজু, তুমি এত আল্‌সে কুঁড়ে লোক তা তো জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু-বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল— সময় হুজুর বড় কম যে!

— কেন, কি কর সারাদিন?

শব্দার্থ ও টীকা

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড়গোছের,তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপত্রের কি দরকার? জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই?

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদুরমাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া বুঝিলাম, রাজু ভক্তমানুষ! ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর একপাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ, তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজাআচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম।

রাজু পাঁড়ে হিন্দী লেখাপড়া ভাল জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে— অধিকাংশ সময় দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। একদিন দেখি একটা ছোট খাতায় খাগের কলমে, বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি? পাঁড়ে কবিতাও লেখে নাকি?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিলে না। তারপর বলিল— জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বনজঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখি ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা তাকান না। কাজেই এখানে, দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন— কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম রাজু কবি বটে, দার্শনিকও বটে।

সেবার শুয়োরমারির বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল। কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। একদিন শুনিলাম, রাজু পাঁড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম না। তবে আমি কিছুদিন হোমিওপ্যাথি ওযুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পৌঁছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বাটুয়াতে শিকড়-বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল— হুজুর আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে। এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিবিল সার্জেন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওযুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া উঠিলে দাম দিবে এই নাকি কড়ার হইয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা

দুধলি ঘাস = একপ্রকার ঘাস।

মহালিখারূপ শৈল = মহালিখারূপ নামক পাহাড়।

রহস্যময় = আশ্চর্যজনক।
অসীমতার = সীমার বাঁধনে যা বাঁধা যায় না।
দুরধিগম্যতার = দুর্গমত্বের।
ভয়াল = ভীতিপ্রদ।
নিস্পৃহ = নিরাসক্ত।

অনুবিভাগ - 32.3.9

কয়েক বারের কথা বলি। সে অমূল্য অনুভূতিরাজির কথা বলিতে গেলে লিখিয়া পাতার পর পাতা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু তবু বলা শেষ হয় না, যা বলিতে চাহিতেছি তাহার অনেকখানিই বাকি থাকিয়া যায়। এসব শুনিবার লোকও সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ক'জন মনে-প্রাণে প্রকৃতিকে ভালবাসে?

অরণ্য-প্রান্তরে লবটুলিয়ার মাঠে মাঠে দুধ্‌লি ঘাসের ফুল ফুটাইয়া জানাইয়া দেয় যে বসন্ত পড়িয়াছে। সে ফুলও বড় সুন্দর, দেখিতে নক্ষত্রের মত আকৃতি, রং হলদে, লম্বা লম্বা সরু লতার মত ঘাসের ডাঁটাটা অনেকখানি জমি জুড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকে, নক্ষত্রাকৃতি হলদে ফুল ধরে তার গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ, পথের ধার সর্বত্র আলো করিয়া ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু সূর্যের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুল কুঁক্‌ড়াইয়া পুনরায় কুঁড়ির আকার ধারণ করিত—পরদিন সকালে আবার সেই কুঁড়িগুলিই দেখিতাম ফুটিয়া আছে।

রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে-সব জায়গায় চৈত্রে শালমঞ্জরীর সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমূল বনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল, দোয়েল, বৌ-কথা-কও প্রভৃতি গায়ক পাখীরা ডাকে না, এ-সব জনহীন অরণ্য-প্রান্তরের যে ছন্ন-ছাড়া রূপ, বোধহয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-এক দিন বাংলাদেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেটুবন, বাতাবীলেবুর ফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘন-ছায়া-ভরা অপরাহ্ন। দেশকে কী ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া! দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

কিন্তু যে-কথাটা বার-বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনো বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম-ছম-করানো সৌন্দর্যের দিকটা। না দেখিলে কি করিয়া বুঝাইব সে কী জিনিস!

জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ ঝাউবন ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে।

সে-রূপ তাহার না দেখাই ভাল, যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে।

গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল

সামলানো বড় কঠিন।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে-রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন বিশাল উন্মুক্ত আরণ্য-প্রান্তর, শৈলমালা, বনঝাউ আর কাশের বন কোথায় যেখানে-সেখানে? তার সঙ্গে যোগ চাই গভীর নিশীথিনীর নীরবতার ও তার অন্ধকার বা জ্যোৎস্নার—এত যোগাযোগ সুলভ হইলে পৃথিবীতে কবি আর পাগলে দেশ ছাইয়া যাইত না?

শব্দার্থ ও টীকা

বিজন = জনহীন।
উন্মুক্ত = খোলা।

একদিন প্রকৃতির সে-রূপ কিভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সে ঘটনা বলি।

পূর্ণিয়া হইতে উকিলের 'তার' পাইলাম পরদিন সকাল দশটার মধ্যে আমায় সেখানে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় স্টেটের একটা বড় মোকদ্দমায় আমাদের হার সুনিশ্চিত।

আমাদের মহাল হইতে পূর্ণিয়া পঞ্চান্ন মাইল দূরে। রাত্রের ট্রেন মাত্র একখানি, যখন 'তার' হস্তগত হইল তখন সতের মাইল দূরবর্তী কাটারিয়া স্টেশনে গিয়া সে-ট্রেন ধরা অসম্ভব।

ঠিক হইল এখনই ঘোড়ায় রওনা হইতে হইবে।

কিন্তু পথ সুদীর্ঘ বটে, বিপদসঙ্কুলও বটে, বিশেষ করিয়া এই রাত্রিকালে, এই আরণ্য- অঞ্চলে। সুতরাং তহশীলদার সৃজন সিং আমার সঙ্গে যাইবে ইহাও ঠিক হইল।

বিপদসঙ্কুল = বিপদ্‌জনক।
তহশীলদার = খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

সন্ধ্যায় দুজনে ঘোড়া ছাড়িলাম। কাছারি ছাড়িয়া জঙ্গল পড়িতেই কিছু পরে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বন-প্রান্তর আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। পাশাপাশি দু'জনে চলিয়াছি —আমি আর সুজন সিং। পথ কখনও উঁচু, কখনও নীচু, সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে। ঝোপঝাপ মাঝে মাঝে, আর শুধু কাশ আর ঝাউবন চলিয়াছে, সুজন সিং গল্প করিতেছে। জ্যোৎস্না ক্রমেই ফুটিতেছে—বনজঙ্গল, বালুচর ক্রমশ স্পষ্টতর হইতেছে। বহুদূর পর্যন্ত নীচু জঙ্গলের শীর্ষদেশ একটানা সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ প্রান্তর একদিকে, অন্য দিকে জঙ্গল। বাঁ দিকে দূরে অনুচ্চ শৈলমালা। নির্জন, নীরব, মানুষের বসতি কুত্রাপি নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন অন্য কোন অজানা গ্রহের মধ্যে নির্জন বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।

অনুচ্চ = বেশি উঁচু নয়।
শৈলমালা = পর্বতশ্রেণী।
কুত্রাপি = কোথাও।

এক জায়গায় সুজন সিং ঘোড়া থামাইল। ব্যাপার কি? পাশের জঙ্গল হইতে একটি ধাড়ী বন্যশূকর একদল ছানাপোনা লইয়া আমাদের পথ পার হইয়া বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকিতেছে। সুজন সিং বলিল—তবুও ভাল হুজুর, ভেবেছিলাম বুনো মহিষ। মোহনপুরা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, বুনো মহিষের ভয় এখানে খুব। সেদিনও একজন লোক মারিয়াছে মহিষে।

আরও কিছুদূর গিয়া জ্যোৎস্নায় দূর হইতে কালোমত সত্যই কি একটা দেখা গেল।

সুজন বলিল—ঘোড়া ভয় পাবে হুজুর, ঘোড়া রুখুন।

কাশের মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, এই কাশের ঝুঁটি দেখিয়া এই গভীর জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া লইতে হয়। একবার সুজন সিং বলিল —হুজুর, এ-পথটা যেন নয়, পথ ভুলেছি আমরা।

আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়া ধ্রুবতারা ঠিক করিলাম—পূর্ণিয়া আমাদের মহাল হইতে খাড়া উত্তরে, তবে ঠিকই আছে, সুজনকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সুজন বলিল—না হুজুর, কুশীনদীর খেয়া পেরুতে হবে যে, খেয়া পার হয়ে তবে সোজা উত্তরে যেতে হবে। এখন উত্তর-পূর্ব কোণ কেটে বেরুতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

সপ্তর্ষি = মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, গুলস্তা, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষিশ্রেষ্ঠ।
সপ্তর্ষিমণ্ডল = সপ্তর্ষি নামে খ্যাত নক্ষত্র সমূহের সমবায়।

অবশেষে পথ মিলিল।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশ-তলে ছায়াহীন উদাস গভীর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে? উঃ, সে কি ছুট! পাশাপাশি চলিতে চলিতে দুই ঘোড়াই হাঁপাইতেছে, শীতেও ঘাম দেখা দিয়াছে আমাদের গায়ে।

সামনের পাহাড়ের পিছন থেকে টকটকে লাল সিঁদুরের গোলার মত সূর্য উঠিতেছে। পথের ধারে এক গ্রামে ঘোড়া থামাইয়া কিছু দুধ কিনিয়া দুজনে খাইলাম। পরে আরো ঘণ্টা-দুই চলিয়াই পূর্ণিয়া শহর।

অন্যমনস্কতা = মনোযোগহীনতা।
পুনরাস্বাদন = আবার উপভোগের আস্বাদন।

পূর্ণিয়া স্টেটের কাজ তো শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, সে কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে বাধা দিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্যের পুনরাস্বাদনের লোভে!

অনুবিভাগ - 32.3.10

কুণ্ডী = জলাশয়, হ্রদ।

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

নিবিড় = ঘন।
বনস্পতি = বড়ো বড়ো গাছ।
সান্নিধ্য = নিকট।
শৈলমালা = পর্বতশ্রেণী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের তিনদিকে নিবিড় বন। এ ধরনের বন আমাদের মহালে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্য-বশতই হোক বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্যপুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতীর কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকে বহুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোনো এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্যের অপূর্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটি হইতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

কুজন = পাখীর ডাক।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখী নাই।

নানা রকমের বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপর বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরনের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। এক প্রকার অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্তল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মূর্তি ধরিয়া। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

আমাদের যেখানে মহাল, সেখানে পাখীর এত বৈচিত্র্য নাই। সেখানটা যেন অন্য জগৎ,তার গাছপালা জীবজন্তু অন্য ধরনের। পরিচিত জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্তি ; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্যহীন মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জিত খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ধার মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদ্দাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধ নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

নাঢ়া বইহার জরীপ হইতেছে প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখাইবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই, শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম—প্রান্তরসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোনো কোনো স্থানে আরও বেশি। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বন্যলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোটো যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন নিবিড় সুবাস সে-ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে।

শব্দার্থ ও টীকা

অতিমানস = অধিক মানবিক চেতনা।
অন্তস্তল = হৃদয়ের ভেতর থেকে।
হৃৎস্পন্দন = হৃদয়ের স্পন্দন।

আর্দ্র = ভেজা।

শব্দার্থ ও টীকা

আড্ডা = মিলনস্থল।

পূর্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে। কত ধরনের কত রং-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিক, হরটিট্, বনটিয়া, ফেজান্ট-ক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখী—পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাক কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারি পাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

ভ্রূক্ষেপ = গ্রাহ্য করা।

অসঙ্কোচ = সঙ্কোচহীন।
সঞ্চরণ = চলাফেরা।

পাখীদের এই অসঙ্কোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিত। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহালের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতায় জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ-বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব!

নির্বাক = বাক্‌শূন্য, বাক্যহারা।
নিস্পন্দ = স্পন্দনহীন, স্থির হয়ে থাকা।
সাগ্রহ = আগ্রহের সঙ্গে।
চকিত = একটুখানি।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ।

আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা জানি না, আমার ঘোড়াটা সে-সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা-ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

তার পর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্ধচন্দ্রাকারে দূর শৈলমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নেই কোনো দিকে—কুণ্ডীর জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে—একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিক-পাখী তীরবর্তী এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

জ্ঞাপন করিতেছে = জানাচ্ছে।

রোদ ক্রমশঃ রাঙা হইয়া আসিল।

ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেঁজি খানিকদূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে

শব্দার্থ ও টীকা

চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখীর কাকলী ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখীদের পায়ে পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুকরো পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোনো দিকে।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশি, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর শরতের প্রথমে সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে- পাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা, ঘাস, শিলাখণ্ড সব-তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না-রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশীলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধূলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

শ্রাবণ মাসে একদিন আমাকে উত্তর সীমানার জরীপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমীন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্ণমেন্টের চাকুরি করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও এ-অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ-ত্রিশ-বছরের পরিচয়।

জরীপ = মাপজোক।
গবর্ণমেন্ট = সরকার।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে ; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের উপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তার একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। হুজুর, ওখানে আপনি ও-রকম যাবেন না।

লাস = মৃতদেহ।

এই সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে। ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায়—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রি হয়। কৌতূহলবশতঃ ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই- কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

ভুঁই-কুমড়া = লতাজাতীয় উদ্ভিদ।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলি, তার ভিতর হইতে ছোটো একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা

থতমত খাইয়া = ঘাবড়ে যাওয়া।
অপ্রতিভ = অপ্রস্তুত, হতবুদ্ধি।

যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্তত কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

সে বলিল—হুজুর কি ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

চাচাতো ভাই = কাকার ছেলে।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল।

বনোয়ারী বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ওই এক ধরনের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের সেই চাচাতো ভাই?

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম—ও কি পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধ হয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল—কিছু না, এই—একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কি গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারী চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল! তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা-ফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।

ব্যয় = খরচ।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে-বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব ভাল লাগে?

—লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারী চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি

এখানকার বনে ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব, এ আমার বহুদিনের শখ।

—কি ফুল নিয়ে আসতে?

—কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ি ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে-জঙ্গলে, মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড় শোভা। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপে কি লোকের বাড়ীর পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডী ফুলের একেবারে জঙ্গল ; সেই থেকে আমার এইদিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু বনের ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বলিলাম—তুমি এরিস্টলোকিয়া লতা চেন?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস-লতা? হাঁসের-মত-চেহারার ফুল হয় তো? ও তো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মত চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইচ্ছা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরীর চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে সাটনের বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। হলদে ধুতুরা-জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা

শব্দার্থ ও টীকা

ভাণ্ডীর = বটগাছ ; ভাঁট বা ঘেঁটু গাছ।

এরিস্টলোকিয়া = হংস লতা, একপ্রকার লতা।

অক্লান্ত = ক্লান্তহীন।

গেঁড় = গ্রন্থিযুক্ত মূল।

আহ্লাদ = আনন্দ, হর্ষ, আমোদ।

বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতার ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহার মৃদু সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাত মাইল দূরবর্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় নাকি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে!

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফ্‌ট্‌' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম। সে গাছ হু হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে, যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে!

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলেভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ ইহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরনের। সেও বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের বন্যপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—দেখিতে খুব ভাল তো বটেই, ভারি সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায়, দেখিতে দেখিতে এত হু হু বংশবৃদ্ধি হয় যে, দু-তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না ; গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়ে যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল।

অনুবিভাগ - 32.3.11

পনের-দিন এখানে একেবারে বন্য-জীবন যাপন করিলাম, যেমন থাকে গাঙ্গোতারা কি গরীব ভুঁইহার বামুনরা। ইচ্ছা করিয়া নয়, অনেকটা বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল এ ভাবে। এ জঙ্গলে কোথা হইতে কি আনাইব? খাই ভাত ও বন-ধুঁধুলের তরকারি, বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু তুলিয়া আনে সিপাহীরা, তাই ভাজা বা সিদ্ধ। মাছ দুধ ঘি—কিছু নাই।

অবশ্য বনে সিল্লি ও ময়ূরের অভাব ছিল না, কিন্তু পাখী মারিতে তেমন যেন মন সরে না বলিয়া বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিরামিষই খাইতে হইত।

শব্দার্থ ও টীকা

ফুলকিয়া বইহারে বাঘের ভয় আছে। একদিনের ঘটনা বলি।

হাড়ভাঙা শীত সেদিন। রাত দশটার পরে কাজকর্ম মিটাইয়া সকাল সকাল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ কত রাত্রে জানি না, লোকজনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। জঙ্গলের ধারের কোন্ জায়গায় অনেকগুলি লোক জড় হইয়া চীৎকার করিতেছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। আমার সিপাহীরা পাশের খুপরি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সবাই মিলিয়া ভাবিতেছি ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু বন্দুকটা নিয়ে শীগগির চলুন—বাঘে একটা ছোটো ছেলে নিয়ে গিয়েছে খুপরি থেকে।

জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ' হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া একজন গাঙ্গোতা প্রজার একখানা খুপরি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইয়া খুপরির মধ্যে শুইয়াছিল— অসম্ভব শীতের দরুন খুপরির মধ্যেই আগুন জ্বালানো ছিল, এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাঁপটা একটু ফাঁক ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

কি করিয়া জানা গেল বাঘ? শিয়ালও তো হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আর কোনো সন্দেহ রহিল না, ফসলের নরম মাটিতে স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ।

আমার পাটোয়ারী ও সিপাহীরা মহালের অপবাদ রটিতে দিতে চায় না, তাছাড়া জোর গলায় বলিতে লাগিল—এ আমাদের বাঘ নয় হুজুর, এ মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের বাঘ। দেখুন না কত বড় থাবা!

যাহাদেরই বাঘ হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। বলিলাম, সব লোক জড় কর, মশাল তৈরী কর—চল জঙ্গলের মধ্যে দেখি। সেই রাত্রে অত বড় বাঘের পায়ের সদ্য থাবা দেখিয়া ততক্ষণে সকলেই ভয়ে কাঁপিতে শুরু করিয়াছে—জঙ্গলের মধ্যে কেহ যাইতে রাজী নয়। ধমক ও গালমন্দ দিয়া জন-দশেক লোক জুটাইয়া মশাল হাতে টিন পিটাইতে পিটাইতে সবাই মিলিয়া জঙ্গলের নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করা গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাইল-দুই দূরে দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় আসান-গাছের তলায় শিশুটির রক্তাক্ত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল।

কৃষ্ণপক্ষের কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রিগুলিই নামিল তাহার পরে!

আমার কাশের খুপরির দরজার কাছেই সিপাহীরা খুব আগুন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাতে কাঠ ফেলিয়া দিই। পাশের খুপরিতে সিপাহীরা কথাবার্তা বলিতেছে—খুপরির মেঝেতেই শুইয়া আছি, মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়া দেখা যাইতেছে ঘন অন্ধকারে-ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে ক্ষীণ তারার আলোয় পরিদৃশ্যমান জঙ্গলের আবছায়া সীমারেখা। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল, যেন মৃত নক্ষত্রলোক হইতে তুষারবর্ষী হিমবাতাস তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে—লেপ-তোশক হিমে ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে, আগুন নিবিয়া আসিতেছে, কি দুরন্ত শীত! আর সেই সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরের অবাধ হু-হু তুষারশীতল নৈশ হাওয়া!

কিন্তু কি করিয়া থাকে এখানকার লোকেরা এই শীতে, এই আকাশের তলায় সামান্য কাশের খুপরির ঠাণ্ডা মেঝের উপর কি করিয়া রাত্রি কাটায়? তাহার উপর ফসল চৌকি দিবার এই কষ্ট, বন্য-মহিষের উপদ্রব, বন্য-শূকরের উপদ্রব কম নয়—বাঘও আছে। আমাদের বাংলা দেশের চাষীরা কি এত কষ্ট করিতে পারে? অত

উন্মুক্ত = খোলা।
তুষারশীতল = বরফের মতো ঠাণ্ডা।

উপদ্রব = জ্বালাতন, অত্যাচার।

উর্বর জমিতে, অত নিরুপদ্রব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফসল করিয়াও তাহাদের দুঃখ ঘোচে না।

আমার ঘরের দু-তিন-শ' হাত দূরে দক্ষিণ ভাগলপুর হইতে আগত কয়েকজন কাটুনী মজুর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল কাটিতে আসিয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় তাহাদের খুপরির কাছ দিয়া আসিবার সময় দেখি কুঁড়ের সামনে বসিয়া সবাই আগুন পোহাইতেছে।

এদের জগৎ আমার কাছে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। ভাবিলাম, সেটা দেখি না কেমন!

গিয়া বলিলাম—বাবাজী, কি করা হচ্ছে?

একজন বৃদ্ধ ছিল দলে, তাহাকেই এই সম্বোধন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সেলাম করিল, বসিয়া আগুন পোহাইতে অনুরোধ করিল। ইহা এদেশের প্রথা। শীতকালে আগুন পোহাইতে আহ্বান করা ভদ্রতার পরিচয়।

গিয়া বসিলাম। খুপরির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা বা আসবাবপত্র বলিতে ইহাদের কিছু নাই। কুঁড়েঘরে মেঝেতে মাত্র কিছু শুক্‌নো ঘাস বিছানো। বাসনকোসনের মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা। কাপড় যার যা পরনে আছে—আর এক টুকরো বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু তাহা তো হইল, এই নিদারুণ শীতে ইহাদের লেপ-কাঁথা কই? রাত্রে গায়ে দেয় কি?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধের নাম নক্‌ছেদী ভকত। জাতি গাঙ্গোতা। সে বলিল—কেন, খুপরির কোণে ঐ যে কলাইয়ের ভুষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা?

বুঝিতে পারিলাম না। কলাইয়ের ভুষির আগুন করা হয় রাত্রে?

নক্‌ছেদী আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল।

—তা নয় বাবুজী। কলাইয়ের ভুষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে, আমরাও কলাইয়ের ভুষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচ মণ ভুষি মজুত রয়েছে। ভারী ওম্‌ কলাইয়ের ভুষিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্‌ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না?

বলিতে বলিতে একটা ছোটো ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপরির কোণের ভুষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢুকাইয়া কেবলমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনও কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকারের ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।

অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে কি রাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি রান্না হচ্ছে?

নক্‌ছেদী বলিল—ঘাটো।

—ঘাটো কি জিনিস?

শব্দার্থ ও টীকা

অনাবিষ্কৃত = যা আবিষ্কার হয়নি।
অজ্ঞাত = অজানা।

জামবাটি = বড়ো ধরনের বাটি।

ভূষি = শস্যের খোসা বা চোকলা।

ঘাটো = মকাই সেদ্ধকে ঘাটো বলে।

এবার বোধ হয় রন্ধনরতা মেয়েটি ভাবিল, এ বাংগালী বাবু সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। এ দেখিতেছি নিতান্ত বাতুল। কিছুই খোঁজ রাখে না দুনিয়ার। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ঘাটো জানো না বাবুজী? মকাই-সেদ্ধ। যেমন চাল সেদ্ধ হ'লে বলে ভাত, মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।

দিন পনেরোর মধ্যে ফুলকিয়া বইহারের চেহারা বদলাইয়া গেল। সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান হইতে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা লইয়া আসিল মাল কিনিতে। তাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করিতে আসিল এক দল লোক। হালুইকররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর তুলিয়া মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া সতেজে পুরী, কচৌরী, লাড্ডু, কালাকন্দ্ বিক্রয় করিতে লাগিল। ফিরিওয়ালারা নানা রকম সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া আসিল।

এ বাদে আসিল রং-তামাশা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে কত ধরনের লোক। নাচ দেখাইতে, রামসীতা সাজিয়া ভক্তের পূজা পাইতে, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্তি হাতে পাণ্ডাঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে। এ সময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।

আর বছরও যে জনশূন্য ফুলকিয়া বইহারের প্রান্তর ও জঙ্গল দিয়া, বেলা পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় যাইতেও ভয় করিত—এ বছর তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চারিদিকে বালক-বালিকার হাস্যধ্বনি, কলরব, সস্তা টিনের ভেঁপুর পিঁপিঁ বাজনা, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি—সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।

লোকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত বেশি। কত নতুন খুপরি, কাশের লম্বা চালাঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল! শুকনো কাশের ডাঁটায় খোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে, আর আছে ওদের নিজেদের শারীরিক পরিশ্রম।

ফুলকিয়ার তহশীলদার আসিয়া জানাইল, এই সব বাহিরের লোক, যাহারা এখানে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে, ইহাদের কাছে জমিদারের খাজনা আদায় করিতে হইবে।

বলিল—আপনি রীতিমত কাছারি করুন হুজুর, আমি সব লোক একে একে আপনার কাছে হাজির করাই—আপনি ওদের মাথাপিছু একটা খাজনা ধার্য ক'রে দিন।

কত রকমের লোক দেখিবার সুযোগ পাইলাম এই ব্যাপারে!

সকাল হইতে দশটা পর্যন্ত কাছারি করিতাম, বৈকালে আবার তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

তহশীলদার বলিল—এরা বেশী দিন এখানে থাকবে না, ফসল মাড়া ও বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলেই সব পালাবে। এর আগে এদের পাওনা আদায় ক'রে নিতে হবে।

একদিন মুনেশ্বর সিং আসিয়া জানাইল, একজন লোক জমিদারের খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে

শব্দার্থ ও টীকা

বাতুল = উন্মাদ, ক্ষেপা।

মকাই-সেদ্ধ = ঘাটো।

কালাকন্দ্ = সন্দেশ বিশেষ।

রশি = দড়ি।

খাজনা = রাজস্ব, জমিদারের প্রাপ্য কর।

পলাইতেছে—হুকুম হয় তো ধরিয়া আনে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—পালাচ্ছে কি রকম? দৌড়ে পালাচ্ছে?

—ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে হুজুর, এতক্ষণ বড় কুণ্ডী পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছল।

দুর্বৃত্তকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচজন সিপাহী পলাতক আসামীকে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

লোকটাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার বয়স ষাটের কম কোনোমতেই হইবে বলিয়া আমার তো মনে হইল না—মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।

শুনিলাম সে নাকি 'ননীচোর নাটুয়া' সাজিয়া আজ কয়দিনে বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে, গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের তলায় একটা খুপরিতে থাকিত, আজ কয়দিন ধরিয়া সিপাহীরা তাহার কাছে খাজনার তাগাদা করিতেছে, কারণ এদিকে ফসলের সময়ও ফুরাইয়া আসিল। আজ তাহার খাজনা মিটাইবার কথা ছিল। হঠাৎ দুপুরের পরে সিপাহীরা খবর পায় সে লোকটা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া রওয়ানা হইয়াছে। মুনেশ্বর সিং ব্যাপার কি জানিতে গিয়া দেখে যে আসামী বইহার ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে পূর্ণিয়া অভিমুখে—মুনেশ্বরের হাঁক শুনিয়া সে নাকি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পরই এই অবস্থা।

সিপাহীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু আমার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমত 'ননীচোর নাটুয়া' মানে যদি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয়, তবে ইহার সে সাজিবার বয়স আর আছে কি? দ্বিতীয়ত, এ লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল, এ কথাই বা কি করিয়া সম্ভব!

কিন্তু উপস্থিত সকলেই হলফ করিয়া বলিল—উভয় কথাই সত্য।

তাহাকে কড়া সুরে বলিলাম—তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হ'ল, জমিদারের খাজনা দিতে হয় জান না? তোমার নাম কি?

লোকটা ভয়ে বাতাসের মুখে তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। আমার সিপাহীরা একে চায় তো আরে পায়, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহারা যে এই বৃদ্ধ নটের প্রতি খুব সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার করে নাই ইহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে দেরি হইল না।

লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তাহার নাম দশরথ।

—কি জাত? বাড়ী কোথায়?

—আমরা ভুঁইহার বাভন হুজুর। বাড়ী মুঙ্গের জেলা—সাহেবপুর কামাল।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—কই না, পালাব কেন, হুজুর?

—বেশ, খাজনা দাও।

শব্দার্থ ও টীকা

দুর্বৃত্ত = দুশ্চরিত্র, দুষ্টস্বভাব, দুরাত্মা।

কুঞ্চিত = সংশোধিত।

বুভুক্ষু = ক্ষুধিত।

তল্পিতল্পা = বিছানাপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের গাঁটরি।

মোলায়েম = নরম, কোমল।

বাভন = ব্রাহ্মন।

শব্দার্থ ও টীকা

—কিছুই পাই নি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি। হনুমানজীর কিরিয়া।

সিপাহীরা বলিল—সব মিথ্যে কথা। শুনবেন না হুজুর। ও অনেক টাকা রোজগার করেছে। ওর কাছেই আছে। হুকুম করেন তো ওর কাপড়চোপড় সন্ধান করি।

লোকটা ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বলছি আমার কাছে কত আছে।

পরে কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া বলিল—এই দেখুন হুজুর, তের আনা পয়সা আছে। আমার কেউ নেই, এই বুড়ো বয়সে কে-ই বা আমায় দেবে? আমি নাচ দেখিয়ে এই ফসলের সময় খামারে খামারে বেড়িয়ে যা রোজগার করি। আবার সেই গমের সময় পর্যন্ত এতেই চালাব ; তার এখনও তিন মাস দেরি। যা পাই পেটে দুটো খাই, এই পর্যন্ত। সিপাহীরা বলছে, আমায় নাকি আট আনা খাজনা দিতে হবে—তা হলে আমার আর রইল মোটে পাঁচ আনা। পাঁচ আনায় তিন মাস কি খাব?

বলিলাম—তোমার হাতে ও পোঁটলাতে কি আছে? বার কর।

লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিনমোড়া আর্সি, একটা রাংতার মুকুট—ময়ূরপাখা সমেত, গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি— কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ।

আর্সি = আয়না।

বলিল—দেখুন তবুও বাঁশী নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশী আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশীতে কাজ চালিয়েছি। এরা গাঙ্গোতা জাত, এদের ভুলানো সহজ। কিন্তু আমাদের মুঙ্গের জেলায় লোক সব বড় এলেমদার। বাঁশী না হ'লে হাসবে। কেউ পয়সা দেবে না।

আমি বলিলাম—বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পার, নাচ দেখিয়ে যাও, খাজনার বদলে।

বৃদ্ধ হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছে এমন ভাব দেখাইল। তাহার পর গালেমুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ঐ বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—তখন হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার সিপাহীরা তো মুখে কাপড় দিয়া বিদ্রূপের হাসি চাপিতে প্রাণপণ করিতেছে। তাহাদের চক্ষে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ এক মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হইল। বেচারীরা ম্যানেজারবাবুর সামনে না পারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারে দুর্দমনীয় হাসির বেগ সামলাইতে।

বিদ্রূপ = ঠাট্টা, ব্যঙ্গ।
মারাত্মক = ভয়ানক।

নাচ শেষ হইল। আমি হাততালি দিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

বলিলাম—এমন নাচ কখনও দেখি নি, দশরথ। বড় চমৎকার নাচো। আচ্ছা তোমার খাজনা মাপ করে দিলাম—আর আমার নিজ থেকে এই দু টাকা বখশিশ দিলাম খুশি হয়ে। ভারি চমৎকার নাচ।

আর দিন-দশ-বারোর মধ্যে ফসল কেনাবেচা শেষ হইয়া গেলে বাড়তি লোক সব যে যার দেশে চলিয়া গেল। রহিল মাত্র যাহারা এখানে জমি চষিয়া বাস করিতেছে তাহারাই। দোকান- পসার উঠিয়া গেল, নাচওয়ালা,

শব্দার্থ ও টীকা

ফিরিওয়ালারা অন্যত্র রোজগারের চেষ্টায় গেল। কাটুনি জনমজুরের দল এখনও পর্যন্ত ছিল শুধু এই সময়ের আমোদ তামাশা দেখিবার জন্য—এইবার তাহারাও বাসা উঠাইবার যোগাড় করিতে লাগিল।

নক্ছেদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপালে হাত দিয়া আমায় সেলাম করিল। বলিল—ও মঞ্চী, বাবুজীকে বসবার একটা কিছু পেতে দে।

অনুমান = আন্দাজ।
দূরবর্তী = দূরে অবস্থিত।

নক্ছেদীর খুপরিতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে, সে যে নক্ছেদীর স্ত্রী তাহা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু সে প্রায়ই বাহিরের কাজকর্ম অর্থাৎ কাঠ ভাঙা, কাঠ কাটা, দূরবর্তী ভীমদাসটোলার পাতকূয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি লইয়া থাকে। মঞ্চী সেই মেয়েটি, যে আমাকে বুনো হাতীর গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল।

তার সেই দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা? বলেছিলাম না, কত নাচ-তামাশা-আমোদ হবে, কত জিনিস আসবে, দেখলেন তো? অনেক দিন আসেন নি বাবুজী, বসুন। আমরা যে শীগগির চলে যাচ্ছি।

মৃদু = অল্প, সামান্য।

ওদের খুপরির দোরের কাছে লম্বা আধশুকনো ঘাসের উপর চেটাই পাতিয়া বসিলাম, যাহাতে সূর্যাস্তটা ঠিক সামনাসামনি দেখিতে পাই। চারিদিকের জঙ্গলের গায়ে একটা মৃদু-রাঙা আভা পড়িয়াছে, একটা আকর্ষণীয় শান্তি ও নীরবতা বিশাল বইহার জুড়িয়া।

নাচ-তামাশা কেমন দেখলেন বাবু? বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন ঝল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী! দেখিলাম মঞ্চী নিতান্ত বালিকার মতই নাচ-তামাশায় আমোদ পায়। এবার কত রকম কি দেখিয়াছে, মহা উৎসাহ ও খুশির সুরে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিয়া গেল।

নক্ছেদী বলিল—নে নে, বাবুজী কলকাতায় থাকেন, তোর চেয়ে অনেক কিছু দেখেছেন। ও এ-সব বড় ভালবাসে বাবুজী, ওরই জন্যে আমরা এতদিন এখানে রয়ে গেলাম। ও বল্লে—না, দাঁড়াও, খামারের নাচ-তামাশা, লোকজন দেখে তবে যাব। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও!

মঞ্চী যে নক্ছেদীর কে হয় তাহা এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবিতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায়?

নক্ছেদী আশ্চর্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর?

—কেন, এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয়?

আমার কথায় সকলের আগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নক্ছেদীর প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপরির ভিতর ঢুকিল।

নক্ছেদী অপমানিত হওয়ার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুর! ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

বলিলাম—ও!

অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে, কথা খুঁজিয়া পাই না।

অনুবিভাগ - 32.3.13

শব্দার্থ ও টীকা

এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল সেবার কালেক্টরীর নীলামে ডাক হইবে খবর পাওয়া গেল। আমাদের হেড আপিসে তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে তারযোগে আদেশ পাইলাম, বিড়ির পাতার জঙ্গল যেন আমি ডাকিয়া লই।

কিন্তু তাহার পূর্বে জঙ্গলটা একবার আমার নিজের চোখে দেখা আবশ্যক। কি আছে না-আছে না জানিয়া নীলাম ডাকিতে আমি প্রস্তুত নই। এদিকে নীলামের দিনও নিকটবর্তী, ‘তার’ পাওয়ার পরদিনই সকালে রওনা হইলাম।

আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র মাথায় রওনা হইয়াছিল, মোহনপুরা ফরেস্টের সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময়ে তাহাদের সহিত দেখা হইল। সঙ্গে ছিল আমাদের পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল।

কারো ক্ষীণকায়া পার্বত্য স্রোতস্বিনী—হাঁটুখানেক জল ঝির্‌ঝির্ করিয়া উপলরাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা দুজনে ঘোড়া হইতে নামিলাম, নয়ত পিছল পাথরের নুড়িতে ঘোড়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দু-পারে কটা বালির চড়া। সেখানেও ঘোড়ায় চাপা যায় না,— হাঁটু পর্যন্ত বালিতে এমনিই ডুবিয়া যায়। অপর পারের কড়ারী জমিতে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা এগারটা। বনোয়ারী পাটোয়ারী বলিল—এখানে রান্নাবান্না করে নিলে হয় হুজুর, এর পরে জল পাওয়া যায় কি না ঠিক নেই।

ক্ষীণকায়া = সরু।
স্রোতস্বিনী = নদী।

নদীর দু-পারেই জনহীন আরণ্যভূমি, তবে বড় জঙ্গল নয়, ছোটোখাটো কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল—খুব ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, লোকজনের চিহ্ন কোন দিকে নাই।

আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।

বেলা যখন যায়-যায়, তখনও জঙ্গলের কুলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশি দূর অগ্রসর না হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল। অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি—একটার নাম কুলপাল, একটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে, সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হইবে না তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।

বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে জঙ্গল বড় ঘন হইয়া আসিল। আগে ছিল ফাঁকা জঙ্গল, এখন যেন ক্রমেই চারিদিক হইতে বড় বড় বনস্পতির দল ভিড় করিয়া সরু সুঁড়িপথটা চাপিয়া ধরিতেছে—এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানটাতে তো চারিদিকেই বড় বড় গাছ, আকাশ দেখা যায় না, নৈশ অন্ধকার ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বনস্পতি = বড়ো বড়ো গাছ।
নৈশ = রাত্রি।

এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা! কি এক ধরনের থোকা থোকা সাদা

শব্দার্থ ও টীকা

অজ্ঞাত = অজানা।

পাটোয়ারী = খাজনা আদায়কারী।

ফুল সারা বনের মধ্যে আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ছায়াগহন অপরাহ্নের নীল আকাশের তলে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এত সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজানো! বনোয়ারী বলিল—ও বুনো তেউড়ির ফুল, এই সময় জঙ্গলে ফোটে, হুজুর। এক রকমের লতা।

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তুলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্বত্র। ঘোড়া থামাইয়া মাঝে মাঝে কতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি—এক এক জায়গার শোভা এমনই অদ্ভুত যে সেদিকে চাহিয়া যেন একটা ছন্নছাড়া মনের ভাব হইয়া যায়—যেন মনে হয়, কত দূরে কোথায় আছি, সভ্য জগৎ হইতে বহু দূরে এক জনহীন অজ্ঞাত জগতের উদাস, অপরূপ বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে—যে জগতের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রবেশের অধিকারও নাই, শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ।

বনোয়ারী বলিল—বড় একটা আগুন কর আর সবাই কাছাকাছি ঘেঁষে থাকো। ছড়িয়ে থেকো না, নানা রকম বিপদ এ জঙ্গলে রাত্রিকালে।

গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা আকাশ, এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূর নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে রাশি রাশি, অজস্র। আমার ক্যাম্প-চেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস আধ শুক্‌নো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুক্‌নো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বন-ফুলের গন্ধ, যেন দুর্গা-প্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না, এই রকম বিরাট নির্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন সে-মুক্ত-জীবনের উল্লাস।

এমন সময় আমাদের এক কুলি আসিয়া পাটোয়ারীর কাছে বলিল, একটু দূরে জঙ্গলের শুষ্ক ডালপালা কুড়াইতে গিয়া সে একটা কি জিনিস দেখিয়াছে। জায়গাটা ভাল নয়, ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে না তাঁবু ফেলিলেই হইত।

পাটোয়ারী বলিল—চলুন হুজুর, দেখে আসি কি জিনিসটা।

কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাইয়া কুলিটা বলিল—ঐখানে নিকটে গিয়া দেখুন হুজুর। আর কাছে যাব না।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপ হইতে মাথা উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই-করা, সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে।

মানুষের হাতের তৈরি এ-বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এ জনহীন জঙ্গলের মধ্যে এ স্তম্ভ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। জিনিসটা কত দিনের প্রাচীন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া বেলা ন'টার মধ্যে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া জঙ্গলের বর্তমান মালিকের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমায় জঙ্গল

দেখাইয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শুষ্ক নালার ওপারে ঘন বনের মধ্যে দেখি একটা প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ জাগিয়া আছে—ঠিক কাল সন্ধ্যাবেলার সেই স্তম্ভটার মত। সেই রকমের বিকট মুখ খোদাই করা।

আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ-দেশে আগে অসভ্য বুনো জাতির রাজা ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরি। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি খাম্বা।

বলিলাম—খাম্বা কি ক'রে জানলে?

সে বলিল—চিরকাল শুনে আসছি বাবুজী, তা ছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্তমান।

বড় কৌতূহল হইল।

—কোথায়?

লোকটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা ছোট বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ-অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড় আর দক্ষিণে ছোটোনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।

বুদ্ধু সিং বলিল—মুঘল বাদ্‌শাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলাদেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব। কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

রাজসন্দর্শনে যাইতে হইলে কিছু নজর লইয়া যাওয়া উচিত। যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে তা না দিলে কর্তব্যের হানি ঘটে।

কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগী—বেলা একটার মধ্যে নিকটবর্তী বস্তি হইতে কিনিয়া আনিলাম। এ-দিকের কাজ শেষ করিয়া বেলা দুইটার পরে বুদ্ধু সিংকে বলিলাম—চল, রাজার সঙ্গে দেখা করে আসি।

বুদ্ধু সিং তেমন উৎসাহ দেখাইল না। বলিল—আপনি সেখানে কি যাবেন! আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত নয়। পাহাড়ী অসভ্য জাতদের রাজা, তাই ব'লে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী? সে তেমন কিছু নয়।

তাহার কথা না শুনিয়াই আমি ও বনোয়ারীলাল রাজধানীর দিকে গেলাম। তাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

রাজধানীটা খুব ছোট, কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস।

ছোটো ছোটো মাটির ঘর, খাপরার চাল—বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপাপোঁছা দেওয়ালের গায়ে মাটির

শব্দার্থ ও টীকা

প্রস্তরস্তম্ভ = পাথর দিয়ে তৈরি থাম।

নিশানদিহি = নিশানা নির্দেশকারী।

খাম্বা = থাম।

সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোটো ছোটো ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই। সকলেই আমাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

শব্দার্থ ও টীকা

ছে = আছে।

বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই। তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়ীতেই আছে।

অনুচ্চ = খুব উঁচু নয়।

সুশ্রী = সুন্দর।

আমরা গ্রামে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিং-এর ভাবে মনে হইল এইবার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র লক্ষ্য করিলাম যে, ইহার চারিপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। রাজবাড়ীতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—কতকগুলি খুব ছোটো। তাদের গলায় পুঁতির মালা ও নীল ফলের বীজের মালা। দু-একটি ছেলে-মেয়ে দেখিতে বেশ সুশ্রী। যোল-সতের বছরের একটি মেয়ে বুদ্ধু-সিং-এর ডাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াই আমাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হইল কিছু ভয়ও পাইয়াছে।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজা কোথায়?

—মেয়েটি কে? বুদ্ধু সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ে।

রাজা বহুদিন জীবিত থাকিয়া নিশ্চয়ই বহু যুবক ও প্রৌঢ়কে রাজসিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল—আমার সঙ্গে এস। জ্যাঠামশায় পাহাড়ের নীচে পাথরে বসে আছেন।

মানি বা নাই মানি, মনে মনে ভাবিলাম যে-মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্বপুরুষেরা এই অরণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল— সেই বংশের সে মেয়ে।

বলিলাম—মেয়েটির নাম কি জিজ্ঞেস কর।

বুদ্ধু সিং বলিল—ওর নাম ভান্‌মতী।

বাঃ, বেশ সুন্দর—ভানুমতী! রাজকন্যা ভানুমতী!

ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। দূর হইতে একটা বড় বকাইন্ গাছ দেখাইয়া দিয়া ভানুমতী বলিল—তোমরা যাও, জ্যাঠামশায় ওই গাছতলায় ব'সে গরু চরাচ্ছেন।

গরু চরাইতেছেন কি রকম! প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়। এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন!

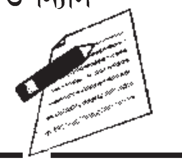

শব্দার্থ ও টীকা

কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মেয়েটি চলিয়া গেল এবং আমরা আর কিছু অগ্রসর হইয়া বকাইন্ গাছের তলায় এক বৃদ্ধকে কাঁচা শালপাতায় তামাক জড়াইয়া ধূমপানরত দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম, রাজাসাহেব।

রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে খুব ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না।

বলিল—কে? বুদ্ধু সিং? সঙ্গে কে?

বুদ্ধু বলিল—একজন বাঙালী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে।

নজর = ভেট, উপহার।

আমি নিজে গিয়া বৃদ্ধের সামনে মুরগী ও জিনিস কয়টি নামাইয়া রাখিলাম।

বলিলাম—আপনি দেশের রাজা, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বহুৎ দূর থেকে এসেছি।

বৃদ্ধের দীর্ঘায়ত চেহারার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল যৌবনে রাজা দোবরু পান্না খুব সুপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মুখশ্রীতে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ খুব খুশী হইলেন। আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—কোথায় ঘর?

বলিলাম—কলকাতা।

—উঃ, অনেক দূর। বড় ভারী জায়গা শুনেছি কল্‌কাতা।

—আপনি কখনও যান নি?

—না, আমরা কি শহরে যেতে পারি? এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল। বোসো। ভান্‌মতী কোথায় গেল, ও ভান্‌মতী?

মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বাঙালী বাবু ও তাঁর সঙ্গের লোকজন আজ আমার এখানে থাকবেন ও খাওয়া-দাওয়া করবেন।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—না, না, সে কি! আমরা এখুনি চলে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রেই—আমাদের থাকার বিষয়ে—

কিন্তু দোবরু পান্না বলিলেন—না, তা হতে পারে না। ভান্‌মতী, এই জিনিসগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিসগুলি বহিয়া অদূরবর্তী রাজার বাড়ীতে লইয়া গেল, ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত- বংশীয় বীর দোবরু পান্না (হইলই বা বন্য আদিম জাতি) আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন— এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।

সম্ভ্রমে = শ্রদ্ধায়।

রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্নার অপেক্ষা অনেক

বড় রাজা অবস্থাবৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরুট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশলাই নাই— গাছের তলায় আগুন করাই আছে—তাহা হইতে একটা পাতা জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিলেন।

বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।

দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে! আমাদের বংশ সূর্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়েস অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।

বহিঃস্থিত = বাইরে থাকা, বাইরের।

এই অরণ্য ভূভাগের বহিঃস্থিত অন্য কোনও পৃথিবীর খবর দোবরু পান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তাহার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রাজা দোবরু বলিলেন—আমার ছোটো নাতি, জগরু পান্না। ওর বাবা এখানে নেই, লছমীপুরের রাণী-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ওরে জগরু, বাবুজীর জন্য খাওয়ার যোগাড় কর।

ভানুমতী আবার আসিয়া একটা পাথরের ভাঁড় আমাদের কাছে রাখিয়া গেল।

রাজা বলিলেন—তেল মাখুন। কাছেই চমৎকার ঝরণা—স্নান ক'রে আসুন সকলে।

আমরা স্নান করিয়া আসিলে রাজা আমাদের রাজবাড়ীর একটা ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল। জগরু সজারু ছাড়াইয়া মাংস আনিয়া রাখিল কাঁচা শালপাতার পাত্রে।

ভানুমতী আর একবার গিয়া দুধ ও মধু আনিল। আমার সঙ্গে ঠাকুর ছিল না, বনোয়ারী মেটে আলু ছাড়াইতে বসিল, আমি রাঁধিবার চেষ্টায় উনুন ধরাইতে গেলাম। কিন্তু শুধু বড় বড় কাঠের সাহায্যে উনুন ধরানো কষ্টকর। দু-একবার চেষ্টা করিয়া পারিলাম না, তখন ভানুমতী তাড়াতাড়ি একটা পাখীর শুক্‌নো বাসা আনিয়া উনুনের মধ্যে পুরিয়া দিতে আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। দিয়াই দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্যাদাজ্ঞান।

রাজা দোবরু পান্না সব সময় রান্নাঘরের দুয়ারটির কাছে বসিয়া রহিলেন। আতিথ্যের এতটুকু ত্রুটি না ঘটে। আহারাদির পরে বলিলেন—আমার তেমন বেশি ঘরদোরও নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হল। এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকাণ্ড বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। আমি বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি বহু প্রাচীনকালে ওখানে পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন। সে দিন কি আর এখন আছে! আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনও সেখানে আছেন।

আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম—যদি আমরা একবার দেখতে যাই তাতে কি কোনও আপত্তি আছে, রাজাসাহেব?

—এর আবার আপত্তি কি! তবে দেখবার এখন বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা চলুন, আমি যাব। জগরু

আমাদের সঙ্গে এস।

আমি আপত্তি করিলাম—বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে আর পাহাড়ে উঠাইবার কষ্ট দিতে মন সরিল না। সে আপত্তি টিকিল না, রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন—এ পাহাড়ে আমায় ত প্রায়ই উঠতে হয়, ওর গায়েই আমার বংশের সমাধিস্থান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। চলুন সে-জায়গাও দেখাব।

শব্দার্থ ও টীকা

উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে অনুচ্চ শৈলমালা (স্থানীয় নাম ধন্‌ঝরি) এক স্থানে আসিয়া যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পূর্বমুখী হওয়ার দরুন একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে, এই খাঁজের নীচে একটা উপত্যকা, শৈলসানুর অরণ্য সারা উপত্যকা ব্যাপিয়া যেন সবুজের ঢেউয়ের মত নামিয়া আসিয়াছে, যেমন ঝরনা নামে পাহাড়ের গা বাহিয়া। অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছের মাথায় মাথায় সুদূর চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালা, বোধ হয় গয়া কি রামগড়ের দিকের— যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু, বড় বড় বনস্পতিসঙ্কুল, কোথাও নীচু, চারা শাল ও চারা পলাশ। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

শৈলসানু = পাহাড়ের উপরকার সমতলভূমি।

চক্রবালরেখা = দিগন্তরেখা।

এক জায়গায় খুব বড় পাথরের চাঁই আড়ভাবে পোঁতা, ঠিক যেন একখানা পাথরের কড়ি যা ঢেঁকির আকারের। তার নীচে কুম্ভকারদের হাঁড়ি-কলসী পোড়ানো পণ-এর গর্তের মত কিংবা মাঠের মধ্যে খেঁকশেয়ালী যেমন গর্ত কাটে—ওই ধরনের প্রকাণ্ড একটা বড় গর্তের মুখ। গর্তের মুখে চারা শালের বন।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই গর্তের মধ্যে ঢুকতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই। জগরু আগে যাও।

প্রাণ হাতে করিয়া গর্তের মধ্যে ঢুকিলাম। বাঘ-ভাল্লুক তো থাকিতেই পারে, না থাকে সাপ তো আছেই।

গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া খানিকদূর গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়ানো যায়। ভয়ানক অন্ধকার ভিতরে প্রথমটা মনে হয়, কিন্তু চোখ অন্ধকারে কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তত অসুবিধা হয় না ; জায়গাটা প্রকাণ্ড একটা গুহা, কুড়ি-বাইশ হাত লম্বা, হাত পনের চওড়া—উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে আবার একটা খেঁকশিয়ালীর মত গর্ত দিয়া খানিক দূর গেলে দেওয়ালের ওপারে ঠিক এই রকম নাকি আর একটা গুহা আছে।

ইহাই নাকি দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের দূর্গ-প্রাসাদ।

আসলে ইহা একটা বড় প্রাকৃতিক গুহা—প্রাচীনকালে পাহাড়ের উপর দিকে মুখওয়ালা এ গুহায় আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করা যাইত।

রাজা বলিলেন—এর আর একটা গুপ্ত মুখ আছে—সে কাউকে বলা নিয়ম নয়। সে কেবল আমার বংশের লোক ছাড়া কেউ জানে না। যদিও এখন এখানে কেউ বাস করে না, তবুও এই নিয়ম চলে আসছে বংশে।

গুহাটা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।

ধড়ে = শরীরে।

তারপর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড়-সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথার অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেরবানি করে।

মেহেরবানি = অনুগ্রহ।

শব্দার্থ ও টীকা

বটগাছতলায় যেন চারিধারে বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের আকারে পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক-একখানা পাথরের তলায় এক-একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি। বিশাল বটতলার সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো—কোনো কোনো সমাধি খুবই প্রাচীন, দু'দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে সব ঝুরি আবার গাছের গুঁড়ির মতো—মোটা হইয়া গিয়াছে—কোনো কোনো শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

অনুমান---ধারণা, কল্পনা।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোটো বটচারা ক্রমে বেড়ে অন্য অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বটগাছটাই এত প্রাচীন যে, এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।

স্থানটির গাম্ভীর্য, রহস্য ও প্রাচীনত্বের ভাব অবর্ণনীয়। তখন বেলা প্রায় হেলিয়া পড়িয়াছে, হলদে রোদ পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অরণ্যে ধন্‌ঝরির অন্য চূড়ায়, দূর বনের মাথায়। অপরাহ্নের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ-সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য দান করিল।

গাম্ভীর্য = গম্ভীরতা।

মিশরের প্রাচীন সম্রাটদের সমাধিস্থল থিব্‌স সাগরের অদূরবর্তী 'ভ্যালি অব্ দি কিংস' আজ পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে—'ভ্যালি অব্ দি কিংস' অতীত কালের কুয়াশায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল, তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়—কিন্তু তার চেয়ে কোনো অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য নাই মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্লের ছায়ায় পাহাড়ের উপরে সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

ভ্যালি অব্ দি কিংস = মিশরের রাজাদের মৃত্যুর পর যেখানে কবর দেওয়া হত। সে-স্থানের নাম ভ্যালি অব্ দি কিংস। স্থানটি থিবস্ সাগরের নিকটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এই সমাধিস্থল দেখতে আসেন।
পাবলিসিটি = প্রচার।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজসমাধি ও বটতরুতল আবৃত হইবার পূর্বেই আমরা সেদিন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

নামিবার পথে একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে একখানা খাড়া সিঁদুরমাখা পাথর। আশেপাশে মানুষের হস্তরোপিত গাঁদাফুলের ও সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছ। সামনে আর একখানা বড় পাথর, তাতেও সিঁদুর মাখা। বহুকাল হইতে নাকি এই দেবস্থান এখানে প্রতিষ্ঠিত, রাজবংশের ইনি কুলদেবতা। পূর্বে এখানে নরবলি হইত—সম্মুখের বড় পাথরখানিই যূপ-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পায়রা ও মুরগী বলি প্রদত্ত হয়।

হস্তরোপিত = হাতে পোঁতা হয়েছে এমন।

যূপ-রূপে = হাড়িকাঠ রূপে।
প্রদত্ত = দেওয়া।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঠাকুর ইনি?

শব্দার্থ ও টীকা

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

মনে পড়িল গত শীতকালে গনু মাহাতোর মুখে শোনা সেই গল্প।

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে।

এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না—কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা যে সত্যই আছেন—তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।

বিজন = জনহীন, নির্জন।
নিবিড় = গহন, ঘন, গভীর।

আমি নওয়াদা হইতে মোটর বাস ধরিয়া গয়ায় আসিব বলিয়া সন্ধ্যার পরেই রওনা হইলাম। বনোয়ারী আমাদের ঘোড়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিল। আসিবার সময় আর একবার রাজকুমারী ভানুমতীর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এক বাটি মহিষের দুধ লইয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল রাজবাড়ীর দ্বারে।

অনুবিভাগ - 32.3.14

সেদিন গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপিয়া দিতে গিয়াছি, আস্‌রফি টিণ্ডেল জমি মাপিতেছিল, আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় কুন্তাকে টোলার পথ ধরিয়া যাইতে দেখিলাম।

কুন্তাকে অনেক দিন দেখি নাই। আস্‌রফিকে বলিলাম—কুন্তা আজকাল কোথায় থাকে, ওকে দেখিনে তো?

—ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গোয়ালঘরের পাশে একখানা ছোট্ট চালা আছে সেখানেই থাকে।

—চলে কি করে? ওর তো দু-তিনটে ছেলেমেয়ে?

—ভিক্ষে করে—ক্ষেতের ফসল কুড়োয়। কলাই গম কাটে। বড় ভাল মেয়ে বাবু কুন্তা। বাইজীর মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ভাল ঘরের মেয়ের মত মন-মেজাজ—কোন অসৎ কাজ ওকে দিয়ে হবে না।

জরীপ শেষ হইল। বালিয়া জেলার একটি প্রজা এই জমি বন্দোবস্ত লইয়াছে—কাল হইতে এখানে সে বাড়ী বাঁধিবে। গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।

মহালিখারূপের পাহাড়ে উপরকার বড় বড় গাছপালার মাথায় রোদ রাঙা হইয়া আসিল। সিল্লীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার আর দেরি নাই।

একটা কথা ভাবিলাম।

এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না এই বিশাল লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারে, যেমন দেখিতেছি। দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল—কিন্তু এই অরণ্যভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ, অথচ যাহারা

শব্দার্থ ও টীকা

নিঃস্ব, হতভাগ্য—জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্তত এতটুকু উপকার করিবই।

আস্‌রফিকে বলিলাম—আস্‌রফি, কুন্তাকে কাল সকালে কাছারিতে হাজির করতে পারবে? ওকে একটু দরকার আছে।

—হাঁ হুজুর, যখন বলবেন।

পরদিন সকালে কুন্তাকে আস্‌রফি আমার আপিস-ঘরের সামনে বেলা ন'টার সময় লইয়া আসিল।

বলিলাম—কুন্তা, কেমন আছ?

কুন্তা আমায় দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জী হুজুর, ভাল আছি।

—তোমার ছেলেমেয়েরা?

দোয়ায় = দয়ায়।

—ভাল আছে হুজুরের দোয়ায়।

—বড় ছেলেটি কত বড় হল?

—এই আট বছরে পড়েছে, হুজুর।

বলিলাম—কুন্তা, জমি নেবে?

কুন্তা কথাটি ঠিক শুনিয়াছে কিনা বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত মুখে বলিল—জমি, হুজুর?

—হাঁ, জমি। নূতন-বিলি জমি।

কুন্তা একটুখানি কি ভাবিল। পরে বলিল—আগে তো আমাদেরই কত জোতজমা ছিল। প্রথম প্রথম এসে দেখেছি। তার পর সব গেল একে একে। এখন আর কি দিয়ে জমি নেব, হুজুর?

—কেন, সেলামীর টাকা দিতে পারবে না?

দিনমানে = দিনেরবেলা।

—কোথা থেকে দেব? রাত্তির ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়োই, পাছে দিনমানে কেউ অপমান করে। আধ টুক্‌রি এক টুক্‌রি কলাই পাই—তাই গুঁড়ো করে ছাতু ক'রে বাচ্ছাদের খাওয়াই।

কুন্তা কথা বন্ধ করিয়া চোখ নীচু করিল। দুই চোখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আস্‌রফি সরিয়া গেল। ছোকরার হৃদয় কোমল, এখনও পরের দুঃখ ভাল রকম সহ্য করিতে পারে না।

আমি বললাম—কুন্তা, আচ্ছা ধর যদি সেলামী না লাগে?

কুন্তা চোখ তুলিয়া জলভরা বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আস্‌রফি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কুন্তার সামনে হাত নাড়িয়া বলিল—হুজুর তোমায় এমনি জমি দেবেন, এমনি জমি দেবেন—বুঝলে না দাইজী?

আস্‌রফিকে বলিলাম—ওকে জমি দিলে ও চাষ করবে কি ক'রে আসরফি?

আস্‌রফি বলিল—সে বেশি কঠিন কথা নয় হুজুর। ওকে দু-একখানা লাঙ্গল দয়া ক'রে সবাই ভিক্ষে দেবে। এত ঘর গাঙ্গোতা প্রজা, একখানা লাঙল ঘরপিছু দিলেই ওর জমি চাষ হয়ে যাবে। আমি সে ভার নেব, হুজুর।

শব্দার্থ ও টীকা

ভার = দায়িত্ব।

—আচ্ছা, কত বিঘে হ'লে ওর হয়, আস্‌রফি?

—দিচ্ছেন যখন মেহেরবানি ক'রে হুজুর, দশ বিঘে দিন।

কুন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা, কেমন, দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা সেলামীতে দেওয়া যায়—তুমি ঠিকমত চাষ ক'রে ফসল তুলে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে তো? অবিশ্যি প্রথম দু-বছর তোমার খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে।

কুন্তা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে।

হতবুদ্ধি = বুদ্ধি নাশ হওয়া।

কতকটা দিশাহারা ভাবে বলিল—জমি! দশ বিঘে জমি!

আস্‌রফি আমার হইয়া বলিল—হাঁ, হুজুর তোমায় দিচ্ছেন! খাজনা দু-বছর মাপ। তীস্‌রা সাল থেকে খাজনা দিও। কেমন, রাজী?

তীস্‌রা = তৃতীয়।

কুন্তা লজ্জাজড়িত মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

লজ্জাজড়িত = লজ্জা মেশানো।

আমার ইঙ্গিতে আস্‌রফি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ইঙ্গিত = ইশারা।

অনুবিভাগ - 32.3.15

এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ধন্‌ঝরি শৈলমালা একটি সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মন অধিকার করিয়া আছে.... তাহার বনানী....তাহার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি....

সঙ্গে লইলাম যুগলপ্রসাদকে।

তহশীলদার সজ্জন সিং-এর ঘোড়াটাতে যুগলপ্রসাদ চড়িয়াছিল—আমাদের মহালের সীমানা পার হইতে না-হতেই বলিল—হুজুর, এ ঘোড়া চলবে না, জঙ্গলের পথে রহল চাল ধরলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পা খোঁড়া হবে। বদলে নিয়ে আসি।

তহশীলদার = যে খাজনা আদায় করে।

তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। সজ্জন সিং ভাল সওয়ার, সে কতবার পূর্ণিয়ায় মোকদ্দমা তদারক করিতে গিয়েছে এই ঘোড়ায়। পূর্ণিয়া যাইতে হইলে কেমন পথে যাইতে হয় যুগলপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত নয় নিশ্চয়ই।

শীঘ্রই কারো নদী পার হইলাম।

তারপর অরণ্য, অরণ্য—সুন্দর, অপূর্ব, ঘন নির্জন অরণ্য! পূর্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই—কেঁদ-চারা, শাল-চারা, পলাশ, মহুয়া, কুলের অরণ্য—প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা

শব্দার্থ ও টীকা

মাটির ডাঙা, উঁচু-নীচু। মাঝে মাঝে মাটির উপর বন্যহস্তীর পদচিহ্ন। মানুষজন নাই।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম লবটুলিয়ার নূতন তৈরী ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা ও বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর, চষা জমি দেখিবার পরে। এ-রকম আরণ্যপ্রদেশ এদিকে আর কোথাও নাই।

এই পথের সেই দুটি বন্য গ্রাম—বুরুডি ও কুলপাল বেলা বারোটার মধ্যে ছাড়াইলাম। তার পরেই ফাঁকা জঙ্গল পিছনে পড়িয়া রহিল—সম্মুখে বড় বড় বনস্পতির ঘন অরণ্য। কার্তিকের শেষ, বাতাস ঠাণ্ডা—গরমের লেশমাত্রও নাই।

দূরে দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিল।

সন্ধ্যার পর কাছারিতে পৌঁছিলাম।

অপ্রত্যাশিত = প্রত্যাশার বাইরে।
আগমনে = আসায়, উপস্থিতিতে।

পরদিন ভোরে রওনা হইয়া বেলা ন-টার মধ্যে দোবরু পান্নার রাজধানী চক্‌মকিটোলায় পৌঁছানো গেল। ভানুমতী কী খুশি আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে! তার মুখে-চোখে খুশি যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপচাইয়া পড়িতেছে।

—আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী। এতদিন আসনে নি কেন?

ভানুমতীকে একটু লম্বা দেখাইতেছে, একটু রোগাও বটে। তাছাড়া মুখশ্রী আছে ঠিক তেমনি লাবণ্যভরা, সেই নিটোল গড়ন তেমনি আছে।

—নাইবেন তো ঝরনায়? মহুয়া তেল আনব, না কড়ুয়া তেল? এবার বর্ষায় ঝরনায় কি সুন্দর জল হয়েছে দেখবেন চলুন।

আর একটা জিনিস লক্ষ করিয়া আসিতেছি—ভানুমতী ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে তার সেদিক দিয়া তুলনাই হয় না—তার বেশভূষা ও প্রসাধনের সহজ সৌন্দর্য ও রুচিবোধই তাকে অভিজাতবংশের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে-মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছি, তাহার উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন গাছ। এক ঝাঁক সবুজ বনটিয়া সামনের আসান গাছটার ডালে কলরব করিতেছে। হেমন্তের প্রথম, বেলা চড়িলেও বাতাস ঠাণ্ডা। আমার সামনে আধ মাইলেরও কম দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে চেরা সিঁথির মত পথ—একদিকে অনেক দূরে নীল মেঘের মত দৃশ্যমান গয়া জেলার পাহাড়শ্রেণী।

পল্লবপ্রচ্ছায় = নতুন পাতায় আচ্ছাদিত বা বিস্তারিত।
স্বতন্ত্র = পৃথক আলাদা।

বিড়ির পাতার জঙ্গল ইজারা লইয়া এই শান্ত জনবিরল বন্য প্রদেশের পল্লবপ্রচ্ছায় উপত্যকার কোনো পাহাড়ী ঝরনার তীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতাম চিরদিন। লবটুলিয়া তো গেল, ভানুমতীর দেশের এ-বন কেহ নষ্ট করিবে না। এ-অঞ্চলে মরুমকাঁকর ও পাইওরাইট্ বেশি মাটিতে, ফসল তেমন হয় না—হইলে এ-বন কোন্ কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, সে স্বতন্ত্র কথা।

ভানুমতী তেল আনিয়া সামনে দাঁড়াইল। বাড়ীর সবাই আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীর ছোট কাকা নবীন যুবক জগরু একটা গাছের ডাল ছুলিতে ছুলিতে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই ছেলেটিকে আমি বড় পছন্দ করি। রাজপুতের মত চেহারা ওর, কালোর উপরে কি রূপ। এদের

বাড়ীর মধ্যে এই যুবক এবং ভানুমতী, এদের দুজনকে দেখলেই সত্যই যে ইহারা বন্য জাতির মধ্যে অভিজাতবংশ, তা মনে না হইয়া পারে না।

বলিলাম—কি জগরু শিকার-টিকার কেমন চলছে?

জগরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে আজই খাইয়ে দেব বাবুজী, ভাববেন না। বলুন কি খাবেন, সজারু, না হরিয়াল, না বনমোরগ?

স্নান করিয়া আসিলাম। ভানুমতী নিজের সেই আয়নাখানি (সেবার যেখানা পূর্ণিয়া হইতে আনাইয়া দিয়াছিলাম) আর একখানা কাঠের কাঁকুই চুল আঁচড়াইবার জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ভানুমতী প্রস্তাব করিল—বাবুজী চলনু, পাহাড়ে উঠবেন না? আপনি তো ভালবাসেন।

যুগলপ্রসাদ ঘুমাইতেছিল, সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলে আমরা বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে রহিল ভানুমতী, ওর খুড়তুতো বোন—জগরু পান্নার মেজ ভাইয়ের মেয়ে, বছর বারো বয়স—আর যুগলপ্রসাদ।

আধ মাইল হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

ধন্‌ঝরির পাদমূলে এই জায়গায় বনের দৃশ্য এত অপূর্ব যে, খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকেই বড় বড় গাছ, লতা, উপল-বিছানো ঝরনার খাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোটো-বড় শিলাস্তূপ। ধন্‌ঝরির দিকে বন ও পাহাড়ের আড়ালে আকাশটা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে, সামনে লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা উঁচু হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের ও-পারের দিকে উঠিয়াছে, কেমন খট্‌খটে শুক্‌নো ডাঙার মাটি, কোথাও ভিজা নয়, স্যাঁৎসেতে নয়। ঝরনার খাদেও এতটুকু জল নাই।

হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কৃষ্ণা বনদেবী! রাজকুমারী তো ও বটেই! এই বনাঞ্চল, এই পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে ধন্‌ঝরি, ওদিকে নওয়াদার শৈলশ্রেণী—এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।

আজকার এই অপরাহ্নটি আমার জীবনে আরও বহু সুন্দর অপরাহ্নের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় স্মৃতির সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—স্বপ্নের মত মধুর, স্বপ্নের মতই অবাস্তব।

ভানুমতী বলিল—চলুন, আরও উঠবেন না?

—কি সুন্দর ফুলের গন্ধ বল তো? একটু বসবে না এখানে? সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখি—

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আপনার যা মর্জি বাবুজী। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কবরে ফুল দেবেন না? আপনি সেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি রোজ পাহাড়ে উঠি ফুল দিতে। এখন তো বনে কত ফুল।

শব্দার্থ ও টীকা

কাঁকুই = চিরুনি।

উপল = শিলা, প্রস্তর।
ইতস্তত = এদিক-ওদিক, এখানে-সেখানে।
সুবাসে = সুগন্ধে।

সপ্তপর্ণ = ছাতিম গাছ।

পরাক্রান্ত = বলশালী।

ট্র্যাজিক = দুঃখময়।

শব্দার্থ ও টীকা
মর্জি = ইচ্ছে, খুশি।

আব্দার = বায়না।

ভানুমতী একগুচ্ছ ছাতিম ফুল পাড়িয়া খোঁপায় গুঁজিল। বলিল—বসব, না উঠবেন বাবুজী?

আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ছাতিম ফুলের ডাল। একেবারে পাহাড়ের উপর উঠিয়া গেলাম। সেই প্রাচীন বটগাছটা ও তার তলায় প্রাচীন রাজসমাধি। বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের মত পাথর চারিদিকে ছড়ানো। রাজা দোবরু পান্নার কবরের উপর ভানুমতী ও তাহার বোন নিছনী ফুল ছড়াইল, আমি ও যুগলপ্রসাদ ফুল ছড়াইলাম।

ভানুমতী বালিকা তো বটেই, সরলা বালিকার মতই মহা খুশি। বালিকার মত আব্দারের সুরে বলিল—এখানে একটু দাঁড়াই বাবুজী, কেমন? বেশ লাগছে, না?

আমি ভাবিতেছিলাম—এই শেষ। আর এখানে আসিব না। এ পাহাড়ের উপরকার সমাধিস্থান, এ বনাঞ্চল আর দেখিব না। ধন্‌ঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই আমার চিরবিদায়। ছ-বছরের দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গ করিয়া কলিকাতা নগরীতে ফিরিব—কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি।

ছাতিম বন এখানে নাই—সে আরও নীচে নামিলে তবে। এরই মধ্যে গাছপালার ডালে জোনাকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস কি সতেজ, মধুর, প্রাণারাম! এ বাতাস সকালে বিকালে উপভোগ করিলে আয়ু না বাড়িয়া পারে? নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কিন্তু বন্য জন্তুর ভয় আছে—তা ছাড়া ভানুমতী সঙ্গে রহিয়াছে। যুগলপ্রসাদ বোধহয় ভাবিতেছিল, নূতন কোন্ ধরনের গাছপালা এ জঙ্গল হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে পারে। দেখিলাম তাহার সমস্ত মনোযোগ নূতন লতাপাতার ফুল, সুদৃশ্য পাতার গাছ প্রভৃতির দিকে নিবদ্ধ—অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। যুগলপ্রসাদ পাগলই বটে, কিন্তু ঐ এক ধরনের পাগল।

ভানুমতী বলিল—বাঁয়ে ওই টাঁড়বারের গাছ—চিনেছেন?

বন্য-মহিষের রক্ষাকর্তা সদয় দেবতা টাঁড়বারোর গাছ অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

অনেকটা নামিয়া আসিয়াছি। এবার সেই ছাতিম বন। কি মিষ্ট মনমাতানো গন্ধ!

ভানুমতীকে বলিলাম—এখানে একটু বসি।

পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম, লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে—কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল—ভানুমতীর ঝন্‌ঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না—শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

অনুবিভাগ - 32.3.16

রাত্রে বসিয়া জগরু পান্না, তাহার দাদার মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা শুনিলাম। মহাজনের

দেনা এখনও শোধ হয় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে, না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মাড়োয়ারী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত—আজ তিন-চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মণ ঘি ঘরে মজুত, খরিদ্দার নাই।

ভানুমতী আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিল। যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর, সে চা-চিনি সঙ্গে আনিয়াছে আমি জানি। কিন্তু লাজুকতাবশত গরম জলের কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহাও জানি। বলিলাম—চায়ের জল একটু গরম করার সুবিধে হবে কি ভানুমতী?

রাজকুমারী ভানুমতী চা কখনও করে নাই। চা খাইবার রেওয়াজই নাই এখানে। তাহাকে জলের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতে সে মাটির হাঁড়িতে জল গরম করিয়া আনিল। তাহার ছোটো বোন কয়েকটি পাথরবাটি আনিল। ভানুমতীকে চা খাইবার অনুরোধ করিলাম, সে খাইতে চাহিল না। জগরু পান্না পাথরের ছোট খোরার এক খোরা চা শেষ করিয়া আরও খানিকটা চাহিয়া লইল।

চা খাইয়া আর-সকলে উঠিয়া গেল, ভানুমতী গেল না। আমায় বলিল—ক'দিন এখানে আছেন বাবুজী? এবার বড় দেরি ক'রে এসেছেন। কাল তো যেতেই দেব না। চলুন আপনাকে কাল ঝাটি ঝরনা বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঝাটি ঝরনায় আরও ভয়ানক জঙ্গল। ওদিকে বড্ড বুনো হাতি। অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন। চমৎকার জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর নেই।

ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ভানুমতী, কখনো কোনো শহর দেখেছ?

—না বাবুজী।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোননি?

—হাঁ বাবুজী।

—কোন্ দিকে জান?

—কি জানি বাবুজী!

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

—ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?

পরে হাতখানি একবার তুলিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া গর্বের সহিত বলিল—জানেন বাবুজী, এই সমস্ত দেশ

শব্দার্থ ও টীকা

রেওয়াজ = প্রথা, অভ্যেস।

শব্দার্থ ও টীকা

গোঁড় = একটি জন জাতির নাম।

ফাঁদ = পশু ধরার কৌশল।

আমাদের রাজ্য ছিল। সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন, ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা ব'লে মানে।

উহার কথায় দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মহাজন দেনার দায়ে দুই বেলা যাহাদের মহিষ ধরিয়া লইয়া যায়, সেও রাজবংশের গর্ব করিতে ছাড়ে না।

বলিলাম—আমি জানি ভানুমতী তোমাদের কত বড় বংশ—

ভানুমতী বলিল—তারপর শুনুন বাবুজী, আমাদের সেই মহিষটা বাঘে নিয়ে গেল। জ্যাঠামশায় যে মহিষটা এনেছিলেন।

—কি ক'রে?

—জ্যাঠামশায় ওই পাহাড়ের নীচে চরাতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় বসেছিলেন, সেখানে বাঘে ধরল।

বলিলাম—তুমি বাঘ দেখেছ কখনও?

ভানুমতী কালো জোড়া-ভুরু দুটি আশ্চর্য হইবার ভঙ্গিতে উপরের দিকে তুলিয়া বলিল—বাঘ দেখিনি বাবুজী! শীতকালে আসবেন চক্‌মকিটোলায়—বাড়ীর উঠোন থেকে গরু-বাছুর ধরে নিয়ে চলে যায়—

বলিয়াই সে ডাকিল—নিছনি, নিছনি—শোন্—

ছোট বোন আসিলে বলিল—নিছনি, বাবুজীকে শুনিয়ে দে তো আর বছর শীতকালে বাঘ রোজ রাতে আমাদের উঠোনে এসে কি ক'রে বেড়াত। জগরু একদিন ফাঁদ পেতেছিল। ধরা পড়ল না।

পরে হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, বাবুজী, একখানা চিঠি পড়ে দেবেন? কোথা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কে পড়বে, এমনি তোলা রয়েছে। যা নিছনি, চিঠিখানা নিয়ে আয়, আর জগরু-কাকাকেও ডেকে নিয়ে আয়—

নিছনি চিঠি পাইল না। তখন ভানুমতী নিজে গিয়া অনেক খুঁজিয়া সেখানা বাহির করিয়া আমার হাতে আনিয়া দিল।

বলিলাম—কবে এসেছে এখানা?

ভানুমতী বলিলি—মাস ছ-সাত হবে বাবুজী—তুলে রেখে দিইছি, আপনি এলে পড়াবো। আমরা তো কেউ পড়তে পারিনে। ও নিছনি, জগরু-কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়। চিঠি পড়া হবে—সবাইকে ডাক দে।

ছ-সাত মাস পূর্বের পুরনো অপঠিত পত্রখানা আমি যুগলপ্রসাদের উনুনের আলোয় পড়িতে বসিলাম—আমার চারধারে বাড়ীসুদ্ধ লোক ঘিরিয়া বসিল চিঠি শুনিবার জন্য। চিঠিখানা কায়েথী-হিন্দিতে লেখা—রাজা দোবরু পান্নার নামে চিঠি। পাটনার জনৈক মহাজন রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে, এখানে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে কিনা—থাকিলে কি দরে ইজারা বিলি হয়।

এ পত্রের সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই—ইহাদের অধীনে কোনো বিড়ি-পাতার জঙ্গল নাই। রাজা

দোবরু নামে রাজা ছিলেন, চক্‌মকিটোলার নিজ বসতবাটীর বাহিরে তাঁর যে কোথাও এক ছটাক জমিও নাই একথা পাটনার উক্ত পত্রলেখক মহাজন জানিলে ডাকমাশুল খরচ করিয়া বৃথা পত্র দিত না নিশ্চয়ই।

একটু দূরে দাওয়ার ও-পাশে যুগলপ্রসাদ রান্না করিতেছে। তাহার কাঠের উনুনের আলোয় দাওয়ার খানিকটা আলো হইয়াছে। এদিকে দাওয়ার অর্ধেকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, যদিও কৃষ্ণপক্ষের আজ মোটে তৃতীয়া—ধন্‌ঝরি পাহাড়ের আড়াল কাটাইয়া এই কিছুক্ষণ মাত্র চাঁদ ফাঁকা আকাশে দৃশ্যমান হইয়াছে। সামনে কিছুদূরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী—চক্‌মকিটোলার বস্তির ছেলেপুলেদের কথা ও কলরব শোনা যাইতেছে।....কি সুন্দর ও অপূর্ব মনে হইতেছিল এই বন্য গ্রামে যাপিত এই রাত্রিটি। ভানুমতীর তুচ্ছ ও সাধারণ গল্পও কি আনন্দই দিতেছিল! সেদিন বলভদ্রের মুখে শোনা সেই উন্নতি করিবার কথা মনে পড়িল।

শব্দার্থ ও টীকা

মানুষে কি চায়—উন্নতি, না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

যুগলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, রান্না হইয়াছে, চৌকা লাগাইবে কিনা। ভানুমতীদের বাড়ীতে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। এদেশে আনাজ মেলে না, তবুও কোথা হইতে জগরু বেগুন ও আলু আনিয়াছে। মাষকলাইয়ের ডাল, পাখীর মাংস, বাড়ীতে তৈরি অতি উৎকৃষ্ট টাটকা ভয়সা ঘি, দুধ। যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।

শান-বাঁধানো = পাকা।

আনাজ = কাঁচা তরি তরকারি, সবজি।

ভয়সা ঘি = মোষের দুধে তৈরি ঘি।

ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা, নিছনি—সবাই আজ আমাদের এখানে খাইবে—আমি খাইতে বলিয়াছি। কারণ এমন রান্না উহারা কখনও খাইতে পায় না। বলিলাম—একটু দূরে উহারাও একসঙ্গে সবাই বসুক। যুগলপ্রসাদের দেওয়ারও সুবিধা হইবে। একত্র খাওয়া যাক।

ওরা রাজী হইল না। আমাদের আগে না খাওয়া হইলে উহারা খাইবে না।

পরদিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল।

হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী—

আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কষ্ট হইল।

উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না—দুপুরের আহারাদির পর বিদায় লইলাম।

রাজী = সম্মত।

মহালে ফিরিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া লবটুলিয়া ত্যাগ করিলাম।

আসিবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আস্‌রফি টিণ্ডেল প্রভৃতি পাল্কির চারিধার ঘিরিয়া পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার সীমানার নূতন বস্তি মহারাজটোলা পর্যন্ত আসিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া আমায় আশীর্বাদ করিল। রাজু বলিল—হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশি। মকাই-ভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে, 'ভাজা উদাস লাগছে'। আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল

ঠিক বলিতে পারিব না।

আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল—আমার পাল্কি যখন তোলা হইল, তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। মেয়েটি কুন্তা।

নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎকাজ। পারিলাম না কিছু করিতে সেই বালিকা মঞ্চীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলাইয়া লইয়া গেল! আজ সে যদি থাকিত তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামীতে।

নাঢ়া বইহারের সীমানায় নক্ছেদীর ঘর দেখিয়াই আরও ওর কথা মনে পড়িল। সুরতিয়া ঘরের বাইরে কি করিতেছিল, আমার পাল্কি দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—বাবুজী, বাবুজী, একটু রাখুন—

পরে সে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কির কাছে দাঁড়াইল। ছনিয়াও আসিল পিছু-পিছু।

—বাবুজী, কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাগলপুরে। তোর বাবা কোথায়?

—ঝল্লুটোলায় গমের বীজ আনতে গিয়েছে। কবে আসবেন?

—আর আসব না।

—ইস্! মিথ্যে কথা।.....

নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাল্কি হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চীৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী, আপনার কাজ দেখে আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!

কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে!

দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিলাম।

হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!.....

বহু কাল কাটিয়া গিয়াছে তারপর—পনেরো-যোল বছর।

বাদাম গাছের তলায় বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের যে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে, সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের

শব্দার্থ ও টীকা

স্বস্তিবাচন = প্রশস্তি।

হাপুস নয়নে = বাষ্পাকুল চোখে।

নিরাশ্রয় = আশ্রয়হীন।

হাস্যদীপ্ত = হাসিতে উজ্জ্বল।

দিগন্তলীন = দিগন্তে মিশে যাওয়া।

সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে।....

আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও !

কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

বিস্মৃতপ্রায় = প্রায় ভুলে যাওয়া।

বনানী = মহাবন।

শৈলবেষ্টিত = পাহাড় ঘেরা।

অনুতপ্তা = অনুশোচনাকারিণী।

32.4 বিষয়ের রূপরেখা

অনুবিভাগ - 32.4.1

[পনের-ষোল বছর .... অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি]

বক্তব্যসার :

'আরণ্যক' উপন্যাসের সূত্রধর সত্যচরণ ১৫/১৬ বছর আগে বি. এ পাস করে অনেক ঘোরাঘুরি করেও চাকুরি জোটাতে পারেননি।

তীব্র অভাবের মধ্যেই তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়। মেসে থাকেন কিন্তু সময়মতো থাকা-খাওয়ার জন্য দেয় অর্থ দিতে পারেন না।

বন্ধু অবিনাশের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সম্প্রতি সত্যচরণ ওকালতি পাস করে বসে আছেন জেনে তিনি তাঁকে জঙ্গলমহলে প্রজা বন্দোবস্তের কাজ নেবার অনুরোধ জানান। সত্যচরণ মান বজায় রাখতে এক কথায় রাজি না হয়ে কিছু সময় চেয়ে নিলেন।

মন্তব্য:

'আরণ্যক' উপন্যাস হলেও কাহিনির তেমন জোরালো বাঁধুনি নেই। সূত্রধার সত্যচরণ উত্তমপুরুষে কাহিনিটি বর্ণনা করেছেন। সত্যচরণ ১৫/১৬ বছর আগে বি.এ পাস করলেও বেকার,আবার অবিনাশের দেওয়া চাকুরির প্রস্তাব এক কথায় গ্রহণ করতেও কুণ্ঠা দেখা যায়।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.1

১। **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) সত্যচরণ লেখাপড়া করেছে কতদূর ?

(অ) ম্যাট্রিক পাস (আ) বি. এ পাস (ই) এম. এ পাস।

(খ) মেসে সত্যচরণের টাকা —

(অ) প্রায় বাকী থাকে (আ) মাসে মাসে দিয়ে দেন (ই) কখনই দিতে চাইতেন না।

২। **উত্তর লিখুন ঃ**

(ক) সত্যচরণের আর্থিক অবস্থার পরিচয় কীভাবে জানা যায়?

(খ) অবিনাশের দেওয়া চাকুরির প্রস্তাব এক কথায় গ্রহণ করতে সত্যচরণের কুণ্ঠা দেখা যায় কেন?

অনুবিভাগ - 32.4.2

[কী করিয়া চাকুরি .... জলের কষ্ট নাই]

বক্তব্যসার:

চায়ের আসরে অবিনাশের সঙ্গে চাকুরিতে যোগ দেবার কথা হবার দু-সপ্তাহ বাদে সত্যচরণ নিজের মালপত্র নিয়ে বি. এন. ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোটো স্টেশনে নামলেন।

শীতের বিকেল। দূরের বনের মাথায় কুয়াশা। রেল লাইনের দুপাশে মটর ক্ষেত। সত্যচরণ তাঁর নতুন জীবনের অনেকখানি জুড়ে নির্জনতা থাকবে তা অনুমান করলেন।

সারারাত গোরুর গাড়িতে ১৫/১৬ ক্রোশ অর্থাৎ ৩০/৩২ মাইল পথ চলা হয়ে গেল। খুব ঠাণ্ডা। বাংলার মাটির থেকে এ মাটির ধরন আলাদা। জনবসতি কম। প্রায়ই ছোটো-বড়ো বন।

বেলা দশটায় সত্যচরণ কাছারিতে পৌঁছলেন। ১০/১৫ বিঘের ওপর খড়ের ঘর বনের কাঠ, বাঁশ দিয়ে বানানো। ঘরে শুকনো ঘাস আর বন মটরের সরু গুঁড়ির বেড়া। বেড়াটি মাটি দিয়ে লেপা। জলকষ্ট হওয়ায় পুরানো কাছারির বদলে এই নতুন কাছারি হয়েছে। এখানে একটা ঝরনা আছে।

মন্তব্য:

সত্যচরণের নতুন জীবন শুরু হল। একেবারে শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে চলে এলেন। মাটি দিয়ে লেপা বেড়ার ঘর। আশেপাশে ছোটো বড়ো বন। কাছেই ঝরনা, নির্জনতায় মোড়া।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.2

১। **ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ**

(ক) সত্যচরণ স্টেশনে নেমেছেন কোন্ সময়ে?

(অ) শীতের বিকেলে (আ) শীতের সকালে (ই) শীতের সন্ধ্যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) কাছারিতে সত্যচরণ কখন পৌঁছলেন?

(অ) সকাল সাতটায় (আ) সকাল আটটায় (ই) সকাল দশটায়।

(গ) গোরুর গাড়িতে সত্যচরণকে কতটা পথ যেতে হয়েছিল?

(অ) প্রায় দশ-বারো ক্রোশ

(আ) প্রায় চোদ্দো ক্রোশ (ই) প্রায় পনেরো-ষোলো ক্রোশ।

২। **অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন ঃ**

গোরুর গাড়ি করে যেতে যেতে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সত্যচরণের মানসিক অবস্থা কীরকম হয়েছিল লিখুন।

৩। কী করে সত্যচরণ চাকরি পেল অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.3

[জীবনের বেশির ভাগ সময় .... অবিনাশকে কথা দিতাম না।]

বক্তব্যসার:

সত্যচরণ কলকাতার অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে এই নতুন পরিবেশে এসে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। এখানকার বিপুল নির্জনতা তাঁকে অস্থির করে তুলল। এখানকার মানুষের ভাষা বোঝেন না, তারাও সত্যচরণের ভাষা বোঝেনা ; যে কাজে আসা এখানে তাও শুরু করা যায়নি। কলকাতা থেকে আনা বই পড়ে তাঁর সময় কাটছে। এখানে কটা টাকার জন্যে আসাটা তাঁর ভুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

এক রাত্রে বৃদ্ধ মুহুরি গোষ্ঠ চক্রবর্তী তাঁর ঘরে এলেন। ভদ্রলোকের বাড়ি বর্ধমানে। তাঁর সঙ্গে সত্যচরণ বাংলা কথা বলে একটু স্বস্তি বোধ করেন। তিনিই সত্যচরণকে এখানকার মানুষ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বললেন। তাঁরও এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু এখন দুদিন এ জায়গা ছেড়ে থাকতে পারেন না। এখানে থাকলে জঙ্গলই আপন করে নেবে। একবার মোকদ্দমার কাজে মুঙ্গেরে গিয়ে গোষ্ঠবাবু জঙ্গলের জন্য এক গভীর টান অনুভব করেছিলেন। গোষ্ঠবাবু ৭/৮ বছর আগের এক ডাকাতির ঘটনা উল্লেখ করে সত্যচরণকে বন্দুক শিয়রে রেখে শুতে পরামর্শ দেন।

গোষ্ঠবাবু চলে গেলে জানলার ধারে গিয়ে সত্যচরণ বাইরের আকাশের চাঁদের ও প্রকৃতির ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন বটে তবুও এখানে আসা যে তার ভুল হয়েছে এটাই তাঁর মনে হতে লাগল।

মন্তব্য:

নতুন পরিবেশে এসে সত্যচরণের পুরানো জীবনের কথা বারে বারে মনে আসছিল। বাধ্য হয়ে নতুনকে গ্রহণ করলেও পুরানোর প্রতি টান মানুষের সহজে যায় না।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.3

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

১। গোষ্ঠ চক্রবর্তী কে?

২। গোষ্ঠবাবুর বাড়ি কোথায়?

৩। সত্যচরণকে শিয়রে বন্দুক রেখে ঘুমোবার পরামর্শ কে দিয়েছিলেন?

৪। কাছারিতে চাকরি করতে এসে সত্যচরণের প্রথম দিন-দশেক কীভাবে কেটেছে অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.4

[কাছারির অনতি দূরে .... বড় কষ্ট তো ওদের]

বক্তব্যসার:

কাছারির কাছেই একটি টিলায় গ্র্যান্টসাহেবের বটগাছ নামে এক বড়ো বটগাছ আছে। একদিন বিকেলে সত্যচরণ সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে এই টিলার উপর উঠলেন। সেখানে তাঁর মন কলকাতার কলুটোলার মেস, কাপালীটোলার ব্রিজের আড্ডা, তাঁর গোলদীঘির প্রিয় বেঞ্চ ইত্যাদির জন্য ব্যথিত হয়ে উঠল। এখানকার নির্জনতা ও আরও অজ্ঞ মানুষদের কথা ভেবে তিনি বিষণ্ণ হলেন এবং ঠিক করলেন সামনের মাসটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিয়ে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তাঁর কলকাতার চেনাজগতের কোলাহলে আবার মিশে যাবেন। কলকাতার মানুষদের জন্য সেদিন তাঁর মন কেঁদে উঠল। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বই বিক্রির দোকানের মুসলমান মালিকটির স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে উঠল।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সত্যচরণ বই নিয়ে বসেছেন এমন সময় সিপাহী মুনেশ্বর তাঁকে সেলাম দিয়ে এসে দাঁড়াল। সত্যচরণ ইতিমধ্যে কিছু দেহাতি হিন্দি বলতে শিখেছিলেন। সত্যচরণ বুঝতে পারলেন মুনেশ্বর একখানা লোহার কড়া কিনতে চায়। সেজন্য দরকার মুহুরির কাছে সত্যচরণের লিখিত নির্দেশ। মুনেশ্বরের কাকুতিমিনতিতে তার প্রতি সত্যচরণের মায়া হল। তিনি মুহুরিকে নির্দেশ দিলেন। সেই কড়া নিয়ে মুনেশ্বর এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে একটা আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার ছবি দেখলেন। এদের কষ্টে সত্যচরণ সেদিন খুবই ব্যথা পেলেন এবং এই সামান্য জিনিস কিনতে পেরে যে আনন্দের প্রকাশ দেখলেন তাতে তাঁর মনে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল। সেদিন এই লোকগুলোকে তাঁর কাছে বেশ ভালো মনে হল।

মন্তব্য ঃ

একদিকে কলকাতার চেনা জগত ছেড়ে এসে সত্যচরণের মানসিক কষ্ট আরম্ভ হল। ফেলে আসা

স্মৃতির ভারে কাতর। আবার অন্যদিকে মুনেশ্বর এর মতো স্থানীয় মানুষদের সহজ সরল কথাবার্তা তাঁকে মুগ্ধ করে।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.4

১। **একটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ**

(ক) সত্যচরণ কোথাকার দোকানে দাঁড়িয়ে পুরনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতেন?

(খ) একটি লোহার কড়াই-এর দাম কত?

২। একটি লোহার কড়াইয়ে কত সুবিধে বলে মুনেশ্বরের ধারণা—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। সত্যচরণ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ভাবছিলেন কেন — অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪। মুনেশ্বরের কষ্টে সত্যচরণ ব্যথা পেয়েছিলেন কেন — অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.5

[একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না .... চির অপরিচিত রহিয়া গেল]

বক্তব্যসার:

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে কাছারির ছুটিতে সারা দিন সিপাইরা ঢোল বাজিয়ে হোলি খেলেছে। সত্যচরণ রাত ১টা পর্যন্ত নিজের ঘরের টেবিলে বসে হেড অফিসে চিঠি লিখেছেন। প্রবল শীত। সত্যচরণ জানলা দিয়ে পূর্ণিমা রাত্রির অপরূপ শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন। এখানে এসে প্রথম তিনি প্রকৃতির এই রূপ দেখলেন।

সত্যচরণ বাইরে এলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নায় সারা এলাকা প্লাবিত। বনের এমন রূপ-মাধুর্য তিনি জীবনে তখনও দেখেননি।

মন্তব্য:

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন সত্যচরণ। জ্যোৎস্নার এ হেন রূপের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। মুগ্ধ তিনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.5

১। কাছারির সিপাইরা হোলির উৎসব কীভাবে পালন করেছিল—একটি বাক্যে লিখুন।

২। সত্যচরণ হোলির দিনে অনেক রাত পর্যন্ত কী করেছিলেন—একটি বাক্যে লিখুন।

৩। **অনধিক পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন ঃ**
'আমি অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভালো করি নাই।'—কোথায় প্রবেশ করে সত্যচরণের এরকম মনে হল কেন?

অনুবিভাগ - 32.4.6

[সাদা কথায় .... সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়]

বক্তব্যসার:

সত্যচরণের কাছারি বাড়িতে থাকার কয়েক মাস পর শুরু হল প্রচণ্ড জলকষ্ট। মাঘ মাস থেকে বৈশাখ পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হয়নি। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষণপুর, পূবে ফুলকিয়া, বইহার ও লবটুলিয়া থেকে পশ্চিমে মুঙ্গেরের সীমানা সব নদ-নদী, খাল,ডোবা-পুকুর সব শুকিয়ে গেল। সারাদিন নদীর শুকিয়ে যাওয়া ধারার বালি খুঁড়ে সামান্য একটু জল মেলে অনেক কাদা-বালি ছেঁকে। ছোটো বালির পাতকুয়া থেকে তিন বালতি জল মিলত সকাল থেকে দুপুর গাড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত মেহনত করে।

দুপুরে তামাটে আকাশ আগুন ঢালত ; আধপোড়া বনঝাড় আর লম্বা ঘাসের বন দেখে ভয় লাগত ; জ্বলন্ত আগুনের গোলা বেরিয়ে আসত সূর্য থেকে ; আগুনে বাতাসের হলকা ছুটত।

একদিন দুপুরে হরিতকী গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সত্যচরণ এখানকার দুপুরের ও বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরের কথা স্মরণ করে বলেছেন বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর এমন অগ্নিবর্ষী নয়। এই দুপুরের রুদ্রমূর্তির মধ্যে সত্যচরণ এক অদ্ভুত ভয়ংকর সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন।

কাছারি থেকে তিন মাইল দূরে বনে-ঘেরা কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল থাকলেও তা গভীর কাদা ও ধাতব গন্ধের জন্য পানের উপযুক্ত নয়।

এক সন্ধ্যায় উত্তাপ-মাত্রা কম হলে সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে কুণ্ডীর পাশের বালিয়াড়িতে গেলেন। সূর্য তখন অস্তগামী। কাছারির জল বাঁচাতে ঘোড়াটিকে জল খাওয়াতে গিয়ে দেখলেন তিনটে বুনো মহিষ আর পাঁচটা বিষাক্ত সাপ ওখানে জলপান করছে। আর এগিয়ে গেলেন না। মোষগুলির বিবরণ শুনে সবাই চমকে উঠে তাঁর বেঁচে যাওয়ার জন্য আনন্দপ্রকাশ করল।

তারপর থেকে এই কুণ্ডী বুনো জন্তুদের জলপানের এক কেন্দ্র হল। সত্যচরণ খবর পেলেন সেখানে বুনো হরিণের পাল, নীলগাই, বুনো শুয়োর প্রভৃতি জন্তুরা জল খেতে আসছে। সত্যচরণ এক

জ্যোৎস্নারাতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলেন দুটি নীল গাই, দুটি হায়েনা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে আর জলপান করছে—আর এই দুই দলের মাঝখানে ছিল একটি ২/৩ মাসের ছোটো নীল গাইয়ের বাচ্চা। এমন দৃশ্য কল্পনা করাও যায় না। সত্যচরণের সাথে দু'তিনটে বন্দুক থাকলেও করুণ দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দুক ব্যবহার করা গেল না।

মন্তব্য:

সৌন্দর্যপিপাসু সত্যচরণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তির ভেতরও উপলব্ধি করেন ভয়ংকর সৌন্দর্যকে। সত্যচরণ শিকারে বেরিয়েও শিকার করেননি হায়না আর নীল গাইকে। পিপাসার্ত জানোয়ারগুলো জলপান করছে আর ভীতচোখে উভয়ে উভয়কে দেখছে। হাতে বন্দুক থাকলেও ওই করুণ দৃশ্য দেখে তিনি বন্দুক চালাতে পারলেন না।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.6

১। কুণ্ডীর ধারে গিয়ে সত্যচরণ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন—দৃশ্যটি কী? অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

২। সত্যচরণ জঙ্গলের ভেতর ওই কুণ্ডীর ধারে গেলেন কেন—অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

৩। কাছারিতে কথাটা তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল—কথাটি কী?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪। কুণ্ডীতে শিকার করতে গিয়ে সত্যচরণ যে দৃশ্যটি দেখেছিলেন তাকে করুণ বলে মনে হল কেন — অনধিক পাঁচটি বাক্যে তা লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.7

[একদিনের ঘটনা .... গিয়া পৌঁছিল।]

বক্তব্যসার:

দুপুরে গরমে ক্লান্ত হয়ে সত্যচরণ যখন বই পড়ছেন সে সময় রামবিরিজ সিং এসে জানাল কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপর একজন হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছে। চারিদিকে ভিড়। দুজন সিপাইকে লোকটাকে আনতে পাঠান হল।

লোকটা এলে দেখা গেল তার পরণে ফর্সা ধুতি হলেও গায়ে জামা নেই, চেহারা ভালো, রং ফরসা কিন্তু মুখের চেহারা ভীষণ। গালের কশ বেয়ে ফেনা ঝরছে, জবাফুলের মতো লাল চোখে পাগলের দৃষ্টি। ঘরের দাওয়ায় এক বালতি জল দেখে সে পাগলের মতো সে দিকে গেল। তখন সেই বালতি সরিয়ে তাকে হাঁ করিয়ে দেখা গেল তার জিভ বীভৎস ফুলেছে। জিভটা সরিয়ে একপাশ থেকে মুখে জল দিতে লোকটি আধঘন্টা পরে একটু সুস্থ হল। তার যথোচিত পরিচর্যা করা হল। পরে জানা

গেল লোকটার বাড়ি পাটনা। গালা চাষের জন্য কুল বাগান খুঁজতে পূর্ণিয়ায় এসে দিশা হারিয়েছে। ভয়ংকর তাপে পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে ও তীব্র পিপাসায় তার এই হাল হয়েছে। অসহ্য গরমে ও কষ্টে জামাটা দেহ থেকে খুলে সে কোথায় ফেলেছে জানে না।

এই ভয়ংকর গরমের মধ্যে সত্যচরণের কাছে খবর হল যে কাছারি থেকে মাইলখানেক দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বনে আগুন লেগেছে আর রোদ্দুরে শুকনো ও আধা শুকনো লম্বা ঘাস ও গাছপালায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সে ছড়িয়ে পড়ায় সাহায্য করছে পশ্চিমে বাতাস।

দ্রুত আগুন ছুটে আসছে দেখে সিপাইদের কাছারি থেকে সব জিনিস বার করার নির্দেশ দেওয়া হল। কিছু লোক আগুন ও কাছারির জঙ্গল কেটে দিতে লাগল। বাথানওয়ালা চরির দু-দশজন প্রজা এসে ওদের সঙ্গে হাত মেলাল। সে সময় জঙ্গল ভেঙে পশ্চিম থেকে পূর্বে ছুটছে নীলগাই, শেয়াল, খরগোস ও বন্য শূকরের দল। পিছনে ছিল এক ঝাঁক লাল হাঁস।

বিশ মিনিটের মধ্যে আগুন এল। দশ-পনেরো জন ঘন্টাখানেক আগুনের সঙ্গে লড়ল। জল নেই, শুধুই গাছের কাঁচা ডাল আর বালি। কাছারির সব জিনিস বাইরে। কাছারির উঠান ও পরিষ্কার করা স্থানে বাধা পেয়ে আগুনের স্রোত ছুটল উত্তর ও দক্ষিণ বেয়ে পূবদিকে। কাছারি বেঁচে গেল।

কয়েকদিন বাদে খবর এল কারো ও কুশী নদীর তীরে পালাতে গিয়ে কাদায় আটকে মারা গেছে আট-দশখানা মোষ, দুটো চিতাবাঘ আর কয়েকটি নীলগাই।

মন্তব্য:

সত্যচরণের প্রখর দৃষ্টি, গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপে প্রকৃতির বুকে যখন আগুন লাগে নীল গাই, শেয়াল, খরগোস, বুনো শুয়োর যখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ছুটতে থাকে—সত্যচরণ মনে ব্যথা পান। পাটনায় বাড়ি যে লোকটার—গরমে জলের জন্য যে পাগল—তার যথোচিত পরিচর্যা করার নির্দেশ দেন তিনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.7

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। রামবিরিজ সিং যখন এল, সত্যচরণ কী করছিলেন?

২। কাদায় আটকে কোন্ কোন্ জন্তু মারা গেল?

৩। 'তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল, উন্মাদের দৃষ্টি।'—লোকটির এ অবস্থা হল কেন অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪। আগুন দেখে পশু পাখিদের যে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তা পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৫। আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত কাছারিটা কীভাবে রক্ষা করা গেল অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

শব্দার্থ ও টীকা

অনুবিভাগ - 32.4.8

[প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে .... কড়ার হইয়াছে।]

বক্তব্যসার ঃ

রাজু পাঁড়ে দরিদ্র কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির। তার সঙ্গে পরিচয় হল ম্যানেজার বাবুর। রাজুকে বড়ো অদ্ভুত লাগল। চাষ আবাদ বাড়াবার কোনো চেষ্টা নেই তেমন। ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় তার সময় নেই। কারণ সে ভক্ত মানুষ। পুজো-আর্চায় সময় চলে যায়। চাষের জন্য জঙ্গল সাফ করতে 'দা-কুডুল হাতে করলেই দেবতারা এসে কেড়ে নেন— কানে কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন যাতে বিষয় সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।' এমনতর দার্শনিক রাজু পাঁড়ে। তাকে দিয়ে চাষবাস কী করে চলবে?

সত্যকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির রাজু পাঁড়ে সাত-আটমাস চীনা ঘাসের দানা খেয়েই অনায়াসে কাটিয়ে দেয়।

ম্যানেজার সত্যচরণের চোখে পড়ে রাজুর আর এক রূপ। সন্ধ্যার দিকে ও প্রায় চুপ করে হরতকী গাছটার তলায় বসে থাকে। হাতে কোনো দিন খাতা থাকে।

রাজু পাঁড়ে কবিও বটে।

মন্তব্য ঃ

লেখক তার 'আরণ্যক' গ্রন্থে সন্ধান দিয়েছেন অরণ্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের। তার সাথে খুঁজে পেয়েছেন অরণ্য অঞ্চলের অনেক মানুষকে। এরা এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে। প্রকৃতির মতোই সহজ সরল এদের মন। তাদের মধ্যে অন্যতম রাজু পাঁড়ে।

লেখক রাজু পাঁড়ের দার্শনিক প্রকৃতি ও সেবা ধর্মের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.8

১। ডানদিক থেকে ঠিক অংশ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান

(ক) রাজু পাঁড়ে— (১) লবটুলিয়া বইহারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দু বিঘা জমি দেওয়া হল।

(খ) রাজু পাঁড়েকে— (২) সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক।

(গ) রাজু পাঁড়ে — (৩) একজন গৌরবর্ণের সুপুরুষ ব্রাহ্মণ।

২। নীচে যে মন্তব্যগুলো ঠিক সেগুলো বেছে নিয়ে লিখুন—

(ক) রাজু পাঁড়ে খুব মন দিয়ে চাষ করে।

(খ) রাজু চীনার দানাই চাষ করেছে তাই তার ভাগ দেয়নি।

(গ) রাজুর পুজো আর্চার দিকেই বেশি মনোযোগ।

(ঘ) রাজু লেখাপড়া জানে না।

(ঙ) ম্যানেজার রাজুকে ভালো বেসে ফেলেছিলেন।

৩। **সংক্ষেপে উত্তর দিন —**

(ক) কী করে জানা যায় রাজু সাত্ত্বিক প্রকৃতির?

(খ) রাজু পাঁড়ের চরিত্রের কী কী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়?

অনুবিভাগ - 32.4.9

[কয়েক বারের কথা .... পুনরাস্বাদনের লোভে]

বক্তব্যসার:

সত্যচরণ এই জঙ্গল এলাকায় থেকে অনুভব করলেন প্রকৃতির প্রকৃত ভক্ত হলেই তবে তাঁর সেরা দানটা মেলে। কিন্তু একমনে প্রকৃতি ভালোবাসে এমন লোকের সংখ্যা কম।

লবটুলিয়ার মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল ফুটে বসন্ত আসার কথা জানিয়ে দেয়। সরু লম্বা ঘাসের ডাঁটায় নক্ষত্র আকারের হলদে রঙের দুধলি ফুল ধরে গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ আলো করে থাকে কিন্তু বেলা বাড়লে ফুল কুঁকড়ে কুঁড়ি হয়ে যায় আবার সকালে সেগুলি ফোটে।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও মহালিখারূপের পাহাড়ে দেখা যায় রক্তপলাশের বাহার আর শালমঞ্জরীর সুবাস বাতাস মাতিয়ে রাখে কিন্তু এখানে কোকিল, দোয়েল ডাকে না। এসময় সত্যচরণের মন বাংলায় ফেরার জন্যে আকুল হয়ে উঠত। বিদেশে গিয়েই সত্যচরণ বুঝল নিজের জন্মভূমিকে সে কত ভালোবাসে।

একদিন পূর্ণিয়া থেকে উকিলের তার পেয়ে সত্যচরণ জানলেন যে পরদিন সকাল দশটার মধ্যে সেখানে না গেলে মামলায় তার স্টেটের হার হবে। রাতের ট্রেন একটি। যখন তার এল তখন ১৭ মাইল দূরে কাটারিয়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরা অসম্ভব। তাই তহশীলদার সুজন সিংকে নিয়ে রাতে সে বিপদসঙ্কুল পথে সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে পূর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওঁরা দুজন পাশাপাশি চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। মাথার উপর দেখা দিল কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ। উঁচু-নীচু পথ। চাঁদের আলোয় সাদা বালি ঝিকমিক করছে। দূরের বন-জঙ্গলদের শীর্ষদেশ একটানা সরলরেখায় চলে গেছে। নিস্তব্ধ নির্জন এই বনভূমিকে সত্যচরণের অন্য এক দেশ বলে মনে হয়েছে।

ওঁরা পথ হারালেন। কিছু খোঁজাখুঁজিতে পথও মিলল। অনেকক্ষণ ছুটে ঘোড়া দুটো হাঁপাচ্ছে। সুজন ও সত্যচরণের গায়ে ঘাম। আরো ঘণ্টা দুই চলার পর ওঁরা এলেন পূর্ণিয়া শহরে।

শব্দার্থ ও টীকা

ওঁরা কাজ শেষ করে তখনই ফিরলেন না রাতে চাঁদের আলোয় প্রকৃতির রূপ উপভোগ করার লোভে। রাতে ওঁরা রওনা দিলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.9

১। 'বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা'—দুজনের নাম কী? তাঁরা কোথায় যাচ্ছিলেন? অনধিক দুটি বাক্যে লিখুন।

২। ঘড়িতে রাত প্রায় চারটা। শেষরাতের অন্ধকারে ঘোড়ায় চেপে চলতে চলতে দুজনেরই ভয় হচ্ছিল কেন?—অনধিক দুটি বাক্যে লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.10

[লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত .... যোগাড় করিয়া আনিল]

বক্তব্যসার:

লবটুলিয়ার উত্তরপ্রান্তে একটা বড়ো হ্রদের মতো জলাশয় আছে। এখানে বড়ো জলাশয়কে বলে কুণ্ডী। আর এই হ্রদটির নাম সরস্বতী কুণ্ডী। এর তিন দিকে ঘিরে আছে বন। কুণ্ডীর নীল জল ; মাথার উপর নীল আকাশ। দূরে পাহাড়। আর অর্ধবৃত্তাকারে ঘেরা কোথাও ঘন আবার কোথাও হালকা বন। বনের শ্যামল রূপ সরস্বতীর জলে ছায়া ফেলে। সত্যচরণের মনকে এই পরিবেশ মুগ্ধ করেছে।

সত্যচরণ প্রায়ই এখানে আসতেন। কখনও এক শিলাখণ্ডে বসতেন ; কখনও আপন মনে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন আর বুনো ফল সংগ্রহ করতেন। অজস্র পাখির আবাস হল সরস্বতী তীরবর্তী গাছগুলো।

নাঢ়া বইহার এলাকায় প্রজাবাসীর জন্য জরিপ চলছে। সেখানে প্রায়ই যেতে হয় সত্যচরণকে। আর ফেরার সময় সরস্বতী কুণ্ডী ঘুরে যেতেন। অজানা ফুলের গন্ধ চারিদিকে মাতিয়ে তুলেছে। সেখানে কত রং বেরঙের পাখি—শ্যামা, শালিক, হরটিট, বনটিয়া, ফেজান্টক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো। সরস্বতীর নীলজলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখি প্রভৃতি জলচর পাখি। তাদের কানফাটা কূজনে চারিদিক মুখরিত।

সার্ভে-ক্যাম্প থেকে ফেরার সময় একদিন সত্যচরণ সরস্বতী তীরের বনপথ দিয়ে আসছিলেন। দেখেন একটি লোক মাটি খুঁড়ছে। তার সঙ্গে একটা চটের থলে। তার মধ্যে থেকে একটা কোদালের মাথা উঁকি দিচ্ছিল। পাশে পড়ে আছে একটা শাবল ; ছড়ানো আছে কতকগুলি কাগজের মোড়ক। নিজের পরিচয় দিয়ে সে জানাল তার নাম যুগলপ্রসাদ। লবটুলিয়ায় পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

সত্যচরণকে যুগলপ্রসাদ জানালো সে মাটিতে গাছের বীজ পুঁতছে। পূর্ণিয়ার এক সাহেবের বাগানের রাঙা রাঙা ফুলের এক বিলিতি লতা গাছের বীজ এখানে পুঁতছে। বনকে সে আরও সুন্দর ও রঙীন করে তুলবে। এর জন্যে সে পারিশ্রমিক পাবার আশা করে না। এমনকি এই কাজে বিনাস্বার্থে সে পয়সাও ব্যয় করেছে। এসব মানুষের জুড়ি নেই।

যুগলপ্রসাদ জানায় যে এ কাজ তার প্রথম নয়। লবটুলিয়ার যত ফুল ও ফুলের লতা আছে সেসব দশ-বারো বছর আগে পূর্ণিয়া থেকে ও দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের জঙ্গল থেকে এনে সে লাগিয়েছিল। এখন ওসব ফুলের জঙ্গল হয়ে গেছে। বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে নতুন ফুল ফোটানোই তার শখ।

যুগলপ্রসাদের বাড়ি ধরমপুরে। ছেলেবেলায় দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে কুশী নদীর ধারে সে মহিষ চরাতে যেত। মাঠের বুনো ভাণ্ডীর ফুলের রূপ তাকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই ফুলের বীজ নিয়ে সে লোকের বাড়ির পোড়ো জমিতে লাগিয়ে এই ফুলের জঙ্গল তৈরি করেছে। সেই থেকে এই কাজের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে।

সত্যচরণ ওর এই নিঃস্বার্থ গাছপালা-ফুলের প্রতি ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দুজনে মিলে তাঁরা সরস্বতীতে পদ্ম ফোটানো ও লবটুলিয়ার জঙ্গলে নতুন গাছপালা বসিয়ে সাজাবার শপথ নিলেন।

সত্যচরণ যুগলপ্রসাদকে একটা দশটাকা বেতনের মুহুরির কাজ জুটিয়ে দিলেন।

যুগলপ্রসাদ নানা জায়গা থেকে বীজ ইত্যাদি যোগাড় করত ও সেগুলি লবটুলিয়ার জঙ্গলে বসিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত।

মন্তব্য:

যুগলপ্রসাদের মতো এমন গাছপাগল খামখেয়ালি লোক এ যুগে বিরল। জঙ্গলে নতুন নতুন গাছ বসিয়ে জঙ্গল বাঁচানোর আকাঙ্খা তাঁর সহজাত।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.10

১। **একটি বাক্যে লিখুন ঃ**

(ক) সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখির সংখ্যা অত্যন্ত বেশি কেন?

(খ) 'সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ-বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব।'—এখানে 'সে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

২। 'লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যেখানে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা।'—লোকটি সম্পর্কে যা

শব্দার্থ ও টীকা

জেনেছেন পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.11

[পনের দিন এখানে .... কথা খুঁজিয়া পাই না]

বক্তব্যসার:

পনের দিন সত্যচরণ বাধ্য হয়েই বুনোজীবন যাপন করেছেন। বন-ধুঁধুলির তরকারি, কাঁকরোল তথা মিষ্টি আলু এনে তাই ভাজা বা সিদ্ধ—এসব খেয়েই তিনি কাটালেন।

ফুলকিয়া বইহারে হাড়ভাঙা শীত। কাজকর্ম সেরে সত্যচরণ সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলেন। জঙ্গলের ধারে কিছু লোকের চিৎকারে তাঁর ঘুম ভাঙল। এমন সময় একজন এসে জানাল ঝুপড়ি থেকে বাঘে একটা ছোটো ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে।

জঙ্গলের ধারেই একজন গঙ্গোতা প্রজার ঝুপড়ি। এক মা তার ছ-মাসের বাচ্চা নিয়ে ছিল—ঝুপড়ির মধ্যেই আগুন জ্বালা। ধোঁয়া বেরোবার জন্যে ঝাঁপটায় একটু ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়েই বাঘটা এসে শিশুটিকে নিয়ে চলে গিয়েছে।

অনেক বকাবকির পর জন দশেক লোক মশাল হাতে টিন পেটাতে পেটাতে জঙ্গলে ঢুকল। কিন্তু কোনো খোঁজই মিলল না।

পরের দিন বেলা দশটায় মাইল দুই দূরে বড় আসান গাছের তলায় রক্তাক্ত দেহাবশেষটা পাওয়া গেল।

সদর কাছারির অভিজ্ঞ শিকারি বাঁকে সিং জমাদারকে জানালে সে বলল যে মানুষ খেকো বাঘ খুবই ধূর্ত হয়। অন্যেরাও আক্রান্ত হতে পারে।

ঠিক তিনদিন পরে এক রাখালকে বাঘে নিয়ে গেল। তারপর থেকে লোকে ঘুম বন্ধ করে টিন পেটাত, কাশের ডাঁটা জ্বালিয়ে আগুন জ্বালাত। সত্যচরণ ও বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেন। তারমধ্যেই একদিন বুনো মোষ এসে বনের ফসল নষ্ট করল।

এখানকার লোক খোলা আকাশের নীচে কাশের ঝুপড়ির মধ্যে দিন কাটায়, তা ভেবে সত্যচরণ অবাক হয়েছিলেন।

সত্যচরণের ঘরের দু-তিনশ হাত দূরে দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে আগত কাটুনি মজুররা ঝুপড়িতে ছিল।

কৌতূহলবশত সত্যচরণ তাদের মধ্যে গেলে ওদের মধ্যে বৃদ্ধ মানুষটি সেলাম জানিয়ে আগুন পোহাবার অনুরোধ জানাল। শীতকালে আগুন পোহানো অনুরোধ করাই ওখানকার রীতি।

সত্যচরণ কৌতূহলে ঝুপড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখেন তাদের মেঝেতে শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই নেই। বিছানা-আসবাবপত্র কিছুই নেই। কাঁসার জামবাটিটা একমাত্র বাসন। পরনের কাপড় ছাড়া আর কারও কোনো কাপড় নেই ; রাতে গায়ে দেবার লেপ কাঁথা নেই। সম্বল শুধু কলাইয়ের ঢাল করা ভূষি। ওদের মধ্যেই বাচ্চারা ঢুকে থাকে আর বড়রা ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে থাকে। ভাত বা রুটি জোটে না। মকাই সেদ্ধ বা ঘাটো নুন আর শাক দিয়ে খায়। সত্যচরণের ভারত দর্শন হল।

ওদের কাছ থেকে সত্যচরণ জানলেন ওরা দেশে দেশে ঘুরে ফসল কেটে বেড়ায়।

এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে, বাঘের মুখে সন্তানকে দিয়ে, চরম ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নীচে ঝুপড়িতে বসবাস করে এরা সব কিছু সহ্য করছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন এরা ভীত-সন্ত্রস্ত নয় ; এটাই ওদের স্বাভাবিক জীবন। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, সবই ওদের জীবনের অঙ্গ।

সেই রাতে ওই মেয়েটি সত্যচরণকে অখিলকুচা পাহাড়ের নীচে বুনো হাতির কথা জানায় ও বলে ওসব ওদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ফুলকিয়ার তহশীলদারের পরামর্শমতো সত্যচরণ ওদের ওপর জমিদারের খাজনা ধার্য করেন। সত্যচরণের নজরে এল মাড়োয়ারী মহাজনরা ওজনে নিরীহ প্রজাদের ঠকাচ্ছে। তখন তিনি পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের ব্যবসায়ীদের সমস্ত কাঁটা ও দাঁড়ি পরীক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। কিছু ক্ষেত্রে ঠকানোর প্রমাণ হওয়ায় ওদের মহাল থেকে বার করে দেওয়া হল।

ওখানে নগদ পয়সার কারবার বিশেষ ছিল না। ফিরিওয়ালাদের জিনিসের দাম ওরা সরষে দিয়ে মেটাত এবং ব্যবসায়ীরা নিরীহ মানুষদের কাছ থেকে দামের থেকে বেশি পরিমাণ তা আদায় করত।

শোনা গেল দশরথ নামে একজন ননীচোর নাটুয়া সেজে প্রজাদের কাছ থেকে বিস্তর পয়সা আদায় করেছে। অথচ খাজনা না দিয়েই চলে যাচ্ছে। সিপাইদের হাঁকে সে দৌড়তে শুরু করল। শেষে সে দেখাল তার কাছে মাত্র তের আনা পয়সা আছে। সে খাজনার বদলে নাচ দেখাতে রাজি হল। আর তার মুখে রং মেখে মাথায় ময়ূরপাখা গুঁজে বালকের ভঙ্গিতে হেলে দুলে নাচতে নাচতে গান গাইল। সকলে কৌতুকের সঙ্গে তা উপভোগ করল। নাচশেষে হাততালি দিয়ে সত্যচরণ তার প্রশংসা করলেন।

দিন দশ-বারোর মধ্যে সব ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়তি লোক যে যার জায়গায় চলে গেল।

মন্তব্য:

এখানে পয়সার চলন সব জায়গায় নেই। দরিদ্র মানুষেরা বিনিময় প্রথায় মাল দেওয়া নেওয়া করে। একঘেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে বাঁচতে চাই হাসি আর আনন্দ। অন্য কোনো মাধ্যম না থাকায় সেখানে সরল মানুষের উপযোগী নাচ-গান পরিবেশিত হত। মানুষ অন্তর দিয়ে তা উপভোগ করত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 32.11

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। (ক) নক্‌ছেদী ভকতের বাড়ির ছেলেমেয়েরা শীতের রাতে শীত নিবারণ করে কীভাবে? —দুটি বাক্যে লিখুন।

(খ) তাদের খাদ্য কী? অনধিক দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন।

২। মঞ্চী ও নক্‌ছেদী ভকতদের জীবনযাত্রা অনধিক পাঁচটি বাক্যে বর্ণনা করুন।

৩। 'ননীচোর নাটুয়া'র আসল নাম কী? তার বাড়ি কোন্ জেলায়? দুটি বাক্যে লিখুন।

৪। 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ দেখে হাসি পাবার কারণ অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.12

[একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় .... চলিয়া গেলে দুঃখিত হইলাম]

বক্তব্যসার:

একদিন সত্যচরণ বেড়িয়ে ফেরার পথে নক্‌ছেদী ভকতের খুপরিতে গেলেন। নক্‌ছেদী সেলাম জানিয়ে মঞ্চীকে বসার জায়গা দিতে বলল। মঞ্চী কাশের ডাঁটায় বোনা একটা চেটাই পেতে দিল।

সত্যচরণ মঞ্চীকে কোথায় চলে যাচ্ছে জিজ্ঞাসা করায় সে পূর্ণিয়া কিষাণগঞ্জ অঞ্চলে যাবে বলে তা জানাল। ইতিমধ্যে মঞ্চী বালিকার স্বভাবে তার দেখা সবই মজার জিনিসের বর্ণনা দিতে লাগল।

বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এই মঞ্চী। একথা শুনে সত্যচরণ অবাক হন। মঞ্চী তাঁকে এই শীতে ঘাস জ্বেলে আগুন করে দিল একটু তাপ পেতে।

বৃদ্ধার তরুণী স্ত্রী বলেই সে ৮/১০ মণ সর্ষে থেকে তিন মণ খরচ করে তার সব সখের জিনিস কিনেছে। নক্‌ছেদী বলে বোকা মেয়েমানুষ পেয়ে তাকে বিক্রেতারা ঠকিয়েছে। তখন মঞ্চী যে ঠকেনি তা প্রমাণের জন্য একে একে সব এনে সত্যচরণের সামনে সাজিয়ে রাখল।

সত্যচরণ বুঝলেন সরলা বন্য মেয়েটি জিনিসের দাম জানেনা বলেই একে ঠকানো সহজ।

পরদিন সকালে নক্‌ছেদী তার দুই স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে নক্‌ছেদী ও মঞ্চী খাজনা দিতে এল। মঞ্চীর গলায় তার প্রিয় হিংলাজের মালা। ভাদ্রমাসে মকাই কাটতে সে এখানে আসবে, সঙ্গে আনবে হর্তুকির আচার।

সত্যচরণ দুঃখিত হলেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.12

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। মঞ্চী কে? অনধিক পাঁচটি বাক্যে তার ছেলেমানুষ প্রকৃতির পরিচয় দিন।

২। মেয়েদের প্রিয় জিনিসের তালিকা সবদেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক বলে সত্যচরণ মনে করলেন কেন?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। মঞ্চী চলে গেলে সত্যচরণ দুঃখিত হলেন কেন?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে এর কারণ প্রকাশ করুন।

অনুবিভাগ - 32.4.13

[এবার আমার একটা .... দাঁড়াইয়াছিল রাজবাড়ির দ্বারে।]

বক্তব্যসার:

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল কালেক্টরীর নিলামে ডাক হবে খবর পাওয়া গেল। সত্যচরণের কাছে ওই নিলাম ডেকে নেবার নির্দেশ এসেছে। কিন্তু জঙ্গলটা না দেখে নিলাম ডাকতে সত্যচরণ রাজি নয়।

পরের দিন সত্যচরণ রওনা দিলেন। তাঁর লোকজন বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর আগেই রওনা দিল। বনোয়ারীলালকে সঙ্গে নিয়ে সত্যচরণ চললেন। লোকজনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল কারো নদী পার হবার সময়।

ওখানেই দুপুরের রান্না হল। পুনরায় রওনা হতে একটা বেজে গেল।

এমন সময় দূরে শুক্‌নো কাঠ কুড়োতে গিয়ে একজন কুলি কী একটা নতুন জিনিস দেখে ভয় পেয়েছে। সে জানাল জায়গাটি ভালো নয় ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে তাঁবু না ফেললেই ভালো হত।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপের মধ্যে একটা স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই করা। সন্ধ্যায় দেখলে ভয় করে। জানা গেল এরকম খাম্বা রাজার রাজ্যের সীমানা নির্দেশক। এই রাজারা মোগলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা আর এক রাজা দোবরু পান্না। বয়স তাঁর অনেক, এখন তাঁর কিছুই নেই।

রাজার তিন ছেলে তাঁদের আবার আট-দশটি ছেলেমেয়ে। বৃহৎ পরিবার সব একত্রে থাকে। শিকার ও গোচারণই প্রধান উপজীবিকা। পাহাড়ী জাতিদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের বিচার করলে রাজা কিছু ভেট ও নজরানা পান। এই তাঁর আয়।

বর্শা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শিকার রাজা গ্রহণ করেন না। ভানুমতীর দেওয়া তেল মেখে কাছের

শব্দার্থ ও টীকা

ঝরণা থেকে অতিথিরা স্নান করলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু এবং দুধ ও মধু এনে দিল। জগরু কাঁচা শালপাতায় সজারুর মাংস রেখে দিল। সত্যচরণ উনুন ধরাতে না পারায় ভানুমতী পাখির শুকনো বাসা উনুনের মধ্যে পুরে দিয়ে উনুন জ্বেলে দিল। রাজা রান্না ঘরের দুয়ারে বসে থেকে আতিথ্যের যেন কোন ত্রুটি না ঘটে সেদিকে নজর রাখলেন।

রাজা তাঁর পূর্বপুরুষদের বাসস্থান দেখাতে পাহাড়ে উঠলেন, ওখানেই তাঁর বংশের সমাধি স্থান। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁকে সেখানে যেতে হয়।

ওপরে এক বড়ো গর্তের মুখ। ওই গর্তের মুখে কিছুক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে সত্যচরণরা ঢুকলেন। ভয়ানক অন্ধকারে চোখ অন্ধকার হলেও পরে অভ্যস্ত হয়ে যান। প্রকাণ্ড একটা গুহা। গুহার মধ্যে চামসে গন্ধ, বাদুড়ের আড্ডা। এছাড়া শোনা গেল শেয়াল, বনবিড়াল ইত্যাদি এখানে থাকে।

এটাই রাজার পূর্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ।

পাহাড়ের মাথায় এক বড়ো বটগাছ। জুতো খুলে সেখানে যেতে হল। চারিধারে শিলের মতো পাথর ছড়ানো। এটা রাজার বংশের সমাধিস্থান। এই সমাধিক্ষেত্র সত্যচরণের বুকে এক অজানা অনুভূতি জাগাল।

সামনের পাথরে এখন পায়রা ও মুরগি বলি হয়। রাজা জানালেন এটা টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

ফেরার সময় ভানুমতী একবাটি দুধ নিয়ে রাজবাড়ির দ্বারে দাঁড়িয়েছিল অতিথিদের বিদায় জানাতে।

মন্তব্য:

এই জনজাতিরা প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার আশীর্বাদটুকু দুহাত ভরে নিয়েছে। ফলে তারা অকারণে বা ব্যক্তিগত লোভ-লালসায় প্রকৃতিকে লুঠ করেনি। এমনকি তাদের নিজেদের ঐতিহ্যময় শিকার প্রথায় তারা বিজ্ঞান বা আধুনিক প্রযুক্তিকেও ব্যবহার করেনি।

আধুনিক সভ্যতায় ‘জোর যার মুলুক তার’ নীতিই চলে আসছে। ভালোবাসা- সহানুভূতির বড়ো অভাব এ যুগের সর্বত্র। কিন্তু আদিম এই জনজাতি মহিষদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়েছে ; মহিষদের দেবতা টাঁড়বারোকে দেবতা রূপে মেনে নিয়ে তাদের নিজেদের অন্তরের প্রসারতাকেই আমাদের দেখিয়েছে।

রাজা গাছতলার পাথরে বসে গোরু চরাচ্ছেন। এ দৃশ্য রাজ-ঐতিহ্যের সঙ্গে বেমানান। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়ে দেয় রাজা পরশ্রমজীবী নন। বৃদ্ধ হলেও নিজের শ্রমের ওপর বেঁচে থাকতে চান।

এখানকার রাজপ্রাসাদের সঙ্গে আড়ম্বর ও জাঁকজমকে অন্য রাজপ্রাসাদের তুলনা হয় না ঠিকই

কিন্তু আন্তরিকতায়, মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার যে প্রতিদিনের জীবনধারা চলে আসছে তার তুলনা নেই।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.13

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

১। খাম্বা কীসের চিহ্ন?

২। রাজার নাম কী?

৩। তাঁর বর্তমান অবস্থা কেমন?

৪। সত্যচরণ কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে যেতে চেয়েছিলেন কেন?

৫। **অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন:**

(ক) ভানুমতী দেখতে কেমন? তার পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিল?

(খ) রাজার চেহারার বর্ণনা দিন।

(গ) 'বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না'—সত্যচরণ বৃদ্ধের কথা অমান্য করতে পারলেন না কেন?

(ঘ) 'ভানুমতী রাজকন্যা বটে কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা।'—ভানুমতীর অমায়িকতার পরিচয় দিন।

৬। টাঁড়বারো কীসের দেবতা? তিনি কী করেন?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

অনুবিভাগ - 32.4.14

[সেদিন গ্র্যান্ট সাহেবের .... তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল]

বক্তব্যসার:

গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপার কাজের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন সত্যচরণ। এমন সময় অনেকদিন পরেই দেখতে পেলেন কুন্তাকে। তারপর কুন্তার এখনকার জীবনের কাহিনি শুনলেন আসরফির কাছে। এখন সে থাকে ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতার বাড়িতে। দু-তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে, ক্ষেত থেকে ফসল কুড়িয়ে কোনোমতে জীবনটা চালিয়ে নেয়।

সত্যচরণের মন বিচলিত হয়ে পড়ে। লবটুলিয়া ও নাঢ়াবইহারের জমি ইজারা নিচ্ছে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা ব্যক্তিরা। কিন্তু কুন্তার মতো নিঃস্ব হতভাগ্য জীবন যাদের—তারা কেন বঞ্চিত হবে। পয়সা

শব্দার্থ ও টীকা

নেই বলে?

আসরফিকে দিয়েই পরদিন কুন্তাকে ডেকে পাঠালেন সত্যচরণ। সত্যচরণের সঙ্কল্প কুন্তার অসহায় জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করতেই হবে।

বিনা সেলামিতে দশ বিঘে জমি তাকে দিলেন। এবার থেকে চাষ করবে কুন্তা। এজন্য প্রথম দু বছর তাকে খাজনা দিতে হবে না। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিলেই চলবে।

যে কুন্তা রাতে রাতে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়িয়ে বেড়ায়—আধ টুকরো কলাই গুঁড়োর ছাতু তার বাচ্চাদের খাওয়ায় আর নিজের সবদিন খাওয়া জোটে না—সেই কুন্তা সত্যচরণের কাছ থেকে দশ বিঘা জমি পেয়ে দিশাহারা হয়ে ওঠে ; বিহ্বলার মতো কেঁদে ফেলে।

মন্তব্য:

কুন্তা অভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, দুঃখ-দারিদ্রে ভেঙে পড়েনি। ভিক্ষে করে ছেলেমেয়ে নিয়েই বেঁচে থাকার লড়াই করে খুব অল্প পরিসরে লেখক কুন্তা চরিত্রকে এক আদর্শ নারী চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন। আর সত্যচরণ? সত্যচরণ নিজেই এ গ্রন্থের শেষে আমাদের জানিয়েছেন, ‘‘নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎ কাজ।’’

পাঠগত প্রশ্ন : 32.14

১। কুন্তা কে? তার ছেলেমেয়ে কজন? তার সংসার চলে কীভাবে—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

২। কুন্তার চরিত্র অনধিক পাঁচটি বাক্যে বর্ণনা করুন।

৩। ‘কুন্তা বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মতো কাঁদিয়া ফেলিল।’— সে হঠাৎ বিহ্বলার মতো কেঁদে ফেলল কেন?

অনুবিভাগ - 32.4.15

[এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় .... এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক]

বক্তব্যসার:

সন্ধ্যের পর বিড়িপাতার জঙ্গলের কাছারিতে পৌঁছলেন সত্যচরণ। এদিকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার এখান থেকে চলে যাবার সময়। তাই শেষ বারের মতো ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা সত্যচরণের প্রবল হল।

পরদিন সকালে পৌঁছলেন তিনি দোবরু পান্নার রাজধানী চকমকিটোলায়। সত্যচরণকে দেখে

ভানুমতী একেবারে আনন্দে আটখানা। প্রায়ই সে ভাবে সত্যচরণের কথা, এমনকি কালও ভেবেছে।

সত্যচরণও যেন ভানুমতীকে দেখছেন নতুন করে। সাঁওতাল মেয়ে সে। কিন্তু তার বেশভূষা, প্রসাধনের পারিপাট্য, সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ—সবকিছুতেই রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ।

বাড়ির সবাই এসে সত্যচরণকে নমস্কার জানাল। ভানুমতীর কাকা, জগরু যার নাম—নবীন যুবক সে। রাজপুত্রের মতোই দেখতে। সত্যচরণ তাকে পছন্দ করেন। এদের আতিথেয়তার এতটুকু ঘাটতি নেই। ভানুমতী তেল এনে দিল—জগরু আন্তরিকভাবেই জানতে চাইল কী খাবেন তিনি—সজারু, হরিয়াল না বন-মোরগ।

খাওয়া দাওয়া শেষে একটু বিশ্রামের পরই ভানুমতীর প্রস্তাব বেড়াতে যাবার। পাহাড়ের পথে চলতে চলতে চারপাশের অজস্র ছাতিম ফুলের সুগন্ধে তাদের মনপ্রাণ যখন ভরে উঠেছে, তখনই সত্যচরণের মনে হল : জীবনটা তার ধন্য। ভানুমতী তো রাজকুমারী বটেই—কিন্তু না তার থেকেও অতিরিক্ত কিছু সে। সত্যচরণ যেন চলেছেন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মূর্তিমতী এক বনদেবীর সঙ্গে। চারপাশে কী সুন্দর ফুলের গন্ধ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, দেখবার জন্য সত্যচরণ একটু বসতে চাইলেন। খানিক পরে দোবরু পান্নার সমাধিতেও ফুল দিয়ে এল তারা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাতাসে ভাসছে তখন শিউলি ফুলের গন্ধ।

মন্তব্য:

প্রকৃতি প্রেমিক সত্যচরণ প্রকৃতির রূপেই যে মুগ্ধ—তা নয়। মানুষের প্রতিও তাঁর ভালোবাসার কথা, সহৃদয়তার কথা লেখক প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে। এবং বিস্তৃতভাবেই সেসব কথা লিখেছেন লেখক।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.15

অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন ঃ

১। সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে ভানুমতীর তুলনা হয় না কেন?

২। ভানুমতীর ছোটোকাকা জগরুকে সত্যচরণ অত্যন্ত পছন্দ করেন কেন?

অনুবিভাগ - 32.4.16

[রাত্রে বসিয়া জগরু .... আর খবর রাখি না]

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

জগরু পান্নাদের সাংসারিক অবস্থা ভালো নয়। মহাজনের দেনা এখনও শোধ হয়নি, ধার করে কিনতে হয়েছে দুটো মোষ। তারা ঘি বিক্রি করত যে মহাজনের কাছে—তিন-চার মাস ধরে সে না আসাতে ঘি বিক্রিও বন্ধ হয়ে গেছে।

চা খাবার পর বাড়ির অন্যান্যরা ওখান থেকে চলে গেলেও ভানুমতী সত্যচরণের সঙ্গে কথা বলেই চলল। সামান্য অনুযোগের সুরে অনেকদিন পরে আসার কথাও উল্লেখ করল। কাল তার ফেরা হবে না। ঝাটি ঝরনার কাছে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। চমৎকার জায়গা সেটা। জঙ্গল ভয়ানক। বুনো হাতি, বনময়ূর দেখা যাবে। পৃথিবীর ভেতর সবচেয়ে সুন্দর জায়গায় সত্যচরণকে নিয়ে যাবার কথা বলে সে।

রাজা দোবরু পান্নার নামে ছ-সাত মাস আগে যে একটা চিঠি এসেছিল—বাড়ির কেউ পড়তে জানে না বলে এতদিন পড়া হয়নি—এখন সত্যচরণকে দিয়ে সেটা পড়িয়ে নিল। পাটনা থেকে এক মহাজনের লেখা সে চিঠিটি। দোবরু পান্নার কাছে জানতে চেয়েছে এখানে বিড়ি পাতার জঙ্গল আছে কিনা, থাকলে কী দরে ইজারা বিক্রি হয়।

ভানুমতীদের বাড়িতে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। সবাই সেদিন যুগলপ্রসাদের রান্না করা খাবারই খেল।

পরদিন কিন্তু সত্যচরণদের ওখান থেকে আসা হল না। ভানুমতী হঠাৎ-ই এসে সত্যচরণের হাত ধরে কাতরভাবে অনুরোধ জানায়—'আজ যেতে দেব না বাবুজী।'

সত্যচরণ ভানুমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। এক অব্যক্ত ব্যথায় বুকটা তার টনটন করে উঠল।

. . . .

তারপর ছায়া নিবিড় পথ দিয়ে চলতে চলতে সত্যচরণ কল্পনায় দেখল ভানুমতীর যুবতী মূর্তি যে সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার প্রণয়ীর আগমনের অপেক্ষায়। হয়তো সে পাহাড়ের ওপারের বনে শিকারে গেছে—এই এলো বলে।

সত্যচরণ তখন মনে মনে ওই তরুণীকে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানায়।

মন্তব্য:

উপন্যাসের এই শেষ অংশে সত্যচরণের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে একটা তীব্র বেদনা। সে বেদনা কেবল লবটুলিয়া থেকে শেষবারের মতো চলে যাবার জন্যই নয়। সে বেদনার কথা স্পষ্ট

হয়েছে—‘এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।’ সত্যচরণের এহেন স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ভানুমতীর কাছ থেকে পাওয়া না গেলেও তার মনের একান্ত গোপন সুরটি কিন্তু পাঠকের বুকে না বেজে পারে না।

পাঠগত প্রশ্ন : 32.16

১। জগরু পান্নাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা কেমন?—অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

২। আনন্দ ছাড়া জীবনের উন্নতি অর্থহীন কেন? অনধিক তিনটি বাক্যে লিখুন।

৩। লবটুলিয়া থেকে বিদায় মুহূর্তে সত্যচরণের বুকে এক অব্যক্ত ব্যথা জেগে ছিল কেন?— অনধিক পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

32.5 আপনি যা শিখলেন

1. প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে ও ভালোবাসতে।
2. মানবদরদী হতে।
3. জন্তু-জানোয়ারের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে।
4. দেশ ও জাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে।

32.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

১। প্রকৃতি অথবা মানুষ—এই উপন্যাসে লেখক কাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন দশটি বাক্যে লিখুন।

২। যুগলপ্রসাদের চরিত্রের কোন্ দিকটি আপনাকে বেশি আকৃষ্ট করে পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। অরণ্যের প্রকৃত অধিকারী কারা— জনজাতিদের রাজবাড়িতে প্রবেশ করে লেখকের একথা কেন মনে হয়েছিল?

৪। রাজু পাঁড়ে সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য বুঝিয়ে দিন।

32.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

32.1

১। ক — আ খ — অ গ — ই

২। ক) বেকার, মেসে টাকা বাকি

খ) উমেদারি করতে চায় না

32.2

১। ক — অ খ — ই গ — ই

২। প্রকৃতি ও জমির রূপ বদল

৩। বন্ধু সতীশের বদান্যতায়

32.3

১। মুহুরি

২। বর্ধমান

৩। গোষ্ঠবাবু

৪। নির্জনতা, ভাষা না জানা, বই পড়া

32.4

১। ক) প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙ, খ) ছ-আনা

২। সব জায়গায় নেওয়া, ভাত রাঁধা, ভাত খাওয়া, জিনিসপত্র রাখা

৩। নিঃসঙ্গ জীবন

৪। খুবই গরিব

32.5

১। ঢোল বাজিয়ে নাচগান করে

২। চিঠি লিখেছেন—রাত একটা

৩। পরীদের বিচরণ ভূমিতে

32.6

১। সাপ ও মোষের একসঙ্গে জল খাওয়া

২। ঘোড়াকে জল খাওয়াতে

৩। বুনো মোষ দেখা

৪। পিপাসার্ত নীল গাই ও হায়নার একসঙ্গে জলপান—মাঝখানে নীল গাই-এর অসহায় ছোটো বাচ্চা।

32.7

১। বই পড়ছিলেন

২। মোষ, চিতাবাঘ, নীলগাই

৩। ভয়ঙ্কর গরম এবং তীব্র পিপাসায়

৪। জঙ্গল ভেঙে ছুটছে

৫। দশ-পনেরো জনের চেষ্টা—গাছের কাঁচা ডাল আর বালি

32.8

১। ক — (৩) খ — (১) গ — (২)

২। খ, গ, ঘ

৩। বিষয় সম্পত্তির প্রতি নিস্পৃহতা

৪। ভক্ত, কবি, দার্শনিক, সেবক

32.9

১। সত্যচরণ ও সুজন সিং—পূর্ণিয়া

২। বুনো হাতির আশঙ্কায়

32.10

১। ক) বন্য ফলের লোভ, বাসা বাঁধার অনুকূল জায়গা, খ) এক হরিণ শিশুর

২। উদাসীন। খুবই গরিব। সৌন্দর্য্যের পূজারি। বনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা।

32.11

১। ক) কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে, খ) মকাই-সেদ্ধ নুন ও শাক

২। সারা বছর বিভিন্ন দেশে ঘুরে ফসল কাটে—যে সময়ের যে ফসল

৩। দশরথ, মুঙ্গের জেলায়

৪। বুড়ো বয়সে বালকের ভঙ্গিতে রং মেখে ময়ূরপাখা মাথায় দিয়ে হেলেদুলে নাচগান

32.12

১। নক্‌ছেদী ভকতের স্ত্রী। নাচ—তামাশায় আমোদ। জিনিস কিনতে খুশি—ঠকবে—তবু গর্ব, হাসি।

সত্যচরণকে আচার তৈরি করে খাওয়াতে চায়।

২। লেখকের বোনের পছন্দের জিনিস—মঞ্জির পছন্দও এক। মাথার কাঁটা, লাল ফিতে প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ।

৩। সহজ সরল মেয়ে—হাসিতে খুশিতে প্রাণ চঞ্চল

32.13

১। সীমানার নিশানা

২। দোবরু পান্না বীরবর্দী

৩। রাজ্য নেই এখন। বৃদ্ধ, খুব গরিব।

৪। যার যা প্রাপ্য সম্মান তা না দিলে কর্তব্যের হানি হয়। রাজার সঙ্গে দেখা করতে হলে কিছু নজর নিয়ে যাওয়া উচিত।

৫। ক) স্বাস্থ্যবতী, মুখশ্রী লাবণ্যময়। খাটো কাপড় পরনে।

খ) দীর্ঘ। যৌবনে সুপুরুষ। মুখে বুদ্ধির ছাপ।

গ) ওখানে সেদিন থেকে খাওয়া-দাওয়া করার কথা অনুরোধটি আদেশের সামিল বলে।

ঘ) পাখির বাসা দিয়ে আগুন জ্বালালো।

৬। বুনো মোষের দেবতা। মোষের বংশ রক্ষা করেন।

32.14

১। কাশীর বাঈজীর মেয়ে। দু-তিনটি। ভিক্ষে করে, ফসল কুড়োয়, কলাই, গম কাটে।

২। আদর্শ নারী চরিত্র। অভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।

৩। সত্যচরণের সদয় হয়ে দশ বিঘা জমি দান। প্রথম দু বছর খাজনা মকুব

32.15

১। ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

৩। রাজপুতের মতো চেহারা, রূপ আছে অভিজাত বংশ বলে মনে হয়

32.16

১। মহাজনের কাছে ঘি বিক্রি বন্ধ। চরম আর্থিক সংকট।

২। জীবন একঘেয়ে, এক-রঙা অর্থহীন হয় বলে।

৩। অরণ্যপ্রান্তর নষ্ট হওয়া—কুন্তা, ভানুমতী, রাখালবাবুর স্ত্রী, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী প্রভৃতিদের কথা ভেবে।

32.8 লেখক পরিচিতি

কাঁচরাপাড়ার মুরাতিপুরগ্রামে মামারবাড়িতে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার বিভূতিভূষণের জন্ম হয়। পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়ের নাম মৃণালিনী। মহানন্দ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, সংস্কৃতে তাঁর প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য ছিল।

নৈহাটির অপর পারে সাগঞ্জ-কেওটার প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিভূতিভূষণের প্রথম বিদ্যারম্ভ। এখানের পাঠ শেষ করে তিনি ১৯০৮ সালে বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস করেন। বি.এ. পড়তে পড়তে শ্রীমতী গৌরীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পাঠ চলাকালেই গৌরীদেবীর মৃত্যু হয়।

লেখক ১৯১৯ সালে জাঙ্গীপাড়া মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২০ সালে কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় আসেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুপারিশে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের চেষ্টায় হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা পান। ১৯২২ সালে কাজে ইস্তফা দিয়ে আবার কলকাতায় আসেন। ১৯২৪ সালে লেখককে ভাগলপুরে পাথুরিয়াঘাটার জমিদারি এস্টেটে সহকারী ম্যানেজার করে পাঠানো হয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত একটানা সেখানে কাজ করেন। 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের প্রেরণা তাঁর এই ভাগলপুরে থেকেই আসে। 'আরণ্যক'-এর পটভূমিও এই ভাগলপুরের জঙ্গল এলাকার নির্জনতা। সেখানকার স্থানিক সৌন্দর্য ও সরল মানুষের জীবনযাত্রা এই বইতে সাহিত্যরূপ পেয়েছে।

১৯৪০ সালে বিভূতিভূষণ রমাদেবীকে বিবাহ করেন। ১৯৪১ সালে খেলাত ঘোষ ইনস্টিউশন ছেড়ে তিনি পাকাপাকিভাবে স্বগ্রাম বারাকপুরে গিয়ে বসবাস করেন। তিনি ঘাটশিলাতেও একটি বাড়ি কিনেছিলেন এবং বছরে কয়েক মাস সেখানেও থাকতেন।

১৯৫০ সালে ১লা নভেম্বর ঘাটশিলাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিভূতিভূষণ ১৯৫০ সালে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

এই লেখকের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপিনের সংসার', 'দুই বাড়ি', 'অনুবর্তন', 'দেবযান' ইত্যাদি লেখাগুলি উল্লেখযোগ্য।

32.9 সমধর্মী রচনার উল্লেখ

(১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা **'পথের পাঁচালি'**, (২) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের **'পালামৌ'**।

ঐচ্ছিক

33. ক পর্যটন

34. ক পর্যটন : সংগঠন ও পরিকাঠামো

35. ক পর্যটন : সম্ভাবনা-সমস্যা-সমাধানের পথ

শব্দার্থ ও টীকা

33 ক

পর্যটন

সংজ্ঞা ও স্বরূপ, উৎস, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ

33.1 প্রস্তাবনা

প্রকৃতির বৈচিত্র্য সীমাহীন। প্রকৃতিকে উপভোগ করার আন্তরিক ইচ্ছা মানুষের আজন্ম। সে কারণেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই অভিযাত্রীদল, আবিষ্কারকগণ, পথিককুল সব রকম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে পথে বেরিয়েছে। নতুন নতুন জায়গা দেখার ইচ্ছা জাগে, জাগে সেখানকার সৌন্দর্যদর্শনের বাসনা। প্রথম সমুদ্র দেখে 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার বলে উঠেছিল: 'আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।'

কালক্রমে এই ইচ্ছাই জন্ম দিয়েছে একটি আধুনিক শিল্পের— নাম পর্যটন। পর্যটন শিল্পের কাজই হচ্ছে নতুন নতুন দেখার জায়গা খুঁজে বার করা, পর্যটক ও সেই জায়গার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা। প্রাকৃতিক দৃশ্য, জল-হাওয়া, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি পর্যটন উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই পাঠে আমরা আলোচনা করব পর্যটনের ধারণা, পর্যটনের প্রকার, পর্যটনের বিভিন্ন উৎস। পর্যটনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং আধুনিক পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও এখানে থাকবে।

33.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি করতে পারবেন —

- পর্যটনের সংজ্ঞা ও ভ্রমণের রূপান্তর ব্যাখ্যা;
- বিভিন্ন প্রকার পর্যটন ও পর্যটনের উদ্দেশ্য আলোচনা;
- ভারতের পর্যটন-উৎসের বৈচিত্র্য ও সম্পদ ব্যাখ্যা;
- পর্যটনের উন্নতির মাধ্যমে একটি অঞ্চলের উন্নয়ন বিশ্লেষণ;
- আকর্ষণের বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন পর্যটন-স্থানের শ্রেণিবিভাগ।

শব্দার্থ ও টীকা

33.3 পর্যটনের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

'পর্যটন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিকল্পিত ভ্রমণ। পর্যটন— পরি (পরিকল্পিত) + অটন (ভ্রমণ)।

Tourism Society of England-এর সংজ্ঞা অনুসারে পর্যটন বা 'Tourism is the temporary, short-term movement of people to destination outside the places where they normally live and work and their activities during the stay at each destination. It includes movements for all purposes.' অর্থাৎ পর্যটন হচ্ছে নিজের বাসস্থানের ও কর্মসংস্থানের বাইরে স্বল্পমেয়াদি ও অস্থায়ী ভ্রমণ।

World Tourism Organisation থেকে পর্যটকদের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে পর্যটনের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐ সংজ্ঞা অনুসারে পর্যটনকারী তারাই যারা 'Who travel to and stay in places outside their usual environment for more than twenty four (24) hours and not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited.' এই সংজ্ঞা অনুসারে উদাহরণ দিলে পর্যটনের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হবে। যেমন, দিঘা পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র। কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি রোজ চাকরি করতে খড়্গপুর থেকে দিঘায় যায়, তবে তার দিঘা ভ্রমণকে পর্যটন বলা যাবে না। কারণ সেটি তার জীবিকার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে জড়িত। কিন্তু সে যদি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে সপরিবারে বা সবান্ধবে দিঘায় বেড়াতে যায় তবে সেই ভ্রমণ হবে পর্যটন। কারণ এতে আছে অবকাশ যাপনের বিস্তৃত পরিকল্পনা। গাড়ি ভাড়া করা, হোটেল বুক করা সেই পরিকল্পনার অঙ্গ। এই জন্যই পর্যটন হচ্ছে পরিকল্পিত স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণ।

প্রাচীনকালের ভ্রমণ থেকে আধুনিক কালের পর্যটন:

ভ্রমণ— মানুষের ইতিহাসে সেকাল থেকে একাল অবধি সময়ের একটি আশ্চর্য আকর্ষণ। প্রাচীন মুনি-ঋষিরা ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ে, সাগর তীরে, হ্রদের পারে, অরণ্যে ধ্যানমগ্ন হয়েছেন পরমার্থের সাধনায়। ভারতের সব ধর্মের সাধক তীর্থদর্শনকে পুণ্যকর্ম বিবেচনা করেছেন। পর্যটনের এ এক উল্লেখযোগ্য দিক।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াও শুধু নতুন দেশ দেখার উদ্দেশ্যে পর্যটন শুরু হয় উনিশ শতকের গোড়া থেকে। তখন আধুনিক পর্যটনের কোনো সুব্যবস্থাই ছিল না। সুনির্ধারিত কোনো পথ-মানচিত্রও ছিল না। 19শ শতকে কয়েকজন অভিযাত্রী গেছেন তিব্বতে ও সন্নিহিত স্থানে। গিয়েছেন প্রায় আন্দাজে পথ খুঁজে খুঁজে।

কলকাতা থেকে প্রায় 600 কিলোমিটার দূরে এই অঞ্চলের শহর, পর্বত, নদী, স্থলপথ, গিরিপথ— কোনো কিছুই ব্রিটিশ সার্ভে অফিসারদের জানা ছিল না। বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে সিং ভ্রাতারা (নইন সিং, মণি সিংহ, কিসান সিং) গোপনে তিব্বতের ওই অঞ্চলের কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিসান সিং 1870 সালে গোবি মরুভূমি পৌঁছোন। চার বছর পর এই দুঃসাহসী পর্যটক দার্জিলিং ফিরে আসেন।

পাঠগত প্রশ্ন 33.1

1) বন্ধনী থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।

i) পর্যটন হচ্ছে নিজের বাসস্থান ও কর্মস্থানের বাইরে .... ভ্রমণ। (অস্থায়ীভাবে/ স্থায়ীভাবে থাকার জন্য)

ii) পর্যটনের অর্থ .... ভ্রমণ। (পরিকল্পিত/অপরিকল্পিত)

শব্দার্থ ও টীকা

iii) ভ্রমণকে পর্যটনের মর্যাদা পেতে হলে তার সময়সীমা হতে হবে কমপক্ষে .... ঘন্টার বেশি এবং বেশির পক্ষে .... বছর। (48/24/10/5/3/1)

2) দুদিকের অংশ ঠিকমতো যোগ করুন—

ক	খ
i) প্রাচীন পর্যটনের বৈশিষ্ট্য ছিল	ক) উনিশ শতকের গোড়ায়।
ii) ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়া নতুন দেশ দেখার উদ্দেশ্যে পর্যটন শুরু হয়।	খ) 1870 সালে।
iii) কিসান সিং গোবি মরুভূমিতে পৌঁছান।	গ) বিশ্রাম, পুণ্য ও জ্ঞান লাভের জন্য নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ঘুরে বেড়ানো।

33.4 পর্যটনের উৎস

নানাবিধ কারণে এক এক এলাকায় এক এক ধরণের পর্যটনশিল্প গড়ে ওঠে। এই কারণগুলিকেই পর্যটনের উৎস বলে গণ্য করা যায়। এই সব কারণের মধ্যে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণ প্রধান।

33.4.1 প্রাকৃতিক উৎস

ভারতের জলহাওয়া এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। তার কারণ (1) বিশাল আয়তন, (2) চওড়া থেকে সরু আকার, (3) অক্ষরেখার বিভিন্নতা, (4) সমুদ্রের বিন্যাস, (5) হিমালয়ের অবস্থান।

এই উপমহাদেশের উত্তরের ও দক্ষিণের জলহাওয়া এক নয়। উপকূল এলাকা ও তার ভিতরের জলহাওয়ার অবস্থা আলাদা। উত্তর ভারত ও তুষারময় হিমালয়— দুইয়ের আবহাওয়ায় তফাত। আবহাওয়ার এই বিভিন্নতা পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। আবহাওয়ার বৈচিত্র্য যত বেশি হয় পর্যটনের উন্নয়নও তত বাড়ে।

জানুয়ারিতে সিমলা, শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে 3^0-7^0 সে: হয়ে যায়। এতে কয়েকমাস ধরে জমা বরফ— স্কি-র মতো শীতক্রীড়ার সুযোগ তৈরি করে। গরমেও এসব জায়গায় কম গরম ইউরোপীয় পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ায়।

ঋতু অনুযায়ী তাপমাত্রার বাড়া-কমা, বরফ-পড়া, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মেঘের অবস্থান প্রভৃতি পর্যটন উন্নয়ন করার জন্য লক্ষ রাখা দরকার।

মূল বক্তব্য:

- জলহাওয়ার পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়ার বৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যটনের পক্ষে বিশেষ কার্যকর।
- শীতের কম তাপমাত্রা পাহাড়ি এলাকার এবং মৌসুমি তারতম্য ভারতের সব জায়গায় পর্যটনের আকর্ষণ বাড়ায়।
- 20^0-30^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাইরের কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং পর্যটকরা এই

শব্দার্থ ও টীকা

স্কেট Skate = পাহাড়ের গায়ে বরফের উপর চলার যন্ত্র।

সময়কে ভ্রমণের জন্য বেছে নেয়।

নিসর্গ সম্পদ:

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। পাথুরে পাহাড়ে ওঠা, ঢালু জায়গায় গ্লাইডিং, বরফ ঢাকা পাহাড়ের গায়ে স্কেটিং, গুহা প্রভৃতি নিসর্গ সম্পদ পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ। মসৃণ সমতলে সাইকেলে ঘোরা বা ছোটো খালে ও শাখা নদীতে নৌচালনা বিশেষ মনোযোগ টানে দর্শকদের। নদীতীর, গিরিসংকট, জলপ্রপাত, ঝরনা, উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতির আকর্ষণও কম নয়। ঘটনাচক্রে ভারতে এ সবই দ্রষ্টব্য। তাই ভারত দেখার আগ্রহ স্বদেশি বিদেশি সব পর্যটকদের।

অরণ্যপ্রকৃতি, বন্য প্রাণী, ন্যাশানাল পার্ক প্রভৃতি পর্যটনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মণিপুরের হরিণ, সুন্দরবনের কুমির প্রকল্প, কলকাতার বটানিক্যাল গার্ডেন, আসামের একশৃঙ্গী গণ্ডার, ডুয়ার্সের সাফারি পার্ক প্রভৃতির বিশেষ আকর্ষণ পর্যটনের। এশিয়ার সর্ববৃহৎ দূষণমুক্ত হ্রদ হল কোলেরু। এটি কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ।

সামুদ্রিক নিসর্গ:

বালুকা বেলা, ছোটো উপসাগর, তীর ঘেরা সমুদ্র, সাগরের পাথুরে তীর পর্যটকদের প্রিয়। ভারতে এসব পাওয়া যাবে গোয়ার উপকূল, কেরালার কোভালাম সমুদ্রতীর, কন্যাকুমারীর সাগর সঙ্গমে। পুরীর সমুদ্রতীর, লাক্ষা দ্বীপ, আন্দামানের প্রবাল প্রাচীর উচ্চমানের সামুদ্রিক আকর্ষণ।

অনেক নদীতীর ভেঙে যাচ্ছে। জোয়ারের জল বিপদসীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে। এগুলো ঠিক মতো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে উপকূল পর্যটন লাভজনক হবে। তীব্র স্রোতে সাঁতারুদের ভেসে যাবার ভয় থেকে রক্ষা করা দরকার। নৌকা বাইচ খেলার জন্যও নিরাপত্তা দরকার। বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা, জলে ডুব দেওয়া (dive) প্রভৃতির জন্য দূষণমুক্ত পরিষ্কার জল— পর্যটনের পক্ষে জরুরি।

ভারতে কয়েকটি সুরক্ষিত তীর আছে যা পর্যটকদের বাঞ্ছিত

জনাকীর্ণ স্থানের আশেপাশে স্থলপ্রকৃতি ও সামুদ্রিক প্রকৃতির উন্নতি ঘটালে পর্যটনের সম্পদ বাড়বে। কর্তৃপক্ষও একমত হয়েছেন পার্বত্য এলাকা, উপকূল এবং মরু অঞ্চলের উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে।

মূল বক্তব্য:

সমতল, বালুকা বেলা, সমুদ্রনিকটবর্তী প্রবালতীর, তীব্র স্রোত ও জলস্ফীতি থেকে মুক্ত এলাকা উপকূল পর্যটনের উন্নয়ন ঘটাবে।

33.4.2 ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক উৎস

এই জাতীয় সম্পদ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলো জড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে আছে মূর্তি, দেবমূর্তি, সমাধিস্থল, মিনার চূড়া, দুর্গ, প্রাসাদ, প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ এবং সাম্প্রতিককালে নির্মিত বাড়ি ঘর। এর অনেক স্থানের দৃশ্য তেমন আকৃষ্ট করে না হয়ত, কিন্তু এগুলোর সঙ্গে জড়িত আছে মহৎ ব্যক্তির জীবন ইতিহাস। দিল্লি তার নিদর্শন।

সবার উপরে আছে প্রদর্শন-শিল্প-নৃত্যনাট্য-সঙ্গীত, প্রথা, ঐতিহ্য, পোশাক, খাদ্য, ভাষা, সামাজিক আচার, ধর্মীয় আচার, উৎসব প্রভৃতি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। শিল্পনগর, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, নদী বাঁধ এবং আধুনিক

শব্দার্থ ও টীকা

স্থাপত্য প্রভৃতি গড়ে উঠেছে স্বাধীন ভারতে। এগুলো ভারতের ঐতিহ্যের অতিরিক্ত সংযোজন। এগুলো দেখার সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজগম্যতা প্রভৃতি পর্যটনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়।

এর থেকে অর্জিত আয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে।

মূল বক্তব্য:

- ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন স্মৃতিসৌধ বা আধুনিক নির্মাণ স্থাপত্য। এ-দেশ প্রদর্শন শিল্প ও জীবনশৈলীর জন্য বিখ্যাত। এসব ঐতিহ্য পর্যটনের সাংস্কৃতিক সম্পদ।
- দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যাবৃদ্ধি রাজস্ব অর্জন ও স্থানীয়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায়।

পাঠগত প্রশ্ন 33.2

1) ভারতবর্ষের প্রতি পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ কেন?

2) ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চলের নাম কী?

3) এশিয়ার সর্ববৃহৎ দূষণমুক্ত হ্রদের নাম কী

33.5 পর্যটনের গুরুত্ব

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে পর্যটনশিল্পের প্রসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পর্যটনের সঙ্গে যেসব পরিষেবা শিল্প যেমন, পরিবহন, হোটেল ও আতিথেয়তা, বিনোদন ইত্যাদি যুক্ত থাকায়, যে আর্থিক লেনদেন হয় তাতে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হয়, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও প্রসারিত হয়। কোনো কোনো দেশ তো মূলত পর্যটনকে ভিত্তি করেই বেঁচে আছে। যেমন, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, গ্রিস, থাইল্যান্ড এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো দেশ। আমাদের দেশেও জম্মু-কাশ্মীর, দার্জিলিং, সিকিমের অর্থনীতি মূলত পর্যটনের উপরই নির্ভরশীল।

তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পর্যটনের সম্পর্ক স্থাপনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। লন্ডনের Cox and Kings হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রথম পর্যটন কোম্পানি। এটি স্থাপিত হয় 1758 খ্রীষ্টাব্দে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর আর্থ সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে পর্যটনের বিশেষ উন্নতি ঘটে।

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু ধনী পরিবার ভ্রমণের সুযোগ পেত। 1945-এর পর থেকে এক বিরাট সংখ্যক পর্যটক আসে সমাজের সব শ্রেণি থেকে। তারা কম টাকায় কম সময়ে বেশি জায়গা ভ্রমণ করে। তার কারণ আধুনিক জীবনে দীর্ঘকালীন ছুটি কাটানোর সময় কমই পাওয়া যায়। তাই বিশ্রাম যাপন ও অভিযানমূলক ভ্রমণ দুটো একসঙ্গে করতে চায়। একাও যায় আবার দল বেঁধেও যায়। এভাবে ব্যক্তিগত স্তরে মানসিকতা, অবসর, শারীরিক ক্ষমতা, আয়, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত আয় ব্যয়কে ইচ্ছামত করার সুযোগ সব কিছু মিলে পর্যটনের প্রবণতা বাড়ে কমে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারে উন্নয়নশীল দেশ থেকে পর্যটনে অনেক এগিয়ে আছে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে। আবার থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস আরো অনেক এগিয়ে, কেননা তাদের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আরও বেশি।

পর্যটন কাছাকাছি দুই দেশকে ভৌগোলিকভাবে, ঐতিহাসিক ভাবে, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিকভাবে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ করে দিতে পারে। অনেক দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের প্রসার, প্রযুক্তির বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ফলে পর্যটনের উন্নয়নের গতিকে দ্রুততর করেছে।

পর্যটনের ক্ষেত্রে ইয়োরোপ বা উত্তর আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভারত এখনো অনেক পিছিয়ে। ভারতের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনের মাত্র 5.3 আসে পর্যটন থেকে। আন্তর্জাতিক পর্যটকের মাত্র 10 শতাংশ আসে ভারতে। তবে সংখ্যাটা ক্রমে বাড়ছে। এটাকে আরও বাড়াতে হলে চাই পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি।

ইতিবাচক দিকগুলি ছাড়া কিছু নেতিবাচক পরিস্থিতিও পর্যটন উন্নয়নের বাধা। যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা, নানারূপ জনবিক্ষোভ, আতঙ্কবাদীদের দ্বারা বিদেশি পর্যটকের অপহরণ পর্যটক-প্রবাহকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জম্মু-কাশ্মীর তার উদাহরণ। এমন কি দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধি, পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা পর্যটনের প্রসারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই দুই অবস্থার উপর নির্ভর করে পর্যটনের প্রসার। দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে পর্যটনকে কাজে লাগাতে হলে দেশে পর্যটন প্রসারের উপযোগী অনুকূল পরিস্থিতি বজায় রাখতে হবে।

মূল বক্তব্য:

- অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে শিল্প বিস্তারের ফলে এবং তাতেই সারা বিশ্বে পর্যটনের বাড়বৃদ্ধি ঘটে।
- আরও অবসর, আর্থিক সঙ্গতি, পর্যটন কেন্দ্রগুলোর প্রতি আরও মনোযোগ, দ্রুত পরিবহন এবং অন্যান্য অনুকূল পরিস্থিতি আধুনিক পর্যটনে বাণিজ্যিক উন্নতি নিয়ে এসেছে।
- নেতিবাচক দিকগুলি পর্যটক-স্রোতকে ব্যাহত করেছে।

পাঠগত প্রশ্ন 33.3

1) পর্যটন দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে উন্নতি ঘটায়। তিনটি কারণ লিখুন।

2) উন্নয়নের প্রসারের তিনটি বাধার কারণ উল্লেখ করুন।

33.6 পর্যটনের প্রকারভেদ

নানারকম বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্যটন শিল্পে পর্যটনের নানারকম প্রকারভেদ করা হয়। যেমন, পর্যটকের সঙ্গে পর্যটনস্থলের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে পর্যটন তিন রকম:

শব্দার্থ ও টীকা

(1) আভ্যন্তরীন পর্যটন (domestic tourism)— পর্যটক যখন নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই ভ্রমণ করে তখন সেই ভ্রমণ আভ্যন্তরীন পর্যটন,

(2) গৃহমুখী পর্যটন (inbound tourism) — ভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী কোনো প্রবাসী যখন সাময়িকভাবে নিজের দেশে ফিরে আসে তখন সেই পর্যটন হয় গৃহমুখী পর্যটন,

(3) বহির্গামী পর্যটন (Outbound tourism)— কোনো পর্যটক যখন নিজের দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে পর্যটন করে তখন সেই পর্যটন হয় বহির্গামী পর্যটন। আন্তর্জাতিক পর্যটন হচ্ছে এই বহির্গামী পর্যটন।

অন্যদিকে, ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানের বৈশিষ্ট্য, পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিবেচনা করে পর্যটনকে আরও কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

পর্যটনের শ্রেণিবিভাগ

- প্রকৃতি পর্যটন (Eco-Tourism)
  - পাহাড়
  - উপকূল
- ঐতিহ্য পর্যটন (Heritage Tourism)
  - ঐতিহাসিক স্থান
  - তীর্থস্থান
  - দুর্গ
  - পুরাকীর্তি
  - স্মৃতিসৌধ
  - দেবস্থান
  - উৎসব
  - যাদুঘর
  - প্রদর্শনশিল্প
- অভিযান পর্যটন (Adventure tourism)
- বন ও বন্যপ্রাণী পর্যটন (Wildlife Tourism)
  - ন্যাশনাল পার্ক
  - অভয়ারণ্য
  - বনাঞ্চল

33.6.1 পার্বত্য ও পাহাড়ি এলাকা

উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে নীলগিরি। কম উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিন্ধ্য, সাতপুরা, আরাবল্লি, পশ্চিমঘাট। 100টা পার্বত্য স্টেশনের মধ্যে 42টি ছড়িয়ে আছে কুমায়ুন থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত। 15টি সহ্যাদ্রি পর্বতমালায় আর 12টি আছে উত্তর-পূর্ব দিকে। বাকি 6টি ছড়ানো আছে পূর্বঘাট ও আরাবল্লি জুড়ে।

এর মধ্যে কিছু পার্বত্য এলাকা তুলনামূলকভাবে উন্নত ও খুবই জনপ্রিয়। বাকিগুলো অনুন্নত।

আমরা পার্বত্য এলাকাকে উচ্চতা অনুযায়ী 3টি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখাতে পারি—

ক) নীচু উচ্চতার এলাকা (800 - 1200 মি:)

খ) মাঝারি উচ্চতার এলাকা (1200 - 2100 মি:)

গ) অধিক উচ্চতার এলাকা (2100 - 3500 মি:)

<u>কম পরিচিত কয়েকটি এলাকা:</u>

হাফলং, উত্তর কাছাড় (1637 মি:), উত্তর ত্রিপুরার জামপুই (1390 মি:), মণিপুরের ইম্ফল, গুজরাটের চিকল দাড়া (100 মি:) প্রভৃতি।

পাহাড় চূড়া, যেমন সিমলা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, অথবা মুসৌরি প্রভৃতি থেকে বহুদূর অবধি উপত্যকা

এবং বরফ ঢাকা পর্বত দেখার অনুভূতি খুব মনোরম।

কয়েকটি শৈলাবাস আছে নৈনিতাল, উটি (উদগমণ্ডলম), কোডাই কানাল হ্রদের পাড়ে। পর্বত ঘেরা শ্রীনগর, কাশ্মীর, উটি থেকে পার্বত্য দৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য। হ্রদতীরবর্তী রাজস্থানের উদয়পুর হিমালয় অঞ্চলের বাইরে উল্লেখযোগ্য। মাউন্ট আবু, মোরনি, পাঁচমাড়ি, সাতপুরা, রাঁচি যেন উটের পিঠের মতো। এগুলির সবুজ উপত্যকা বা অরণ্য প্রকৃতি চমৎকার।

নদী এলাকায় মানালি বা পহেলগাঁও প্রভৃতির উচ্চতা ও উপত্যকা দুটোই উপভোগ্য। জব্বলপুরের কাছে ধুয়ান-ধার জলপ্রপাত, ঢালুতে পাঁচমাড়ি জলাশয় পাহাড় ও জলাশয়ের সমন্বয়।

শৈলাবাসের কাছে যদি বড়ো শহর থাকে তাহলে পর্যটনের কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যস্ত নগরবাসী সপ্তাহান্তে সেসব শৈলাবাসে ঘুরে আসতে পারে। লোক উৎসব, লোক হস্তশিল্পের প্রদর্শনী, দুর্লভ গাছপালা, লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান প্রভৃতি পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ জোগায়। আর আছে বিশেষ খাবারের আকর্ষণ। ত্রিপুরার আনারস যে খেয়েছে তার কাছে আর ভালো লাগবে না সিমলার আপেল।

অনেক শৈল অঞ্চলে তুষার দৃশ্য, সূর্য ওঠার ও ডোবার বিশেষ জায়গা, বন্যপ্রাণীর সংরক্ষিত এলাকা, মঠ মন্দির, গুহা, পর্বত গাত্রে ম্যুরাল চিত্র, পাহাড় কেটে মূর্তি প্রভৃতি দেখাবার ব্যবস্থা আছে।

33.6.2 উপকূল পর্যটন

7000 কি:মি: দীর্ঘ উপকূল কাণ্ডলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রসারিত। এছাড়া আছে দ্বীপগুলি। এসবই উপকূল পর্যটনে পর্যটকদের টানে। গোয়ার সুন্দর উপকূল, কেরালার কোভালাম পর্যটকদের বিশেষ প্রিয়। এখানে আসে অসংখ্য দেশি পর্যটকও।

কোভালাম কেবল সমুদ্রতীরের জন্য নয়, স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার প্রাচীন আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে গাত্র মর্দনের (body massage) জন্যও অনেকে আসে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যে পর্যটন তাকে বলে চিকিৎসা পর্যটন (Medical Tourism)। এখানকার বিভিন্ন জলক্রীড়াও লোভনীয়।

গোয়ার সাগরতীরের খ্যাতি তার বিস্তৃত বালুকা বেলার জন্য। এখানে রৌদ্রসেবনের জন্যও আসে অনেকে। গুজরাটে সৌরাষ্ট্র তীরের খ্যাতি তার সোনালি বালুর জন্য। জুনাগড়ের নবাব আমেদপুরে উপকূল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন রাজার অন্তঃপুরিকাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।

মুম্বাইয়ের জুহু তীর বেশ জনপ্রিয়। চেন্নাইয়ের গর্ব তার আবর্জনামুক্ত মেরিনা উপকূলের জন্য। অন্ধ্রে আছে দুটো উপকূল, ভাইজাগের কাছে রামকৃষ্ণ মিশন ও ঋষিকোণ্ডা। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত তীর গোপালপুর এবং পুরী ও তোসালি বালুবেলা।

মূল বক্তব্য:

- পর্যটনের শ্রেণিবিভাগ হয় পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থান, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এবং পর্যটকের বিভিন্ন প্রবণতা ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।
- পাহাড়ি কেন্দ্রগুলো সুবিস্তৃত বিভিন্ন উচ্চতায়, নদীর সন্নিহিত জায়গায়, হ্রদের ধারে।
- পর্যটন কেন্দ্র যদি বড় শহরের কাছাকাছি হয়, তাহলে অল্প সময়ে নানা কিছু দেখার সুযোগ থাকে আর তাতে পর্যটনের প্রসার ঘটে।

শব্দার্থ ও টীকা

- ভারতের সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর থাকায় উপকূল পর্যটনের অনেক সুযোগ আছে।
- কেরালা ও গোয়ার সাগরতীর ছাড়া অসংখ্য তীরভূমি এখনও অবহেলিত।

পাঠগত প্রশ্ন 33.4

1) প্রতি পর্যটন কেন্দ্রের একটি করে উদাহরণ দিন—

   i) হিমাচল প্রদেশে

   ii) উড়িষ্যায়

   iii) অসমে

   iv) হ্রদের

2) কোভালাম তীরের খ্যাতির দুটি কারণ দেখান

   i) —

   ii) —

3) পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্রের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয় যে সব সুবিধা তার তিনটি বন্ধনী থেকে বেছে নিন।

   (ঢেউ খেলানো পার্বত্য ভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্য/ পর্যটকদের ফ্যাশন প্রিয়তা/ শহরের নৈকট্য/ উপাসনার জন্য মন্দির/ তুষার রেখার সান্নিধ্য/ বহুতল বাড়ি)

   i) —

   ii) —

   iii) —

4) মুম্বাই, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ুর একটি করে বিখ্যাত তীরভূমির উল্লেখ করুন।

   i) —

   ii) —

   iii) —

33.6.3 ঐতিহ্য-মূলক পর্যটন

ভারতের ঐতিহ্য-পর্যটন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন 26টি স্থান আছে যা বিশ্বের পর্যটন স্থানের তালিকাভুক্ত। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে আছে প্রাচীন মন্দির, বিভিন্ন ধর্মের দেবমূর্তি। মুনিঋষিদের সাধনপীঠ। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত এগুলি পরিদর্শনে যান। ভাস্কর্য, গঠনশৈলি, খিলান-গম্বুজ-মিনার ভারতময় ছড়িয়ে আছে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। উদাহরণ: বৌদ্ধমঠ ও গুম্ফা (লাডাক ও সিকিমে), বিচিত্র সব গুম্ফা, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মন্দির।

দুর্গম স্থানে ধাম ও মন্দির নির্মিত হয়েছে যুগে যুগে। উত্তরে কেদার বদ্রী, পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 51টি শক্তিপীঠও হিন্দুদের কাছে বিশেষ ভক্তিতীর্থ।

প্রাচীন মন্দিরগুলো দেখা যায় গিরিচূড়ায়, নদীসঙ্গমে, নদী ও হ্রদের তীরে, দ্বীপে, দুর্গম অরণ্যে। এগুলো

পরিদর্শনের জন্য চাই প্রশিক্ষিত গাইড যাদের পুরাকাহিনিকে আকর্ষণীয় ও ঠিকভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা আছে।

তারপরে আসে ঐতিহাসিক নগর। ধ্বংসাবশেষ, গুহা এবং পাহাড় কেটে গড়া মন্দির। চৈত্য ও স্তূপের কথাও আসবে। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত অনেক স্থান আছে বিহারে। গুজরাট, রাজস্থান, কর্ণাটকে আছে জৈন তীর্থস্থান। শিখ স্মৃতি মন্দির আছে পাঞ্জাবে (অমৃতসরের হরমন্দির সাহেব)। খ্রিষ্টান চার্চ আছে গোয়ায়, শিলং ও কেরালায়।

মুসলিমদের জন্য আছে মসজিদ (দিল্লির জামা মসজিদ, হায়দরাবাদে মক্কা মসজিদ, ভোপালে তাজ মসজিদ, শ্রীনগরে হজরতবল মসজিদ)। বিখ্যাত তীর্থস্থান আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির দরগা, দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়া। সর্বধর্মের প্রাচীন সব ধর্মস্থান ছড়িয়ে আছে ভারতে।

নগরীর ধ্বংসাবশেষ পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। কর্ণাটকের হাম্পি ও উত্তর প্রদেশের ফতেপুর সিক্রি উল্লেখযোগ্য। আকর্ষণীয় অনেকগুলি পুরনো দুর্গ ও স্তম্ভ আছে। যেমন দিল্লির কুতব মিনার বিজয় স্তম্ভ, রাজস্থানে চিতোরগড়। আছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম।

ভারতের ঐতিহ্য পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত আছে অতীতের রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান। যেমন, উদয়পুরের হলদিঘাট, অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ, পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল। এ ছাড়া আছে মহাপুরুষদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। যেমন, কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলা, সবরমতীর গান্ধি আশ্রম, পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রম প্রভৃতি।

মূল বক্তব্য:

- ইতিহাস আশ্রিত পর্যটন কেন্দ্র, যেমন: তীর্থস্থান, প্রাচীন দুর্গ ও মনুমেন্ট এবং বিভিন্ন রকম ধ্বংসাবশেষ।
- ভারতে মণীষীদের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত বিভিন্ন স্থান, যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি, পুরাকীর্তির প্রদর্শনী প্রভৃতি নিয়ে ঐতিহ্য পর্যটন।

পাঠগত প্রশ্ন 33.5

1) কোন্ ধর্মের সঙ্গে জড়িত আছে নীচের স্থানগুলো—

i) সারনাথ, (ii) অমৃতসর, (iii) সোমনাথ, (iv) আজমির, (v) পুরোনো গোয়া।

2) বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো চারটি প্রধান হিন্দু তীর্থস্থানের নাম লিখুন।

3) তিনটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় মন্দিরের ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় লিখুন।

33.6.4 অভিযান-মূলক পর্যটন (অপ্রচলিত পর্যটন কেন্দ্র)

সাধারণভাবে পর্যটনের লক্ষ অবকাশ যাপন ও আনন্দ লাভ। কিন্তু কোনো কোনো দুঃসাহসী পর্যটক পর্যটনের মাধ্যমে আনন্দদায়ক স্বাচ্ছন্দের বদলে চান রোমাঞ্চকর শিহরণ। এ জন্য তাঁরা অজানা অচেনা দুর্গম পথে যাত্রা করেন, যোগ দেন নানা ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে। এঁদের জন্যই পর্যটকদের অপরিচিত নতুন জায়গায়

শব্দার্থ ও টীকা

অভিযান পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ট্রেকিং, স্কি, নদীতে নৌকাচালনা, শৈত্যক্রীড়া, জলক্রীড়া, পর্বতারোহন, গ্লাইডিং, পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, অরণ্যে শিবির বাস প্রভৃতি অভিযান পর্যটনের পর্যায়ে পড়ে। এখন অবধি মোট পর্যটনের মাত্র 7 শতাংশ হচ্ছে অভিযান পর্যটন।

ট্রেকিং: দীর্ঘ পথ হাঁটা বা সাইকেলে যাওয়া। পাহাড়ে, গিরিপথে তীব্র জলহাওয়ায় উঁচু জায়গায় যাওয়া। সিকিম, অরুণাচল, হিমাচল প্রভৃতি জায়গা ট্রেকিং-এর জন্য প্রশস্ত। ট্রেকিং অভিযান খুবই প্রাচীন। বস্তুত এভাবে নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

পর্বতারোহন: নইন সিং, কিসান সিংদের কথা আগেই জানানো হয়েছে। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম ভারতীয় পর্বতারোহী। এভারেস্টজয়ী তেনজিং নোরগে তো স্মরণীয় হয়ে আছেন। মহিলা অভিযাত্রী বাচেন্দ্রি পালের নামও পর্বতারোহীদের তালিকায় শীর্ষস্থানে।

হিমালয় ও হিমাচল প্রদেশে পর্বতারোহণযোগ্য অনেক পর্বতশৃঙ্গ আছে।

আজকাল পর্বতারোহণের প্রতি আকর্ষণ অনেক বেড়েছে।

মানালিতে ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের মতো দার্জিলিং, উত্তরকাশীতেও পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

শৈত্যক্রীড়া: শৈত্যক্রীড়া দু'রকম— (1) স্কেটিং, (2) স্কিয়িং বা স্কি। চাকা লাগানো জুতো বা বোর্ডের সাহায্যে বরফের উপর ঘুরে বেড়ানোর খেলা হচ্ছে স্কেটিং; আর বুটজুতোর সঙ্গে সরু লম্বা কাঠের, ধাতুর বা প্লাস্টিকের টুকরো জুড়ে বরফের উপর ছুটে চলার খেলা হচ্ছে স্কিয়িং। বরফের উপর দৌড়োনোর এই আনন্দ অনেকেই পেতে চান। ভারতে হিমালয় অঞ্চলের পর্বতের ঢাল এই খেলার জন্য জনপ্রিয়। 2700 মিটার উচ্চতায় গুলমার্গ ভারতের সর্বোচ্চ স্কি গ্রাউন্ড। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল স্কি-এর ভালো সময়। গুলমার্গে গল্‌ফ খেলার মাঠ বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। কাশ্মীরের স্কি প্রোজেক্ট থেকে বছরে 5 লক্ষ ডলার আয় হয়।

নারাকোন্ডা, কোটগড়, শোলাং নালা, গাড়োয়াল, যোশীমঠ, বদ্রীনাথ প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নানা প্রকার শীতক্রীড়া।

জলক্রীড়া: জলক্রীড়া একাধিক— (1) ভেলা চালানো (rafting): (2) দাঁড় টানা (rowing), (3) ডুব সাঁতার (diving)। নদীর ভাটির দিকে দল বেঁধে ভেলা চালানোর খেলাকে বলে রাফটিং; আর ছোটো নদীতে ছোটো নৌকায় দাঁড় টেনে যে প্রতিযোগিতা তা-ই হল রোয়িং। নদীতে ভেলা চালানো— ভারতে এই অভিযান পর্যটনের বিশেষ সুযোগ আছে, যেহেতু এ দেশে নদনদী অসংখ্য। এখনও পর্যন্ত জলক্রীড়া খুবই সীমিত সংখ্যায়। গঙ্গার হৃষিকেশ, মানালির বিয়াস ইত্যাদি দু-চারটি জায়গায় এটি সীমাবদ্ধ। এই ক্রীড়ার দারুণ সুযোগ আছে সিকিমের তিস্তায়, আসামের ব্রহ্মপুত্রে, হিমাচলের চন্দ্রায়, অরুণাচলের ভারালিতে। এখন দরকার এই ক্রীড়ার জন্য দক্ষ প্রশিক্ষকের ও উপকরণের।

ভারতে আছে অসংখ্য কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক হ্রদ ও জলাশয়। আর আছে সমুদ্রের প্রান্তবর্তী শান্ত অংশ। এসব জায়গায় গড়ে তোলা যেতে পারে পাল তুলে ডুব সাঁতার, দাঁড়টানা, মাছ ধরা প্রভৃতি জলক্রীড়া কেন্দ্র।

এছাড়া snorkel (একরকম নল) ও scuba (হাওয়া ভরা থলি) নামক কৃত্রিম শ্বাসগ্রহণ উপকরণ নিয়ে জলের তলায় 40 - 50 মিটার গভীরে ডুবুরি হয়ে নেমে ঘুরে বেড়ানো আর এক ধরণের আকর্ষণীয় জলক্রীড়া। লাক্ষাদ্বীপে, আন্দামান নিকোবর দ্বীপে পরিষ্কার সমুদ্রজল, এখানে এই চমৎকার জলক্রীড়া কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

গুহা পর্যটন: ভারতের অনেক গুহা বা পাহাড় কেটে নির্মিত আবাস আছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে পর্যটন

শব্দার্থ ও টীকা

গড়ে তোলার কোনো কাজ হয়নি।

আওরঙ্গাবাদের আশে পাশে সুবিখ্যাত অজন্তার মতো 30টি গুহা আছে। মধ্য ভারতে আছে অন্তত 500টি গুহা। এর অনেকগুলি ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের আবাস। তাদের অনেকগুলিতে ওদের আঁকা গুহাচিত্র আছে। উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে পাহাড়ের গা কেটে জৈনদের দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়েছে।

33.6.5 বন ও বন্যপ্রাণী পর্যটন

এমনকি আফ্রিকাতেও নেই ভারতের মতো এতো বিপুল জীব ও উদ্ভিদের সমাবেশ। জীববৈচিত্র্যের সাথে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। বন্যপ্রাণী পর্যটন গড়ে ওঠে ন্যাশানাল পার্ক, পশু পাখিদের সংরক্ষিত নিবাস, অভয়ারণ্য, সব রকমের জলাভূমি প্রভৃতিকে ভিত্তি করে। বন্যপ্রাণী পর্যটন কেন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

কাশ্মীরের কস্তুরী মৃগ উদ্যান গড়া হয়েছে দাচিগাঁও সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে। নইনিতালে আছে করবেট (জিম করবেট-এর নামে) জাতীয় পার্ক বাঘ ও হাতির আবাসস্থল। বিন্ধ্য-সাতপুরার মধ্যবর্তী উপত্যকায় আছে কান্হা জাতীয় পার্ক। এটি বাঘ, চিতা, চিত্রল হরিণ বা চিতলের আবাস উদ্যান। কাছাকাছি বান্ধবগড় বাঘের জন্য বিখ্যাত। ভরতপুরের (রাজস্থানে) পাখিরালয় বিখ্যাত বিদেশাগত বা পরিযায়ী পাখিদের জন্য।

সৌরাষ্ট্রের গির অরণ্য সিংহের জন্য বিখ্যাত।

বিখ্যাত বিশালাকৃতি সারস আছে রাজস্থানে।

কর্ণাটকের জাতীয় পার্কে হাতি আছে।

আসামের কাজিরাঙা জাতীয় পার্কে আছে একশৃঙ্গী গণ্ডার। মানস জাতীয় পার্কে আছে হাতি, বাঘ, গণ্ডার।

উড়িষ্যার চিল্কায় আছে বহুপ্রকার জলপ্রাণী।

কেরালার জাতীয় পার্ক পেরিয়ারে আছে বুনো শুয়োর, হাতি, গর্জনকারী হরিণ।

খাজুরাহোর প্রস্তাবিত জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষিত হবে 800 ভালুক।

নতুন নতুন ন্যাশনাল পার্ক, পরিবেশ বান্ধব পরিবহন, প্রাণীদের নিরাপত্তা ও অভয় দানের ব্যবস্থা বন্যপ্রাণী পর্যটনের উন্নতি ঘটাবে। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য ভ্রমণকারী ও পর্বতারোহনকারীদের উপদ্রব থেকে মুক্ত রাখতে হবে অরণ্য পরিবেশকে। থাকতে হবে স্থানীয়দের বনসংরক্ষণের আন্তরিক উদ্যোগ।

পাঠগত প্রশ্ন 33.6

1) নিম্নলিখিত প্রাণীদের জন্য বিখ্যাত স্থানের নাম লিখুন—

	প্রাণী	স্থান
i)	সিংহ	....
ii)	Indian Bustard	....
iii)	একশৃঙ্গী গণ্ডার	....
iv)	বুনো শুয়োর	....

শব্দার্থ ও টীকা

2) পর্বতারোহন ইনস্টিটিউট্‌গুলির কাজ কী? এই রকম ইনস্টিটিউট্ আছে এমন তিনটি জায়গার নাম লিখুন।

3) অভয়ারণ্য বলতে কি বোঝায়?

33.7 আপনি যা শিখলেন

1. আধুনিক পর্যটন ও প্রাচীন কালের পর্যটনের তফাত।
2. আধুনিক পর্যটনের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি।
3. বিনোদন ও অবকাশ যাপন পর্যটনের অঙ্গ।
4. পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বহু সম্পদ আছে ভারতে।
5. জল-হাওয়ার বিভিন্নতা ছাড়াও জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ, চোরাশিকারি ও অরণ্য ভ্রমণকারীদের উৎপাত প্রভৃতির প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ভারতের পর্যটনে প্রসার ঘটাবে।

এছাড়াও শিখলেন —

— পর্বতাঞ্চল পর্যটনের বিভিন্ন দিক, যেমন পর্বতশৃঙ্গ, ঢালু অংশে তুষার ইত্যাদির অপরূপ বিস্তার, পর্বতের গুহা ও খাদ এবং পাহাড়ের গা কেটে মূর্তি ও আবাস নির্মাণের বিভিন্ন পরিচয়।

— সাগর উপকূলে নৈসর্গিক বৈচিত্র্য ও সাগর তীরের আকর্ষণে পর্যটনের সমৃদ্ধি।

— আমাদের শতশত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন বা পর্যটনের বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন লোকশিল্পে নিযুক্ত হবার ফলে লক্ষ লক্ষ স্থানীয় মানুষের জীবিকার সংস্থান।

আর শিখলেন —

— আজকের বিশ্ব অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব অনেকখানি।

— পর্বত, সাগর-সৈকত, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-কেন্দ্র প্রভৃতি বহু বৈচিত্র্যের ফলে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের পর্যটন।

— এ পর্যটনের শ্রেণিবিভাগ হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানিক বৈশিষ্ট্য, পর্যটকদের নানা ভাবে আকর্ষণের সুযোগ ইত্যাদির ভিত্তিতে।

— অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযানমূলক পর্যটন তাদের জন্য যারা দুর্গম জায়গায় যেতে ভালোবাসে এবং জলক্রীড়া, পর্বতারোহন, তুষার ক্রীড়া, গ্লাইডিং, গল্ফ খেলা, স্কি প্রভৃতি রোমাঞ্চকর অনুশীলন যাদের খুব প্রিয়।

শব্দার্থ ও টীকা

33.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. সংক্ষেপে উত্তর দিন

(ক) কী রকম সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের বেশি পছন্দ?

(খ) ভারতের কী কী বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পর্যটনের প্রেরণা দেয়?

2. গ্রীষ্মে পার্বত্য পর্যটনের কারণগুলি উল্লেখ করুন যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

3. পার্থক্য দেখান

(i) সাধারণ যাওয়া আসা ও পর্যটন।

(ii) আভ্যন্তরীন পর্যটন ও বহির্গামী পর্যটন।

4. পর্যটনের কোন্ কোন্ দিক পর্যটনকে আধুনিক করে?

5. যেটি ঠিক সেটিতে টিক চিহ্ন দিন:

i. (ক) শহর কাছে হলে পার্বত্য পর্যটনের একটি বিশেষ সুবিধা

(খ) কাছাকাছি শহর থাকলে পর্যটকদের সংখ্যা কমে যায়।

ii. (ক) কোঙ্কন এবং গুজরাট উপকূলে সৈকত পর্যটন গড়ে তোলা যাবে না।

(খ) কেরালা ও গোয়ায় সৈকত পর্যটন যথেষ্ট উন্নত।

iii. (ক) অনেকগুলো ধর্ম থাকার ফলে তীর্থকেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বেশি হয়েছে।

(খ) দুর্গ আর প্রাসাদ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে মানুষ তীর্থস্থান গড়ে তুলেছে।

6. পার্থক্য দেখান:

i) পর্বতারোহন ও ট্রেকিং

ii) স্কেট (Skate) ও স্কি (Ski)

iii) রাফটিং (ভেলায় চড়া) ও Rowing (দাঁড়টানা)

7. গভীর জলে ডুবসাঁতারের খেলা (diving) দেখাবার সময় কৃত্রিমভাবে শ্বাসগ্রহণের জন্য কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয়?

শব্দার্থ ও টীকা

8. কারণগুলি উল্লেখ করুন:

i) প্রবালযুক্ত সাগরে দাঁড়টানা জলক্রীড়ার পক্ষে বেশি উপযুক্ত।

ii) বাঘের অভয়ারণ্য অনেকগুলো, কিন্তু গ্রেট বাস্টার্ড সারসের জন্য মাত্র একটি।

iii) উত্তর ভারতে রেকর্ড সংখ্যক তীর্থযাত্রী আসে কিন্তু এখানকার পর্যটনে উন্নয়নের মাত্রা এখনো খুব কম।

33.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

33.1. **1)** i) অস্থায়ীভাবে, ii) পরিকল্পিত, iii) ২৪ (ঘন্টা), এক (বছর)

2) i)-(গ), ii)-(ক), iii)-(খ)

33.2. **1)** বিশাল ও সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক এই দেশে পর্যটনের অসংখ্য বৈচিত্র্য বিদ্যমান বলে।

2) পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন।

3) কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ কোলের হ্রদ।

33.3. **1)** পর্যটন সূত্রে অন্য দেশে (i) বাণিজ্যের প্রসার, (ii) প্রযুক্তির বিনিময়, (iii) সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।

2) রাজনৈতিক অস্থিরতা (i) পরিবহনের ব্যয় বৃদ্ধি, (ii) পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা

33.4 **1)** i) সিমলা, ii) গোপালপুর, iii) কাজিরাঙা, iv) নৈনিতাল

2) i) স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ii) হাঙরের উপদ্রবমুক্ত

3) i) শহরের নৈকট্য, ii) তুষার রেখার সান্নিধ্য iii) ঢেউ খেলানো পার্বত্যভূমির প্রকৃতি

4) i) জুহু-মুম্বাই, ii) পুরী iii) মেরিনা

33.5 **1)** i) বৌদ্ধ, ii) শিখ, iii) হিন্দু, iv) ইসলাম, v) খ্রিস্ট।

2) উত্তরে বদ্রীনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে পুরী, দক্ষিণে রামেশ্বরম।

3) তামিলনাড়ুতে মীনাক্ষী, পশ্চিমবঙ্গে কালীঘাট, পাঞ্জাবে স্বর্ণমন্দির।

33.6

1) i) গির, ii) রাজস্থান, iii) কাজিরাঙা, iv) পেরিয়ার

2) i) পর্বতারোহন প্রশিক্ষণ

(ক) উত্তর কাশী, (খ) মানালি, (গ) দার্জিলিং

3) বন্য প্রাণীর নির্ভয়ে জীবনধারণ, বংশবিস্তার, অবাধ আচরণ ইত্যাদির ব্যবস্থাযুক্ত পরিকল্পিত অরণ্য।

34 ক

পর্যটন: সংগঠন ও পরিকাঠামো

34.1 প্রস্তাবনা

পর্যটন মানচিত্রে ভারত ইতিমধ্যেই একটি স্থান করে নিয়েছে। বিশাল দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন এলাকা এর কারণ। আবার এও ঠিক যে, চিন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড থেকে ভারত পিছিয়েই আছে পর্যটনে। পিছিয়ে থাকার কারণ সাংগঠনিক দুর্বলতা ও পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা।

এই পাঠে আমাদের আলোচনা হবে পর্যটনের পরিকাঠামোর অবস্থা (পরিবহন নেটওয়ার্ক, হোটেল পরিষেবা) এবং পর্যটনের সম্পর্ক নিয়ে।

আমাদের আলোচনায় থাকবে বিভিন্ন পর্যায়ে গাইড, পরিবহন সংগঠন এবং পর্যটন ব্যবস্থাপনা।

34.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনি বুঝতে পারবেন—

- পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কী কী সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রয়োজন।
- পর্যটকের সুখসুবিধার প্রয়োজনে হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং আতিথেয়তার ভূমিকা।
- স্থানীয় ও দূরগামী পরিবহন ব্যবস্থা ও পর্যটনের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব।
- পর্যটনের উন্নয়নে গাইড ও পর্যটন পরিচালকের পারস্পরিক সমন্বয়ের প্রয়োজন।
- ট্রাভেল এজেন্সির ভূমিকা।
- বিশেষ সময়ভিত্তিক ও গন্তব্যভিত্তিক পর্যটনের পার্থক্য।

34.3 পরিবহন ও পর্যটন

পর্যটনের শুরুর স্থান ও গন্তব্যস্থলের সেতুরচনা করে পরিবহন। এর অভাবে বা দুর্বলতার ফলে পর্যটনের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবহন-নীতি ছাড়া পর্যটন-পরিকল্পনা করাই চলে না। এই নীতির মধ্যে পড়ে পথ, পরিবহনের সুবিধা ও উপযুক্ত যানবাহন ইত্যাদির একটি নেটওয়ার্ক।

শব্দার্থ ও টীকা

যানবাহন বলতে আকাশ পথ, সমুদ্রপথ ও স্থলপথের উপযোগী যান। যদি স্থলপথ হয়, তাহলে তার জন্য রেল, বাস, ট্যাক্সি, লাক্সারি কোচ, ডুলি, ঘোড়া, রিক্সা, অটো, টাঙা, মোপেড, ট্রাম ইত্যাদি। জলপথের জন্য নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ ইত্যাদি। আর আকাশপথের জন্য তো বিমান।

পর্যটনকে আকর্ষণীয় করতে হলে সবরকম বিকল্প ব্যবস্থাই থাকা চাই। পর্যটকদের কেবল পরিবহন হলে চলবে না, সহজগম্য পরিবহন হতে হবে। আরামদায়ক পরিবহন হতে হবে। সব রকম আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত ও সহজলভ্য পরিবহন দরকার।

একটি হিসাবে দেখানো হয়েছে মোট পর্যটন ব্যয়ের প্রায় 40 শতাংশ যায় পরিবহন বাবদ।

ক) বিমান পরিবহন

প্রায় 97 শতাংশ পর্যটক ভারতে আসেন বিমানে। দেশের ভেতরে তাঁদের 82 শতাংশ ঘোরেন বিমানে, 11 শতাংশজলপথে, 7 শতাংশ স্থলপথে।

বিমানগুলির গতি সাধারণত 1000 কি:মি: ঘন্টায়। কাজেই পরিবহনে বিমানের গুরুত্ব অনেক বেশি, বিশেষত বিশ্ব পর্যটনের ক্ষেত্রে।

বিমান ভাড়ায় ছাড় (discount), বিভিন্ন বয়সের জন্য পাশ ইত্যাদি বিমান পরিবহনের উন্নতি ঘটাতে পারে। বিমান ব্যবহার করে সাধারণত ব্যবসায়ীরা। কেননা সময়ের সাশ্রয় তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে অমৃতসর, শ্রীনগর, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, আহমেদাবাদ, গোয়া, গুয়াহাটি, বেনারস, ভুবনেশ্বর, নাগপুর প্রভৃতির সঙ্গে বিমান যোগাযোগ থাকলেও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে কেবল মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা ও চেন্নাইতে।

খ) সমুদ্র পরিবহন:

দীর্ঘ দূরত্বে পরিবহনের জন্য জাহাজ এখন আর তেমন পছন্দসই নয়। কিন্তু স্বল্প দূরত্বে জাহাজে ঘোরা পর্যটকদের বেশ পছন্দসই। যেমন, মুম্বাই থেকে গোয়া জাহাজ ভ্রমণ চলছে। কোচি থেকে লাক্ষাদ্বীপ, চেন্নাই থেকে কলকাতা, পোর্ট ব্লেয়ার জাহাজ ভ্রমণ জনপ্রিয় হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র নদীতে জলপথে পর্যটন জল পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

গ) স্থলপথ: মোটর পরিবহন

1970 থেকে ব্যক্তিগতভাবে ও দলবদ্ধভবে ট্যাক্সি, বাস, লাক্সারি কোচে ভ্রমণ জনপ্রিয় হয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে, মোটেল (হোটেল ও গাড়ি রাখা) প্রভৃতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্থল পর্যটনে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রধান সব নগরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ এখন অনেক সুবিধা করে দিয়েছে।

মোটর পরিবহন কম খরচে যাত্রী পরিবহনে এগিয়ে এসেছে। শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী (উত্তর থেকে দক্ষিণ), শিলচর থেকে পোরবন্দর (পূর্ব থেকে পশ্চিম) 4000 এবং 3300 কি:মি: দীর্ঘ করিডর তৈরির প্রস্তাব আছে। হিমালয় অঞ্চলে মোটরপথ প্রধান পরিবহন এবং এই পার্বত্য পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ভালোভাবেই হয়।

ঘ) স্থলপথ: রেল পরিবহন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সংগঠিত রেল পর্যটন শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের 60000 কি: মি: দীর্ঘ রেলপথে কম বাজেটে আরামে ভ্রমণ করা যায়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রধান ট্রাঙ্করোড মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লিকে সংযুক্ত করেছে। উত্তর-দক্ষিণ রেলপথ এখন জম্মু-উধমপুর পৌঁছেছে। উত্তরপূর্ব রেল পৌঁছে গেছে অরুণাচলে।

প্রায় সব রেলপথ এখন বিদ্যুতায়িত হয়েছে, ফলে গতি দ্রুততর হয়েছে।

সিমলা, উটি, মাথারেন, দার্জিলিং প্রভৃতি কয়েকটি পাহাড়ি স্টেশনে চলছে টয় ট্রেন। এইসব ট্রেনে চড়ে প্রকৃতি উপভোগ খুব লোভনীয়।

হিমালয়ান কুইন (Himalayan Queen) একটি রোমান্টিক নাম। দিল্লি-রাজস্থান 138 কি:মি: রেলপথে চলা ট্রেনকে বলে ফেয়ারি কুইন (Fairy Queen)।

কাংড়া উপত্যকার শোভা দর্শনের জন্য আছে যোগিন্দর নগর-পাঠানকোট narrow gauge ট্রেন।

760 মাইল দীর্ঘ মুম্বাই-বাঙ্গালোর উপকূল রেলপথের 10 শতাংশ যাচ্ছে টানেলের ভিতর দিয়ে ও সেতুর উপর দিয়ে।

রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্য ট্রেনের নাম Palace on Wheels, রাজস্থান-আগ্রা-দিল্লি পথে চলাচল করে।

Indrail Pass পাশ কিনে পর্যটকরা পছন্দমতো চক্রাকার পথে রেল ভ্রমণ করতে পারেন।

পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার যদি রেল দপ্তরকে আরও পর্যটক টানতে হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

মূল বক্তব্য:

- বিভিন্ন রকমের পরিবহন পদ্ধতি ও পরিবহন পথ ট্যুরিস্টদের গন্তব্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- ধনী দেশগুলি থেকে বিমান যাত্রীদের পক্ষে খরচপাতি কোনো ব্যাপার নয়।
- যারা কম বাজেটের পর্যটক, বিমান ভাড়ায় তাদের ছাড় দেবার ব্যবস্থা থাকলে তাদের বিমান পরিবহনে উৎসাহ যোগাবে।
- জলপথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া জাহাজ ভ্রমণের আর কোনো গুরুত্ব নেই এখন।
- বিলাসবহুল দ্রুতগতি ট্রেন সত্ত্বেও পর্যটকদের কাছে সময়ের বিবেচনায় রেল পরিবহন দ্বিতীয় পছন্দ।
- 1970 সাল থেকে পর্যটনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মোটর পরিবহন। হাইওয়ে যোগাযোগের ফলে পাহাড়ি পথে মোটর পরিবহন বেশি উপযোগী।
- সব রকম পরিবহনে আতিথেয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য আরও অনেক কিছুর দরকার।

পাঠগত প্রশ্ন 34.1

1) পর্যটকরা কীরকম পরিবহন পছন্দ করেন?

2) পর্যটনে বিমান পরিবহনের গুরুত্ব কী?

3) টয় ট্রেনের সুবিধা কী?

শব্দার্থ ও টীকা

4) রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ট্রেনটির নাম কী?

34.4 পর্যটনে হোটেলের স্থান

পর্যটনে খাবার ও বিশ্রামের স্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে হোটেল এখন রীতিমত একটি শিল্প হয়ে উঠেছে। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য দারুণ কক্ষ, রেস্টুরেন্ট পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নামকরা হোটেলে থাকবে আরামদায়ক কক্ষ, fast food, স্থানীয় কারুশিল্পদ্রব্য ইত্যাদি। এরকম হোটেল আন্তর্জাতিক পর্যটকদের থেকে বিদেশি মুদ্রার 50 শতাংশ আয় করে।

আমাদের দেশে হোটেলে রুমের সংখ্যা প্রায় 98000 আর ইন্দোনেশিয়ায় এই সংখ্যা 36 লক্ষ। পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে তাই নতুন নতুন হোটেল করা এবং বর্তমান হোটেলগুলিতে কক্ষ সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। বড়ো শহরে জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় শহর থেকে দূরে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের সুযোগ করে নতুন নতুন হোটেল গড়ে উঠছে।

তিনতারা বা পাঁচতারা হোটেল ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির হোটেল (স্বাচ্ছ্যন্দের ভিত্তিতে) তৈরি হয়েছে। এরকম কতকগুলোর নাম মোটেল। থাকা ও গাড়ি রাখা দুটোরই ব্যবস্থা এখানে থাকে। এ ছাড়া আছে অরণ্য আবাস, পাহাড়ি এলাকায় তাঁবু আর জলে আছে ভাসমান হাউস বোট।

অনেক জায়গায় আছে ছোটো হোটেল কিন্তু নানা রকম বিনোদন ও খেলাধূলার ব্যবস্থা। এরকম হোটেলও পর্যটকদের প্রিয়।

আবার আছে আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। এখানে থাকে উচ্চমানের বিনোদন, হেলথ ক্লাব, শপিং মার্ট, বাণিজ্য কেন্দ্র। আমাদের দেশে এগুলোর ব্যয় ধনী বিদেশের বড়ো হোটেলের চেয়ে অনেক কম বলে বিদেশি পর্যটকদের কাছে আমাদের দেশের বড়ো হোটেল আকর্ষণীয়।

মোটরে যারা বেড়ায় তাদের কাছে আকর্ষণীয় হচ্ছে হাইওয়ের কাছে মোটেল, তৈরি fast food-এর জন্য পথের ধারের দোকান kiosk, ধাবা এগুলি অনেক সংখ্যায় গড়ে উঠেছে হরিয়ানার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে।

আর আছে যুব আবাস, সরাই, হলিডে হোম। এগুলো পরিচালনা করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বা এজেন্সি।

মূল বক্তব্য:

- পরিবহনের সুযোগ ছাড়াও নানা সুবিধাযুক্ত বিভিন্ন রকমের আবাস পর্যটকদের প্রয়োজন মেটায়।
- হোটেলের কক্ষসংখ্যাবৃদ্ধি জরুরি।
- পর্যটকদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে পর্যটন ব্যবস্থাপক ও হোটেল কর্তৃপক্ষের আরও পরিষেবা দেওয়া দরকার।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 34.2

1. নামকরা হোটেলের পাঁচটি আকর্ষণের কথা উল্লেখ করুন।
2. হোটেল ও মোটেলের পার্থক্য দেখান।
3. কিয়স্ক-এর সুবিধা কী?

34.5 পর্যটনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

পর্যটন ব্যবস্থাপনার জন্য চাই অধিক সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মচারী। এদের কাজ হবে পর্যটন পরিচালনা, স্টুয়ার্ড, বাবুর্চি ও তাদের সহায়কদের কাজের তদারক করা।

এদের মধ্যে ট্যুর গাইড হচ্ছে ব্যবস্থাপনার মুখ্য ব্যক্তি। স্থান নির্বাচন, পরিবহন যোগাড়, পর্যটকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি আগেই পরিকল্পনা করা এবং সেই মতো পর্যটন পরিচালনার দায়িত্ব ট্যুর গাইডের।

ক) ট্যুর গাইড

গাইডদের থাকতে হবে পর্যটন কেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থান, কেন্দ্রের পটভূমি ও অতীত ইতিহাস আর সংশ্লিষ্ট মন্দির, মূর্তি, মনুমেন্ট, দুর্গ, ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি নিয়ে প্রচলিত লোকগাথা প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। গাইড যেন পর্যটকদের বুঝিয়ে দিতে পারেন স্থানীয় লোক-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোককথা, প্রয়োগ শিল্প (performing arts) আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে। অভিজ্ঞ গাইড অবিলম্বে বুঝে যায় পর্যটকদের মনের কথা, তাদের সঙ্গে করতে পারে ভাবের ও রসবোধের বিনিময়।

গাইডের কার্যকলাপে ত্রুটি থাকলে ব্যবস্থাপকদের ও কোম্পানির বদনাম হতে পারে।

এছাড়া পরিকল্পনার ত্রুটিতেও পর্যটনের ক্ষতি হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ভাইজাগের স্থানীয় আদিবাসীদের কথা। তারা গাইড হিসাবে গভীর স্থানে দেখাতে পারে চুনাপাথরে খোদাই গুহা ও জলপ্রপাত। 2001 অবধি তারা এইভাবে মাসে 7000 টাকা পর্যন্ত আয় করেছে। পরে সরকার ওই সব গুহার খোদাই সিমেন্ট করে দিয়ে আলোকিত করে দেয়। উল্লিখিত গাইডদের মাস মাইনে দেয় 3000 টাকা করে, এইভাবে মোটা টাকা আয় করে সরকার। কিন্তু এভাবে স্থানীয়দের আর্থিকভাবে বঞ্চিত করে পর্যটনের আখেরে লাভ হয় না।

খ) ট্যুর পরিচালনা

এটা অনেকটাই একটা বিশেষ ধরণের কাজ। এই কাজের মধ্যে পড়ে অনেকগুলো বিষয়, যেমন প্রয়োজনীয় পরিবহন, ভিসা, Permit clearance, হোটেল বুকিং ও সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু। পরিচালকদের জানা থাকতে হয় পর্যটনের নিয়মবিধির সাম্প্রতিক পরিবর্তনও। পর্যটন মরশুমে যখন বেড়াবার ধুম পড়ে যায় তখন কেন্দ্র নির্বাচনে হিমসিম খেতে হয়। সেজন্য সে বিষয়ে পরিকল্পনা অনেক আগেই ছকে রাখতে হয়। কতজন যাবে, একা না দলে, কোথায় যাবে, কী পরিবহনে যাবে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছুরই নিখুঁত ব্যবস্থা না থাকলে পর্যটকদের অসন্তোষ বাড়ে।

গ) ট্র্যাভেল এজেন্সি

নীচের স্তরে গাইড, পরিচালক, এজেন্ট আর উপরের স্তরে টিম ম্যানেজার— এদের নিয়েই হয় একটি

ট্রাভেল এজেন্সি। তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড ও ট্যুর পরিচালকদের সংগ্রহ করে একটি সুদক্ষ টিম তৈরি করে।

সর্বত্র এদের জাল বিস্তৃত। ট্র্যাভেল এজেন্সিকে কী কী করতে হয়?

দ্রুততম গতিতে তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে খবর পাঠানো,

প্যাকেজ ট্যুর এর ব্যবস্থা, তার সঙ্গে পথনির্দেশ, পরিবহনে ছাড়ের ব্যবস্থা, থাকার জায়গা, খাবার দাবার ইত্যাদি।

এজেন্সির লোক ট্যুরিস্টদের কেনাকাটায় সাহায্য করে। নানারূপ বিনোদন ও খেলাধূলার জন্য ট্যুরিস্টদের সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও এটা ওটা অনেক ব্যাপারে এরা পর্যটকদের সহায়তা দেয়। যেমন, আয়ুর্বেদিক ম্যাসেজ, যোগব্যায়াম ইত্যাদি।

পর্যটন ব্যাপারে ট্যুর এজেন্সির সংগৃহীত নানা প্রতিক্রিয়া ও তথ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর ও অন্যান্য পরিবহন সংস্থার পর্যটন পরিকল্পনার কাজের সহায়ক হয়।

ঘ) ঋতু-বিশেষে আর গন্তব্য-বিশেষে পর্যটন

গন্তব্যভিত্তিক পর্যটনের সঙ্গে ঋতুভিত্তিক পর্যটনের কিন্তু ফারাক আছে। ঋতুভিত্তিক পর্যটন হচ্ছে কয়েকটি জায়গায় বিশেষ ঋতুতেই যাওয়া। ঋতুভিত্তিক পর্যটন ঋতুর অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রতিকূল ঋতুতে এই পর্যটন বন্ধ থাকে। যেমন:

হিমালয়ের লাহুল-স্পিতি বা কাশ্মীরের লাডাক-জাসকার বহু উচ্চতায় পুরু তুষার খণ্ড এবং শীতের তীব্র ঝঞ্ঝা সঙ্কুল। এখানে গরমের কয়েকটা মাস বড়ো জোর যাওয়া যেতে পারে। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে পর্বতচূড়ায় বৌদ্ধ মঠ, সুপ্রাচীন স্থাপত্য, দেওয়াল চিত্র পর্যটকদের পক্ষে লোভনীয় বর্ষা ঋতুতে।

গ্রীষ্মকালই অমরনাথ, কেদারবদ্রী, হেমকুণ্ড দর্শনের পক্ষে প্রশস্ত।

আন্দামান-নিকোবরে বর্ষা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

কম শীতে যাওয়া বিধেয় রাজস্থানের মরু অঞ্চলে, জয়শলমিরে।

আর গন্তব্যভিত্তিক পর্যটন নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ জায়গা যথার্থে পর্যটকদের বিশেষ পছন্দের উপর। সাধারণভাবে আকর্ষণীয় গোয়ার উপকূল, কেরালা ও পুরীর সৈকতভূমি। পশ্চিমঘাট ও নীলগিরি প্রভৃতি পার্বত্য এলাকা গন্তব্য হিসাবে বিশেষ আকর্ষক।

মূল বক্তব্য:

- উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত গাইড ও ম্যানেজারের ব্যক্তিগতভাবে আবার টিম হিসাবে দক্ষতা ট্রাভেল এজেন্সির জন্য বিশেষ জরুরি।
- ভিসা যোগাড়, পারমিট ক্লিয়ারেন্স, সংরক্ষিত পর্যটন কেন্দ্রের জন্য অনুমতি যোগাড়, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি পর্যটনে বিদেশি টানার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।
- পর্যটন পরিচালকদের কাজের মধ্যে পড়ে টিকিট বুকিং, রিজার্ভেশন, পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া ইত্যাদি। আজকের ব্যস্ততার যুগে এসবের জন্য পর্যটকদের সময় দেওয়া মুশকিল।

শব্দার্থ ও টীকা

- কিছু পর্যটনকেন্দ্র বিশেষ বিশেষ ঋতুর পক্ষে শ্রেয়। আবার গন্তব্যভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র বাছাই নির্ভর করে পর্যটকদের নিজস্ব রুচি ও পছন্দের উপরে।
- কালক্রমে পর্যটন ব্যবস্থাপনা একটি পেশায় পরিণত। একাজের জন্য বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে চলে না।

পাঠগত প্রশ্ন 34.3

1. প্রত্যেকটির উপযুক্ত নাম কী হবে?

i) হ্রদে ভাসমান হোটেল, ii) পথের ধারে হোটেলের ও গাড়ি রাখার সুবিধাযুক্ত জায়গা, iii) পথের ধারের যাত্রীদের fast food বিক্রয়ের স্টল, iv) একটি অঞ্চলের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবার ভ্রমণসূচি, v) বৃহত্তম নির্জন জলাভূমি যেখানে জলপথে যাওয়া যায়।

2. i) তিনটি আনন্দজনক বাসরুটের নাম লিখুন।

ii) আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের চারটি বিশেষ দিক উল্লেখ করুন।

3. বেশি সংখ্যায় পর্যটক পাবার চারটি বিশেষ আকর্ষণ উল্লেখ করুন।

4. কারা বিমান পরিবহনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়?

34.6 আপনি যা শিখলেন

1. আধুনিক পর্যটন ব্যবস্থাপনার জরুরি হল পরিবহন নেটওয়ার্ক, হোটেল পরিষেবা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।
2. পর্যটনের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য চাই সমস্ত শ্রেণির পর্যটকের আরও বেশি থাকার জায়গা। এটা ক্রমবর্ধমান পর্যটক সংখ্যার (বিদেশি ও দেশি) চাহিদা মেটাতেই দরকার।
3. দরকার আকাশপথ, জলপথ, স্থলপথে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী স্থানের উপযুক্ত পরিবহন। বিভিন্ন প্রকার পরিবহনের সমন্বয়ও ঘটাতে হবে।
4. পর্যটনের মতো সংবেদনশীল শিল্প নির্ভর করে গাইড, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীদের পেশাদারি যোগ্যতার উপর। ক্রমে এগুলি প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
5. বিদেশি দেশি সব রকম পর্যটকের পর্যটনের শুরু থেকে ফিরে যাওয়া অবধি পরিকল্পনা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, আইনগত সহায়তা ও জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি পর্যটন পরিচালকের কাজের মধ্যে পড়ে।
6. পর্যটন হতে পারে ঋতুভিত্তিক আর গন্তব্যভিত্তিক।
7. পর্যটন পরিচালক প্যাকেজ ট্যুর, ব্যক্তিগত দলগত পর্যটনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয়। গাইডকে পর্যটনরত পর্যটকদের সব রকমভাবে সহায়তা দিতে হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

34.7 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. **সংক্ষেপে উত্তর দিন:**

   i) মেট্রো রেল ভারতের কোথায় কোথায় হচ্ছে?

   ii) টয় ট্রেনের বিশেষত্ব কী?

2. পর্যটন পরিচালক ও গাইড এদের কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকা দরকার? চারটির কথা লিখুন।

3. ট্রাভেল এজেন্সির কাজ কী বুঝিয়ে দিন।

34.8 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

34.1 **1)** **i)** সহজগম্য **ii)** সহজলভ্য **iii)** আরামদায়ক **iv)** সব আবহাওয়ার উপযোগী

2) অতি কম সময়ে দীর্ঘ দূরত্বে যাওয়া যায়।

3) প্যালেস অন হুইলস

34.2 **1)** **i)** আরামদায়ক কক্ষ **ii)** রেস্টোরেন্ট পরিষেবা **iii)** উচ্চমানের বিনোদন ব্যবস্থা **iv)** হেলথ ক্লাব **v)** শপিং মার্ট

2) মোটেলে খাওয়া, থাকা ছাড়াও থাকে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, কিন্তু হোটেলে থাকে মূলত থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।

3) বড়ো রাস্তার ধারে, চটজলদি ফাস্ট ফুডের ব্যবস্থা

34.3 **1)** **i)** হাউজ বোট বা শিকারা **ii)** মোটেল **iii)** কিয়স্ক **iv)** সার্কিট ট্যুর **v)** সুন্দরবন

2) **i)** মানালি-লে **ii)** দার্জিলিং-গ্যাংটক **iii)** মাদুরাই-কোডাই কানাল

(ক) কনফারেন্স হল, (খ) ইন্টারনেট ব্যবস্থা (গ) হেলথ ক্লাব (ঘ) শপিং মার্ট

3) পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, আরামদায়ক আসন, দ্রুতগতি, ভাড়ায় ছাড়।

4) ধনী বিদেশি পর্যটক এবং দেশিয় বণিক ও বাণিজ্য প্রতিনিধি।

35 ক

পর্যটন: সম্ভাবনা-সমস্যা-সমাধানের পথ

35.1 প্রস্তাবনা

ধনীদেশে পর্যটনের জন্য অবসর সময় এবং পর্যাপ্ত টাকা আর বাণিজ্যবৃদ্ধি মিলে পর্যটন শিল্পের অগ্রগতি দ্রুত হচ্ছে। 2008 সালে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা দাঁড়ায় 922 মিলিয়ন, এই সংখ্যা 2007 সালের তুলনায় 1.9 শতাংশ বেশি। এর ফলে 2008 সালে আন্তর্জাতিক পর্যটন থেকে অর্জিত আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে (মার্কিন মুদ্রায়) 944 বিলিয়ন (ইউরো মুদ্রায় 642 বিলিয়ন) যা আগের বছরের তুলনায় 1.8 শতাংশ বেশি। তবে পর্যটনের ইতিবাচক সম্ভাবনার সঙ্গে নেতিবাচক আশঙ্কাও জড়িয়ে থাকে। যেমন, আন্তর্জাতিক মন্দার জেরে জুন 2008-এর পর আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা 2 শতাংশ কমে যায়। এর সঙ্গে সংক্রামক সোয়াইন ফ্লু (AH1N1) রোগের জেরে 2009-এ আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা 4 শতাংশ কমে যায়। ফলে পর্যটনলব্ধ আয়ের পরিমাণও 2009 সালে 6 শতাংশ কমে যায়। সুতরাং পর্যটন শিল্পের আলোচনায় সম্ভাবনা ও সমস্যা দুদিকের কথাই মাথায় রাখতে হবে।

এই পাঠে আমরা পর্যটন কার্যক্রমের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে অপরিকল্পিত পর্যটনের সমস্যা এবং সম্ভাব্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটননীতি সংক্রান্ত কিছু পথ নির্ণয় করে ওই সমস্যার সমাধানের বিষয়ও আলোচনা করব।

35.2 উদ্দেশ্য :

এই পাঠটি পড়লে আপনারা করতে পারবেন—

- ভারতের বর্তমান পর্যটনের অবস্থা পর্যালোচনা;
- পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নে পর্যটনের ভূমিকা ব্যাখ্যা;
- অদৃশ্য রপ্তানি, স্থানীয় উৎপাদনের বিপণন ও পারফর্মিং আর্ট-এর উন্নতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ;
- বহিরাগত পর্যটকদের নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয়;
- সুস্থ ও প্রীতিকর পর্যটনের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক নীতির মূল্যায়ন।

শব্দার্থ ও টীকা

35.3 ভারতে পর্যটনের বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা

1970-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারত বিশ্বের পর্যটন বাজারে কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ নিতে পারেনি। যদিও আমাদের দেশে পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 3.36 মিলিয়ন তবু হংকং বা সিঙ্গাপুরের মতো ছোটো দেশগুলিও আমাদের চেয়ে ঢের এগিয়ে।

বিশ্বে প্রতি দশ জনের একজন হচ্ছে ভ্রমণার্থী। 2009 সালে আন্তর্জাতিক মন্দা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ভ্রমনার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 880 মিলিয়ন। কিন্তু আমাদের অগ্রগতি অনেক কম।

তালিকা - 1

ভারতে বিদেশি পর্যটকের পরিসংখ্যান :

সাল	বিদেশি পর্যটক সংখ্যা
1951	17,000
2004	33,00,000
2007	40,55,000

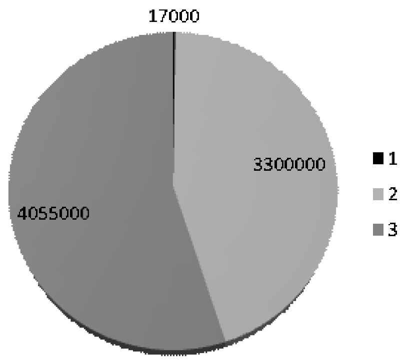

তালিকা - 2

ভারতে আভ্যন্তরীন পর্যটকের পরিসংখ্যান :

সাল	আভ্যন্তরীন পর্যটক সংখ্যা (তীর্থযাত্রীসহ)	তীর্থযাত্রী
1996	20,03,000	10,05,000
2004	30,05,000	10,09,000

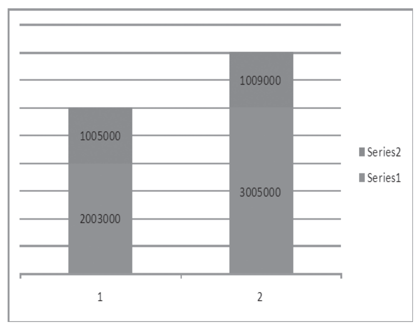

পর্যটন সংক্রান্ত অন্যান্য পরিসংখ্যান :

1.	পর্যটন থেকে ভারতের আয়	-	মোট জিডিপি-র 3.5 শতাংশ
2.	বিশ্বের পর্যটনে ভারতের স্থান	-	35 তম
3.	বিশ্বপর্যটনে এশিয়ার অংশ	-	7.8 শতাংশ

শব্দার্থ ও টীকা

4. বিশ্বপর্যটনে ভারতের অংশ - 2.6 শতাংশ

5. 2003 থেকে 2007 বছরে পর্যটন বাবদ ভারতে আয়বৃদ্ধি - 13.7 শতাংশ

তবে এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে পর্যটক সংখ্যা দ্রুত কমে যায়। কারণ, দেখা গেছে তখন সবচেয়ে প্রথম আক্রান্ত হয় পর্যটকরাই। অবশ্য তীর্থযাত্রীরা যে কোনো হাঙ্গামাকে উপেক্ষা করেই তাদের তীর্থ পর্যটন অব্যাহত রাখতে চায়। সেজন্য সরকার অতিরিক্ত 200 কোটি টাকা ধরেছে সুষ্ঠু পর্যটন ব্যবস্থার জন্য।

বিদেশি মুদ্রা (foreign exchange) আয়:

ইয়োরোপ থেকে আগত বিদেশি পর্যটকরা এদেশে যা ব্যয় করে তার পরিমাণ মোট পর্যটন থেকে আয়ের 50 শতাংশ। 2004 সালে এই আয়ের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে 4.122 বিলিয়ন ডলার।

পর্যটন: তখন ও এখন

ষাটের দশকে ভারতের 2য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে সব স্থানে বিদেশিরা ঘন ঘন বেড়াতে যান সেসব স্থানের পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

আশির দশকে কম আয়ের পর্যটকদের বাছাই করা পর্যটন কেন্দ্রগুলোর উন্নতির দিকে রাজ্য সরকারগুলিকে নজর দিতে বলা হয়।

1985 - 90 সালের পরিকল্পনা কালে অনেক রাজ্য পর্যটনকে শিল্পের স্বীকৃতি দেয়। হস্তশিল্প বিক্রি বাড়াবার জন্য হস্তশিল্পভিত্তিক বিশেষ পর্যটন ব্যবস্থার কথা ভাবে। বিশেষ বিশেষ স্থানে যাবার সুবিধার জন্য চক্রাকার ভ্রমণ (circuit tour)-এর কথা ভাবতে শুরু করে।

এই পরিকল্পনাকালে জোর দেওয়া হয়—

পর্যটন থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগের উপর।

পর্যটন উন্নয়নের জন্য প্রাইভেট ও বিদেশি মূলধন টানার সম্ভাবনার উপর।

বিভিন্ন এলাকায় পর্যটনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর।

পর্যটনের উন্নয়নকল্পে সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার উপর।

মূল বক্তব্য:

- আন্তর্জাতিক পর্যটক সংখ্যার হিসেবে 2004 সালে ভারত 30 লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এই বছরে এর থেকে অর্জিত বিদেশি মুদ্রার পরিমাণ 4.2 বিলিয়ন ডলার।
- দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দিনগুলো থেকে ভারত তার পর্যটনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বাজেটে এই বাবদ ব্যয় বরাদ্দ অনেক বাড়িয়েছে

শব্দার্থ ও টীকা

এবং পর্যটনকে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করেছে।

- বিশ্ব পর্যটনে ভারত 35ম স্থান থেকে কিছুটা উপরের দিকে উঠে এসেছে। মোট জিডিপি (মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদন) 5.3% আসে পর্যটন থেকে।

পাঠগত প্রশ্ন 35.1

1. শিল্প হিসাবে বিবেচিত হবার পক্ষে পর্যটনের চারটি দিক উল্লেখ করুন।
2. কোন্ কোন্ প্রধান কারণে ভারত পর্যটন থেকে খুব কম বিদেশি মুদ্রা অর্জন করছে?

35.4 পর্যটন পরিষেবা: অর্থ ও প্রভাব

ক) পর্যটন খুবই শ্রমিক-নির্ভর শিল্প। পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী এই শিল্পে কর্মীদের বিভিন্ন রকমের পরিষেবা দিতে হয়।

2004 সালে 11.5 মিলিয়ন কর্মী পর্যটনের অতিথি পরিষেবার কাজে নিযুক্ত ছিল। 2014 সালে এই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াতে পারে 28 মিলিয়ন। পরোক্ষভাবে ট্যাক্সি, লাক্সারি কোচ, গাইড, লোকশিল্পী, শিল্প দ্রব্য বিক্রেতা, আর্থিক পরিষেবা, ফোটোগ্রাফি ও ক্রীড়াসামগ্রীর যোগানদার প্রভৃতির কাজও কম লোভনীয় নয়।

হিসাবের মধ্যে আনতে হয় সংশ্লিষ্ট আরও অনেককে। যেমন প্রচার পরিচালনা যারা করে, পর্যটন পরিকল্পনায় যারা বাবুর্চি, সেলস ম্যান, সবাই পর্যটনের পক্ষে অপরিহার্য।

এই শিল্প সুপরিচালনার জন্য অর্থের চেয়েও বেশি দরকার প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর।

শিল্প হিসাবে পর্যটন তার চাহিদা বাড়ায় আরো মানুষকে পর্যটনে উদ্বুদ্ধ করে। আবার পর্যটনই তৈরি করে কৃষি, উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ শিল্প, রাস্তা তৈরি, হোটেল নির্মাণ প্রভৃতি অনেক শিল্পের বাজার। পুরাকীর্তি, ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ, যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস ও স্থান যাকে এখন বলা হয় 'ঐতিহ্য শিল্প' সেগুলিও প্রকৃত পক্ষে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মতো আমরা বিক্রি করি।

10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটন শিল্পে হোটেল ক্ষেত্রে 89টি কর্মসংস্থান হয়। একই টাকায় কৃষি শিল্পে হয় 45টি ও উৎপাদন শিল্পে মাত্র 13টি।

এসব দিকে দৃষ্টি পড়ার ফলে ভারতে পর্যটন শিল্পের বৃদ্ধি ঘটেছে হু হু করে।

খ) ভারতে ভ্রমণরত বিদেশিদের যে পর্যটন পরিষেবা দেওয়া হয় তাকে বলা যায় পর্যটন শিল্পের পরোক্ষ উৎপাদন। এই উৎপাদনগুলির মধ্যে আছে সব রকম আতিথেয়তা পরিষেবা। যত বেশিদিন তারা থাকে তত বেশি টাকা আসে।

আমাদের পরিষেবা দিয়ে পাওয়া টাকা যে কোনো রপ্তানিদ্রব্য বিক্রির দামের মতোই। আবার কার্পেট, হস্তশিল্প, লোকশিল্প ডিজাইনে প্রস্তুত পোশাক প্রভৃতি বিক্রির থেকেও টাকা আসে।

বিদেশি বাণিজ্য যত বাড়ে, পর্যটক, বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং পেশাদারদের ঘন ঘন যাওয়া আসাও ততই বাড়ে। এতে আবার পর্যটন শিল্পেরও বাড়বৃদ্ধি ঘটে।

শব্দার্থ ও টীকা

গ) অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন:

বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যটক মানে বেশি পরিমাণ লোকশিল্প সামগ্রীর চাহিদা। এর মানে ঐ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। এই সুবিধা পেয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকাগুলি।

শিল্পে অনুন্নত বা কম উন্নত কৃষি এলাকায় কৃষি ছাড়া বিকল্প উপার্জনের সুযোগ নেই বললেই চলে। ভারতে এরকম লোকালয়ই অনেক ছড়িয়ে আছে। বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ এসব এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের অন্তত সামাজিক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। মহিলা ও বয়স্কদের আয়ের সুযোগও তৈরি হতে পারে লোকশিল্প সামগ্রী থেকে।

স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লগ্নিকার জমির মালিক, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির সুযোগ বাড়ে বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণের ফলে।

মূল বক্তব্য:

- পর্যটনের উপকারগুলির মধ্যে আছে নতুন কর্মসংস্থান ও নানা উৎস থেকে আয়বৃদ্ধি।
- অনুন্নত এলাকায় স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবার সুযোগ ঘটায় পর্যটন।

পাঠগত প্রশ্ন 35.2

1. পর্যটনের মধ্য দিয়ে দুই প্রকার পরোক্ষ রপ্তানির নাম করুন।
2. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পর্যটক এই দুয়ের মধ্যে কারা বিদেশি মুদ্রা যোগায়?
3. পর্যটনের মাধ্যমে অনুন্নত এলাকার উন্নয়নে তিনটি বিকল্প সম্ভাবনা কী কী?
4. পর্যটনকে পরিষেবা শিল্প বলা হয় কী কারণে?
5. ঐতিহ্য শিল্পের অন্তর্ভুক্ত তিনটি জিনিসের নাম বলুন।

35.5 পর্যটনের সমস্যা

ক) পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব।

খ) স্থানীয় অর্থনীতির উপর চাপ

গ) স্থানীয় সংস্কৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাব।

ক) পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব

পরিবেশ ততক্ষণই পর্যটনের আকর্ষণ হিসাবে অভিপ্রেত, যতক্ষণ এর ক্ষতির পরিমাণ আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়।

এরকম কী কী ক্ষতি হতে পারে?

পরিবহন, যাত্রীবাহী ঘোড়া বা বহু মানুষের পায়ের চাপ অতিমাত্রায় পড়লে মাটি আলগা হয়ে যায়।

ভূমির উপরের স্তরের ক্ষয় হয়। জমাট বরফের উপর অতিরিক্ত চলাফেরায় বরফ গলে যায়। পর্যটকদের নিক্ষিপ্ত বর্জ্য প্লাস্টিক, টিন, রাসায়নিক দারুণ ক্ষতির কারণ হয়। অতিরিক্ত ভিড়ে গাছের চারা, সবুজ নষ্ট হয়। প্রকৃতির ভারসাম্য সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। তাতে দেখা যায় বন্য পশু পাখি মানুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে চায়। ওই সান্নিধ্য সইতে না পেরে অনেক পশু পাখি মারাও যায়। জওহরলাল নেহরুর উক্তি আছে, 'মানুষ যে ক্রমে বন্য হয়ে উঠছে কেবল তা নয়, মানুষ যে-কোনো বন্য পশুর চেয়েও হিংস্র, সভ্যতা সংস্কৃতি থাকা সত্বেও।'

পর্যাপ্ত টাটকা জল পর্যটনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। ভারতের মত ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় এর অভাব বেশি। অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যায় পর্যটক জলের অভাব দেখলে দ্বিতীয় বার সেই এলাকায় যাওয়ার উৎসাহ হারাবে। বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের স্তূপ পর্যটকের বিরক্তি ঘটায়।

যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে নিসর্গশোভা/ বন্যপ্রাণ/ সাংস্কৃতিক আকর্ষণ/ প্রাকৃতিক ভারসাম্য পর্যটনের ভিত। এই ভিত মজবুত করতে হলে এই চারটির সংরক্ষণ অবশ্য পালনীয়।

অনেক প্রাচীন স্থাপত্য স্মৃতির রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হয় না। অধিক সংখ্যক পর্যটকের যাতায়াতের ফলে ইতিমধ্যে ইলোরা অজন্তা এলিফেন্টার গুহায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এতে গুহার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গুহাচিত্র নষ্ট হচ্ছে। বিমান অবতরণের আওয়াজের আঘাতে ক্ষতি হয়েছে খাজুরাহোর ভাষ্কর্য। আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদের ফলে দিল্লির যন্তরমন্তরের সৌরগণনা আর নির্ভুল হতে পারছে না। নিকটস্থ মথুরা তেলশোধন কারখানার বর্জ্য তাজমহলের অনুপম সৌন্দর্যের ক্ষতি করেছে। এসব ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বেড়ে চলেছে অপরিকল্পিত পর্যটক সংখ্যার ফলে।

সংখ্যাধিক্যের চাপে ক্ষতির মুখে পড়েছে পক্ষীনিবাস, অভয়ারণ্য, ম্যানগ্রোভ অরণ্য, ফলে এগুলির উপর নির্ভরশীল মানুষের উপার্জনেও টান পড়েছে।

মূল বক্তব্য:

- পরিবেশের সব উপাদান— মাটি, ফুলপল্লব, পশুপাখি, ঐতিহ্যবাহী স্মারককে বিপুল সংখ্যক পর্যটকদের চাপমুক্ত রাখা দরকার।
- কেবল সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে হবে না, স্থানীয় বাসিন্দাদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা করা হলে তবে পর্যটন শিল্প দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

খ) স্থানীয় অর্থনীতির উপর চাপ

অনিয়ন্ত্রিত পর্যটক সংখ্যা স্থানীয় সম্পদের উপর বিরাট চাপ ফেলে।

পর্যটনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অর্থ চলে যায়। এতে উন্নয়ন বাড়ে। কিছু নতুন ঘটনা তৈরি হয়। জমির দাম বাড়ে হোটেল ইত্যাদি তৈরির জন্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ে। লোকজনের কর্মসংস্থান বাড়ে। এসব ভালো দিক।

কিন্তু এর খারাপ দিকও আছে, যেমন, পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্রে বিশেষ সময়ে পর্যটক বাড়লে জল ও বিদ্যুতের সংকট হয়। পরিবহন নির্দিষ্ট সংখ্যক হওয়ায় তার সমস্যা তৈরি হয়। এতে স্থানীয়দের সমস্যা বাড়ে। কর্মসংস্থান বাড়লেও সামাজিক সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়। এরকম অনেক কিছুই অস্থায়ীভাবে হলেও সেটা সমস্যাই। একজায়গায় কর্মপ্রার্থী বেশি হলে কমসংস্থানের সমস্যা হয়। এর সমাধান হতে পারে যদি পর্যটক সংখ্যা পর্যটন কেন্দ্রের সংকুলান ক্ষমতা অনুযায়ী হয়। কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা একটা জায়গায় খুব বেশি বেড়ে যাওয়াটাকেও আটকানো

শব্দার্থ ও টীকা

দরকার।

মূল বক্তব্য:

- পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের ভিড় বাড়লে কর্মীদের বেতন বাড়ে, জমির দাম বাড়ে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ে।
- স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটক উভয়ের মিলিত চাহিদা সামাল দিতে পারে না সীমিত জল ও বিদ্যুতের যোগান। এতে ভীষণ কষ্টে পড়ে স্থানীয়রাই।
- পর্যটন কেন্দ্রের সংকুলান ক্ষমতা অনুযায়ী পর্যটক সংখ্যাকে সীমিত রাখা গেলে এবং কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যায় রাখা গেলে এসব সমস্যার সমাধান হয়।

গ) স্থানীয় সংস্কৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাব

কম উন্নত দেশ ভারতে পর্যটনের অর্থনৈতিক সুবিধা সর্বদাই কাম্য। কিন্তু এর সামাজিক ফলাফল সবসময় সুখের হয় না। স্বাধীন ভারতে স্বদেশি শিল্প সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি গর্ববোধ সৃষ্টি হয়েছে দেশবাসীর মধ্যে। তার উপর বিন্দুমাত্র আঘাতও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় সৈকত নগরী মহাবলীপুরমকে পূর্ণাঙ্গ পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টিতে। বিদেশি দম্পতির বালুকাবেলায় অবাধে শুয়ে থাকা, রীতিমত ফ্যাশান শো ভারতীয় রুচিতে অশোভন। ধনীদের একাংশ যখন যুক্তি দেয় এসব আকর্ষণ এখানকার অর্থনীতিতে প্রাচুর্যের বান ডাকবে তখন বাকিরা ভাবেন স্বাধীন ভারতে আবার বিদেশি অপসংস্কৃতির উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এরই ফলে শুরু হয়েছিল মহাবলীপুরমের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ।

অনুরূপ সংঘর্ষ ঘটতে পারে প্রধানত 3টি কারণে:

ক) উৎপাদিত দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য উৎপাদনকারী নিজে পাচ্ছেন কম, বেশিটাই খেয়ে নিচ্ছে দালাল বা বিক্রয়কারী পরিষেবার কর্মীরা। তাছাড়া পর্যটকদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন রীতি হচ্ছে নিতান্তই বাণিজ্যিক, এতে স্থানীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন হয় না। এই সব আর্থসামাজিক কারণে পর্যটনের প্রসারে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারে।

খ) পর্যটকের মুখোমুখি হলে তারা বিনা ভূমিকায় বিক্রয়লব্ধ পণ্য হিসাবে স্থানীয় পুরুষ ও মহিলার ফোটো তুলতে যায়। এতে বিদেশিদের সম্বন্ধে একটি সন্দেহ দানা বাঁধে। কখনো বা প্রয়োজনীয় রীতিনীতি না মেনে মন্দিরে, উৎসব অনুষ্ঠানে বিদেশিদের অবাধ প্রবেশ স্থানীয়দের ক্ষুব্ধ করে। এতে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির ফলে বিদেশিরা স্থানীয়দের বিরাগ ভাজন হয়।

গ) বহিরাগত পর্যটকরা স্থানীয় যুবকদের বিশেষ করে যুবতীদের চিরাচরিত ঘরোয়া জীবনের গণ্ডি ছেড়ে বাইরে আসার বাসনা জাগিয়ে তোলে। এটাকে স্থানীয় সমাজ ওদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো বলে ভেবে নেয়। এখনকার পর্যটক প্রধানত মজার খোঁজ করে। সব সময় ছেলে-মেয়েতে অবাধ মেশামেশি, পর্যটকদের অনুকরণে স্বল্পবাস পরার প্রবণতা, ওদের মতো বিজাতীয় খাদ্যাভ্যাস স্থানীয় ঐতিহ্যকে কালক্রমে শিথিল করে তোলে। অনেক সময় স্থানীয় তরুণরা পর্যটকদের অনুকরণে বিলাসী জীবন কাটাতে গিয়ে তাদের আয় তাদের পরিবারের প্রয়োজনে দিতে পারে না। তবে ঘনঘন আসা যাওয়া ঘটানো হলে বহিরাগত সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় কেটে যাবে। শিক্ষার অগ্রগতি ঘটলে স্থানীয় সংকীর্ণতা দূর হবে। পর্যটনের ফলে সম্পদ এবং কর্মদক্ষতা বাড়বে।

ফলে স্থানীয় মানুষের ঐতিহ্যবোধ সংকীর্ণতা মুক্ত হবে। পরস্পরের সাংস্কৃতিক তথ্য ও ভাব বিনিময় যদি উভয়ের সম্মতিতে হয় তাহলে এ ধরণের সংঘর্ষ কম হবে।

মূল বক্তব্য:

- বিদেশি ট্যুরিস্ট ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে সংঘাত প্রকৃতপক্ষে দুটি সংস্কৃতির সংঘর্ষ। অনেক পর্যটন কেন্দ্রেই এটা ঘটে।
- পর্যটক ও স্থানীয়দের সম্পর্ক নিতান্তই বাণিজ্যিক ও পরিষেবার ক্রেতা বিক্রেতা সম্পর্ক।
- স্থানীয়দের কেবল পণ্যসামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা স্থানীয় মানুষের বিরক্তি ও ক্ষোভের কারণ ঘটায়।
- বিদেশি পর্যটকরা বহুক্ষেত্রে অপরিমিত স্ফুর্তির সন্ধানী। তারা অভাবগ্রস্ত সমাজের মানুষের মধ্যে এসে স্থানীয় মানুষের আর্থসামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে।
- পর্যটকদের অনুকরণ করতে গিয়ে স্থানীয় তরুণ তরুণীরা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়। এটা গণ পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাব।

35.6 সমাধানের পদক্ষেপ

পর্যটন শিল্পের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার যেমন পর্যটন কেন্দ্র প্রসার ও পর্যটন নিয়ন্ত্রণের নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন তেমনি বেসরকারি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় ট্রাস্টগুলিও এগিয়ে এসেছেন প্রচলিত কেন্দ্রগুলিকে পর্যটক প্রচারের চাপমুক্ত রাখতে, সরকারি পদক্ষেপগুলি যাতে কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করতে। তাঁরা পুরোনো জলসরবরাহ কেন্দ্রগুলি আবার চালু করতে উদ্যোগী হয়েছেন। যেমন কূপ খনন, জলাশয় সংস্কার ও খনন। তাঁরা পুরোনো পান্থশালাগুলির সংস্কার করছেন। পর্যটকের কাছ থেকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে কেন্দ্রকে বর্জ্যমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করেন। প্রাচীন পুরাকীর্তিস্থানে যথেচ্ছ যাতায়াত বন্ধ করতে প্রবেশবিধি প্রণয়ন করতে হবে সরকারকে। সর্বাধিক সমাবেশের সময় বহু পর্যটকের সমাগম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পর্যটকরা যাতে যাওয়া-আসা নির্দিষ্ট পথে করে সেটার ওপর কড়া নজরদারি দরকার। পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের পরিত্যক্ত বর্জ্যমুক্ত রাখার জন্য সামান্য শুল্ক নির্ধারণের কথা সরকার বিবেচনা করছে।

অসংখ্য খাবার দোকান খুলে উঁচু পার্বত্য পর্যটন কেন্দ্রের বাণিজ্যিকীকরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

অতিথি-পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে সহযোগিতা এখন বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভরতপুরে ন্যাশনাল পার্কের চারপাশের কৃষকরা খরার সময় যদি খালের কিছু জল ছেড়ে না দেয় তাহলে পর্যটকদের ক্ষতি হবে, তাদেরও লাভ হবে না।

মূল বক্তব্য:

- সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসছেন।
- সরকারকে প্রয়োজনীয় বিধি নির্দেশ আরোপ করতে হবে পুরাকীর্তিগুলিকে পর্যটকদের যথেচ্ছ আচরণের হাত থেকে রক্ষা করতে।
- বহিরাগত পর্যটক আর স্থানীয় সমাজ উভয়ের সহযোগিতার অভাব ঘটলে পর্যটনশিল্প বা এলাকার উন্নয়ন কোনোটাই হবে না।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 35.3

1. গণপর্যটনের তিনটি নেতিবাচক প্রভাবের উল্লেখ করুন।
2. খাজুরাহো ভাস্কর্যের ক্ষতির কারণ কী?
3. জনমতের চাপে স্থানীয় পরিবেশ রক্ষা পাবার দুটি দৃষ্টান্ত দিন।
4. অতিসংখ্যায় পর্যটনের চাপের সমস্যা থেকে পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে মুক্ত রাখার তিনটি পদক্ষেপ উল্লেখ করুন।

35.7 আপনি যা শিখলেন

1. বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা এবং বিদেশি মুদ্রা অর্জনের হিসাবে ভারত বিশ্বপর্যটনের ক্ষেত্রে এখনো অনেক পিছিয়ে। দেশের বিদেশি বাণিজ্য থেকে আয়ের এক তৃতীয়াংশ আসে পর্যটন শিল্প থেকে। পর্যটন শিল্পে কম বিনিয়োগে বেশি কর্মসংস্থান হয়। এর ফলে অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ঘটে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।
2. আন্তর্জাতিক পর্যটনে বাইরে পণ্য না পাঠিয়েও পরোক্ষ উৎপাদন রপ্তানি করে রপ্তানির উন্নতি ঘটায়। এই পরোক্ষ উৎপাদন বলতে বোঝায় বিদেশিদের প্রতি আতিথেয়তা ও পরিষেবা। তা ছাড়া হস্তশিল্পের মতো লোভনীয় সামগ্রী বিক্রি হয় প্রচারের জন্য কোনো ব্যয় না করে।
3. প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রত্ন সম্পদ ও ধ্বংসাবশেষ আকর্ষণীয় থাকে অতিরিক্ত পর্যটকের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগে অবধি। অনিয়ন্ত্রিত গণপর্যটন পর্যটন এলাকায় প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। আবাসন সংকুলান অনুযায়ী পর্যটক নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক যাতে স্থানীয় দুর্গতি না হয়।
4. বিদেশি পর্যটকের অনুকরণের ফলে স্থানীয় তরুণসমাজ যাতে ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার কবলে না পড়ে সে সম্বন্ধে সতর্কতা জরুরি।
5. পর্যটনের প্রসারের লক্ষ্যে এখন সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও এগিয়ে আসছে।

35.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. **সংক্ষেপে উত্তর দিন:**
   i) নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষির চেয়ে পর্যটন কেন বাঞ্ছনীয়?
   ii) বিদেশি পর্যটক ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে সংঘাতের তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।
   iii) পর্যটন কীভাবে অনুন্নত এলাকা থেকে মানুষের চলে যাওয়াকে আটকাতে সাহায্য করে?
2. **দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখান**
   i) পরোক্ষ রপ্তানি ও প্রত্যক্ষ রপ্তানি
   ii) স্থানীয় তরুণদের উপর বিদেশি পর্যটকদের প্রভাব ও স্থানীয় সমাজের উপর বিদেশি পর্যটকদের প্রভাব।
   iii) পান্থশালা ও পর্যটন আবাস
3. **ভারতে বিদেশি পর্যটক টানার জন্য তিনটি পদক্ষেপের কথা বলুন।**

4. **পর্যটনের পক্ষে পরিবহনের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।**

5. **ব্যাখ্যা করুন**
   i) পর্যটন শিল্প অনেকগুলো শিল্পের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।
   ii) স্থানীয় পরিবেশের উপর পর্যটনের প্রভাব।

35.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

35.1 1) **i)** কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ii) ব্যক্তিগত ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা
iii) রাজ্যগুলি পরিকল্পনার বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন
iv) সরকার ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সহযোগিতা

2) **i)** সরকারের উদ্যোগের অভাব
ii) পর্যটনের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব।
iii) দেশে অর্থনৈতিক অনুন্নতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা

35.2 1) (ক) আতিথেয়তা ও আনুষঙ্গিক পরিষেবা (খ) হোটেলের সুবিধা

2) বৈদেশিক

3) **(i)** পর্যটনের মাধ্যমে আরো অর্থ আসা
(ii) পর্যটকদের পরিষেবার অর্জিত অর্থে স্কুল, হাসপাতাল গড়ার সুযোগ।
(iii) কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে পারিবারিক সংকীর্ণ গন্ডি থেকে মেয়েদের মুক্তি ও ক্ষমতায়ন।

4) কারণ এই শিল্প পর্যটকদের প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা যোগায়।

5) পুরোনো স্মৃতি স্তম্ভ, স্বাধীনতা উত্তরকালে নির্মিত আকর্ষণীয় সৌধ এবং চিত্র ও কারুশিল্পের যাদুঘর।

35.3 1. (ক) অতিরিক্ত মাত্রায় পর্যটনের চাপে স্থানীয় পরিবেশের ক্ষতি।
(খ) পর্যটকদের বিলাসবহুল জীবনের অনুকরণ করতে গিয়ে স্থানীয় সামাজিক ঐতিহ্য শিথিল।
(গ) স্থানীয় প্রত্ন সম্পদকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে গণ্য করার জন্য স্থানীয় মানুষের গর্ববোধে আঘাত।

2. রানওয়ে মন্দিরের কাছে বলে বিমান ওঠানামার কম্পন।

3. **i)** জনমতের অনুকূলে কোর্টের নির্দেশে তাজমহলের চারিদিকে ১০,৫০০ বর্গ কিমি জঞ্জাল মুক্ত হওয়া।
ii) মহাবলীপুরমকে পুরোপুরি পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা থেকে সরে আসা জনমতের চাপে।

4. (ক) বেসরকারি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় ট্রাস্টগুলির সংরক্ষণ উদ্যোগ।
(খ) প্রাচীন পুরাকীর্তিস্থলে যথেচ্ছ বিচরণ বন্ধ করার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ।
(গ) অতিথি-পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

ঐচ্ছিক

33. খ গণজ্ঞাপন

34. খ গণজ্ঞাপনের পরিকাঠামো

35. খ গণজ্ঞাপনের সমস্যা ও সমাধান

শব্দার্থ ও টীকা

33 খ

গণজ্ঞাপন

সংজ্ঞা-গুরুত্ব-প্রকারভেদ— সমস্যা ও প্রতিকার

33.1 প্রস্তাবনা

সমাজে নানা প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় প্রয়োজন। ডাক্তারকে জানাতে হয় অসুখের কথা। বিক্রেতাকে জানাতে হয় ক্রেতা কোন জিনিসটা কিনতে চায়। কন্ডাকটরকে জানাতে হয় কোথায় যাবে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাবামায়ের কোনো কথা হয় না— এমন পরিবার ভাবা যায়? ছাত্ররা শিক্ষককে কিছু জানায় না— এমন ক্লাশের কথা ভাবতে পারেন? কাজেই সমাজে বাঁচার জন্য দরকার একের কথা অন্যকে জানানো। এই জানানোর প্রক্রিয়াকেই বলে জ্ঞাপন। তবে জ্ঞাপনের পরিধি অর্থাৎ জ্ঞাপনের লক্ষ্য কতটা বিস্তৃত তার উপর জ্ঞাপনের প্রকৃতি নির্ভর করে। জ্ঞাপনের পরিধি যদি কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাকে বলতে পারি ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞাপন। আর জ্ঞাপনের লক্ষ্য যদি হয় সমাজ বা দেশের বৃহত্তর অংশের জনগণ তবে তাকে বলা হবে গণজ্ঞাপন (Mass Communication)। প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি নানা সমাজমুখী কাজে গণজ্ঞাপন খুবই উপযোগী।

যেসব উপকরণের মাধ্যমে গণজ্ঞাপন করা তাদের বলা হয় গণজ্ঞাপনের মাধ্যম, সংক্ষেপে গণমাধ্যম (Mass Media)। গণজ্ঞাপনের প্রচলিত মাধ্যমে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। সংবাদপত্রের যুগ ছাড়িয়ে আমরা পৌঁছে গেছি রেডিয়ো, ফিল্ম, টিভি, ইন্টারনেটের যুগে। এ সবই হল বিভিন্ন গণজ্ঞাপন-মাধ্যম। চোখের বাইরে থাকা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশাল দর্শক ও শ্রোতার কাছে এসব মাধ্যমে জানানো যায় নানা তথ্য ও ঘটনা।

এই পাঠে আমরা শিখব গণজ্ঞাপন বলতে কী বোঝায়, শিখব তার প্রকারভেদ। গণতন্ত্রের রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ও দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম কী ভাবে সাহায্য করে তার বিষয়, সমাজে গণমাধ্যমের কী ভূমিকা, গণমাধ্যমের ভালো ও মন্দ প্রভাব নিয়েও এই পাঠে আলোচনা করা হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

33.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি করতে পারবেন —

- গণজ্ঞাপনের সংজ্ঞা নির্ণয়।
- বিভিন্ন জ্ঞাপনকর্মের ব্যাখ্যা।
- গণজ্ঞাপনের উৎস বর্ণনা।
- গণমাধ্যমের বিভিন্ন রূপগুলির তফাত।
- প্রথাগত বা চিরাচরিত গণজ্ঞাপন মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য।

33.3 গণজ্ঞাপনের সংজ্ঞা

আগেই বলা হয়েছে জ্ঞাপনের লক্ষ্য যদি হয় দেশ বা সমাজের বৃহত্তর অংশের জনগণ তবে তাকে বলে গণজ্ঞাপন। গণজ্ঞাপনের প্রক্রিয়ায় সমাজের বৃহত্তর অংশে প্রয়োজনীয় নানা বার্তা ও তথ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। কীভাবে এগুলো প্রেরিত হয়?— সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে। তাই এগুলিকে বলে গণমাধ্যম।

33.4 গণজ্ঞাপনের নানা প্রক্রিয়া

ব্যক্তিগতভাবে কথার সাহায্যে, আকারে ইঙ্গিতে, শারীরিক ভাষায় নিজের ভাব অন্যকে জানানো যায়। কিন্তু গণজ্ঞাপনের জন্য নানা উপকরণের সাহায্য নিতে হয়। যুগে যুগে এই সব উপকরণের নানা পরিবর্তন ঘটেছে। ঘোড়ার ডাক (শেরশাহ আমলে), যুদ্ধ-পায়রার যুগ পেরিয়ে বার্তা প্রেরণ প্রক্রিয়া পৌঁছে গেল 1835 সালে স্যামুয়েল মোর্স আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফের যুগে।

1839 সালে জোসেফ (Goseph Niepce) ও লুই (Louis Daguerre) ফোটোগ্রাফি আবিষ্কার করার ফলে ছবিসহ বার্তা জ্ঞাপনের কাজ শুরু হল। কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবন আধুনিক গণজ্ঞাপনের প্রথম পদক্ষেপ। 1901 সালে মার্কনি আবিষ্কৃত বেতারের সাহায্যে কণ্ঠস্বর দূরে প্রেরণ সম্ভব হল। 1947 সালে ট্রানজিস্টরের উদ্ভাবন রেডিওকে খুবই জনপ্রিয় করে তোলে। 1920 সালে বেয়ার্ড উদ্ভাবন করলেন টেলিভিশন। তাকে উন্নত করা হল। এবার কণ্ঠস্বর এবং ছবি দূরে পাঠাবার পথ করে দেবার ফলে গণমাধ্যমে যে কোনো দূরত্বে বার্তা পাঠাবার বাধা আর রইল না।

গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম— দুয়ের মধ্যে আসলে তফাতটা কী? জনগণকে জানানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে গণজ্ঞাপন, আর যে উপকরণের মাধ্যমে গণজ্ঞাপন করা হয় তাকে বলে গণমাধ্যম। যেমন মাইক্রোফোনে কিছু বলা বা ঘোষণা করা হচ্ছে গণজ্ঞাপন আর মাইক্রোফোনের মাধ্যমে এই গণজ্ঞাপন করা হয় বলে মাইক্রোফোন হচ্ছে এক ধরণের গণমাধ্যম।

বহু মানুষকে জ্ঞাপনের প্রথম আধুনিক মাধ্যম সংবাদপত্র। তবে গণমাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রের নানা সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রথমত এতে সময় লাগে। কারণ সংবাদ সংগ্রহ, সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করা, ঝাড়াইবাছাই, সম্পাদনা ইত্যাদির শেষ হলে তখন ছাপার কাজ, বিলি ব্যবস্থার কাজ। তাছাড়া সংবাদপত্র থেকে

শব্দার্থ ও টীকা

বার্তা পাবার জন্য পাঠকের লেখাপড়া জানা চাই। কিন্তু সমাজে সবাই সাক্ষর না-ও হতে পারে। এরকম কিছু অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে উন্নততর জ্ঞাপন মাধ্যমের জন্য মানুষ সচেষ্ট হল। এই চেষ্টার শেষ নেই।

পাঠগত প্রশ্ন 33.1

(ক) গণজ্ঞাপনের সংজ্ঞা একটি বাক্যে লিখুন।

(খ) গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম— এ দুটির মধ্যে সম্পর্কটি বুঝিয়ে দিন।

33.5 গণজ্ঞাপনের গুরুত্ব

ব্যক্তির পক্ষে বা সমাজের পক্ষে গণজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য নানাভাবে কাজ করে যায়। গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, কুষ্ঠ ও এইডস সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভীতিজনক একটা ধারণার কথা ধরা যাক। সাধারণের একটি ভুল ধারণা আছে যে রোগবহনকারীকে ছুঁলেই রোগ সংক্রামিত হবে। বেতার, টিভি এই ভুল ধারণাটি ভেঙে দেবার জন্য নানা অনুষ্ঠান করে। দর্শক যখন দেখে যে অনেকে কুষ্ঠ বা এইডস রোগীকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে বসছে কিন্তু তাদের দেহে ওই রোগ সংক্রামিত হচ্ছে না, তখন সকলের ভুল ভেঙে যায়। কিংবা ধরুন পোলিও। গণমাধ্যমে পোলিও খাওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে নানাভাবে প্রচার করা হয়। ফলে বহুসংখ্যক শিশুকে পোলিও খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে।

সমাজের ভালোর জন্য অনেক পুরনো প্রথাকে বাদ দিতে হয়, পুরনো যন্ত্রপাতির জায়গায় উন্নততর নতুন যন্ত্রপাতির দরকার হয়, পুরোনো প্রযুক্তি নাকচ করে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। তাতে ফলাফলের পরিমাণ ও গুণমান দুই-ই বাড়ে। এবং তাতে অনেক সমস্যার নিরসন হয়। এই সব নতুন উপকরণ তাদের প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তাতে ভালো ফললাভ প্রভৃতি টিভিতে হাতে কলমে দেখানো হলে ব্যবহারকারীদের সেকেলে মনোভাব দূর হয়ে নূতনকে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তোলা সহজ হয়ে যায়।

গণজ্ঞাপন পৃথিবীকে ছোটো করে আনে, কাছে নিয়ে আসে। ধরুন ক্রিকেট ম্যাচের কথা। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের ম্যাচ হচ্ছে সে সব দেশে। সেটা প্রত্যক্ষ দেখানো হচ্ছে টিভিতে। মনে হবে না কি ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ঘরের মধ্যে চলে এসেছে? তেমনি সারা পৃথিবী জুড়ে ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেট পৃথিবীর দেশ ও মানুষকে কাছে এনে দিয়েছে।

গণজ্ঞাপন পণ্য বিজ্ঞাপনের উন্নতি ঘটায়। বিভিন্ন জিনিস ও পরিষেবাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরে। ক্রেতারা বুঝতে পারে তেল থেকে টেলিভিশন, ব্যাঙ্কিং, বিমা, চিকিৎসা, প্রভৃতির দাম, খরচ ও কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে তার হদিস।

পাঠগত প্রশ্ন 33.2

(ক) গণজ্ঞাপনের দুটি গুরুত্বের কথা উল্লেখ করুন।

(খ) গণজ্ঞাপন কীভাবে সাধারণের ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

33.6 গণজ্ঞাপনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারে গণজ্ঞাপনের কাজ চলে। যার মাধ্যমে গণজ্ঞাপনের কাজ চলে তাকে বলে গণজ্ঞাপনের মাধ্যম, সংক্ষেপে গণমাধ্যম। যে সব মাধ্যমে গণজ্ঞাপনের কাজ চলে সেগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে—

i) চিরাচরিত মাধ্যম (Traditional Media)

এই মাধ্যমের সব উপকরণই আমাদের একেবারে দেশজ, আমাদের সমাজের সংস্কৃতির গভীরে আছে এর শেকড়। ট্যাঁড়া পেটানো বা ঢোল বাজিয়ে কোনো দরকারি ঘোষণা গণজ্ঞাপনের একটি সুপ্রাচীন প্রথা। এছাড়া মেলা ও উৎসবের অঙ্গ হিসাবে স্বতস্ফূর্ত নাচগান প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এই চিরাগত নাচগান আমাদের লোকসমাজে শিক্ষা, বিনোদন ও জ্ঞাপনের মাধ্যম হয়ে গেছে।

আধুনিক কালের দ্রুতগতির মাধ্যমগুলো এর ওপর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এই প্রাচীন মাধ্যম যেমন দর্শক ও শ্রোতা উভয়ের পরিচিত, রেডিও টিভিতে সে সুযোগ নেই। এগুলো অনুষ্ঠিত হয় পরিচিত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। বিষয়বস্তু প্রদর্শক ও শ্রোতা উভয়ের জানা, ভাষা-ভঙ্গিও পরিচিত। আধুনিক মাধ্যম যেমন একসময় দর্শক শ্রোতাকে ক্লান্ত করে, প্রথাগত পুরোনো মাধ্যম কিন্তু কখনো ক্লান্তিকর হয় না।

রামলীলার রামকাহিনি সকলের জানা। একই কাহিনি অভিনীত হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। তবু প্রত্যেকবারই বহুসংখ্যক শ্রোতা দর্শক এতে ভিড় করছে। সাধারণ ফিল্ম আপনি কতবার দেখতে পারবেন?

প্রথাগত প্রাচীন মাধ্যম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। কতগুলোর বিষয় এক হলেও আঙ্গিক বিভিন্ন। যেমন গল্পবলা বা কথকতা, লোকগান, পথনাটক, পুতুলনাচ।

ii) মুদ্রিত মাধ্যম (Print Media)

মৌখিক জ্ঞাপনে বক্তা ও শ্রোতা দুজনের সরাসরি অংশগ্রহণ থাকে।

লিখিত জ্ঞাপনে বক্তা একতরফা লিখে জানায়। এজন্য লেখককে অনেক কাজ একা করতে হয়।

লিখিত ভাষার আবিষ্কার চিনেই প্রথম বলে ধরা হয়। কাগজের আগে হরফ লেখা হত গাছের পাতায় বা বাকলে, শিলায়, চামড়ায়, মাটির পাটায়, ধাতুর পাতে।

15 শ শতাব্দীতে জোহান গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে লিখিত মাধ্যমের বিপুল প্রসার ঘটে। সাময়িক পত্রে, সংবাদপত্রে, জার্নালে বিশ্বের কোথায় কী ঘটেছে সব জানা যাচ্ছে। সংবাদপত্র হচ্ছে আধুনিক গণজ্ঞাপন মাধ্যম। এ ছাড়াও আছে চিঠি, নোটিশ, আদেশনামা, রিপোর্ট, প্রশ্নপত্র, ম্যানুয়াল, পত্র-সংবাদ, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, বইপুস্তক, বুলেটিন ইত্যাদি।

আপনার লেখাপড়া সবটাই কাগজনির্ভর। পাঠ্যবই, নোটবই, প্রশ্নপত্র ভর্তির ফরম, দরখাস্ত, উত্তরপত্র বা পোস্টার হ্যান্ডবিল কোনো কিছুই কাগজ ছাড়া চলে না। কাগজ সর্বত্র পাওয়া যায় বলে ভাবনা চিন্তা, ধ্যান ধারণার বিনিময় সম্ভব হয়েছে। সাহিত্য জগতে কাগজের ভূমিকা অসামান্য। শিক্ষা, শিল্পকলা, জ্ঞানচর্চা, বিনোদন বাণিজ্য— সব কিছুতে কাগজ অপরিহার্য। এমন কি বাস, ট্রাম, প্লেন, ট্রেন প্রভৃতির টিকিট, তাতেও কাগজ চাই।

মুদ্রণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জার্মানির গুটেনবার্গ সাহেবের মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবন। তারপর থেকে মুদ্রণ জগতে যুগান্তকারী সব পরিবর্তন ঘটেছে।

তথ্য ও জ্ঞান যা ছিল সমাজের ছোটো একটি অংশের একচেটিয়া, ক্রমে তার বহুল প্রসার ঘটে সমাজের

শব্দার্থ ও টীকা

সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসার সম্ভব হয়েছে কাগজে হরফ মুদ্রণের ফলে। স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, বইয়ের দোকান পাঠককে বইয়ের যোগান দেয়। খবরের কাগজ ম্যাগাজিন এখন খুবই জনপ্রিয় মুদ্রিত মাধ্যম।

গুটেনবার্গের সময় পেরিয়ে নতুন নতুন যন্ত্র আর প্রযুক্তি এখন মুদ্রণকে নিয়ে গেছে অত্যন্ত উন্নত মানে, সূক্ষ্ম সব প্রযুক্তি কৌশলের স্তরে। প্রেস এখন অতি দ্রুতগতিতে অত্যন্ত উন্নত মানের মুদ্রণ সম্পন্ন করতে পারে।

কাজ: কাছাকাছি কোনো ছাপাখানায় গিয়ে দেখে আসুন মুদ্রণের কাজ কী করে চলে।

iii) বৈদ্যুতিন মাধ্যম (Electronic Media)

বেতার: 1835 সালে স্যামুয়েল মোর্স উদ্ভাবন করেন টেলিগ্রাম কোড বা সাংকেতিক শব্দ। 1851 সালে উদ্ভাবিত হয় আন্তর্জাতিক মোর্স কোড। এই সেদিন পর্যন্ত বার্তা প্রেরণের কাজ চলেছে বিদ্যুৎচালিত মোর্সের টেলিগ্রাফ পদ্ধতিতে।

কালক্রমে তার বা কেবল (Cable) ছাড়াই বার্তা প্রেরণ সম্ভব হয়েছে। ট্রানজিস্টার, সেল ফোন (Cell Phone) বিনা তারে বার্তা প্রেরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ফোটোগ্রাফি বা স্থিরচিত্র: ক্যামেরা ও ফোটোগ্রাফ আপনার চেনা জিনিস। 19শ শতকে ফরাসি দেশের Niecpe ও Dagurre উদ্ভাবন করেন ফোটোগ্রাফ। প্রথম দিকে ওগুলো ছিল সাদা-কালো। পরে হয় বহুবর্ণ। 20শ শতকের শেষের দিকে ডিজিটাল প্রণালী ফোটোগ্রাফিকে সহজসাধ্য করে দেয়। ক্যামেরার ব্যবহার সহজসাধ্য হয়। আজকাল তো বহু সেলফোনেই ছবি তোলা যায়।

ফিল্ম বা চলচ্চিত্র: ফোটোগ্রাফকে যদি বলি স্থিরচিত্র তাহলে ফিল্মকে বলতে হবে চলচ্চিত্র। এই প্রক্রিয়া উন্নত হয়ে চলমান চিত্র বা মুভি হয়ে যায়। আসলে ওই স্থিরচিত্রই খুব দ্রুতলয়ে ফিল্মের উপর প্রতিফলিত হলে ছবিগুলোকে চলমান দেখায়। এরজন্য ব্যবহৃত ক্যামেরাকে বলে মুভি ক্যামেরা। চলমান ছবির সঙ্গে কথা ও আওয়াজ যুক্ত হয় আলভা এডিসন ও ল্যুমিয়ের দুজনের চেষ্টায়। ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ভারতে এলে বোম্বাই (এখন মুম্বাই) শহরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

আমেরিকার হলিউডের মতো ভারতেও চলচ্চিত্রের কৃৎকৌশল গৃহীত হয়। প্রথমে নির্বাক ও পরে সবাক চলচ্চিত্র বা টকি (talkie) দেখানো হয় 1927 সালে। প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র **'হরিশচন্দ্র'** ও প্রথম টকি **'আলম আরা'** নির্মাতা দাদা সাহেব ফালকে।

রেডিও: কৌতূহল ও গবেষণার ফসল রেডিও এখন একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। পশ্চিমের দেশে প্রথম আবিষ্কৃত হলেও আমাদের দেশে রেডিও প্রথম চালু হয় 1920 সালে বোম্বাই শহরে। প্রথম বেতার কেন্দ্রও স্থাপিত হয় ওই শহরে।

টেলিভিশন: বিংশ শতকের প্রযুক্তি বিদ্যার বিস্ময় 1920 সালে বেয়ার্ড উদ্ভাবিত টেলিভিশন। ভারতে টেলিভিশন চালু হয় 1959 সালে দিল্লিতে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে পরে ধীরে ধীরে এর প্রসার ঘটে, জনপ্রিয়তা বাড়ে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 33.3

(ক) দুটি চিরাচরিত গণমাধ্যমের উল্লেখ করুন।

(খ) কোনটি বৈদ্যুতিন মাধ্যম, কোনটি মুদ্রিত মাধ্যম বন্ধনীতে দেখান। বৈদ্যুতিন হলে বন্ধনীতে (ব), মুদ্রিত হলে বন্ধনীতে (ম) দিন।

1. প্রশ্নপত্র ( )
2. চলচ্চিত্র ( )
3. ট্রানজিস্টার ( )
4. হ্যান্ডবিল ( )

33.7 আপনি যা শিখলেন

1. গণজ্ঞাপন বলতে কি বোঝায়
2. মানুষের জীবনে গণজ্ঞাপনের গুরুত্ব
3. গণজ্ঞাপন কীভাবে ভুল ধারণাকে দূর করতে সাহায্য করে
4. গণজ্ঞাপনে বিভিন্ন মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য

33.8 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. দৃষ্টান্ত দিয়ে গণমাধ্যমের অর্থ বুঝিয়ে দিন।
2. গণমাধ্যমের বিভিন্ন কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
3. গণমাধ্যমের বিভিন্ন আঙ্গিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

33.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

33.1. ক) সংজ্ঞা দেখুন।

33.1. খ) জনগণকে জানানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে গণজ্ঞাপন, আর যে উপকরণের মাধ্যমে গণজ্ঞাপন করা হয় তাই হল গণমাধ্যম। মাইকে কিছু বলা বা ঘোষণা করে হচ্ছে গণজ্ঞাপন আর মাইক যন্ত্রটি হচ্ছে গণমাধ্যম।

33.2. ক) ভুল ধারণা দূর, পণ্যের প্রচার।

33.2. খ) এইডস ও কুষ্ঠ রোগের প্রসঙ্গ লিখুন।

33.3. ক) নিজে লিখুন।

33.3. খ) **1)** (ম) **2)** (ব) **3)** (ব) **4)** (ম)

শব্দার্থ ও টীকা

34 খ

গণজ্ঞাপনের পরিকাঠামো

34.1 চিরাচরিত মাধ্যম

আপনার নিশ্চয় মনে পড়বে কোনো নাচ, গান, বা যাত্রা, থিয়েটারের কথা। আপনি নিশ্চয় দেখেছেন কোনো উৎসব অনুষ্ঠান। আপনার কি মনে হয় না ওগুলো শিক্ষার বা বিনোদনের মাধ্যম?

প্রাচীন যুগে যখন প্রচার মাধ্যমের কোনো উন্নত ব্যবস্থা ছিল না তখনো মানুষ পরস্পরের সুখ, দুঃখ, আনন্দ বেদনার সংবাদ অভিজ্ঞতা ও তথ্য আদান প্রদান করত। অর্থাৎ প্রাচীন কালেও মানুষের সমাজে এক রকমের গণমাধ্যম প্রচলিত ছিল। তার কিছু কিছু এ যুগেও দেখা যায়। এগুলোই হচ্ছে ট্রাডিশনাল বা চিরাচরিত মাধ্যম। এই পাঠে চিরাচরিত গণমাধ্যমের সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

প্রাচীন যুগ পেরিয়ে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারিত হয়েছে। মানুষ উদ্ভাবন করেছে লেখার হরফ ও ছাপার যন্ত্র। মুদ্রা উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রবেশ করেছে মুদ্রিত মাধ্যমের যুগে। এই পাঠে মুদ্রিত মাধ্যম সম্বন্ধে প্রথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে।

তারপরে আরও উন্নত হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি।। মানুষ পৌঁছে গেছে বৈদ্যুতিন যুগে। উদ্ভাবিত হয়েছে রেডিও, টিভি, মোবাইল, কম্পুটার। ফলে গণজ্ঞাপনের নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। গণজ্ঞাপনের পরিকাঠামো এর ফলে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় হয়েছে। এই পাঠে বেতার ও টিভি বিষয়ে প্রাথমিক কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

34.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি করতে পারবেন —

- ❑ চিরাচরিত মাধ্যমের
  - সংজ্ঞা নির্ণয়;
  - বিভিন্ন আঙ্গিক নির্ণয়;
  - প্রয়োগ;
  - সীমাবদ্ধতা নির্ণয়;

শব্দার্থ ও টীকা

- চিরাচরিত মাধ্যমের
  - সংজ্ঞা নির্ণয় ও সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা;
  - সংবাদপত্রের ধরণ ও গুরুত্ব নির্ণয়;
  - ভারতে সংবাদপত্র প্রবর্তন ও সংবাদপত্রের অবদান ব্যাখ্যা;
  - সংবাদপত্রের প্রভাব ব্যাখ্যা;
- রেডিও বা বেতার মাধ্যমের
  - সম্প্রচারের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা;
  - বেতারের ভূমিকা বিশ্লেষণ;
  - বেতারের সীমাবদ্ধতা নির্ণয়;
- টেলিভিশন মাধ্যমের
  - বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ও কাজের বিশ্লেষণ;
  - বলিষ্ঠতা ও দুর্বলতা ব্যাখ্যা;
  - অন্যান্য মাধ্যম থেকে টেলিভিশনের পার্থক্য নির্ণয়।

34.4.1 চিরাচরিত মাধ্যমের সংজ্ঞা

আধুনিক বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়া ও মুদ্রিত মাধ্যম ছাড়াই যে সব প্রক্রিয়া বা উপকরণের মাধ্যমে যুগে যুগে পুরুষানুক্রমে গণজ্ঞাপনের কাজ চলে এসেছে সে সব মাধ্যমকেই বলে গণজ্ঞাপনের চিরাচরিত মাধ্যম।

চিরাচরিত মাধ্যম— এটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

অন্ধ্রপ্রদেশে এটির নাম 'জনপদম'। অনেক জায়গায় বলা হয়— জন মাধ্যম।

বাংলায় 'লোক শিল্প' নামটির বিভিন্ন নাম: লোকনাট্য, লোকগীত।

লোক শিল্প কলার মধ্যে আছে নিজস্ব আঞ্চলিক স্টাইল, কথকতা, সংগীত, নাচ, পোশাক, লোকাচার প্রভৃতি। এগুলো অতি পুরোনো আর এগুলোর শেকড় সমাজের গভীরে।

এগুলো কি এখনো আছে? হ্যাঁ। আছে। তবে অঞ্চলভেদে পার্থক্য আছে। গল্প বলা, নাটক, পুতুল নাচ প্রভৃতি প্রায় সর্বত্রই আছে।

পাঠগত প্রশ্ন 34.1

(a) চিরাচরিত মাধ্যমের সংজ্ঞা কী?

(b) এখনও চলছে এমন তিনটি চিরাগত মাধ্যমের নাম লিখুন।

34.1.2 চিরাচরিত বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন আঙ্গিক

গণজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, সামাজিক ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি অনুসারে চিরাচরিত গণমাধ্যমের নানা আঙ্গিকের বৈচিত্র্য লক্ষ করা। সব আঙ্গিক জনপ্রিয় না হতে পারে কিন্তু সেগুলো জ্ঞাপনের কাজকে সাহায্য করে। ভালো করে বুঝে নেবার জন্য আঙ্গিকগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখানো হল—

নাকাড়া (নাকারা): কাঠি দিয়ে ঢোল বাজিয়ে কোনও বার্তা বা আদেশ প্রচার। অনেকটা বাংলায় ঢেঁড়া দেওয়া।

পুতুল নাচ: সুপ্রাচীন এই আঙ্গিকটি এখনো গ্রামাঞ্চলে চলে। ছায়া পুতুল বা সুতো চালিত পুতুল নাচ বেশ জনপ্রিয়।

পটচিত্র: এই আঙ্গিকে ছবি দেখাবার সঙ্গে কাহিনি বলা হয়।

কথকতা, গল্পবলা: যখন লিখিত শব্দের চল ছিল না তখন থেকেই এই আঙ্গিক চলে আসছে। যেমন স্থানীয় বীরের কাহিনি, যার কোনো লিখিত তথ্য নেই, লোককথার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামান্তরে লোকমুখে প্রচারিত। কথকতা এবং কবিগান এর সুন্দর উদাহরণ।

লোকগান: বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম।

নৌটঙ্কি: একটি বিখ্যাত লোকশিল্প। উত্তর ভারতে খুব জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। এতে নাচ ও সংগীতের মিশ্রণ।

যাত্রা: পূর্বভারতে খুব জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। এতেও নাচ-গান ও অভিনয়ের সাহায্যে কাহিনি বর্ণিত হয়।

মেলা ও উৎসব: সামাজিক, প্রথাগত, আনুষ্ঠানিক একটি জায়গায় বহু মানুষের দেখা-সাক্ষাৎ ও মতামতের আদানপ্রদান এই সব জমায়েতের একটি বৈশিষ্ট্য।

লোকনৃত্য: স্থানভেদে এর রকমফের আছে। প্রতি আদিবাসী সমাজেই পোশাক, উপকরণ, প্রতীক সম্বলিত নিজস্ব নাচ প্রচলিত। এই সব লেকনৃত্যে নানা সামাজিক বার্তা প্রচারিত হয়।

লোকচিত্র: দেয়ালচিত্র, শিলালিপি ও মুদ্রালিপি, মূর্তি, স্তূপ প্রভৃতি।

আরও কিছু চিরাচরিত মাধ্যমের আঙ্গিক: পাঁচালি, মঙ্গলগান, ডাকের বচন, খনার বচন, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকায়ত মন্ত্র ইত্যাদি।

ভাবতে মজা লাগে একটি বিষয়ের উপস্থাপনা নানা আঙ্গিকে হতে পারে। যেমন— রামকাহিনি।

পাঠগত প্রশ্ন 34.2

1. নীচের কোনটি চিরাচরিত মাধ্যমের মধ্যে পড়ে না—

   (ক) খেলাধুলা, (খ) ফোটোগ্রাফি (গ) পুতুল নাচ

2. নৌটঙ্কি কোথায় প্রচলিত? এর বৈশিষ্ট্য কী?

3. যে কোনো তিনটি খুব পুরোনো চিরাচরিত মাধ্যম উল্লেখ করুন।

চিরাচরিত মাধ্যমের প্রয়োগ

চিরাচরিত মাধ্যম ভারতে বহুকাল ধরে প্রচলিত। পল্লি অঞ্চলে এটা জ্ঞাপন মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পল্লির মানুষ এই মাধ্যমেই করে আসছে সামাজিক, প্রথাগত, নৈতিক ও আবেগের প্রকাশ। এই মাধ্যম আর্থসামাজিক উন্নয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। মানুষের মতামত গ্রহণে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই মাধ্যম।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বাধীনতা সংগ্রামে লোক মাধ্যম দেশপ্রেম প্রচারের কাজ করেছে। বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব মুকুন্দ

শব্দার্থ ও টীকা

দাস স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে যাত্রাকে লাগিয়েছেন। 'পালা' নামক লোকগাথার গানকে উড়িষ্যা সরকার সমাজচেতনার কাজে লাগিয়েছেন।

ভারত সরকারের সংগীত ও নাটক বিভাগ (Song and Drama Division) এইডস্, পোলিও প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চিরাচরিত মাধ্যমকে ব্যবহার করেছে। উৎসবের দিনে আমরা ঘর সাজাই, ফুল মিষ্টি দেওয়া-নেওয়া করি। একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিই। চিরাচরিত মাধ্যম ভালো সম্পর্ক স্থাপনের ভালো জ্ঞাপন।

পাঠগত প্রশ্ন 34.3

ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান—

i) চিরাচরিত মাধ্যম হচ্ছে একটি .... মাধ্যম।

(ক) যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ নির্ভর, (খ) যান্ত্রিক (গ) পরোক্ষ (ঘ) যন্ত্রনির্ভরতা মুক্ত

ii) স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যতম চিরাচরিত মাধ্যম যাত্রাকে কাজে লাগিয়েছিলেন

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (গ) মুকুন্দ দাস (ঘ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ

iii) কোন্ আঙ্গিকে নাচ, গান ও অভিনয়ের সাহায্যে কাহিনি শোনানো হয়?

(ক) লোক গাথা, (খ) যাত্রা (গ) চিত্রকলা (ঘ) পুতুল নাচ।

34.3.4 সীমাবদ্ধতা

অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চিরাচরিত মাধ্যমের অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতার দিকটাও মনে রাখা দরকার।

সুবিধা

- মানবিক আবেদন দর্শক-শ্রোতাকে কাছে টানে।
- যা কিছু প্রশিক্ষণ তা সহজেই গ্রহণ করা যায়।
- একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ। সেই সংস্কৃতির উদ্ভাবক নিজেরাই।
- জীবন যাপনের অঙ্গ।
- প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়।
- জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব বয়সের মানুষের কাছে গ্রহণীয়।
- এই মাধ্যমের আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, আবেগের কাছে।
- দর্শক শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী আঙ্গিকের অদল-বদল সহজেই করা যায়।

অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

- এর আবেদন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
- এক অঞ্চলের আঙ্গিক অন্য অঞ্চলে জনপ্রিয় নাও হতে পারে।
- অনুষ্ঠান সংরক্ষণের বা রেকর্ড রাখার অসুবিধা।
- দর্শক-শ্রোতা সীমিত।
- সবাই অংশ নিতে পারে বলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি হতে পারে। কিন্তু সবার কাজ সমান জনপ্রিয় হয় না।
- আধুনিক জীবনের প্রতিফলন থাকে না।
- এই মাধ্যমের অনেক বিষয়বস্তু আজ অপ্রাসঙ্গিক।
- মাধ্যম হিসাবে এখন আর কার্যকর হচ্ছে না, কারণ নিপুণ দক্ষ শিল্পীরা অনেকে বেঁচে নেই,

শব্দার্থ ও টীকা

- স্থানীয় জীবন থেকে উঠে আসে এর আঙ্গিক ও বিষয়।

তাঁদের পরবর্তীরা তেমন আগ্রহী হচ্ছেন না।

- মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের চাপে পড়ে এই মাধ্যম আধুনিক জীবনে তেমন আবেদনশীল হচ্ছে না।

পাঠগত প্রশ্ন 34.4

1. চিরাচরিত মাধ্যমের চারটি সুবিধা দেখান।

2. চিরাচরিত মাধ্যমের চারটি অসুবিধা দেখান।

34.3.5 মুদ্রিত মাধ্যমের সংজ্ঞা, সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব

সংবাদপত্র সংবাদ-বিবরণ, সংবাদ নিবন্ধ প্রভৃতির বিষয় সংগ্রহ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন করে। সংবাদপত্র সকালে ও বিকালে প্রকাশিত হয়। বিকেলের সংবাদপত্রকে বলে সান্ধ্য দৈনিক।

গতকাল আপনি একটি দুর্ঘটনা দেখেছিলেন। দুটি বাসে সংঘর্ষ ও প্রাণহানি ঘটে। দৈনিক ব্যস্ততার ফাঁকে ঘটনাটি আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ল। কিন্তু ওটি সম্বন্ধে কোথায় খোঁজ করবেন। কেননা আপনি জানতে চান ওই দুর্ঘটনায় ক'জন মারা গেল, ক'জন আহত হল। ওদের মধ্যে কি আপনার পরিচিত কেউ ছিল?

এসব ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য আপনাকে সাহায্য করতে পারে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র পড়ে এরকম আরও অনেক কারণে, অনেক রকমের কৌতূহল মেটাতে মানুষ সংবাদপত্রে আগ্রহী হয়—

কোনো ঘটনা সম্পর্কে বিশদে জানতে, তথ্য ও সংবাদ জানতে, বিনোদনের উদ্দেশ্যে:

আপনারা নিশ্চয়ই খবরের কাগজ পড়েন। এটাকে খবরের কাগজ বলে কেন? কারণ এতে খবর থাকে। জানেন কি কীভাবে খবর যোগাড় করা হয়? খবরের নানা উৎস। আপনি রেডিওতে, টিভিতে, খবরের কাগজে, ইন্টারনেটে খবর দেখেন, শোনেন। আমরা প্রতিদিনকার জীবনে যে সব ঘটনা ও দৃশ্য চারদিকে ঘটতে দেখি, শুনি সেগুলোই হল খবর। খবর সর্বদাই নতুন হতে হবে। খবর কী ভাবে তৈরি হয়। এ নিয়ে জন বোগাটের একটি গল্প হচ্ছে কুকুর মানুষকে কামড়ালে খবর হয় না, মানুষ যদি কুকুরকে কামড়ায় তাহলে সেটি খবর হবে।

N (North), E (East), W (West), S (South) অর্থাৎ সব দিক থেকেই খবর আসে। সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ যা আগে জানা যায়নি সেটাই হয় খবর।

তথ্য ও সংবাদের তফাত:

স্টেশনে ট্রেনের যাওয়া ও আসার সময়সূচি আপনার চোখে পড়ে থাকবে। এটা সংবাদ নয়, তথ্য। কিন্তু তথ্যও সংবাদ হতে পারে, যখন কোনো তথ্য সংবাদের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। যেমন সময়সূচিতে দেখানো কোনো ট্রেনের সময়সূচির হঠাৎ পরিবর্তন হলে সেটা হয়ে যায় সংবাদ। এমন সংবাদ মাঝে মাঝে শোনা যায় রেডিওতে।

আপনি দেখে থাকবেন সংবাদপত্রে আবহাওয়ার রিপোর্ট। প্রতিদিনের তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণের কোনো সংবাদমূল্য নেই। কিন্তু আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনে প্রবল বৃষ্টির ফলে বন্যার সৃষ্টি কিংবা বৃষ্টিপাতের অভাবে প্রবল খরার অবস্থা হলে তখন সেটা সংবাদ হয়ে ওঠার গুরুত্ব পায়।

শব্দার্থ ও টীকা

কাজেই সংবাদ তথ্য থেকে অনেকটাই আলাদা। পাঠক শ্রোতা বা দর্শকের কাছে সেটাই হবে সংবাদ যা নতুন।

সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব:

বলা হয়ে থাকে কোনো সংবাদ যদি 6টি প্রশ্নের উত্তর যোগায় তবেই সেটি হবে সম্পূর্ণ সংবাদ। প্রশ্নগুলি হচ্ছে— কে? কখন? কোথায়? কী? কেন? এবং কেমন করে?

ধরুন আপনি খবর পেলেন একটি স্কুল ছাত্র একজন ছেলেকে পুকুরে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছে। স্বভাবতই আপনার মনে জাগবে—

কোন জায়গায় ঘটনাটি ঘটেছে?

কোন দিন কখন ঘটেছে?

কেন ডুবে যাচ্ছিল সে ছেলেটি?

যে তাকে উদ্ধার করেছে সেই ছেলেটির পরিচয় কী?

এবং ছেলেটি কী ভাবে তাকে উদ্ধার করেছে?

খবরটিতে যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না থাকে তাহলে এটি হবে অসম্পূর্ণ সংবাদ।

সংবাদের গুরুত্ব:

কোন্‌টি খবর, কোন্‌টি নয় সেটি সাংবাদিকরাই ভালো বুঝতে পারে। কতকগুলো গুরুত্ব দেখে তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কতকগুলো অপরিহার্য শর্ত যা যথার্থ সংবাদ বলে গণ্য হয়। এই সব শর্ত হচ্ছে:

সময়-রেখা: একমাস আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার সংবাদ-গুরুত্ব নেই। ঠিক আগের দিন যদি ঘটে থাকে তাহলে সেটাই হবে সংবাদ। আবার টেলিভিশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি সেকেন্ড হচ্ছে সময়-রেখা। যে কোনো মুহূর্তে ব্রেক নিউজ হতে পারে। ব্রেক নিউজের পর আগের মুহূর্তের ঘটনার আর সংবাদ মূল্য থাকে না। সংবাদপত্রের সঙ্গে টিভির সময়-রেখা আলাদা।

প্রভাব: প্রভাব তৈরি সংবাদযোগ্যতার একটি শর্ত। সুনামি সারা বিশ্বের মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছিল। সেটা সমগ্র বিশ্বে হয়ে ওঠে প্রধান সংবাদ।

নৈকট্য: ইংলন্ডে বার্ড ফ্লুতে শত শত মুরগি মারা গেছে— এ খবর আপনাকে তেমন আলোড়িত করবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বার্ড-ফ্লুর খবর আপনাকে উদ্বিগ্ন করবে। কারণ এটি একেবারে কাছে এসে গেছে। এবার হয়তো আপনার এখানেও ছড়াতে পারে।

বিতর্ক: মানুষ বিতর্ক ভালোবাসে। দ্বন্দ্ব, যুক্তি, পরস্পরকে দায়ী করা, সংঘর্ষ, উত্তেজনাপূর্ণ খবর মানুষ শুনতে আগ্রহী হয়।

প্রসিদ্ধি: প্রতিদিন মানুষ যাচ্ছে রাজঘাটে গান্ধিজির স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে। সেটা কোনো খবর হয় না। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন রাজঘাট পরিদর্শন করেন তখন সেটি খবর হয়। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট একজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রয়োজনীয়তা: প্রয়োজনীয়তা সংবাদের অন্যতম শর্ত। আবহাওয়ার আগাম সংবাদ সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ। সংবাদপত্র হাসপাতাল, থানা, অ্যামবুলেন্স প্রভৃতির টেলিফোন নম্বর জানিয়ে দিয়ে সকলের প্রয়োজন সাধন করে। স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে সংবাদপত্র। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সংবাদপত্র অর্থসংগ্রহ করে। রক্তদান ও আর্তত্রাণের একটা সামাজিক প্রয়োজনের দিক আছে। সেজন্য এই ধরণের সমাজসেবার খবর সংবাদ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাগত: প্রায় সব কাগজেই শিক্ষার সুযোগ ও কর্মসংস্থানের খবর থাকে। এই ধরণের খবর সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সেজন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য ও পর্যালোচনা বিশেষ সাংবাদিক গুরুত্ব লাভ করে।

পাঠগত প্রশ্ন 34.5

1. কোন্ ছ'টি প্রশ্নের উত্তর একটি খবরকে সম্পূর্ণ করে তোলে?

2. যেটি ঠিক সেটিতে দাগ দিন।

(ক) প্রাত্যহিকী বেতার অনুষ্ঠানে ট্রেন চলাচলের খবর (সংবাদ/তথ্য)

(খ) সুন্দরবন অঞ্চলে আইলার আবির্ভাব (সংবাদ/তথ্য)

(গ) শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব (সংবাদ/তথ্য)

(ঘ) শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ চুরি (সংবাদ/তথ্য)

3. ভালো সংবাদের পাঁচটি শর্তের উল্লেখ করুন।

34.3.6 সংবাদের ধরন, গ্রহণ যোগ্যতা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব

সংবাদের ধরন:

নীচের প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামগুলি লক্ষ করুন:

i) মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার শুরু হয়ে গেল।

ii) প্রধানমন্ত্রী আজ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

iii) রাজ্যসরকার আগামী কাল ছুটি ঘোষণা করেছে।

iv) বাস দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু।

খবরগুলো সবই এক ধরনের নয় । এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখাতে পারেন?

এই ভাগ অনুসারে চারভাগ করা যায় খবরগুলোকে:

(ক) আন্তর্জাতিক, (খ) জাতীয়, (গ) আঞ্চলিক, (ঘ) স্থানীয়।

কাজ:

আপনি একটি দৈনিক কাগজ পড়ে ওই চারভাগে পড়ে এমন চারটি খবর বেছে নিন।

শব্দার্থ ও টীকা

সংবাদপত্রের গ্রহণযোগ্যতা :

একটি সংবাদপত্রের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে মূলত তিনটি শর্তের উপর:

(ক) বিশ্বাসযোগ্যতা: পাঠক সংবাদপত্রের উপর আস্থা রাখে তার পরিবেশিত সংবাদে বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য। এর অভাব ঘটলে পাঠক সেই কাগজ বর্জন করে।

(খ) নিরপেক্ষতা: সংবাদপত্রের সাংবাদিক নানা চাপে (ব্যক্তির, রাজনীতির, বাণিজ্যিক) অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েন। তখন তাঁর সংবাদটিতেও নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না। এরকম হলে সংবাদপত্র তার মর্যাদা হারায়।

(গ) ভারসাম্য: বলা হয় যে প্রত্যেক সংবাদের দুটি দিক থাকে। সংবাদটি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে হলে ছাপবার আগে অপরপক্ষের মতামত জানতে হবে ও জানাতে হবে। তা না হলে ভারসাম্য থাকবে না। ভারসাম্যহীন সংবাদ পরিবেশিত হলে পাঠক বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক:

সংবাদ একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া নেতিবাচকও হতে পারে, ইতিবাচকও হতে পারে।

সংবাদ এক: গুরগাঁও শহরে এক 8ম শ্রেণির ছাত্র তার সহপাঠীকে গুলি করে মেরে ফেলে। খবরটি আমাদের স্বাভাবিক মূল্যবোধকে আঘাত করে। তাই এটা একটি নেতিবাচক সংবাদ।

সংবাদ দুই: একটি ছোটো শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুজন মারা গেছে। এটাও নেতিবাচক। কারণ এই সংবাদ তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে।

সংবাদ তিন: স্কুলের সমাজসেবা কর্মসূচি অনুযায়ী ছেলেরা পাশের একটি গ্রামে রাস্তা তৈরিতে সাহায্য করেছে। সংবাদটি অবশ্যই ইতিবাচক। কারণ এটা অন্য ছাত্রদের মধ্যেও সমাজসেবার প্রেরণা জোগাবে।

সংবাদ চার: সরকার দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীর বিনা বেতনে পড়াশুনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর ফলে যারা বেতন দিতে পারে না এমন লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বিনাবেতনে পড়াশুনার সুযোগ পাবে। এটা সমাজ উন্নয়নমূলক খবর। সেই কারণে এটি ইতিবাচক।

কাজ:

এক সপ্তাহের খবরের কাগজ থেকে কয়েকটি ইতিবাচক ও কয়েকটি নেতিবাচক সংবাদের তালিকা তৈরি করুন।

পাঠগত প্রশ্ন 34.6

1. দুটি করে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদের দৃষ্টান্ত দিন।
2. দুটি করে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংবাদের দৃষ্টান্ত দিন।
3. সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়?
4. সংবাদের দুটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব দেখান।

শব্দার্থ ও টীকা

34.3.7 ভারতে সংবাদপত্র প্রবর্তন ও তার প্রভাব

ভারতে সংবাদপত্র প্রবর্তন:

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র চালু হয় এই কলকাতায়। প্রথম প্রকাশিত Hicky's Gazette ছিল সেই প্রথম সংবাদপত্র। এটির নাম বেঙ্গল গেজেট, নামান্তরে ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজার।

1780 সালে James Augustus Hicky এটির প্রবর্তক।

ব্রিটিশ East India Company প্রেসের স্বাধীনতাকে সমাজের পক্ষে হিতকর মনে করেনি। হিকি সাহেব যখন কোম্পানির বিরুদ্ধে নানা সংবাদ তাঁর কাগজে ছাপতে থাকেন তখন কোম্পানি তাঁকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁরা ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে হিকির বেঙ্গল গেজেট সংরক্ষিত আছে। কলিকাতার বেঙ্গল গেজেটের পর বেরোতে থাকে মাদ্রাজ গেজেট ও বোম্বাই গেজেট।

ভারতে সংবাদপত্রের প্রভাব: সাাংস্কৃতিক জাগরণ

উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই ভারতীয় সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য অনেক সামাজিক সংস্কার শুরু হয়। সতীদাহ রোধ, বিধবা বিবাহে উৎসাহ দান, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি প্রধান কয়েকটি সংস্কার সাধনে নামেন বিখ্যাত নেতারা। তাঁদের সক্রিয় উৎসাহে ভারতের নানা স্থানে অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে সংবাদপত্র শিল্পে হঠাৎ জোয়ার আসে।

এই সময়ে সামনের সারির কয়েকটি সংবাদপত্র ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকে। দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া (1861) শুরু হয় ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থন যোগাতে। Pioneer শুরু হয় 1868, The Amrita Bazar Patrika (1868), The Statesman (1875), The Hindu (1887), The Tribune (1880), The Hindustan Times (1923)। আঞ্চলিক ভাষায় 'মালয়ালা মনোরমা' (1888) এখনো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র।

1918 সালে Home Rule Party প্রকাশিত সাপ্তাহিক Young India কাগজটি ভারত প্রত্যাগত গান্ধিজি নিয়ে নেন। তাঁর আরেকটি পত্রিকা 'নবজীবন'। পরে মহাদেব দেশাইয়ের সম্পাদনায় গান্ধিজি শুরু করেন 'হরিজন'।

আপনি অনুমান করতে পারেন কি 100 বছর অতিক্রম করেছে এমন ভারতীয় সংবাদপত্রের সংখ্যা কত? সংখ্যাটি 41।

তার মধ্যে ইংরেজি The Times of India, The Hindu, The Tribune, The Statesman আছে। আঞ্চলিক ভাষায় আছে মুম্বাই সমাচার, মালয়ালা মনোরমা এবং দীপিকা।

পাঠগত প্রশ্ন 34.7

1. উনিশ শতকে প্রকাশিত ভারতের তিনটি সংবাদপত্রের নাম লিখুন।
2. ভারতের প্রাচীনতম সংবাদপত্রটি, যা আজও চলছে, কোন্‌টি?
3. গান্ধিজি শুরু করেছিলেন এমন দুটি সংবাদপত্রের নাম লিখুন।
4. ভারতে সাংস্কৃতিক জাগরণে সংবাদপত্রের প্রভাব বুঝিয়ে দিন।

শব্দার্থ ও টীকা

34.3.8 সংবাদপত্রের আকার ও ভালো সংবাদ

আপনারা হয়ত লক্ষ করেছেন সব সংবাদপত্রের আকার এক নয়। কয়েকটির আকার বড়ো, কয়েকটির ছোটো, আবার কয়েকটি খুবই ছোটো।

আকার অনুযায়ী সংবাদপত্রের শ্রেণিবিভাগ:

i) Broad Sheet: সকালের কাগজগুলো সাধারণত বড়ো আকারের। এগুলো broad sheet। যেমন **The Times of India, আনন্দ বাজার পত্রিকা, আজকাল**।

ii) Tabloid: আকারে ব্রডশিটের অর্ধেক। ভারতের অধিকাংশ সান্ধ্য দৈনিক tabloid আকারের।

iii) **Mid Day, সান্ধ্য সত্যযুগ, সান্ধ্য আজকাল** প্রভৃতি টেবলয়েড আকারের কাগজ।

আপনি রোজ যে কাগজ পড়েন, বলতে পারেন সেটি ট্যাবলয়েড না ব্রডশিট?

সংবাদপত্রের Internet সংস্করণ:

ইন্টারনেট হল কম্পুটার-ভিত্তিক পৃথিবীব্যাপী Interlinked Network। দেশের সীমার বাধা কিছু নেই। কাজেই কলকাতায় বসে ইন্টারনেটে লন্ডনের ইন্টারনেট কর্মসূচি দেখে নিতে পারেন।

সম্প্রতি অনেক সংবাদ পত্রের ইন্টারনেট সংস্করণ হয়েছে। আপনি জাপানের টোকিওতে ইন্টারনেটে বসে কলকাতার **'আজকাল'** পড়তে পারেন।

কিছু সংবাদপত্রের কেবল ইন্টারনেট সংস্করণই আছে। এরকম কাগজের একটা বড়ো সুবিধা এই যে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এটি পাওয়া যায়।

অন্যান্য আকারের মুদ্রিত মাধ্যম:

চন্দামামা, ইন্ডিয়া টুডে, সাপ্তাহিক বর্তমান— এগুলোর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে? এইগুলোও মুদ্রিত মাধ্যম। তবে এগুলো দৈনিক সংবাদপত্র নয়, এগুলো সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্র। সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের মধ্যে পার্থক্য কী বলতে পারেন?

সংবাদপত্রের মতো ম্যাগাজিনেও সাপ্তাহিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের মুদ্রিত মাধ্যম। তবে এগুলো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। যেমন— **India Today**, সাপ্তাহিক। **'দেশ'** পাক্ষিক। **'সন্দেশ'** মাসিক ম্যাগাজিন। তাছাড়া সাময়িকপত্র বা ম্যাগাজিনে সংবাদ ছাড়াও প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, কমিক্স ইত্যাদি ছাপা হয়।

34.2.10 ভালো সংবাদের গুণ

রিপোর্টার খুবই ব্যস্ত থাকেন। অনেক সময় খবর সংগ্রহের পর সংবাদ কাহিনি লেখার যথেষ্ট সময় পান না। এই পরিস্থিতিতেও তাঁর মনে থাকা দরকার সংবাদ কাহিনি ভালো হলে পাঠক উপভোগ করেন। সুলিখিত সংবাদ পাঠকের মন কেড়ে নেয়। যদিও বলা হয়ে থাকে একটি সংবাদপত্রের আয়ু মাত্র 24 ঘন্টা তবু ভালো সংবাদ পাঠক বহুদিন মনে রাখে। ভালো সংবাদের এই গুণগুলি থাকা চাই:

সহজবোধ্যতা: সমাজে বহুরকমের মানুষ খবর পড়ে। সেজন্য খবরের ভাষা হবে সহজ এবং সুস্পষ্ট। কোনো রকম দ্ব্যর্থবোধক হবে না। যে খবর পাঠকের কাছে স্বচ্ছ হবে না সেটি বাদ দেওয়া ভালো।

শব্দার্থ ও টীকা

জোর: খবরের প্রধান দিকটির উপরই জোর দিতে হবে। সংবাদ পাঠক চায় তথ্য ও সারবস্তু।

নৈর্ব্যক্তিকতা: রিপোর্ট হবে নৈর্ব্যক্তিক। রিপোর্টারকে কোনো পক্ষপাতিত্ব করলে হবে না। ঘটনায় যদি দুটি পক্ষ থাকে তাহলে দুই পক্ষের বক্তব্যকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশ্বাসযোগ্যতা: রিপোর্ট হবে বিশ্বাসযোগ্য। ছাপার আগে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে তথ্যের ও পরিসংখ্যানের নির্ভুলতা।

পাঠগত প্রশ্ন 34.8

1. সংবাদপত্রের তিনটি আকারের উল্লেখ করুন।
2. ইন্টারনেট সংস্করণের সুবিধা কী?
3. ভালো সংবাদপত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

34.3.9 বেতারের কাজ ও বৈশিষ্ট্য

মহাভারতের সঞ্জয়কে মনে আছে তো? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধারাবিবরণ দেবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দেন। তার ফলে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়ে দেন। সেদিক থেকে সঞ্জয়ই হলেন প্রথম বেতার সম্প্রচারক। বেতার বলতে আমরা রেডিও ও ট্রানজিস্টারকেই ধরব।

মনে করুন আপনি আছেন দার্জিলিঙে। দিল্লি থেকে অনেক দূরে। আপনার কাছে একটি রেডিও আছে। 26শে জানুয়ারি দিল্লিতে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের ধারাবিবরণী শুনে বুঝতে পারবেন সেদিন দিল্লির রাজপথে কী ঘটছে। যেখানেই থাকুন রেডিও খুলে আপনি শুনতে পাবেন খবর, সংগীত এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান।

বেতারের কাজ:

বেতারে বলা হল পরের রবিবার ‘পোলিও টিকা’ দেওয়া হবে। আপনার বাড়িতে শিশু থাকলে বেতারের ঘোষণা শুনে পোলিও টিকার জন্য শিশুকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন।

বেতারে কৃষি বিশেষজ্ঞ জানিয়ে দিলেন ফসল রক্ষার জন্য কী কী সতর্কতা নিতে হবে। সেই তথ্য জেনে আপনার ফসল রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

নিরক্ষর, অনভিজ্ঞ কোনও প্রশিক্ষণহীন চাষিও বেতারের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান (যেমন ‘চাষিভাইদের বলছি’) শুনে লাভবান হতে পারেন।

শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান শুনে শিক্ষার্থীরা বিশেষ লাভবান হতে পারে।

রেডিওতে প্রচারিত গান ও নাটক শুনে আনন্দ পেতে পারেন।

তাই রেডিওর কাজ হচ্ছে—

নানা বিষয়ে জানানো
শিক্ষায় সহায়তা করা
বিনোদনের মাধ্যমরূপে কাজ করা
উন্নয়নে সহায়তা করা
জনমত গঠন করা

শব্দার্থ ও টীকা

বেতারের বৈশিষ্ট্য:

i) ধ্বনির সাহায্যে মনের মধ্যে একটি ছবি ফুটিয়ে তোলে। যেমন একটি ফুটবলের ধারাভাষ্য। রেডিওতে ওই ধারাবিবরণী শুনে মনে হবে যেন আপনি মাঠে বসে খেলা দেখছেন।

ii) দ্রুততা সম্পন্ন মাধ্যম।

iii) রেডিওর দাম কম, সুলভ।

iv) রেডিও সহজে বহনযোগ্য, যে কোনো জায়গায় বসে শোনা যায়

v) এটি শ্রুতি-মাধ্যম, শোনার জন্য সাক্ষর না হলেও চলে।

পাঠগত প্রশ্ন 34.9

1. আপনি জেনেছেন যে বেতারের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে জানানো। আপনি আরও দুটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করুন। প্রত্যেকটির উদাহরণ দিন।

2. রেডিওর তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

3. নীচের কোন্‌টি ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেখান।

i) রেডিও ছবি তৈরি করে।

ii) রেডিও ধীরগতি মাধ্যম।

iii) রেডিও ব্যয়বহুল।

iv) রেডিও শুনতে হলে সাক্ষর হতে হবে না।

v) রেডিও সহজে বহনযোগ্য নয়।

34.3.10 বেতারের সীমাবদ্ধতা

বেতার সম্প্রচারের সুবিধাগুলোর কথা আমরা জেনেছি। এবারে দেখব কী কী এর সীমাবদ্ধতা—

i) একবারই শোনার মাধ্যম: সংবাদপত্রে কোনো সংবাদ ইচ্ছে করলেই একাধিক বার দেখে নেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে বহুদিন রেখে দিতে পারেন খবরের কাগজ। একবার পড়ে কোনও শব্দের অর্থ বুঝতে না পারলে অভিধান দেখতে পারেন।

কিন্তু রেডিওতে? ওই যে একবার বলে দেওয়া হল সেটাই শেষ। দ্বিতীয় বার আর শোনা যাবে না। কোনও শব্দের অর্থ খোঁজার সময়টুকুও পাবেন না। একবারই মাত্র সুযোগ থাকে রেডিওতে। যা শোনা হল পরক্ষণেই হয়তো তা ভুলে গেলেন।

ii) বেতারে কোনো ছবি দেখা যায় না: বেতার আর দূরদর্শন, দুটোকে পাশাপাশি রাখলে দেখবেন একটিতে ছবি-টবি কিছু দেখা যাচ্ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে কিছু কথা। ধরুন আইলার ঝড়। বেতার আপনাকে শোনাচ্ছে মৌখিক বর্ণনা, কিন্তু দূরদর্শন দেখাচ্ছে আইলার বাস্তব ধ্বংসচিত্র, মুখেও শোনাচ্ছে তার বিবরণ।

শব্দার্থ ও টীকা

বলা হয় একটি ছবি এক হাজার শব্দের সমান। বলা হয় দেখা মানে বিশ্বাস করা। ছবির অভাব বেতারের একটি বড়ো সীমাবদ্ধতা।

iii) শ্রোতা বেতারে শোনা খবর বা আলোচনা তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারে। ছবি না থাকায় বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা কিছু চোখে দেখলে সেটা অনেক দিন স্মরণে থাকে। ধরুন আগ্রার তাজমহলের সুন্দর একটি ছবি দেখেছেন। সেটা নিশ্চয়ই অনেক দিন ধরে মনে রেখেছেন। কেবল কানে শুনলে সেটা তাড়াতাড়ি স্মৃতির বাইরে চলে যায়।

iv) সম্প্রচারের কাজে দুর্বলতা: বেতার ঘোষক বা অংশগ্রহণকারীদের সম্প্রচারের কাজ নীরস একঘেয়ে হলে শ্রোতা তার রেডিও বন্ধ করে দেয়। কাজেই কী ভাবে তথ্য বা বার্তা উপস্থাপিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে শ্রোতার আগ্রহ।

v) দুর্বল শ্রুতির পক্ষে অসুবিধা: যারা কানে শুনতে পায় না বা কম শোনে তাদের কাছে রেডিও অদরকারি।

পাঠগত প্রশ্ন 34.10

1. রেডিওর সীমাবদ্ধতার তালিকা তৈরি করুন
2. কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি ভুল দেখান।
   i) রেডিওতে ছবি দেখা যায়।
   ii) সম্প্রচারক নীরস হলে তার সম্প্রচারও নীরস হবে।
   iii) বেতার বার্তা সহজে বিস্মরণ হয়।
   iv) যারা চোখে দেখে না তাদের কাছে রেডিও প্রয়োজনীয় মাধ্যম নয়।
   v) শ্রোতা বেতারবার্তা শোনা ও বোঝার সুযোগ পায় মাত্র একবার।

34.3.11 মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশনের বৈশিষ্ট্য

আপনি কতবার করে টিভি দেখেন? আমাদের মধ্যে অনেকেই টিভি ছাড়া একটি জগতের কথা ভাবতেই পারে না। আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান কেন পছন্দসই হয় ভেবেছেন কখনও? টেলিভিশনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী? এর বলিষ্ঠতা ও দুর্বলতাগুলো কী কী? এই মাধ্যমটির কাজ কী? পাঠের এই অংশ এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের চেষ্টা করবে।

টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে দেখতে আপনার কী অনুভূতি হয়? একেবারে স্টেডিয়ামে আছেন এমন মনে হয় না? কাগজে লেখা বর্ণনা বা বেতারে শোনা ধারাভাষ্য থেকে এটা একেবারেই আলাদা। টিভিতে ক্রিকেট এত আকর্ষণীয় হয় কেন? রেডিওতে শুধু শব্দ, টিভিতে শব্দ আর দৃশ্য দুইই। দৃশ্যশ্রাব্য— এই বৈশিষ্ট্যই এটিকে ম্যাজিক মাধ্যম করে তুলেছে। বসার ঘরেই বিশ্বকে দেখা যায়। আমাদের অনেকের কাছেই দেখা মানে বিশ্বাস করা।

টিভির সঙ্গে যেন আবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সচিত্র এই মাধ্যমের অনুষ্ঠান অনেক দিন মনে থাকে।

এটির একটি ঘরোয়া চরিত্র আছে। খবরের কাগজের রিপোর্টে কেউ যেন আড়ালে থেকে কিছু লিখে পাঠাচ্ছে। কিন্তু টিভিতে? সঞ্চালক ও অংশগ্রহণকারী যেন চোখের সামনে মুখোমুখি বসে আমাদের বলছে। এই

শব্দার্থ ও টীকা

নৈকট্যবোধ টেলিভিশনের একটি বৈশিষ্ট্য।

টিভিতে ফুটবল খেলায় কে গোল দিল সেটা সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। খবরের কাগজে আগের দিনের খেলার কথা পরের দিন পেতে হয়। হাজার মাইল দূরেও কী ঘটছে সেটা তক্ষুণি দেখা যায় টিভিতে। টিভিকে সেজন্য বলা হয় জীবন্ত মাধ্যম (live medium)।

যারা লিখতে পড়তে জানে না তারাও টিভি দেখে বার্তা পেতে পারে, টিভির অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। বহু মানুষের কাছে অনুষ্ঠান পৌঁছে দিতে পারে। এটাও টিভির বৈশিষ্ট্য। এইজন্য টিভি একটি কার্যকর গণমাধ্যম।

কাজ:

আপনার এলাকায় মানুষ দিনে কত ঘন্টা টিভি দেখে তার একটি সমীক্ষা করুন।

আপনি একটি গল্প বা প্রবন্ধ লিখবেন। এর জন্য আপনার দরকার বড়ো জোর একটি কলম আর কিছু কাগজ। কিন্তু একটি টিভি অনুষ্ঠান তৈরিতে লাগে বহু টাকা, জটিল সব যন্ত্রপাতি এবং সুদক্ষ কারিগর। টিভি সম্প্রচার (telecast) জটিল প্রযুক্তিসাপেক্ষ।

তার মানে টেলিভিশন একটি ব্যয়বহুল মাধ্যম।

তাহলে টেলিভিশনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে— (ক) একটি দৃশ্য শ্রাব্য মাধ্যম, (খ) একটি ঘরোয়া এবং কাজের মাধ্যম, (গ) জীবন্ত মাধ্যম, (ঘ) ক্ষণস্থায়ী, (ঙ) ব্যয়বহুল।

পাঠগত প্রশ্ন 34.11

1. টেলিভিশনের ছাপ মনে থেকে যায় কেন?

2. টেলিভিশনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

3. টেলিভিশনের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখান যা খেলার অনুষ্ঠান দেখাবার পক্ষে খুব ভালো।

4. ঠিক উত্তরটিতে দাগ দিন—

i) টেলিভিশনের কোন বৈশিষ্ট্য তাকে খুব কাছের করে তোলে?

(ক) তাকে জীবন্ত দেখায় বলে, (খ) ঘরোয়া মনে হয় বলে, (গ) দৃশ্যশ্রাব্যতার বৈশিষ্ট্য, (ঘ) এর ক্ষণস্থায়িত্ব

ii) কোন্ মাধ্যম দ্রুততর গতিতে বার্তা পৌঁছে দেয়?

(ক) সংবাদপত্র, (খ) সাময়িক পত্র, (গ) টেলিভিশন, (ঘ) সিনেমা

iii) সংবাদ সম্প্রচারের কোন্ বৈশিষ্ট্য টেলিভিশনকে বিশেষত্ব দিয়েছে?

(ক) দৃশ্য-শ্রাব্য বৈশিষ্ট্য, (খ) প্রাণবন্ত ভাব, (গ) ঘরোয়া বৈশিষ্ট্য, (ঘ) ক্ষণস্থায়িত্ব

iv) টেলিভিশনের একটি ত্রুটি হল

(ক) এর ব্যয়বহুলতা, (খ) এর গণমাধ্যম হওয়া, (গ) এর ঘরোয়া বৈশিষ্ট্য, (ঘ) এর প্রাণবন্ত ভাব।

শব্দার্থ ও টীকা

34.3.12 টেলিভিশনের কাজ

আপনি যদি টিভিতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্ অনুষ্ঠানটি দেখেন তাহলে দেখবেন কচ্ছপ থেকে আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি নানা রকমের তথ্য ওখানে দেওয়া হয়। আবার একটি নিউজ চ্যানেল দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচ থেকে ইরাকে যুদ্ধ কিংবা আইলা-তাণ্ডব প্রভৃতি বহুতর তথ্য। তথ্য পরিবেশন টিভির অন্যতম প্রধান কাজ।

কাজ:

আপনার পছন্দের চ্যানেলটি খুলুন। দেখুন তাতে বিভিন্ন তথ্যমূলক অনুষ্ঠান। সেখানথেকে কোন্ কোন্ বিষয়ের তথ্য আপনি পেলেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

আপনি কি দূরদর্শনের ‘জ্ঞান দর্শন’ শীর্ষক অনুষ্ঠান দেখেন? তাতে কি আপনার পাঠের বিষয় শেখার বেশি সুবিধা হয়? এই চ্যানেলেই এন আই ও এস এর কার্যক্রম পরিবেশিত হয়। জ্ঞানদর্শন দূরদর্শনের একটি ভালো শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। দৃশ্যায়নের ফলে দূরদর্শন একজন পাঠককে ভলো করে শেখাতে পারে। ভারতের ইতিহাসকে আলো ও শব্দের প্রয়োগে চমৎকারভাবে তুলে ধরতে পারে টেলিভিশন। টেলিভিশন শিক্ষার একটি ভালো উপকরণ হতে পারে।

আর কী বিষয় নিয়ে টেলিভিশনের সাহায্যে ভালো শেখা যায় তা নিয়ে ভাবতে পারেন কি?

টেলিভিশন ব্যবহৃত হতে পারে— গৃহস্থালির কাজে (যেমন রান্না), শরীর চর্চায় (যেমন যোগব্যায়াম), যাদের স্কুলে গিয়ে পড়ার অসুবিধা আছে, দূরশিক্ষাকে অনেকটা ব্যক্তিগত করার কাজে, শেখা ও শেখানোকে আরো আকর্ষণীয় ও গতিশীল করার কাজে।

টেলিভিশনের সীমাবদ্ধতাও আছে: ক্লাশে শিক্ষক কোনো সন্দেহ সংশয়ের নিরসন করে দিতে পারেন। শিক্ষক দরকার মতো বারবার বুঝিয়ে দিতে পারেন। টেলিভিশনে কিন্তু এরকম সুযোগ থাকে না। তবে টেলিকন্‌ফারেন্সে প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করা যায়।

এর সীমাবদ্ধতা এরকম — (ক) এই মাধ্যম সাধারণত একমুখী, (খ)অনুষ্ঠান তৈরি ও তার সম্প্রচার ব্যয়বহুল। অনুষ্ঠান তৈরির প্রক্রিয়াও দীর্ঘ।

আপনি টেলিভিশন কেন দেখেন? কোনো বিশেষ কারণ আছে কি তার? আমরা অনেকে বিনোদনের জন্য দেখি। পরিশ্রমের পর একটা হালকা মেজাজে থাকা যায়। কাজেই বিনোদনও টেলিভিশনের একটা কাজ। ফলে এসেছে ধারাবাহিক (serials), সিনেমা গান বাজনার মতো জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। কারো কাছে আবার টেলিভিশন প্রিয় তার খেলার অনুষ্ঠানের জন্য। কেউবা আবার কুইজ কনটেস্ট অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভালোবাসে।

পাঠগত প্রশ্ন 34.12

1. টেলিভিশনের দুটি কাজের উল্লেখ করুন।

2. শিক্ষামূলক টেলিভিশন অনুষ্ঠানের একটি উদাহরণ দিন।

3. আপনার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান কী?

4. ঠিক শব্দ শূন্যস্থানে বসান

i) .... একটি তথ্য জানাবার মাধ্যমের উদাহরণ

ii) টেলিভিশন দূরশিক্ষাকে .... করতে পারে।

iii) একমুখীনতা টেলিভিশনের একটি ....।

34.4.13 টেলিভিশনের চ্যানেল

টেলিভিশনের এক এক ধরণের প্রচারকেন্দ্রকে বলে এক একটি চ্যানেল (Channel)। রোজ এক খাবারে যেমন অরুচি এসে যায় তেমনি একই চ্যানেলের প্রোগ্রাম রোজ দেখতে ভালো লাগে না। সাতের দশকের মাঝামাঝি অবধি দূরদর্শন অনুষ্ঠান দেখাত মাত্র কয়েক ঘন্টা। তাও সাদা-কালোয়। এখন অনেক চ্যানেল। তাদের নানা রকম অনুষ্ঠান। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সাদা কালো এখন রঙিন হয়ে টেলিভিশনের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

টেলিভিশনের নানা শ্রেণির চ্যানেল:

বৈচিত্র্যের জন্যই কি বিভিন্ন শ্রেণির চ্যানেল হয়েছে? ঘটনা হচ্ছে টেলিভিশন চায় সব রকমের দর্শকই টেলিভিশন দেখুক। তা সে ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, নারীপুরুষ, কৃষিকর্মী, শিল্প-শ্রমিক, ছাত্র, কিংবা নিরক্ষর যে-ই হোক। সবার কাছেই টেলিভিশন যেন আকর্ষণীয় হয় একথা মাথায় রেখেই টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়।

লক্ষ্য দলকে মাথায় রেখে অনুষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা করা হয়।

যেমন ছোটোদের লক্ষ করে গল্প, খেলা, সাধারণ জ্ঞান;

মেয়েদের কথা ভেবে রান্না, সেলাই, আইনগত সমস্যার সমাধান;

কৃষিজীবীদের জন্য চাষবাস, প্রাণী পালন, মুরগি পালন, সমবায় ইত্যাদি।

যুবকদের জন্য আলাদা ধরণের চ্যানেল। সেগুলোর সঞ্চালক হয় যুবক যুবতীরা, উপস্থাপক, দর্শকও তারাই।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চ্যানেলের পরিচয় নেওয়া যাক:

সংবাদ চ্যানেল: 15 - 20 বছর আগে সংবাদ প্রচারিত হত সন্ধ্যায়। আর আজ? সংবাদ শোনা যায় সারাদিন। শুরুতে সংবাদের জন্য ছিল আধঘন্টা একঘন্টা। আজ 24 ঘন্টা প্রচারিত হয়। সংবাদ নানা শ্রেণিতে নানা আঙ্গিকে। হিন্দিতে আজতক, ইংরেজিতে এন.ডি.টিভি, বাংলায় 24 ঘন্টা, আকাশ বাংলা প্রভৃতি। ই টিভির সংবাদ চ্যানেলে নানা ভাষায় প্রচারিত হয় সংবাদ।

স্পোর্টস চ্যানেল: নিউজ ছাড়াও স্পোর্টস চ্যানেল বিশেষ করে খেলাধুলার সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করে। সাধারণত বড়ো বড়ো খেলাগুলোর লাইভ প্রোগ্রাম দেখানো হয়।

এতে অন্য চ্যানেলের অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটে না।

আপনি কি জানেন প্রথম স্পোর্টস চ্যানেল চালু হয় 1979 সালে?

কার্টুন চ্যানেল: এই চ্যানেল বাচ্চাদের খুব প্রিয়। এই চ্যানেলের অনুষ্ঠান নানা ভাষায় প্রচারিত হয়। সুপারম্যান জাতীয় অতিনায়ক বিষয়ক অনুষ্ঠানও এখানে দেখানো হয়। নানা বিষয়ে নির্জীবকেও সজীবভাবে (animated) দেখানো হয় কার্টুন চ্যানেলে। 'আকবর বীরবল', 'সিন্দবাদ', 'বেতাল', 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর কার্টুন চিত্র বেশ জনপ্রিয়।

শব্দার্থ ও টীকা

জীবন শৈলী (Life Style) চ্যানেল: আপনি কি মাঝে মাঝে আপনার খবরের কাগজের কিছু রঙীন সাপ্লিমেন্টও পেয়ে থাকেন? দেখবেন ওখানে আছে সিনেমার খবর, গৃহসজ্জা, অন্যান্য বিনোদন সংক্রান্ত নানা তথ্য। টেলিভিশনেও এমন চ্যানেল আছে যেখানে আছে বাড়ি, বাগান, রান্নাঘর, পরিবার সংক্রান্ত নানা বিষয়। একে বলে জীবন শৈলী বা Life Style চ্যানেল। লাইফ স্টাইল চ্যানেলে পাবেন চিত্রতারকা ও মডেলদের রূপচর্চা পোশাক ও সাজসজ্জার স্টাইল, বিখ্যাত ব্যক্তিদের পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদি। এরকম চ্যানেল হচ্ছে 'Zoom', 'Travel', 'Living'।

বিজ্ঞান ও আবিষ্কার সংক্রান্ত চ্যানেল: বিজ্ঞান চ্যানেলের বিষয় আবহাওয়া, প্রযুক্তি, সৌরজগৎ, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি। যদি আপনি জানতে চান ডাইনোসরদের কথা, সাপ-বাঘ, জলপ্রপাত প্রভৃতির কথা এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, তাহলে অবশ্যই দেখতে হবে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' ও 'ডিসকভারি চ্যানেল'।

পাঠগত প্রশ্ন 34.13

1. ঠিক উত্তরে দাগ দিন—

i) যে চ্যানেলে বাড়ি, বাগান, পারিবারিক বিষয় দেখানো হয় সেটি হল

(ক) বিজ্ঞান চ্যানেল, (খ) সংবাদ চ্যানেল, (গ) স্পোর্টস চ্যানেল, (ঘ) জীবনশৈলী চ্যানেল

ii) ছোটোদের সবচেয়ে পছন্দ

(ক) সংবাদ চ্যানেল, (খ) স্পোর্টস চ্যানেল, (গ) কার্টুন চ্যানেল, (ঘ) জীবনশৈলী চ্যানেল

iii) নীচের কোনটি সংবাদ চ্যানেল

(ক) ডিসকভারি চ্যানেল, (খ) বিনোদন চ্যানেল, (গ) 300M, (ঘ) 24 ঘন্টা

2. যে কোনো দুরকম চ্যানেলের নাম লিখুন। প্রত্যেকের প্রচারের বিষয় উল্লেখ করুন।

3. টেলিভিশনে জীবনশৈলী চ্যানেলের চারটি উদাহরণ দিন।

34.3.14 টেলিভিশনের বিভিন্ন আঙ্গিকের (format) কর্মসূচি

কথায় আছে বৈচিত্র্য হচ্ছে জীবনের মশলা। খাবারে বলুন, পোশাকে বলুন, বন্ধুত্বে বলুন কিংবা বিনোদনে বলুন মানুষ চায় বৈচিত্র্য।

চ্যানেলের অনুষ্ঠান যাতে বৈচিত্র্যময় হয় তার জন্য অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় নানা আঙ্গিকের আশ্রয় নেওয়া হয়।

এই সব আঙ্গিক প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত:

(ক) কল্পনাভিত্তিক, (খ) বাস্তবভিত্তিক

কল্পনাভিত্তিক অনুষ্ঠান: নাটক, সোপ, অপেরা প্রভৃতি চলতি অনুষ্ঠান হচ্ছে কল্পনাভিত্তিক। হিন্দি 'হামলোগ', 'ঘর এক মন্দির' প্রভৃতি, বাংলা 'তিথির অতিথি' বা 'সুবর্ণলতা' প্রভৃতিতে বাস্তবতার ছাপ থাকলেও কাহিনিগুলি কাল্পনিক।

আপনি কি জানেন সোপ অপেরা নামটি এসেছে সাবান উৎপাদক সংস্থার বেতার নাটক অনুষ্ঠান থেকে?

শব্দার্থ ও টীকা

বাস্তবভিত্তিক অনুষ্ঠান: আপনার বাড়িতেই হয়ত রিমোট (দূরনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র) নিয়ে কাড়াকাড়ি হচ্ছে। আপনার মা চাইছেন একটি অনুষ্ঠান, আপনার বোন চাইছেন আর একটি। অথচ দুজনেরই ইচ্ছা এমন কোনো অনুষ্ঠান দেখা যার মধ্যে আছে বাস্তব জীবনের কথা।

বাস্তবভিত্তিক কয়েকটি অনুষ্ঠানের কথা:

সংবাদ বুলেটিন: জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় সংবাদে শ্রোতারা বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সবাই জানতে চায় কী কী ঘটনা ঘটছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে।

কুইজ: বোর্নভিটা ক্যুইজ কনটেস্ট বেশ জনপ্রিয় হয়। সেই অনুষ্ঠান শ্রোতাদেরও অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছে। আজকাল এইরকম অংশগ্রহণমূলক কুইজ অনুষ্ঠানের সংখ্যা অনেক।

কোনো বিষয়ে বলা ও আলোচনা: সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞরা বলেন। কেবল রিপোর্টই যথেষ্ট নয়, একটি বিষয়ে বিভিন্ন মতামত শুনলে নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যায়। রাজনীতি নিয়ে বক্তব্য পেশ ও পর্যালোচনায় শ্রোতারা আজকাল বেশ উৎসাহী।

পাঠগত প্রশ্ন 34.14

1. টেলিভিশনের দুটো আঙ্গিক কী কী?
2. বাস্তবভিত্তিক অনুষ্ঠানের দুটি দৃষ্টান্ত দিন।

34.3.15 বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

নানারকমের এবং অনেক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

মুহূর্তের মধ্যেই বার্তা জানিয়ে দেওয়া যায়।

একই সঙ্গে বহু মানুষের কাছে বার্তা দেওয়া যায়।

একটি মাধ্যমেই নানা শ্রাব্য, দৃশ্য বিষয় ব্যবহার করা যায়।

রেকর্ডিং করে বহুদিন ধরে রাখা যায় ভবিষ্যতের জন্য।

অদূর ভবিষ্যতে এই মাধ্যম অংশগ্রহণমূলক করা যাবে।

অসুবিধা:

নিকট সম্পর্কের নয়।

প্রতিক্রিয়া পেতে সময় লেগে যায়।

ব্যয়বহুল।

অনুষ্ঠান তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার।

গ্রামীণ এলাকায় প্রসার সীমিত।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 34.15

1. বৈদ্যুতিন মাধ্যমের তিনটি সুবিধার উল্লেখ করুন।
2. টেলিভিশনে আপনার প্রিয় তিনটি নিয়মিত অনুষ্ঠানের উল্লেখ করুন।

34.4 আপনি যা শিখলেন

চিরাচরিত মাধ্যম সম্পর্কে

1. চিরাচরিত মাধ্যমের বিভিন্ন আঙ্গিক— নাচ, নাটক, লোক কথা ইত্যাদি।
2. চিরাচরিত মাধ্যমের গুরুত্ব— স্বাধীনতা সংগ্রামে এই মাধ্যমের গুরুত্ব, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।
3. চিরাচরিত মাধ্যমের সুবিধা (মানবিক আবেদন, তৃণমূল স্তরের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা) ও অসুবিধা (আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা, সীমিত দর্শকশ্রোতা ইত্যাদি।)

মুদ্রিত মাধ্যম সম্পর্কে

1. তথ্য ও সংবাদের পার্থক্য
2. সংবাদের সূত্র— কে?, কখন?, কোথায়?, কেন?, কী?, কেমন করে?
3. সংবাদ হবার যোগ্যতা— সময়রেখা, প্রভাব, বিতর্ক, উল্লেখযোগ্যতা, সাম্প্রতিকতা, আবেগ, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষণীয়তা।
4. সংবাদের বিভিন্ন ধরন— আঞ্চলিক, স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক।
5. সংবাদের নিরপেক্ষতা, ভারসাম্য, বিশ্বাসযোগ্যতা।
6. ইতিবাচক ও নেতিবাচক সংবাদ।
7. ভারতীয় সংবাদপত্রে কলকাতার স্থান।
8. বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংবাদের স্থান।
9. সংবাদপত্রের বিভিন্ন আকার।
10. সংবাদের বাঞ্ছিত গুণাবলী।

বেতার মাধ্যম সম্পর্কে

1. রেডিওর উদ্দেশ্য— জানানো, শিক্ষিত করা, বিনোদন।
2. রেডিওর বৈশিষ্ট্য— ধ্বনির সাহায্যে ছবি গড়ে তোলা, দ্রুতগতিসম্পন্ন মাধ্যম, সাদাসিধে, বহনযোগ্য, কম খরচ।
3. রেডিওর সীমাবদ্ধতা— সুযোগ মাত্র একবার, ছবিহীন, প্রচারিত বার্তা সহজে ভুলে যায়, বধিরদের কোনো কাজে লাগে না।

টেলিভিশন মাধ্যম সম্পর্কে

1. বৈশিষ্ট্যসমূহ— দৃশ্য শ্রাব্য (), প্রাণবন্ত, ঘরোয়া, ক্ষণস্থায়ী, ব্যয়সাধ্য।
2. বিভিন্ন কাজ— শিক্ষিত করে, তথ্য জানায়, আনন্দ দেয়।
3. বিভিন্ন চ্যানেলের বৈশিষ্ট্য।
4. টেলিভিশনের সুবিধা ও অসুবিধা।

34.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

চিরাচরিত মাধ্যম

1. চিরাচরিত মাধ্যমের বিভিন্ন আঙ্গিকের উদাহরণ দিন।
2. চিরাচরিত মাধ্যমের সুবিধাগুলি দেখান।
3. জ্ঞাপনের কাজে চিরাচরিত মাধ্যমগুলি কোনটা কোনটা এখনো কী কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বুঝিয়ে দিন।

মুদ্রিত মাধ্যম

1. সংবাদের প্রধান ধরনগুলি কী কী?
2. সংবাদ ও তথ্য— দুয়ের মধ্যে তফাত দেখান।
3. সংবাদ হয়ে ওঠার যোগ্যতাগুলি বুঝিয়ে দিন।
4. কোনো খবরকে যথার্থ সংবাদ হতে হলে কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়?
5. সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

বেতার মাধ্যম

1. গণমাধ্যম হিসাবে বেতারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।
2. সামাজিক উন্নয়নে বেতারের ভূমিকা বুঝিয়ে দিন।

দূরদর্শন মাধ্যম

1. মাধ্যম হিসাবে টেলিভিশনের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখান।
2. আপনার সবচেয়ে প্রিয় টিভি প্রোগ্রাম কী? কেন প্রিয় সেটি বুঝিয়ে দিন।
3. টেলিভিশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বুঝিয়ে দিন

34.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

34.1 1) যে মাধ্যম বংশানুক্রমে আমাদের ঐতিহ্যের ধারা বহন করে, গণজ্ঞাপনের কাজ অব্যাহত রাখে তাকেই বলে চিরাচরিত মাধ্যম।

2) **i)** কথকতা **ii)** রঙ্গোলি **iii)** পুতুল নাচ

34.2 1) ক এবং খ

2) উত্তর ভারতে, গান ও নাচের মিশ্রণ।

3) উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে।

শব্দার্থ ও টীকা

34.3 1) **i)** ঘ **ii)** গ **iii)** যাত্রা

34.4 1) উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে।

2) উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে।

34.5 1. i) কে, (ii) কখন, (iii) কোথায়, (iv) কেন, (v) কেমন করে,

2. (ক) তথ্য, (খ) সংবাদ, (গ) তথ্য, (ঘ) সংবাদ

3. সময়-রেখা, বিতর্ক, প্রয়োজনীয়তা, প্রসিদ্ধি, নৈকট্য

34.6 1. সংবাদপত্র দেখে ঠিক করে নিন

2. সংবাদপত্র দেখে ঠিক করে নিন

3. যে সংবাদপত্রের সংবাদকে পাঠক বিশ্বাস করে

34.7 1. The Hindu, মালয়ালা মনোরমা, The Hindustan Times

2. The Times of India

3. নবজীবন, হরিজন

4. সতীদাহ বন্ধ, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী সংগ্রামীদের দেশপ্রেমের উদ্দীপনা যোগানো

34.8 1. ব্রড শিট, ট্যাবলয়েড, সাপ্তাহিক

2. পৃথিবীর সব ইন্টারনেট থেকে দেখা যায়

3. নৈর্ব্যক্তিকতা, সহজবোধ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা

34.9 1. বিনোদন, শিক্ষাদান। দৃষ্টান্ত নানা জনের নানা রকম হতে পারে।

2. সুলভ, বহনযোগ্য, ব্যবহার সহজ।

3. iv

4. i) ভুল, ii) ঠিক, iii) ভুল, iv) ঠিক, v) ভুল

34.10 1. পাঠের 'রেডিও সীমাবদ্ধতা' অংশটি দেখে উত্তর তৈরি করুন।

2. i) ভুল, ii) ঠিক, iii) ঠিক, iv) ঠিক, v) ঠিক

34.11 **1.** দূরদর্শনের দৃশ্যশ্রাব্য চরিত্র

2. প্রাণবন্ত, দৃশ্যশ্রাব্য বিষয়, ঘরোয়া

3. প্রাণবন্ত, দৃশ্যশ্রাব্য

4. i) খ, ii) গ, iii) ক, iv) ক।

34.12 **1.** **ক)** দূরশিক্ষা প্রণালীকে অনেক ঘনিষ্ঠ করা

খ) তথ্যপ্রদান

2. দূরদর্শনের 'জ্ঞান দর্শন' অনুষ্ঠান

3. উত্তর নানাজনের নানা রকম হতে পারে

4. i) টেলিভিশন, ii) নিকট শিক্ষার মতো, iii) ত্রুটি

34.13 **1.** i) ঘ, (ii) গ, (iii) ঘ।

2. i) ডিসকভারি চ্যানেল— বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক বিষয়

(ii) সংবাদ চ্যানেল— দেশ বিদেশের সংবাদ

3. i) 300M, (ii) Travel, (iii) Living, (iv) Zoom

34.14 **1.** i) কল্পনাভিত্তিক, (ii) বাস্তবভিত্তিক

2. i) সংবাদ, (ii) কুইজ

34.15 **1.** i) নানা রকমের অনুষ্ঠান, (ii) মুহূর্তের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দেওয়া, (iii) একই সঙ্গে বহু মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

2. i) নানা রকম হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

35 খ

গণজ্ঞাপনের সমস্যা ও সমাধান

35.1 প্রস্তাবনা

আধুনিক জীবনে গণজ্ঞাপনের প্রয়োজন অপরিহার্য। আমাদের জীবনযাপন আজ গণমাধ্যমের সাহায্য ছাড়া অচল। প্রতিমুহূর্তে মানুষ উদ্ভাবন করে চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা তথ্য। তার সুফল মানুষের সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে এনে দিচ্ছে নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্য, দূর করে দিচ্ছে নানা অভাব অসুবিধা, অনেক প্রচলিত অশুভ ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাস। সে সব তথ্য ও সংবাদ না জানলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। আবার সে সব তথ্য সর্বসাধারণকে জানিয়ে দিতে পারে গণজ্ঞাপন মাধ্যম। গণমাধ্যমের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

তবে আমাদের দেশে গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যমের প্রসার সর্বাংশে বাধামুক্ত নয়। তার অনেক কারণের মধ্যে যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার একটি হচ্ছে লিখিত বা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম সমাজের দূরবর্তী অংশ অবধি আজও পৌঁছায়নি। দ্বিতীয় কারণটি হল শিক্ষার অভাব। শহর, শহরতলি কিংবা গ্রামাঞ্চলের মানুষের একটি অংশের উপর গণমাধ্যম তার প্রভাব তেমন ফেলতে পারেনি। ফলে অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিবেচনা ও চিরাচরিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেনি ওই অংশটি। গণমাধ্যমের এটা একটা বড়ো সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বলেই মনে হবে।

এছাড়া গণমাধ্যমের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। এই পাঠে এই সব সমস্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। সেসব সমস্যার সমাধানের কিছু ভাবনা-চিন্তার কথাও আলোচিত হবে সেই সঙ্গে।

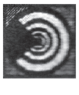

35.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়লে আপনি করতে পারবেন:

- গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা
- সমাজে গণমাধ্যমের বিরূপ প্রভাবের বিশ্লেষণ
- বিভিন্ন গণমাধ্যমের সমস্যার পর্যালোচনা
- বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের উপর আলোক পাত।

শব্দার্থ ও টীকা

35.1 গণজ্ঞাপনের প্রধান সমস্যাগুলো হল

ক) প্রযুক্তিগত: এযুগ প্রযুক্তির যুগ। যে দেশ প্রযুক্তিতে যত শক্তিশালী সে দেশ তত উন্নত। আমাদের দেশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে প্রযুক্তি-নির্ভর গণমাধ্যমের প্রসার ও প্রভাবের সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

আমরা দেখছি আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে আমাদের সমাজ চিরাচরিত মাধ্যমকে ছাড়িয়ে এসেছে লিখিত গণমাধ্যমের যুগে। আবার বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি হয়েছে বলেই আমরা লিখিত মাধ্যমের যুগ অতিক্রম করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যুগে প্রবেশ করেছি। কিন্তু প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশীয় গণমাধ্যমগুলো যেন টিকে থাকতে পারছে না। ফলে এই মাধ্যমের কোনো কোনো মালিকানা বহিরাগতদের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করছে। বহিরাগত মালিকানা আমাদের দেশের স্বার্থের চেয়ে তাদের মুনাফার স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে। ফলে গণমাধ্যমের পূর্ণ সদ্ব্যবহার থেকে দেশবাসী বঞ্চিত হচ্ছে। অবিলম্বে এই সমস্যার প্রতিকার প্রয়োজন।

খ) সাংগঠনিক পরিকাঠামোর সমস্যা: দেশের অর্থনীতি যথেষ্ট মজবুত হলে তবেই মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে গণমাধ্যমের জন্য আর্থিক আনুকূল্য দিতে পারে। তার অভাব ঘটলে সেটা সম্ভব হয় না। ফলে গণমাধ্যমের পরিকাঠামোর অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

গণমাধ্যমের উন্নয়ন এবং আয়তনগত বিস্তার ও প্রসারের জন্যই প্রথমেই চাই সুদক্ষ কর্মীবাহিনী যা এখনো যথেষ্ট নয়। তার উপর আছে আর্থিক সংগতির অভাব। প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের অভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের আধুনিকীকরণ বাধাপ্রাপ্ত। এই সব দুর্বলতার ফাঁকে গণমাধ্যমে ঢুকে পড়েছে বিদেশি প্রভাব। গড়ে তুলছে অসম প্রতিযোগিতা। এই সমস্যারও একটা সন্তোষজনক সমাধান চাই।

গ) লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা: গণমাধ্যমের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যবোধের অভাব ঘটলে তা গণমানসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক সময় গণমাধ্যম চটুল অনুষ্ঠান পরিবেশন করে শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করে। তাতে সমাজজীবনের রুচিবোধ ক্ষুণ্ণ হয়।

গণমাধ্যমের বিনোদনের দিকটাই অনেক সময় প্রধান হয়ে ওঠে আর মানুষের শিক্ষালাভের দিকটা গৌণ হয়ে যায়। পণ্যসামগ্রীর জনপ্রিয়তা বাড়াবার বাধ্যবাধকতার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অসামাজিক চাহিদার দিক তুলে ধরে গণমাধ্যম। এর ফলে নিজেই রুচিহীনতা ও বিকৃতির শিকার হয়ে ওঠে। এতে সমাজজীবন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম হিংসাকে প্রশ্রয় দেয়। সিনেমা টিভিতে হিংসাত্মক ঘটনা বিশেষ করে ছোটোদের মনোজগতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফলে সমাজের আগামী প্রজন্ম অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আমাদের সমাজের অপরাধ জগৎ এভাবে নিজের প্রভাব বাড়াবার সুযোগ পেয়ে যায়।

গণমাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপন সমাজের ক্ষতিও করে। বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে ক্রেতা তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস কিনে ফেলে। এতে আর্থিক অপচয় হয়। আবার বিজ্ঞাপনের বাহুল্যের ফলে অনেক সময় বিজ্ঞাপনই হয়ে ওঠে মুখ্য, আসল বার্তা চাপা পড়ে যায়।

গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা বা সচেতনতার অভাব ঘটলে তার নানারকম কুপ্রভাব সমাজের উপর পড়ে। সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ, সামাজিক সংকীর্ণতা, জাতীয় জীবনে অনৈক্য, সমাজজীবনে হিংসা ও হানাহানি প্রভৃতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অনেক সময় গণমাধ্যমের ভুল অথবা বিভ্রান্তিকর প্রচারের প্রতিক্রিয়ায় ঘটে থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

35.2 সাংস্কৃতিক সমস্যা

গণমাধ্যমের লক্ষ্যভ্রষ্ট পরিবেশনার সমস্যা ছাড়া আরও একপ্রকার সমস্যা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। সেটা হল গণমাধ্যমের গ্রাহকদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা।

ক) এখনও আমাদের দেশ তার অর্থনৈতিক পিছিয়ে পড়াকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সমাজের একটা বড়ো অংশ রয়ে গেছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। ফলে অন্নবস্ত্রের অভাব মেটানোই তাদের পক্ষে দুষ্কর। খবরের কাগজ, টিভি বা রেডিও কেনার ক্ষমতা থাকবে কী করে? সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান শোনার বা উপভোগ করার উৎসাহ থাকে না। অথচ এই অংশেরই গণমাধ্যম প্রচারিত তথ্য ও ঘটনা জানার প্রয়োজনটা খুব জরুরি।

খ) এই সঙ্গেই আসে নিরক্ষরতার সমস্যা। দারিদ্র্যের জন্য আমাদের দেশের জনগণের বড়ো অংশটাই থেকে গেছে নিরক্ষর। লিখিত মাধ্যমের সুযোগ এরা গ্রহণ করতে পারে না। আবার বৈদ্যুতিন মাধ্যমের অনেক অনুষ্ঠান এদের কাছে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। এগুলোকে ওপরতলার মানুষের জন্য বলে মনে করে এরা। ফলে গণমাধ্যম এদের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে। আর এই সব দুর্বলতার কারণে দৈবশক্তি ও অলৌকিক শক্তি, ভাগ্যের উপর নির্ভরতা সম্বল করেই যেন এরা চলে। নানারকম কুসংস্কার ও প্রগতি বিরোধিতা এদের মনে শিকড় গেড়ে বসে। সহজে এ শিকড় উৎপাটন করা যায় না। গণমাধ্যমের সর্বাঙ্গীণ সক্রিয়তার পক্ষে এটা একটা বিরাট সমস্যা।

পাঠগত প্রশ্ন 35.1

1. গণমাধ্যমের দুটি সমস্যার উল্লেখ করুন।
2. গণমাধ্যম প্রচারিত বিজ্ঞাপন কীভাবে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে?
3. গণমাধ্যম সমাজের রুচিবোধকে কীভাবে ক্ষুণ্ণ করে?
4. সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশ গণমাধ্যমের সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না কেন?

35.3 আলোচিত সমস্যাগুলির সমাধান

প্রযুক্তিগত সমস্যা: এই সমস্যার সমাধানের পথ খুলে দিতে পারে প্রযুক্তি বিষয়ে উন্নততর গবেষণা। আমাদের দেশের মানব সম্পদ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। উপযুক্ত মেধার অভাব এদেশে নেই। কাজেই উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে অবিলম্বে কাজ শুরু করা যেতে পারে। প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের বিষয় মনে রেখে খোলা হয়েছে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। আশা করা যায় গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান অচিরেই সম্ভব হবে।

সাংগঠনিক পরিকাঠামোর সমস্যা: সম্প্রতি বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে প্রাণপণ চেষ্টায় নেমেছ। এই প্রতিযোগিতার ফলে অনেক ঐতিহ্যশালী সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অনেক গণমাধ্যম অনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থহানিকর অনেক অনুষ্ঠান প্রচার করতে দ্বিধা করছেন না, অনেক টিভি চ্যানেলের মালিকানা বদল হয়ে গেছে। ফলে এসব মাধ্যম ভালোর চেয়ে খারাপটাই বেশি করছে।

এতো গেল প্রতিযোগিতার একটা দিক। এই সমস্যার আর একটা দিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুদক্ষ কর্মীর

শব্দার্থ ও টীকা

অভাব। এদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে গণমাধ্যমের সাংগঠনিক পরিকাঠামোর গুণগত মান।

এই কর্মীদের জন্য চাই উন্নতমানের প্রশিক্ষণ। এর জন্য একাধিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র চাই যেখানে তৈরি হবে সুদক্ষ কর্মীবাহিনী, বিশেষজ্ঞবৃন্দ। এদের কাজ হবে কর্মরত যারা তাদের কাজকর্মের মানকে উন্নত করার জন্য হাতেনাতে দেখিয়ে দেওয়া। এরাই তৈরি করবে সাংগঠনিক পরিকাঠামোকে আধুনিক মানে উন্নীত করার জন্য পাঠক্রম। তবে এ সবের জন্য যে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হবে তার জোগানেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা: এই সমস্যার সমাধানের কিছু ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এখানে সে-সবকে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সমাধানের আরও কিছু পথের কথাও সংযোজিত হচ্ছে।

1) গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি থাকা চাই। কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনকে নিয়ে যদি কোনো বিতর্কিত সংবাদ প্রচারিত হয় তা হলে সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের পাল্টা যুক্তি প্রকাশেরও সুযোগ থাকতে হবে।

2) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের উৎস (নাম, দপ্তর প্রভৃতি) গোপন রাখতে হবে।

3) প্রাসঙ্গিক বক্তব্যটুকুই কেবল প্রকাশ করা যাবে, কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু জানানো অনৈতিক।

4) এমন কোনও বার্তা বা সংবাদ প্রকাশ করা অন্যায় হবে যা অমার্জিত, অশালীন, হিংসার উস্কানি বা বিদ্বেষমূলক।

5) গণমাধ্যমকে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা (যথা, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ইত্যাদি) থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

6) মানুষের দরকারি নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করে জনসাধারণকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

7) গণমাধ্যম হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যথার্থ সহায়ক।

8) জনকল্যাণের জন্য গৃহীত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রচারে গণমাধ্যমকে অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে।

9) গণমাধ্যমে প্রচারিত তথ্য যথাযথ হওয়া চাই। সংবাদ যাতে অসত্য বা ভিত্তিহীন না হয় তার জন্য কঠোর সতর্কতা থাকা চাই।

এছাড়াও জনসাধারণের একটা বিশেষ অংশে গণমাধ্যমের প্রভাব বিস্তারের সমস্যার কিছু সমাধানের কথা:

গণমাধ্যমের যে সব দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হল তা দূর করার নানা উপায় অনেকেই ভেবেছেন। উপায়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক। সমাধানের এই কথাগুলো বিভিন্নপ্রকার গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভৌগোলিক ভাবে দুর্গম ও দূরবর্তী স্থানের অধিবাসীদের জন্য গণমাধ্যমকে দুদিক থেকে সক্রিয় হতে হবে। প্রথমত এসব এলাকার মানুষের কাছে গণমাধ্যম সামগ্রীকে সহজলভ্য করে তোলা। এর জন্য দরকারে ভরতুকির ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়ত, ওইসব অঞ্চলে জনপ্রিয় চিরাচরিত মাধ্যমের বিষয় ও আঙ্গিককে সময়-উপযোগী করার ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু কোনও ক্রমে ওদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এমন কোনও

শব্দার্থ ও টীকা

পদক্ষেপ গ্রহণ অনুচিত হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সাক্ষরতার অভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশকে গণমাধ্যমমুখী করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এর জন্য পরিকল্পিত অভিযান (Drive) চালানো যেতে পারে।

তাছাড়া ওদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকে চিহ্নিত করা এবং তার দিকে লক্ষ রেখে বিশেষ অনুষ্ঠানসূচি রচনা করা দরকার। গণমাধ্যম যে আন্তরিকভাবে ওদের শিক্ষাগ্রহণকে সহজসাধ্য করতে চায়, ওদের উপার্জনের পথকে খুলে দিতে চায় এই কথাটা ওদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। তবেই ওদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে। আর এভাবেই ওদের অবৈজ্ঞানিক ধারণা ও কুসংস্কারের শিকড় ক্রমেই শিথিল হয়ে উঠবে।

পাঠগত প্রশ্ন 35.2

1. গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতার একটি খারাপ দিকের উল্লেখ করুন।

2. গণমাধ্যমের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি পদক্ষেপের উল্লেখ করুন।

3. সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশকে গণমাধ্যমমুখী করার জন্য একটি পদক্ষেপের কথা লিখুন।

35.4 আপনি যা শিখলেন

1. প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের এঁটে উঠতে না পারার সমস্যা।
2. যথেষ্টসংখ্যক সুদক্ষ প্রযুক্তি কর্মী পাবার সমস্যা।
3. গণমাধ্যম শিল্পে অর্থ জোগানের সমস্যার কথা।
4. লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক না থাকলে গণমাধ্যমের প্রচারিত অনুষ্ঠান সমাজে ক্ষতি করার কথা।
5. গণমাধ্যমের সুযোগ সমাজের সব মানুষের পাবার সমস্যার কথা।
6. কী ভাবে এসব সমস্যার সমাধানের পথ বের হতে পারে তার বিষয়ে কিছু সুপারিশ।

35.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. কারা গণমাধ্যমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত?
2. গণমাধ্যমের উপযুক্ত লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে সমাজে কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়?
3. বিজ্ঞাপন প্রচারের একটি ভালো ও একটি খারাপ দিক উল্লেখ করুন।
4. গণমাধ্যমের দৃষ্টিভঙ্গি অভ্রান্ত রাখতে হলে কী কী সতর্কতার দরকার— পাঁচটির কথা লিখুন।
5. সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার বিভ্রান্তি দূর করতে গণমাধ্যম কী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?

শব্দার্থ ও টীকা

35.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

35.1 **1.** i) সাংগঠনিক, ii) লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিগত

2. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করে অপব্যয় ও অমিতব্যয়িতা

3. কুরুচিকর বিজ্ঞাপন প্রচার করে।

4. আর্থিক অভাব ও কুসংস্কারের কারণে।

35.2 **1.** সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর অনুষ্ঠান প্রচার করে।

2. i) বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা।

ii) সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকা।

iii) হিংসার উসকানি থেকে বিরত থাকা।

3. সেই অংশের উপযোগী অনুষ্ঠান পরিবেশনা।